বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২০৪৬
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ষষ্ঠখণ্ড।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯৬ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্ ৫নং, জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্রালয়ে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল।

সন ১২৯৬ সাল, ষষ্ঠ খণ্ডের

সূচীপত্র।

কবিরাজী।

বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
গতবর্ষ	কবিরাজ সম্পাদক	১
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—মানবশত্রু—স্ত্রী	ঐ	৬-৬৫-১৩৩-২৩৩
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা—সূতিকারোগ,	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	১৭৯-১৪১-২৪১-৩০৯-৩২৯
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ	রামনিরঞ্জন রায় চৌধুরী জমীদার	২৬-২১৫
ঐ	প্রিয়নাথ দাস কবিরাজ	২৮-১১৮
ঐ	হৃদয়নাথ শর্ম্মা	৩১-১২১
আবার একটী নূতন কথা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৪১
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী লৌহপট্‌পটী	কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	৫০-২০৪-২৪৫
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	কবিরাজ জগবন্ধু সেন গুপ্ত	৫১-২০৯-২৫১
প্লীহারোগ	কবিরাজ সম্পাদক	৫৬
পাঁচনের অসীম ক্ষমতা	গগনচন্দ্র নন্দী	৫৮
অধর্ম্ম হইতে রোগোৎপত্তি	কবিরাজ সম্পাদক	৭৫
দ্রব্যগুণতত্ত্ব—হরীতকী	কবিরাজ নৃপেন্দ্রকুমার রায়	৭৯
রোগ হইলে চিকিৎসা কর্ত্তব্য,	কবিরাজ প্যারীমোহন সেন	১২৪
ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি	কবিরাজ প্রাণগোবিন্দ রায়	১২৭-২০৬-২৪৭
রায় সুরেন্দ্রনাথ ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন,	কবিরাজ সম্পাদক	১২৯
পান-তাম্বূল	(উদ্ধৃত)	১৫৯
ধাতুব্যাখ্যা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	১৬১-২৬৫
মতদ্বৈধ হয় কেন?	ঐ	১৭১-৩৪৯
টোট্‌কা ঔষধ (উদ্ধৃত)		২১৯
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ (সম্পাদকীয়)	কবিরাজ সম্পাদক	২২২-২৯৯-৩৯৪
কুষ্ঠরোগ ও লেডি ডফারীণের ফণ্ডদ্বারা স্ত্রীলোকের চিকিৎসা সম্বন্ধে কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য	ঐ	২৭৪
পরীক্ষাতত্ত্ব	প্রাণগোবিন্দ রায়	২৮১

অবলাবান্ধব	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	২৯০-৩৮৫
সমালোচনা	কবিরাজ সম্পাদক	২৯৯
ঔষধবিনা রোগশান্তি	বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৫
খাদ্যাখাদ্য	কবিরাজ সম্পাদক	৩১৮
মুড়ি ও নারিকেল (উদ্ধৃত)		৩৫৩

এলোপেথী।

স্ত্রী ও পুরুষ	ডাক্তার সম্পাদক	৪-৭১-১৩৭-২৩৬-৩২২
লক্ষণতত্ত্ব	ঐ	১১-৮৯-১৬৫
নাসিকা	ঐ	১৫-৯৩-১৫২-২৮৬
কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ	ঐ	২৪-১১২ ২১১-২৯৩-৩৯৩
পেঁপিয়া ফলের ভৈষজ্যতত্ত্ব	ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এম্ বি	৩১
সূতিকা তরুণজ্বর বা প্রসূতির পচাজ্বর,	ডাক্তার সম্পাদক	৪৭-১৪৪-২৮৮
পুরাতন প্লীহারোগের চিকিৎসা	ঐ	৫৩
পুল্‌টিস্	ঐ	৬০
বমনকারক ঔষধ	ঐ	১১৫
বাঙ্গলায় চিকিৎসক সমাজ,	ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিএ, এম্ বি	১৭৮
কাশরোগে বায়ুপরিবর্ত্তনের উপযোগিতা ও উপকারিতা	ডাক্তার অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস,	২০৮
খাদ্য	ডাক্তার সম্পাদক	২৩৯ ৩১৩
সংশয় অপনয়ন	ঐ	২৫৪
ইংরেজরাজ্যে কুষ্ঠরোগের বৃদ্ধি	ঐ	২৬৮
চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিণাম,	ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিএ, এম্ বি	৩৩৫
পূর্ব্ববঙ্গ	ডাক্তার সম্পাদক	৩৬১
কলিকাতা মেডিকেল স্কুল	ঐ	৩৮১
কুইনাইনের অপব্যবহার	ঐ	৩৮৮

হোমিওপেথী।

হোমিওপেথিক ঔষধতত্ত্ব	ডাক্তার শিখরকুমার বসু, এল, এম্, এস্	৩৬-১০৫-১৪৮
শিশু চিকিৎসা	ঐ	৬২-৮৬-১৫৬-২৬০
জ্বরচিকিৎসা	ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রেয়, এম্, বি	১৯৩-৩২৭

৬ষ্ঠ খণ্ড। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। ১ম ও ২য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

(চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা)

৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯৬ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদককর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। ডাক্তার শিখরকুমার বসু এল, এম্, এস্। ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি। ডাং গগণচন্দ্র নন্দী। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। বাবু রামনিরঞ্জন রায় চৌধুরীজমীদার। প্রিয়নাথ দাস কবিরাজ। জগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত। শ্রী—এবং সম্পাদকদ্বয়।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট, ৫নং জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৯।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনার হিসাবে এই দুই সংখ্যার একত্রে নগদ মূল্য ৸০ বার আনামাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
গতবর্ষ	১
স্ত্রী ও পুরুষ	৪
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (মানবশত্রু-স্ত্রী) ...	৬
লক্ষণতত্ত্ব	১১
নাসিকা	১৫
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা	১৭
কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ	২৪
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ	২৬
পেপিয়াফলের ভৈষজ্যতত্ত্ব	৩১
হোমিওপ্যাথি ঔষধতত্ত্ব	৩৬
আবার একটী নূতন কথা	৪১
সূতিকা তরুণজ্বর বা প্রসূতির পচাজ্বর ...	৪৭
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী	৫০
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	৫১
পুরাতন প্লীহারোগের চিকিৎসা	৫৩
প্লীহারোগী বৈদ্যমতে	৫৬
পাচনের অসীম ক্ষমতা	৫৮
পোলটীস্	৬০
শিশুচিকিৎসা (হোমিওপ্যাথিমতে) ...	৬২

বিজ্ঞাপন।

সানুবাদ-শার্ঙ্গধরসংগ্রহ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে নাড়ীপরীক্ষা, রোগগণনা, রোগের সাধ্যাসাধ্যনির্ণয়, তৈল ও ঔষধাদিপ্রস্তুতপ্রণালী, শোধন ও ভস্মপ্রকরণ, বিবিধ মুষ্টিযোগ, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ, আসব, অরিষ্ট এবং পঞ্চকর্ম্মের বিষয় আরো অনেক নূতন নূতন বিষয় আছে। একাধারে এতগুণ অন্য পুস্তকে নাই। মূল্য সডাক ২৷৷৵০ আনামাত্র। বঙ্গানুবাদসহ সটীক চক্রদত্ত মূল্য ৪৷০। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত। ১২৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মূল্যপ্রাপ্তি।

হিজ্‌হাইনেস্‌দী মহারাজা অব্ বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান	... ...	১৬৸৵০
শ্রীমতী রাণী নিস্তারিণী দেবী	মহিষাদল রাজবাটী	...	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত রাজা রমণীকান্ত রায় বাহাদুর	চৌগ্রাম, রাজসাহী	...	৩৷৵০
,, রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর	শেওড়াফুলী রাজবাটী	...	৩৷৵০
,, রাজা ফণীন্দ্রভূষণ দেবরায়	দীনাবাজার, জলপাইগুড়ি		৩৷৵০
,, রাজা মুরলীলাল রায় চৌধুরী	গড়কীকিশোর নগর, কাঁথি		৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী জমীদার	সেরপুর	...	৩৷৵০
,, ,, কুমার বরদাকান্ত রায় চৌধুরী	নাটোর	... ...	৩৷৵০
,, ,, ম্যানাজার দীঘাপতিয়া ষ্টেট্	দীঘাপতিয়া	... ...	৩৷৵০
,, ,, গিরিজানাথ রায় চৌধুরী জমীদার	সাতক্ষীরা	... ...	৩৷৵০
,, ,, ভূঞা অক্ষয় নারায়ণ দাস মহাপাত্র জমীদার	বালিসাইড়, মেদিনীপুর	...	৩৷৵০
,, ,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার	কামেশ্বরপুর, বর্দ্ধমান		৩৷৵০
,, ,, কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র জমীদার	দাঁতুন, মেদিনীপুর		৩৷৵০
,, ,, নফরচন্দ্র ভট্ট সবজজ্	বরিশাল	...	৩৷৵০
,, ,, কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর	কুচবিহার ষ্টেট্	...	৩৷৵০
,, ,, নবীনচন্দ্র দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্	মুঙ্গের	..	৩৷৵০
,, ,, উপেন্দ্রনাথ দাস মহাপাত্র জমীদার	পঁচেটগড়, মেদিনীপুর		৩৷৵০
,, ,, ব্রজমোহন রায় ডেপুটীম্যাজেষ্ট্রেট	বাঁকীপুর	...	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী L. M. S.	কালনা	...	৩৷৵০
,, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর	দিল্লী	...	৩৷৵০
,, ডাক্তার জগদ্বন্ধু মিত্র	মহাজনটুলী, বর্দ্ধমান	...	৩৷৵০
,, রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	...	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমীদার	মুক্তাগাছা	...	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বনারায়ণ রায় মহাশয় জমীদার	লক্ষ্মণনাথ, বালেশ্বর		৩৷৵০
,, ,, বনয়ারীলাল ঘোষ কাননগো	গোয়ালন্দ	...	৩৷৵০
,, ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্লীডার	বহরমপুর	...	৩৷৵০
,, ,, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত প্লীডার	যশোর	...	৩৷৵০

,, ,,	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্লীডার	কৃষ্ণনগর ...	৩৷৶০
,, ,,	যাত্রামোহন সেন প্লীডার	চট্টগ্রাম ...	৩৷৶০
,, ,,	উমেশচন্দ্র সান্যাল	বেনারস ...	১৸৶০
,, ,,	কুমারনাথ বসু	আরা ...	১০৷৶০
শ্রীযুক্ত	ডাক্তার রাজকুমার সেন	জলপাইগুড়ি ..	৩৶০
,,	ডাক্তার বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবঘর, বৈদ্যনাথ ...	৬৸০
,,	কবিরাজ হারাণচন্দ্র মজুমদার	গাইবাঁধা, রঙ্‌পুর ...	৩৷৶০
শ্রীযুক্ত	বাবু বিলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রহমৎপুর, বরিশাল ...	৩৷৶০
,, ,,	চন্দ্রকুমার বসু	নাউসর, খানাকুল ...	১০৶০
,, ,,	নারায়ণ প্রসাদ মিত্র কমিশনার	আফিষ, কটক ...	৬৸০
,, ,,	দুর্গাচরণ দে লারসিংহ চাগান	শিলচর ...	৩৷৶০
,, ,,	অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়	ভাঙ্গা, ফরীদপুর ...	৩৷৶০
,, ,,	দ্বারকানাথ ঘোষ	গোবিন্দগঞ্জ, বগুড়া ...	৩৷৶০
,, ,,	জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বাকলযোড়া, দেউটোকন	৩৷৶০
,, ,,	তারিণীচরণ দত্ত	বাঘুটীয়া, যশোর ...	৩৷৶০
শ্রীযুক্ত	কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত	নড়াল	৩৷৶০
,,	বাবু হরিমোহন ঘোষ	নাটোর	৩৷৶০
,,	ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	বনগ্রাম	৩৷৶০
,,	ডাক্তার ভুবনচন্দ্র দে এল্, এম্, এস্,	মধুপুর, কালনা ...	৩৷৶০
,,	বাবু হেমচন্দ্র গর প্লীডার	জাহানাবাদ ...	৩৷৶০
,,	ডাক্তার ধরণীধর হালদার	যশোর	৩৷৶০
,,	ডাক্তার শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	দাঁতুন	৩৷৶০
,,	ডাক্তার বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার	জঙ্গলবাড়ী ...	৩৷৶০
,, ,,	ভুবনমোহন দত্ত	বরাহনগর ...	৩৷৶০
,,	ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	আঝাপুর, মেমারী ...	৩৷৶০
,,	ডাক্তার নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আমলাসদরপুর, পোড়াদহ	৩৷৶০
,,	ডাক্তার শ্রীনাথ গুহ	সমশেরনগর চাবাগান, শ্রীহট্ট	৩৷৶০
,,	বাবু উদয় গোবিন্দ চৌধুরী	চরদীঘা, বালাগঞ্জ ...	৫৲
,,	ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায়	পাঁচথুপী, সাঁইথিয়া ...	৩৷৶০
,,	ডাক্তার গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ডোমকোল, মুর্শিদাবাদ	৩৷৶০
,,	ডাক্তার শ্রীধর দাসগুপ্ত	ফরীদপুর ...	৩৷৶০

,,	ডাক্তার রাজকুমার ঘোষ	মুর্শিদাবাদ ...	৩৷৶০
,,	ডাক্তার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	মরিচা, জাগুলিয়া ...	৩৷৶০
,, ,,	ডাক্তার গগণচন্দ্র দাসগুপ্ত	পুরী, বালেশ্বর ...	৩৷৶০
,, ,,	বাবু ভৈরবপ্রসাদ ক্ষেত্রী	মছরহাটা, পাটনা ...	৩৷৶০
,, ,,	কুমুদচন্দ্র রায় নায়েব	করিমপুর, নারায়ণগঞ্জ	৬৸০
শ্রীযুক্ত	বাবু শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী	চোয়ালইব্রারী ...	৩৷৶০
,, ,,	হেমচন্দ্র বসু	কামারকিতা, মণ্ডলগ্রাম	২৷৶০
,, ,,	নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়	খরণীয়া, খুলনা ...	২৲
,, ,,	পূর্ণচন্দ্র চটোপাধ্যায় কবিরাজ	চারঘাট, গোচরডাঙ্গা ...	২৷৶০
,, ,,	অঘোরনাথ হাজরা	বুড়ার, রায়না ...	২৷৶০
,, ,,	চন্দ্রকান্ত ঘোষাল	নাড়াজোল ...	২৷৶০
,, ,,	নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ	মেদিনীপুর ...	২৷৶০
,, ,,	শ্যামনাথ বন্দোপাধ্যায় ডাক্তার	ঘোড়াঘাট, উলুবেড়িয়া ...	২৷৶০
,, ,,	উদয়নারায়ণ বেরা	হেড়া, লাখি, মেদিনীপুর ...	২৷৶০
,, ,,	উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	কুকুটীয়া, ঢাকা ...	২৷৶০
,, ,,	রসিকচন্দ্র বিশ্বাস কবিরাজ	লোয়পাড়া, চট্টগ্রাম ...	২৷৶০
,, ,,	হেরম্বনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়	লোকপাড়া, সাঁইথিয়া ...	৩৷৷০
,, ,,	বিষ্ণুদাস নাথ ডাক্তার	নবাবগঞ্জ, মালদহ ...	১৷৶০
,, ,,	মনমোহন গুপ্ত	সাহেবগঞ্জ ...	৩৷৶০
,, ,,	রাইচরণ মণ্ডল	বাদুড়িয়া, বসীরহাট ...	২৷৶০
,, ,,	যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	জগন্নাথপুর, কৃষ্ণনগর ...	২৷৶০
,, ,,	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার	বেলুন, মেদিনীপুর ...	২৷৶০
,, ,,	দীননাথ দাস	সেন হাটী, খুলনা ...	২৷৶০
,, ,,	শ্রীশচন্দ্র গুহ	বৈটপুর, খুলনা ...	২৷৶০
,, ,,	ভুবনমোহন মৈত্র	বনগ্রাম, পাবনা ...	২৷৶০
,, ,,	বনমালী দাস	রহমৎপুর, বরিশাল ...	২৷৶০
,, ,,	দুর্গাচরণ গুপ্ত কবিরাজ	যশোর ...	২৷৶০
,, ,,	ললিতচন্দ্র দাস	বগুড়া ...	২৷৶০
,, ,,	মুকুন্দচন্দ্র রায়	মোহনপুর, পাবনা ...	২৷৶০
,, ,,	কালীকান্ত বিশ্বাস	পাবনা ...	২৷৶০
,, ,,	গিরিশচন্দ্র সরকার	কাশীপুর, পাবনা ...	২৷৶০

,, ,,	মাধবচন্দ্র ঘটক	কোড়কদী, পাংসা	... ২।৶০
,, ,,	পতিতপাবন রায়	বেলতৈল, পাবনা	... ২।৶০
,, ,,	রামচন্দ্র বসু ডাক্তার	মুকুন্দপুর, কালীগঞ্জ	... ২।৶০
,, ,,	দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী	মাধবপুর, সেরপুর,	... ২।৶০
,, ,,	কুঞ্জকিশোর চক্রবর্ত্তী	ঈশ্বরগঞ্জ	... ২।৶০
,, ,,	কে, পি, ভদ্র	আমিনবাজার, কৃষ্ণনগর	... ২।৶০
,, ,,	বঙ্গচন্দ্র চন্দ্র পণ্ডিত	জলপাইগুড়ি	... ২।৶০
,, ,,	কৃষ্ণদাস বসু মল্লিক	উস্তি, নাজরা	... ২।৶০
,, ,,	যদুনাথ বিশ্বাস	দৌলৎপুর, নদীয়া	... ২।৶০
,, ,,	রামকুমার সিংহ	শিমুলকান্দি, নারায়ণডহর	... ২।৶০
,, ,	বিপিনবিহারী ঘোষ	কামারকাটী, জলাবাড়ী	... ২।৶০
,, ,,	নবকৃষ্ণ নন্দী	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	... ২।৶০
,, ,,	হরিনাথ অধিকারী	নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	... ২।৶০
,, ,,	লক্ষ্মণচন্দ্র পাল	রুদ্রপুর, বাদুড়িয়া	... ২।৶০
,, ,,	ভোলানাথ অধুর্য্য	বাকুড়া	... ২।৶০
,, ,,	জগন্নাথ সাহা	কাশীমগঞ্জ, রাজমহল	... ২।৶০
,, ,,	কৃষ্ণপ্রসাদ রাণা	অজানবাড়ী, মেদিনীপুর	২।৶০
,, ,,	রাধিকাকান্ত গোস্বামী	বরুইচর, পাবনা	... ২।৶০
,, ,,	নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী	বন্দ্যকাওয়ালজানি, টাঙ্গাইল	২।৶০
,, ,,	বালকনাথ দাস	কয়থা, বীরভূম	... ২।৶০
,, ,,	প্রাণগোপাল দে	শিববাটী, বগুড়া	... ২।৶০
,, ,,	চন্দ্রনাথ গন্ধবণিক	বাগুয়া, ঢাকা	... ২।৶০
,, ,,	গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	বড়িশার কালী নগর, ঢাকা	২।৶০
,, ,,	নবগোল বন্দ্যোপাধ্যায়	দাঁইহাট, কাটোয়া	... ২।৶০
,, ,,	চন্দ্রকান্ত কুশারী	মুরাদনগর, ত্রিপুরা	... ২।৶০
,, ,,	বিপিনবিহারী বৈরাগী	চিথলিয়া, পাবনা	... ২।৶০
,, ,,	বিনোদবিহারী রায়	তালন্দ, রাজসাহী	... ২।৶০
,, ,,	দেবেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ	... ২।৶০
,, ,,	প্রাণবন্ধু চক্রবর্ত্তী	তারাপুর, হাতিয়ালদহ	... ২।৶০
,, ,,	রামলাল চক্রবর্ত্তী	গোরখপুর	... ২।৶০
,, ,,	শিবচন্দ্র চৌধুরী	পুষা, দ্বারভাঙ্গা	... ২।৶০

,, ,,	শ্যামাচরণ গুপ্ত ডাক্তার	গোপালগঞ্জ	... ২।৶০
,, ,,	ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্য	দেউটোকন, পাইকপাড়া	... ২।৶০
,, ,,	রামচন্দ্র দাস বৈরাগী	বরেয়া, কালীগঞ্জ	... ২।৶০
,, ,,	ভক্তিরাম চৌধুরী	বড়পেটা, আসাম	... ২।৶০
,, ,,	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মাদরাল, ২৪ পঃ	... ২।৶০
,, ,,	পূর্ণচন্দ্র অধিকারী	পাকুড়িয়া, সাড়া	... ২।৶০
,, ,,	দেবরাজচন্দ্র শ্রীবাটী	বর্দ্ধমান	... ২।৶০
,, ,,	রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চিড়িমারসাই, মেদিনীপুর	... ২।৶০
,, ,,	শ্রীনাথনিয়োগী	বেড়াবুচিনা, টাঙ্গাইল	... ২।৶০
,, ,,	রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	খলিশাদী, ২৪ পং	... ২।৶০
,, ,,	শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	মনসাতলা, খিদিরপুর	... ২।৶০
,, ,,	কৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা	সলিলআড়া, টাঙ্গাইল	... ২।৶০
,, ,,	রজনীকান্ত জয়	পশ্চিমদী, ঢাকা	... ১।৶০
,, ,,	উমেশচন্দ্র সান্নাল সব্ জজ	হাউস, বহরমপুর	... ২৸০
,, ,,	রাখালদাস মুখোপাধ্যায়	খলিশখালি, খুলনা	... ১।৶০
,, ,,	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বেড়গম, গোবরডাঙ্গা	... ২।৶০
,, ,,	শরচ্চন্দ্র পাল	কৃষ্ণনগর	... ১।৶০
,, ,,	শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মাগুরা, সাৎক্ষীরা	... ১।৶০
,, ,,	রাজকুমার দও	জলাবাড়ী, বরিশাল	... ৩৷৷০
,, ,,	বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়	ঝাপা, যশোর	... ১৷৷৶০
,, ,,	সিদ্ধেশ্বর বসু	সুগন্ধ্যা, হুগলী	... ১৸৶০
,, ,,	অন্নদাপ্রসাদ সাহা	সাঁকারীটোলা, পাবনা	... ২৲
,, ,,	রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	ধোঁড়াদহ, নদীয়া	... ১।৶০
,, ,,	গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা	ভিনারীর হাট	... ২।৶০
,, ,,	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	লালগোলা, মুর্শিদাবাদ	... ২৲
,, ,,	হরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঢাকা	... ১৲
,, ,,	পরমেশ্বর ঘোষ	কড়াইল, টাঙ্গাইল	... ১৵০
,, ,,	রজনীকান্ত শীল	কনকসার, ঢাকা	... ১৲

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	শ্যামবাজার কলিকাতা	... ৩৲

„	ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্রী এল্, এম্, এস্, বড়বাজার,	কলিকাতা	...	৩৲
„	বাবু কামিনীকুমার সেন শ্যামবাজার	ঐ	...	১৲
„ „	যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পাথুরেঘাটা	ঐ	...	২৲
„ „	তারকনাথ ভট্টাচার্য্য জানবাজার	ঐ	...	২৲
„ „	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় H. P. Doctor. চিৎপুর রোড	ঐ	...	৪৲
„ „	অঘোরচন্দ্র সরকার শিমলা	ঐ	...	২৲
„ „	ভগবতীচরণ মিত্র যোড়াসাঁকো	ঐ	...	৫৲
„ „	নীলমণি পাল শ্যামবাজার	ঐ	...	২৲
„	ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বসু আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট্	ঐ	...	৩৲
„	বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিমলা	ঐ	...	৩৲
„ „	দুর্গাচরণ রক্ষিত বড়বাজার	ঐ	...	৩৲
„	কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কণ্ঠাভরণ যোড়াসাঁকো	ঐ	...	৩৲
„	বাবু হরিনারায়ণ দে চিৎপুর	ঐ	...	৩৲
„ „	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী বাগবাজার	ঐ	...	২৲
„ „	রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ শোভাবাজার রাজবাটী	ঐ	...	৬৲
„ „	অক্ষয়কুমার ঘোষ শ্যামবাজার	ঐ	...	৩৲

স্থানাভাবে ক্রমশঃ—

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

গতবারে ভিঃ পিঃ দ্বারা যে সমস্ত টাকা আদায় করা গিয়াছে। তন্মধ্যে পোঃ মঃ মাদারীপুর ঠিকানা হইতে যে ২।৶০ টাকা আসিয়াছে, উহার ভিঃ পিঃ কুপনে প্রেরকের নাম ধাম না পাওয়াতে আমরা এই টাকা জমা করিতে পারি নাই, অথচ হয়ত তাঁহার নাম কাটীয়া দিয়াছি, অতএব পত্র-দ্বারা জানাইয়া বাধিত বরিবেন।

ম্যানাজার।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

৬ষ্ঠ খণ্ড]   বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ সাল।   [১ম ও ২য় সংখ্যা।

গতবর্ষ।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা সকল গতবর্ষের সমালোচনা করিয়া থাকেন। কোন্ দেশে কোন্ রাজা সিংহাসনস্থ বা সিংহাসনচ্যুত হইল—কোথায় বা যুদ্ধবিগ্রহাদি সংঘটিত হইল—কোন্ নূতন আইনের বা সৃষ্টি হইল—ইত্যাকার কথা লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত রহিয়াছেন। ধর্ম্মপত্রিকা সকল কোন্ ধর্ম্ম বা কোথায় কাহাকর্ত্তৃক প্রচারিত হইল—কত লোক বা কোন্ নূতনধর্ম্মভুক্ত হইল—ইহার আলোচনায় বাদবিসম্বাদ করিতেছেন। সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা সকল—গতবর্ষে কত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাদের গ্রন্থকারই বা কে—সাহিত্যসংসার বা তদ্দ্বারা কতদূর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছেন—এই সকল আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। এইরূপে মহাজন আপনার আয়ব্যয়ের হিসাবে গতবর্ষ সমালোচন করিতেছেন, কৃষক আপনার কৃষিজাতদ্রব্যে ও বৈরাগী আপনার বৈরাগ্যভাবের উন্নতি বা অবনতিতে গতবর্ষ সমালোচন করিতেছেন। এক্ষণে আমরা আমাদের সম্মিলনীকে লইয়া কিরূপ সমালোচনা করিব? সম্মিলনী কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার চর্চ্চা রাখেন না—কোন দেশের বা জনপদের সমাচার বহন করাও ইঁহার জীবনব্রত নয়—এতদ্দ্বারা কৃষি বা বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কোন লাভালাভেরও আলোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে গতবর্ষ সমালোচনায় আমরা কোন্ নূতন সুসমাচার লইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইব? সম্মিলনী যে দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, গতবর্ষের সমালোচনায় ইহার জয়পরাজয় বা লাভালাভ বিচার করিবার সুযোগ নাই। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের সমন্বয় করা—ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে মূলসত্যের নির্ব্বাচন করা—ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় উপকারক ঔষধ ও পথ্যের নিরূপণ করা—ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর চিকিৎসকগণের বহুজ্ঞতার ফল একত্রে সন্নি-

বেশ দ্বারা সার সত্যের সঙ্কলন করা—এই সকল আলোচনা করিবার জন্য—চিকিৎসার তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য—সম্মিলনীর সৃষ্টি। সত্য আবিষ্কৃত হউক বা না হউক, সত্যানুসন্ধানই মঙ্গলব্রত। ইহাতে জয়পরাজয়, লাভালাভ, ভয় বা আশঙ্কার উদ্বেগ নাই। যতটুকু সত্য আলোচিত হয়, ততটুকুই ভাল। সুতরাং সাংসারিক দৃষ্টিতে ইহার গতবর্ষ সমালোচনা হইতে পারে না। কত যুগযুগান্তর সত্যানুসন্ধানের পর যে দুএকটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহা পণ্ডিতমাত্রেই জানেন। সুতরাং দু এক বর্ষের সমালোচনায় ইহার লাভালাভ কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? তবে ঈশ্বরকৃপায় সম্মিলনী নিজব্রতে অটল থাকিলে যে কোন না কোন কালে ইহা হইতে সুমহান্ প্রত্যক্ষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমাদের গ্রাহকবর্গ যে একথা দিন দিন হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, গতবর্ষ সমালোচনা করিলে আমরা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আমাদের দেশে যেরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত, তাহাতে চিকিৎসা-সম্মিলনী ব্যতীত কোন একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসাপ্রণালী এদেশের উপযোগী হইতে পারে না। পরমপূজ্যপাদ ঋষিগণ তপোবলে ভারতের হিতের জন্য যে আর্য্যচিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন—দেশকাল এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে প্রণালী এক্ষণে এদেশে সর্ব্বতোভাবে সংলগ্ন হয় না। এক্ষণে আহারে বিহারে, আচারে পরিচ্ছদে, কার্যকর্ম্মে সকল বিষয়েই আর্য্যগণ মধ্যে এত পরিবর্ত্তন উপস্থিত বোধ হয় যে, যে আধারকে লক্ষ্য করিয়া পরমপূজ্যপাদগণ ঔষধ ও পথ্যাদির মাত্রা নিরূপণ করিয়াছেন—বর্ত্তমান ভারতবাসী সে আধার নয়। সুতরাং আমরা ঋষিগণের কৃপা বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছি। পক্ষান্তরে বিজাতীয় চিকিৎসাপ্রণালীও আমাদিগকে সম্যক্ আশ্রয়দানে সমর্থ নহে। যে আধারকে—যে আচার ব্যবহারকে—যে সকল ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের সত্য নিরূপিত হইয়াছে—প্রকৃতিদোষে আজও আমরা সেই আধারের সহিত স্বাত্ম্যতা প্রাপ্ত হই নাই। সুতরাং চিকিৎসাবিষয়ে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য এবং এই সকল আলোচনা করিবার জন্যই সম্মিলনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সম্মিলনীর প্রতি গ্রাহকগণের যেরূপ আদর ও যত্ন—যে সকল প্রথিতনামা ব্যক্তিগণ ইহার সাহায্যকারী—তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হয় যে, সম্মিলনী বর্ত্তমানকালের

একটী গুরুতর অভাব। গতবর্ষ সমালোচনায়ও আমরা ঐ কথা বেশ বুঝিতে পারি। গতবর্ষে অনেক গুলিন মহাত্মা ইহার সাহায্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

কিন্তু গতবর্ষ সমালোচনায় গ্রাহকগণের অনুগ্রহের কথা মনে হইয়া যেমন আনন্দ হয়, আমাদের নিজের কথা ভাবিয়া তেমনি দুঃখ উপস্থিত হয়। সন ১২৯১ সালের শুভ বৈশাখের আরম্ভে প্রথমে রায়যতীন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে ও মৃত মহাত্মা ডাক্তার কাস্তগিরি মহাশয়ের সহযোগিত্বে আমরা পরম উৎসাহের সহিত চিকিৎসা-সম্মিলনীর প্রচারে ব্রতী হই। যেমন ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় আমাদের আশাও ক্রমে ক্রমে ফলবতী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কামদুঘা ধেনুর ন্যায় সম্মিলনীকে যখনই দোহন করিয়াছি, তখনই আশানুরূপ দুগ্ধ পাইতে বঞ্চিত হই নাই। চিকিৎসার পক্ষপাতিতা ত্যাগ করিয়া সম্মিলনীর দৃষ্টিতে আমরা যে এপর্য্যন্ত কতশত রোগীর উপকার করিয়াছি, তাহা বলা যায় না। এক কথায়—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি মানবের প্রার্থিত চতুর্ব্বর্গই যেন সম্মিলনী উত্তরোত্তর প্রদান করিতে ছিলেন। কিন্তু গভীর দুঃখ ও নিতান্ত কলঙ্কের কথা এই যে, এহেন পরমোপকারিণী, বিপদ্‌তারিণী এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সম্মিলনীকে নিজ বুদ্ধিদোষে গতবর্ষে কথঞ্চিৎ হতাদর করিয়াছি। আশঙ্কা এই—পাছে বা হাতে হাতে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। গতবর্ষে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ ও চিকিৎসাব্যবসায়ে বিশেষ বিব্রত থাকায় আমরা সম্মিলনী প্রচারে ততদূর চেষ্টা করিতে পারি নাই। গতবর্ষ সমালোচনায় আমাদের এই এক মহান্ দুঃখ আছে। আশা করি, এবর্ষে আমরা সমধিক যত্নবান্ হইতে পারিব।

অবশেষে যে মহাত্মার অনুগ্রহে সম্মিলনী জন্মলাভ করিয়াছে—বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও যে মহাত্মার সৎপ্রবৃত্তি তিরোহিত হয় নাই—ভগবানের কৃপায় যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এখনও সম্মিলনীর মঙ্গল কামনায় অনুক্ষণ রত রহিয়াছে, সুধীর জমীদার সেই রায়যতীন্দ্রনাথকে আমরা অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া ও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া এইখানে গতবর্ষ সমাপন করিলাম।

কবিরাজ সম্পাদক।

স্ত্রী ও পুরুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতর জন্তু মধ্যে পুরুষজাতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অস্ত্রদ্বারা সুশোভিত হয়, যাহা স্ত্রীজাতিতে আদৌ দেখা যায় না। অনেক শৃঙ্গধারী জন্তুর স্ত্রীদিগের মোটেই শৃঙ্গ থাকে না, যেমন মেষ ও হরিণ। পুংজাতির কোন কোন দন্ত অত্যন্ত বৃহৎ হয়। এই গুলি আত্মরক্ষার্থে নিয়োজিত হয় পুং হস্তীর দুই পার্শ্বের দাঁত অত্যন্ত বড় হয়। হস্তিনীর ঐরূপ দাঁত থাকে না। এইরূপ শূকরের দুইদিকে দুইটী দাঁত বড় হয়, উহাদের স্ত্রীজাতির দাঁত বড় হয় না। গো ও মহিষের স্ত্রীপুরুষ উভয়ই শৃঙ্গধারী। তত্রাচ পুরুষদিগের শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত মোটা ও মজবুত। ছাগীর শৃঙ্গ অপেক্ষা ছাগের শৃঙ্গ বৃহৎ। প্রায় সমুদয় প্রাণিজগতে স্ত্রীজাতি পুংজাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার যথা—গাভী অপেক্ষা ষণ্ডের শরীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও স্থূলাকার। হস্তিনী অপেক্ষা হস্তী বড় হয়, বিড়ালী অপেক্ষা বিড়াল বড় ও উহার গলার স্বর সমধিক গম্ভীর। এইরূপ ছাগী অপেক্ষা ছাগ, কুক্কুটী অপেক্ষা কুক্কুট, সিংহী অপেক্ষা সিংহ, কুক্কুরী অপেক্ষা কুক্কুর এবং ব্যাঘ্রী অপেক্ষা ব্যাঘ্রের শরীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও ভারী। কোনস্থান দিয়া দুইটী শৃগাল দম্পতী গমন করিলে কেবলমাত্র ছোট বড় দেখিয়া কোন্‌টী স্ত্রী এবং কোন্‌টী পুরুষ তাহা অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ মধ্যে এই নিয়মের বিপরীতভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বল্মীক ও রেশম কীটের স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা বড় হয়। কোন কোন স্থানে স্ত্রীজাতি প্রায় আকারে দ্বিগুণ হয়। কিন্তু এই সকল স্থানেও স্ত্রীজাতি বড় হইলেও উহারা অলস ও নিষ্কর্ম্মা। রেশম কীট ও বল্মীক কীটের স্ত্রীজাতির বস্তিপ্রদেশ ডিম্ব দ্বারা পূর্ণ থাকে, উহারা নড়িতে চড়িতে পারে না। পুরুষগণ উহাদিগকে খুজিয়া লইয়া উহাদের সহিত মিলিত হয়। অনেক জীবের পুংজাতি এত ক্ষুদ্রাবয়ব যে, তাহাদিগকে দেখিলেই স্ত্রীজাতি মারিয়া ফেলে। এজন্য উহারা অতি সাবধানে পশ্চাৎ দিক হইতে গমন করিয়া স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে। কোন কোন জন্তুর পুংজাতির বাহু অপেক্ষাকৃত বড়, লম্বা এবং বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট হয়। এই বাহু কেবল

স্ত্রীজাতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধৃত করিয়া রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। গোবরেপোকার দুইটী বাহু কেবল এই কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতি রূপবান্। তবে আমরা যে স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতি অপেক্ষা রূপবতী দেখি, সেটি আমাদিগের চক্ষের ও মনের ভ্রম। স্ত্রীজাতিও পুরুষজাতিকে তাহাদিগের অপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে সুন্দরী বলিয়া অভিবাদন করে। যে কারণবশতঃ এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র বোধ জন্মে, তাহার মূলে একটী গূঢ়রহস্য নিহিত আছে, উহাকে sexual attraction বা স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আসক্তি কহে। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা বিভিন্ন আকার প্রকার ধারণ করাতেই পুরুষের নিকট সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীভাব পরিবর্জ্জিত পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট মনোমহিনী বলিয়া বোধ হইবে না। আবার স্ত্রীর সাদৃশ্যযুক্ত পুরুষ স্ত্রীজাতির নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব গঠন বৈচিত্র তথা শারীরিক বৃত্তি বিশেষ পরিতৃপ্তি—এই দুই একত্রে মিলিত হইয়া মনোমধ্যে এইরূপ বিপরীত ভাবের উদয় হয়। মনোমধ্যে বৃত্তি বিশেষের স্ফূরণ হইলে অতি কুৎসিতা অথচ সম্পূর্ণ স্ত্রী আকার বিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, অথচ স্ত্রী আকার ও স্ত্রীবেশ পরিবর্জ্জিতা স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী হইলেও পুরুষকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। আবার এই মানসিক বৃত্তির স্ফূরণের অভাব হইলে অতি সুন্দরী স্ত্রীও তাদৃশ মনোরমা বলিয়া বোধ হইবে না। অথচ একজন কুৎসিত পুরুষকেই রূপবান্ বলিয়া বোধ হইবে।

অতএব গঠন বৈপরীত্য তথা শারীরিক বৃত্তিবিশেষের পরিতৃপ্তির আধার জ্ঞান—এই দুয়ের একের অন্যথা হইলে আর এরূপ ভাব মনোমধ্যে উদয় হয় না। নপুংসকের নিকট স্ত্রী ও পুরুষ সমান সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। আমরা যদি নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুগণের স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে আমাদিগের মনের ভাব আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সমুদয় নিম্নশ্রেণীর জীবগণ মধ্যে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতি সমধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। পুরুষজাতি এরূপ কতকগুলি আভরণ দ্বারা সুশোভিত, যাহা স্ত্রীজাতিতে মোটেই দেখা যায় না। ময়ূর কেমন আশ্চর্য্য-মনপ্রাণ-বিমুগ্ধকর-পালকরাজী দ্বারা বিভূষিত। যখন ময়ূর তাহার পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া

বনমধ্যে নৃত্য করে, তখন কে না তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়? স্ত্রীজাতির এইরূপ পুচ্ছ নাই। কুক্কুটের মাথায় কেমন লাল জবাফুলের ন্যায় চুড়া দেখা যায়। উহার পুচ্ছও কেমন বিবিধবর্ণে সুশোভিত এবং ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত। ইহাদের স্ত্রীজাতি এই সকল সৌন্দর্য্যবিহীন। ভারতমহাসাগরের আরু (Arru) দ্বীপপুঞ্জের Bird of paradise (স্বর্গীয়পক্ষী) যে এত রূপবান্ বলিয়া বর্ণিত হয়, সে রূপ কেবল পুরুষজাতিতেই আছে। চড়াই পক্ষীর পুরুষজাতির গলায় কেমন কাল কাল দাগ আছে। বুল্‌বুল্‌পক্ষীর পুরুষজাতির পুচ্ছ কেমন দীর্ঘ ও সুন্দর। সিংহের ঘাড় কেমন ঝালরের ন্যায় লম্বা লম্বা কেশররাজির দ্বারা সুশোভিত। বৃষের কেমন ঝুট ও গলদেশে মাংসখণ্ড রহিয়াছে। হস্তী সুন্দর দুইটী বৃহৎ দন্ত দ্বারা সুশোভিত। এইরূপ ছাগী অপেক্ষা ছাগ, কুক্কুর অপেক্ষা কুক্কুরী, ভেড়ী অপেক্ষা ভেড়া এবং মৃগী অপেক্ষা মৃগ সমধিক রূপবান্। মনুষ্যের মধ্যেও পুংজাতি কেমন সুন্দর দাড়ী ও গোঁফ নামক চুলরাজী দ্বারা সুশোভিত। এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে পুরুষজাতিকেই স্ত্রীজাতি অপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া বোধ হইবে, প্রকৃত অবস্থাও তাহাই।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

মানবশত্রু—স্ত্রী।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

এক্ষণে এদেশে যত কিছু পুস্তক বা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে—সকলই স্ত্রীজাতির মাহাত্ম্যসূচক। "আদরের আদরিণী, দেহের প্রাণ, অন্ধকারের আলো, নিরাশার আশা, প্রবাসের চিন্তা, প্রেমের পুত্তলী, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল ও মরুভূমে স্রোতস্বতী" ইত্যাদি শব্দে পুস্তক সকলে স্ত্রীজাতির মহিমা ব্যাখ্যাত হইতেছে। নাটক, কাব্য, সাহিত্য—আজ কালকার যাহা কিছু পাঠ্য, তাহা স্ত্রীজাতির মহিমা ব্যতীত সুপাঠ্যই নয়। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা—এই সকলই

উন্নতসমাজের প্রধান চর্চ্চা। এমন আলোচনা নাই, যাহাতে স্ত্রীজাতির কথা নাই—স্ত্রীজাতির নামগন্ধ না থাকিলে পুস্তকাদি প্রচারেরই সুযোগ নাই। আধুনিক সমাজে যাঁহারা প্রধান ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত—যাঁহারা আধুনিক দেশহিতৈষী—সমাজে সহস্র সহস্র দুঃখস্থান থাকিলেও স্ত্রীজাতির দুঃখমোচনই তাঁহারা প্রকৃতদেশহিতৈষিতা মনে করেন। পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য করুক, দারুণ কঠোরতা করুক—একাদশী করুক—দাসবৃত্তি অবলম্বন করুক—যাতনায় মরিয়া যাউক—তাহাতে দেশের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক যদি বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্য করে, একাদশী করে, পরিচারিকা বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তবেই দেশহিতৈষীর হৃদয়োচ্ছাসে সমগ্র সভ্যসমাজের ধমনী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবে। গৃহস্থালী দেখ, তথায় ভ্রাতার তো কথাই নাই—পিতামাতারই উপরোধ অনুরোধ রক্ষা হওয়া ভার, তথায়ও স্ত্রী সর্ব্বেসর্ব্বা। গৃহে ধর্ম্মচর্চ্চার লেশমাত্রও নাই—আশ্রমধর্ম্মের ভিতর অতিথিপূজা নাই—দেবপূজা, পিতৃপূজা—দানধ্যান বা স্বাধ্যায়ের চর্চ্চা নাই—তথায় কেবলমাত্র স্ত্রীপূজা বা স্ত্রীতৃপ্তিবিদ্যমান। গৃহেও যেমন বাহিরের আন্দোলনেও তদ্রূপ স্ত্রীজাতি প্রধান। শুদ্ধ আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের যে এইরূপ অবস্থা তাহা নহে; ইংরাজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি যাহারা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সভ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যেও এই দশা উপস্থিত বরং কিছু বাড়াবাড়ি। স্বর্গীয় প্রেম এবং দারুণ বিরহ ব্যতীত তাঁহাদের কবিত্বের স্ফূর্ত্তি নাই—স্ত্রীলোক ব্যতীত জগতের অন্য কোন স্থানে তাঁহাদের ভয়, আশা, ক্রোধ, ক্ষোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয়ের আন্দোলন নাই—স্ত্রীর তৃপ্তিতেই তাঁহারা ধনমানাদি উপার্জ্জনের সার্থকতা মনে করে। পিতামাতা ভাইভগিনী আত্মীয়কুটুম্বের সহিত সংস্রব নাই—কেবল "তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টঃ" এই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। মনে হয়, যেন কি এক অলৌকিক জ্ঞানজ্যোতিঃ সমুদয় সভ্যজগতের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাতে তাহারা স্ত্রীলোক লইয়া এত উন্মত্ত হইয়াছে।

কিন্তু এত ব্যাখ্যান ও বক্তৃতাতে, স্ত্রীলোকের এত আদর অভ্যর্থনাতে, সমগ্র সভ্যজাতির দৃষ্টান্তেও প্রাচীন আর্য্যসমাজ আত্ম-হারা হন নাই। তাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্ত্রীজাতিকে প্রাধান্যে বরণ করা ভাল নয়—এই যে জ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন—আজও কার্য্যে তদ্রূপ

অনুষ্ঠানেই রত আছেন। হায়! কালের কি প্রভাব? প্রাচীনমতে যাহা অপ্রধান বলিয়া পরিগণিত, নব্যমতে তাহাই প্রধান—প্রাচীনমতে যাহা কিছু ভাল, নব্যমতে সে সমুদয়ই মন্দ। প্রাচীন সমুদয় সংস্কারই এক্ষণে কুসংস্কার। মানবশত্রু স্ত্রী ইহা সংস্কারের কথা বলিয়া বোধ হয় অনেকে উপহাস করিবেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে কোন্ সংস্কার সু বা কু—তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে। আজকাল সকলেই সহজজ্ঞানবাদী। সহজজ্ঞানে যাহা প্রতীতি হয়, তাহাই সত্য বলিয়া লোকে মনে করে। যাহা কিছু মিষ্ট তাহাই ভোজনীয়—ক্ষুধা পাইলেই খাইতে হয়—যাহা কিছু সুবিধাজনক ও উপাদেয়, তাহাই গ্রাহ্য—ইত্যাকার সহজজ্ঞানের প্রেরণা। একারণ আহার, বিহার, স্নান, শয়ন ইত্যাদি কোন কর্ম্মেই আধুনিকগণের বিচার নাই। কিন্তু প্রাচীনগণ সহজজ্ঞানকে কোন জ্ঞানের মধ্যেই গণ্য করেন না। তাঁহারা সহজজ্ঞানকে বালকজ্ঞান বোধ করেন, সুতরাং ইহাকে মানবের অহিতকরবোধে আপ্তবচনেরই প্রাধান্য মানিয়া গিয়াছেন।

ভাল, অমৃতে অরুচি কার? প্রাচীন আর্য্যগণও তো সহজ জ্ঞানে স্ত্রীজাতিকে অতি উপাদেয় বলিয়া জানিতে পারিতেন, তাহাদের সহিত নিত্যসহবাস—তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল না করা—তাহাদিগের মনোরঞ্জন করা—সদা কামোপভোগ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করা—তাহাদিগকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকল শিখাইয়া তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে অবারিতভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া মনস্তুষ্টি করা—তাহাদের প্রেমেমগ্ন হওয়া—তাহাদিগকে প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু করিয়া রাখা—তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া—এসকলিতো আমাদের ন্যায় তাঁহাদেরওতো সহজজ্ঞানে উদয় হইতে পারিত, তবে কেন তাঁহারা "দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ" দূর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিবে "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" সঙ্গ হইতে কাম জন্মায়, স্বভাব এষ নারীণাং নরাণাং ইহ দূষণং" নরকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ইত্যাদি কথায় স্ত্রীগণকে মানুষের শত্রু বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। কোন ঋষির গ্রন্থে আধুনিক প্রেমের কথা কি শুনিয়াছ? ঋষি, স্ত্রীলোকে প্রেমের উৎকর্ষতা সাধন হয়, তাহা জানিতেন না, তবে তাঁহারা যে স্ত্রীলোককে আদর করিতে বলিয়াছেন তাহা "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোক তুষ্ট থাকিলে সুসন্তান উৎপাদন হইবে

বলিয়া এবং সুসন্তান উৎপাদন হইবে বলিয়াই তাঁহারা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বোধ করিতেন। স্ত্রীলোক হইতে লোকের বিলাস, বুদ্ধি ও ঈর্ষ্যাদি কুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়—একথা তাঁহারা ভূয়োভূয় বলিয়াছেন। মনুঃ। এবং একারণ গৃহস্থধর্ম্মে—দেবপিতৃ অতিথি পূজা ও আত্মীয়সেবারূপ ধর্ম্মের সহকারিত্বে নিযুক্ত থাকিবে বলিয়া তাহাদিগকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াগিয়াছেন। স্ত্রীলোকের কোন মন্ত্রে অধিকার নাই—কোন যজ্ঞে অধিকার নাই—কোন ধর্ম্মকার্য্য তাহারা স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারিবে না—স্ত্রীলোকের উপর শত্রুত্ব বুদ্ধি না থাকিলে তাঁহারা এরূপ শাসন করিবেন কেন? স্ত্রীলোক মানবশত্রু বলিয়াই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বালককালে স্ত্রীলোক পিতৃবশে, যৌবনে ভর্ত্তাধীনে এবং বার্দ্ধক্যে তাহারা পুত্রের অধীনে থাকিয়া জীবনযাপন করিবে—তথাপি কদাচ স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নয়। পাছে তাহাদের সহবাসে মনুষ্যমনে ঈর্ষ্যাদি কুপ্রবৃত্তি সকল সংক্রামিত হয়, এজন্য তাহাদিগকে অবগুণ্ঠনের মধ্যে থাকিতে ও পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপও করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (শাস্ত্র দেখ) স্ত্রীলোক সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এতদূর নির্ম্মম, যে তাঁহারা স্ত্রীলোককে দ্রব্যসম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। (ঐ দেখ)। স্ত্রীলোক হাই তুলিতেছে, হাঁচিতেছে, থুৎকার ফেলিতেছে—ভোজন করিতেছে বা অনাবৃত ও স্বাধীনভাবে রহিয়াছে—এই সকল দেখিতে নাই বলিয়া তাঁহারা শাস্ত্রে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়াছেন। আজকালকার ন্যায় স্ত্রীলোককে মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করা দূরে থাকুক—স্ত্রীলোককে কোন গুহ্যকথা বলিতে ও তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। ঋষিগণ স্ত্রীলোককে এতদূর শত্রুদৃষ্টিতে দেখিতেন যে, স্ত্রী মরিয়া গেলে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের আদেশ দিয়াছেন কিন্তু পতি মরিয়া গেলে স্ত্রীলোকের চিরবৈধব্যবিধান। তাঁহাদের মতে স্ত্রীলোক গৃহে থাকিবে, সন্তানাদি লালনপালন করিবে, গৃহস্থালীর রন্ধনাদি কার্য্য করিবে, দেবপিতৃ ও অতিথিসেবার সাহায্য করিবে এবং কায়মনোবাক্যে নিত্য পতিসেবা করিবে। আমাদের শাস্ত্র সকল দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে, স্ত্রীলোকের উপর যেরূপ কঠোর শাসন, তাহাতে তাহারা মানব শত্রু বলিয়াই ঋষিগণ মনে করিতেন। ভাল, এমন আদরের সামগ্রীকে—সহজজ্ঞানে এমন অমৃতের আকরকে—তাঁহারা কেন এমন বিষদৃষ্টিতে দেখি-

লেন? আহারে, বিহারে, ভ্রমণে, চিন্তনে—সদাসর্ব্বদা তাঁহারা কেন স্ত্রীলোককে নিত্য সঙ্গী করিতে চাহেন নাই? তাঁহারাও তো আমাদের ন্যায় রক্তমাংসবিশিষ্ট ছিলেন, তবে কেন গৃহস্থপরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোককে সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে পরিচারিকা মাত্র পদ প্রদান করিলেন? এ সম্বন্ধে ঋষিগণের জ্ঞানবুদ্ধিকে অলৌকিক বলিব, না, এক্ষণকার সহজজ্ঞানকে অলৌকিক বলিব অথবা আমাদের অপেক্ষা ঋষিরা অতিশয় কামুক ছিলেন বলিয়াই স্ত্রীলোকে তাঁহারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ব্যতীত অপর কিছু গুণ দেখিতেন না বলিব? যাহা হউক, সহজজ্ঞান যে অলৌকিক নয়, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয় না। ঋষিরাও স্ত্রীলোক যে পরমপ্রীতিকর পদার্থ তাহাও জানিতেন। তাঁহারাই বলিয়াছেন যে,

"ইষ্টাহ্যেকৈকশোপ্যর্থাঃ পরং প্রীতিকরাঃ স্মৃতাঃ।
কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সজ্ঞাতেন ব্যবস্থিতাঃ॥
সজ্ঞাতো ইন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়ো ইন্দ্রিয়ার্থো যঃ স প্রীতিজননোঽধিকঃ॥"

অর্থাৎ শব্দ স্পর্শরূপাদি ইন্দ্রিয়ের পরমপ্রীতিকর সমুদয় বিষয়ই—যেমন স্ত্রীশরীরে একত্রে বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপিও তাহা নাই। এক স্ত্রীসম্ভোগ, সমুদয় ভোগের সমান।

"স্ত্রীষু প্রীতির্ব্বিশেষেণ স্ত্রীষ্বপত্যং প্রতিষ্ঠিতং।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

অর্থ এই যে এই জগতে যত বস্তু আছে তন্মধ্যে স্ত্রীলোকে প্রাণীগণের যেরূপ বিশেষ প্রীতি হয়, এমত আর কিছুতেই হয় না। স্ত্রীলোককে যথাভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী এবং যাবতীয় লোক লাভ হয়। এক্ষণে কথা এই যে, যথাভাবে গ্রহণ করিতে গেলে স্ত্রীলোক "আদরের আদরিণী" না মানবশত্রু?

ক্রমশঃ—

শ্রী——

লক্ষণতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রোগলক্ষণ সকলকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে:—যথা:—(১) বোধবিপর্য্যয় (২) ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য (৩) যান্ত্রিক-বিকৃতি। দেহের কোন স্থানে কষ্ট, বেদনা বা অসুখ অনুভব, অথবা অসাড় বোধ হওয়া এ সমুদয় প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। দেহস্থ যন্ত্র সকলের অত্যধিক বা অত্যল্প ক্রিয়া অথবা ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা লোপ হওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ মধ্যে গণ্য। কোন যন্ত্রের হ্রস্বতা বা বিবৃদ্ধি অথবা উহার অস্বাভাবিক আকার সংপ্রাপ্তি প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণ বলিয়া অভিহিত। যে সকল বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণগুলি আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, সেই চিহ্ন গুলিকে ভৌতিক চিহ্ন কহে।

প্রথম প্রকারের লক্ষণ গুলি রোগী নিজে নিজে বুঝিতে পারে এবং উহাদিগকে অবগত হইতে হইলে রোগীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয়। যথা—চিকিৎসক রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার কোন্ স্থানে কিরূপ বেদনা ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণ চিকিৎসক স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াই অবগত হইবেন। রোগীর উপর নির্ভর করিবেন না।

সমুদয় রোগে লক্ষণ মধ্যে বোধ বিপর্য্যয় সর্ব্বপ্রধান এবং এই বোধবিপর্য্যয়ই প্রকৃত পীড়া বলিয়া গণ্য। কারণ কোনরূপ বেদনা বা কষ্ট অনুভব না হইলে কোন ব্যক্তি তাহার পীড়া হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারে না। সময় সময় অন্য অন্য লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই লোকে কেবল এই বোধ বিকৃতি দ্বারা বুঝিতে পারে, যে তাহার কোন পীড়া হইবে! অনেক লোকে সামান্য সামান্য বোধ বিকৃতি দ্বারা বুঝিতে পারে, যে তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইবে। কতকগুলি বোধবিপর্য্যয় আছে যাহাকে রোগের পূর্ব্বলক্ষণ বলা যায়। যথা:—কম্পজ্বর হইবার পূর্ব্বে রোগীর হাত পা কামড়ায় এবং অত্যন্ত আলস্য বোধ হয়। সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে নাসিকা দ্বার ও তালু চুল্‌কায়। উদরের পীড়া বা আমাশয় হইবার পূর্ব্বে পেটভার ও পেটে অসুখ বোধ হয়। কখন কখন অত্যন্ত সুস্থ ব্যক্তি

কোন সাংঘাতিক রোগ হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। আমরা জানি কোন এক অত্যন্ত বলশালী বৃদ্ধ প্রাতে বাহ্যে যাইবার সময় এত দুর্ব্বলতা বোধ করিলেন যে, গাড়ু তুলিতে সক্ষম হইলেন না, পরে অবিলম্বে তিনি অচৈতন্য হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। কোন কোন ব্যক্তির কলেরা হইবার পূর্ব্বে শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে এবং মাথা ঘুরিতে থাকে। এপিলেপ্সি অথবা মৃগী রোগ হইবার পূর্ব্বে রোগী কোন কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে যে, সে শীঘ্রই আক্রান্ত হইবে। এই লক্ষণ গুলিকে "অরাএপিলেপ্টিকা" কহে। কোন কোন চর্ম্ম রোগ হইবার পূর্ব্বে গাত্র জ্বালা করে। এইরূপ প্রায় সকল রোগ দেখা দিবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ গুলিকে ইংরেজিতে প্রিমণিটরি সিম্টন্ (premonitory symptom) কহে। কিন্তু অনেক রোগ এমন প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত হয়, যে তাহার কোন পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দেয় না এবং রোগীও জানিতে পারে না যে কিরূপে কখন তাহার সেই ব্যাধি উপস্থিত হইল। অনেক ব্যক্তির হৃদয়ের পীড়া থাকে, অথচ সে বুঝিতে পারেন যে তাহার পীড়া আছে। ইহাদিগের হঠাৎ কোন গুরুতর পীড়া উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়, এবং সেই সময়মাত্র চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

বোধবিপর্য্যয় লক্ষণ মধ্যে যন্ত্রণা বোধ সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ অর্থাৎ প্রায় সকল পীড়াতেই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার প্রাদাহিক পীড়াতে কোন না কোন সময়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়ই হয়। আবার প্রদাহ ব্যতীত অন্যান্য অনেক পীড়াতেও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং এই যন্ত্রণা সময় সময় অত্যন্ত অধিক হয়। যথা;—গ্যাষ্ট্রো ডাইনিয়া, স্তন্যশূল বেদনা প্রভৃতিকে প্রদাহের কোন লক্ষণ না থাকিলেও এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে, রোগী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়।

বেদনা বা যন্ত্রণা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে এবং উহার পরিমাণ গুরু বা লঘু হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, আবার একই রোগে ভিন্ন ভিন্ন রকমের যন্ত্রণাবোধ হইয়া থাকে। প্রদাহরোগে যন্ত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকারের বেদনা উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের যন্ত্রণা অন্ত্রপ্রদাহের (এনেটরাইটিস্) যন্ত্রণা অপেক্ষা বিভিন্ন। অস্থি, মাংস, মাংসসূত্র (tendon) বন্ধনীসূত্র (ligament), মূত্রাধার,

বৃক্ক, জরায়ু প্রভৃতি প্রদাহান্বিত হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। লোকে নানাবিধ যন্ত্রণাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করে। যথা:—টন্‌টনে ব্যাথা, যেন ছুঁচ ফুটাইয়া দিতেছে এরূপ ব্যথা (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা); তীক্ষ্ণ ছুরিকার দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, কট কট বা ঝন ঝন করা বেদনা; দপ্‌দপানি বেদনা (throbing pain), কামড়ের বেদনা, কোন জন্তুতে যেন চিবাইতেছে এরূপ বেদনা (চর্ব্বণবৎ বেদনা), জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হওয়া (দাহনবৎ) বেদনা, কোনস্থানে ভার বোধ হওয়া রূপ বেদনা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের বেদনা আছে।

অনেক স্থানে এরূপ ভাবের বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগী সহসা সে বেদনা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু সেই স্থান স্পর্শ করিবামাত্র বা তাহাতে হস্তের বা অন্য কোন দ্রব্যের চাপ পড়িবামাত্র বেদনা অনুভূত হয়। এইরূপ স্পর্শ দ্বারা যে বেদনা অনুভূত হয়, তাহাকে স্পর্শ বেদনা বা টেন্‌ডার্‌নেস্ কহা যায়। কোন অঙ্গে স্পর্শবেদনা এবং অন্য প্রকারের বেদনা এ দুরকম বেদনাই হইতে পারে। আবার অনেক স্থানে কেবল স্পর্শবেদনা থাকে, কিন্তু অন্য প্রকার বেদনাবোধ থাকে না, অথবা অন্য প্রকারের বেদনা বর্ত্তমানেও সেস্থানে স্পর্শ বেদনা অনুভূত হয় না। যকৃত প্রদাহে যকৃত টিপিতেও ব্যথা করে এবং অন্যরূপ বেদনাও হইয়া থাকে। যকৃতে সুধু খানিক রক্ত জন্মিলে (কন্‌জেস্‌সন) যকৃৎ টিপিতে বেদনা করে কিন্তু অন্য কোন যন্ত্রণা প্রায় থাকে না। হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্ত্রীলোকের অঙ্গ বিশেষে অত্যন্ত স্পর্শ বেদনা হয়, যেন হাত ছোঁয়াতেই চম্‌কিয়া উঠে—অথচ অন্য কোনরূপ যন্ত্রণা থাকে না। উপদংশের পীড়াজনিত বাতরোগে অত্যন্ত হাত পা কামড়ায় অথচ ঐ সকল অঙ্গে স্পর্শবেদনা (টিপিতে বেদনা) থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও পারে।

অনেক রোগে পীড়িত অঙ্গে বেদনা বোধ না হইয়া অন্য কোন স্থান বেদনা করে। যথা, লিভার বা ডায়েফ্রামের প্রদাহ হইলে দক্ষিণদিকের স্কন্ধে বেদনা হয়। মূত্রাধারে পাথরি হইলে শিশ্নের অগ্রভাগ বেদনা করে। হিপ্‌জয়েণ্টের জঙ্ঘা সন্ধি প্রদাহ হইলে হাঁটুবেদনা বোধ হয়। হৃদয়ের পীড়া হইলে সচরাচর বামদিকের বাহুতে বেদনা হয়, যেন বেদনা বুক হইতে বরাবর বাম বাহুতে চলিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হয়। অজীর্ণ

রোগ হইলে শীরঃপীড়া উপস্থিত হয়। এইরূপ বেদনাকে "ইন্‌ডাইরেক্‌ট" বেদনা বলিতে পারা যায়। এক অঙ্গ পীড়িত হইলে অন্য অঙ্গে যে কোন বেদনা অনুভূত হয়, তাহা অনেকস্থলে ঠিক করিতে পারা যায় না। কিন্তু প্রায় অধিকাংশস্থলে এরূপ বেদনা সমবেদনোৎপাদক স্নায়ুসূত্রের পরস্পর সংযোগ বশতঃ ঘটিয়া থাকে।

ব্যক্তিবিশেষে এবং জাতিবিশেষে বেদনাবোধের তারতম্য হইয়া থাকে। অনেক ব্যক্তি এরূপ কষ্টসহ আছে, যে অনায়াসেই গুরুতর বেদনা সহ্য করিয়া থাকে, অথবা সেই একই পীড়া বা আঘাতে তাহার অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা যন্ত্রণা কম হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি সামান্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়। আবার অনেক ব্যক্তি অনায়াসে অগ্নিতে হস্তার্পণ করিতে পারে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহার কোনরূপ যন্ত্রণা নাই। সচরাচর দুর্ব্বল ব্যক্তি অপেক্ষা বলবান্‌ব্যক্তি বেশী কষ্টসহ হয়। কিন্তু অনেক স্থলে বিপরীতও দেখা যায়। স্নায়ুপ্রধান ধাতু (বায়ু ধাতু) গ্রস্ত লোক অল্প যন্ত্রণায় অধীর হয়। স্ত্রীলোক ও বালক বেশী কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে।

বাঙ্গালী অপেক্ষা বিহার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী বেশী কষ্ট সহ্য করিতে পারে। একজন পশ্চিমা লোক বিনা ক্লোরফরমে গুরুতর অস্ত্রাঘাত সহ্য করে। কোন এক পশ্চিমদেশবাসীর গালের উপর একটা আব হইয়াছিল। সে অম্লানবদনে চেয়ারে বসিয়া আবটী ডাক্তার দ্বারা কাটাইয়া লইল। একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি, কোন কোন পশ্চিমাঞ্চল-বাসী বিনা ক্লোরফরমে, বিনা চীৎকার স্ক্রোটলটিউমর (মাংসকোরণ্ড) কাটাইতে পারে এবং লিথটমি অপারেসন সহ্য করিতে পারে। ডাক্তার ওয়াট্‌সন বলেন, আইরিস্ অপেক্ষা স্কচেরা বেশী কষ্টসহ হয়। আইরিসের দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার সময়ে সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে কিন্তু স্কটলণ্ডের লোকেরা চুপ করিয়া থাকে। অনেক ব্যক্তি বেদনা বাড়াইয়া ফেলে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী সামান্য বেদনাকে গুরুতর বলিয়া বর্ণনা করে। অনেক সময় ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে অত্যন্ত মনোযোগ প্রদর্শন করার জন্য রোগী অত্যধিক যন্ত্রণা বোধ করে। এই সকল রোগীর মন অন্য দিকে নিযুক্ত হইলে বেদনা কম বোধ হয়। মন কোন বিষয়ে অত্যন্ত নিযুক্ত থাকিলে

সামান্য সামান্য বেদনার বোধ হয় না। যথা—বনে শিকারে বহির্গত হইলে শিকারের দিকে মন থাকিলে, কাঁটায় পা ছড়িয়া গেলেও সে সময়ে জানিতে পারা যায় না, পরে বেদনা ও ঘটনা বুঝিতে পারা যায়। একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নে বা রচনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে সামান্য পিপীলিকায় দংশন করিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না। বাত প্রভৃতির কামড় উপস্থিত হইলে খুব একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলে যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়। হঠাৎ কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বযন্ত্রণার লাঘব হয় বা কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত হয়। যথা—কোন ব্যক্তি শূলবেদনায় অস্থির হইতেছে, সেই সময় যদি গৃহে আগুন ধরে বা তাহার কোন আত্মীয়বিয়োগের সম্বাদ পায়, তবে তাহার যন্ত্রণার লাঘব হয়। হঠাৎ সুসম্বাদেও যন্ত্রণা কম পড়িয়া থাকে, যথা—কোন ব্যক্তির অঙ্গবিশেষে অসহ্য যন্ত্রণা হইলে যদি সে হঠাৎ প্রচুর অর্থলাভের সম্বাদ পায়, তবে তাহার সেই স্থানের যন্ত্রণা কম পড়িয়া যায়।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

নাসিকা।

(সাধারণের পাঠ্য)

নাসিকার কার্য্য দ্বিবিধ। নাসিকা ঘ্রাণশক্তির ইন্দ্রিয়। নাসিকার দ্বারাই দ্রব্যের গন্ধ উপলব্ধি হয়, আবার এই নাসিকার দ্বারাই আমরা শ্বাসগ্রহণ করি। নাসিকার ছিদ্র দিয়া বায়ুগমন করিয়া ফুস্‌ফুসে উপনীত হয় এবং তাহাতেই আমরা জীবিত থাকি। যেমন জিহ্বা থাকাতে আমরা খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ বুঝিতে পারি এবং খাদ্যদ্রব্যের ভালমন্দ বিচার করিয়া খাইতে পারি, সেইরূপ নাসিকার দ্বারা আমরা কিরূপ বায়ু বা বাষ্প ফুস্‌ফুসে গ্রহণ করিতেছি তাহা বুঝিতে পারি। কু ও বিকট রসবিশিষ্ট দ্রব্য সকল পাকস্থলীতে গমন করিয়া আমাদিগের পীড়া জন্মাইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের পাকযন্ত্রের দ্বারস্বরূপ মুখের

অভ্যন্তরে জিহ্বা নামক খাদ্যপরীক্ষার যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। আবার যাহাতে দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক মলিন বায়ু ও বাষ্প আমাদিগের ফুস্‌ফুসে গমন করিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ না করে, সেই অভিপ্রায় শ্বাসযন্ত্রের দ্বার-স্বরূপ নাসিকার ছিদ্রের অভ্যন্তরে বায়ু ও গন্ধপরীক্ষার আশ্চর্য্য কৌশলময় যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাসিকার ঘ্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা না করিয়া ইহাকে বায়ুগ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।

হস্তদ্বারা নাসিকার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। এজন্য অনেকে হয়ত বিবেচনা করিতে পারেন, যে নাসিকা দ্বার বায়ু গ্রহণ জন্য যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় এমত নহে। কিন্তু এটী ভ্রম। যেমন মুখ গহ্বরস্থ দন্তদ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমরা পাকস্থলীতে গ্রহণ করি, সেইরূপ ফুস্‌ফুসে বায়ু গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা নাসিকার দ্বারা বায়ুকে ফুস্‌ফুসের উপযোগী করিয়া লই। নাসিকার দ্বারা আমরা বাতাসকে ছাঁকিয়া বা ফিল্টার করিয়া লই। অতএব যেমন নাসিকা দ্বার দিয়া আহার ও পানীয় গ্রহণ অযুক্তি, সেইরূপ নাসিকার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করাও অবৈধ। নাসিকা দ্বার দিয়া বায়ু গমন করিবার সময় বায়ুর তিনপ্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা অত্যন্ত শীতলবায়ু উষ্ণ হয়, নিতান্ত শুষ্ক বায়ু নাসিকা হইতে জল গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত ভিজা হয়, তৃতীয়তঃ নাসিকা দ্বার দিয়া বায়ু গমনকালে বায়ু ছাকিয়া লওয়া যায়। ওয়ার্জবর্গের ডাক্তার আসেনব্রণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নাসিকা দ্বারা ঐ তিন কার্য্য সাধিত হয়। তিনি নাসিকার এক ছিদ্র দ্বারা বায়ু প্রবিষ্ট করাইয়া ঐ বায়ু শ্বাসনালীতে গমন করিতে না দিয়া কৌশলক্রমে অপর ছিদ্র দিয়া নির্গত করিয়া ঐ বায়ু তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

সূতিকা রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, ভগবন্! আমি এই সকল কথা আর শুনিতে চাহি না, প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করাই ভাল।

তখন পার্ব্বতীবল্লভ কহিলেন, প্রিয়ে! সূতিকারোগের সহিত সাধারণ রোগের নিদানাদি তুলনা করিয়া দেখিলে যে প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা তোমাকে কহিয়াছি। এইক্ষণ তাহার চিকিৎসার বিষয়ও সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। সূতিকা রোগের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১) জরায়ুর ক্লেদ নিবারণ ও তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওয়া। (২) কোষ্ঠাগ্নি বর্দ্ধিত করা। (৩) জ্বরাতীসার প্রভৃতি উপদ্রবগুলি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা। যোনি-গহ্বর বা জরায়ুতে ক্লেদ সঞ্চিত থাকিলে অথবা তত্তৎস্থান বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে প্রথমে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। এইক্ষণ সেই বস্তি প্রয়োগের নিয়মাদিই কথিত হইতেছে।

তরল ঔষধপূর্ণ নল দ্বারা যোনিরন্ধ্রে অথবা প্রয়োজন হইলে মূত্ররন্ধ্রে পিচকারী দেওয়াকে বস্তি প্রয়োগ কহে। যে নলদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বস্তিনেত্র কহা যায়। উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে মেষ, শূকর ও ছাগ চর্ম্ম দ্বারা নেত্র প্রস্তুত করিয়া লইবে। তাহার অপ্রাপ্তি হইলে পক্ষীদিগের গলার চর্ম্ম দ্বারাও কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে *। স্ত্রীলোক দিগকে বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহার নেত্রের মূলভাগ হইতে চারি

---

* উপকরণ-বিহীন পরপদাশ্রয়-লাভার্থী হতভাগ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে প্রকার অন্তিম কাল উপস্থিত, তাহাতে আর কিছুরই আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আজ কাল বৈদেশিক ফিমেল্ পিচকারী দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

অঙ্গুলি অন্তরে কর্ণিকা নিবেশ কর্ত্তব্য এবং নেত্রের স্থূলতা তাহাদের মূত্ররন্ধ্রের ন্যায়, উহার দৈর্ঘ্যতা দশ অঙ্গুলি এবং মুদগ নির্গত হইতে পারে এরূপ ছিদ্র থাকা অবশ্যক। যোনি-পথে বস্তি প্রদান আবশ্যক হইলে নেত্রের চারি অঙ্গুলি এবং মূত্র-পথে দিতে হইলে দুই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে।

রমণীদিগের গর্ভাশয় বিশুদ্ধির নিমিত্ত যোনি-মার্গে বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহাদিগকে উত্তানভাবে (চিত করিয়া) শয়ন করাইয়া জানুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে কহিবে। পরে নেত্রমধ্যে দ্রব ঔষধ পূর্ণ করিয়া তাহার চারি অঙ্গুলি যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং নেত্র মধ্যস্থিত শলাকা ২।৩ বার পীড়ন করিয়া অবশেষে ঔষধ গুলি বাহির করিয়া ফেলিবে। যদি ঔষধ প্রত্যাগত না হয়, তবে বলপূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশে পীড়ন করিবে। তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধি না হইলে সোঁদাল পত্র ও সৈন্ধব লবণ, নিসিন্দার স্বরস ও গোমূত্রের সহিত একত্রে বাঁটিয়া বয়ঃক্রমানুসারে মুগ, এলাইচদানা বা সরিষার ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শলাকা দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের রন্ধ্র মধ্যে নিহিত করিবে। অথবা গৃহ ঝুল, বৃহতী, বিপুল, সৈন্ধব ও শুঁঠ শুক্ত, গোমূত্র ও সুরার সহিত পেষণ করিয়া উল্লিখিতরূপ বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। যোনি-রন্ধ্রে বস্তি প্রদান করিতে হইলে স্নেহৌষধের মাত্রা ২ পল ও মূত্র মার্গে প্রদেয় হইলে ১ পল হওয়া আবশ্যক। এইক্ষণ কতিপয় ঔষধের কথা কথিত হইতেছে।

১।—বাঁশের কোঁড়, খদির, নিম্ব, আকন্দ, বেণু, জায়ফল, আম্র, জম্বু, জিঙ্গিনী ও বাসক মূল, এই সমুদায়ের ক্বাথ কিস্‌মিস্ কৃত মদ্য এবং শুক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদান করিলে যোনির আস্রাব বিনষ্ট হয়।

২।—গোমূত্র, তক্র ও শুক্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া যোনি ধাবন করিলে আভ্যন্তরীণ ক্ষত ও ক্লেদ নির্গমন দূরীভূত হয়।

৩।—ঐ রূপ ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ধৌত করিলেও ক্ষতাদি উপশমিত হইয়া থাকে।

৪।—মৃদু অগ্নিতে বেত মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা যোনি ধৌত করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

এতদ্ভিন্ন দৈহিক বল এবং দোষত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্ত বিবেচনায় অনুবাসনাধিকারোক্ত অন্য কোন স্নেহৌষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকাবস্থার জ্বর অতীসার প্রভৃতি যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তৎসমুদায়ের চিকিৎসা করিতে হইলে কোষ্ঠাগ্নির অল্পতা এবং দৈহিক স্রোতোগয়াদির নিরোধ বশতঃই সূতিকা রোগ ক্রমশঃ নিতান্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে এবং পরিশেষে একবারে জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে। এই জন্যই সাধারণ রোগাধিকারোক্ত সকল প্রকার ঔষধ দ্বারা ইহার কোন প্রতিকার হয় না। যে সমস্ত ঔষধের উপকরণ সমষ্টির মধ্যে অগ্নিদীপক, উত্তেজক, বলকারক, দোষসঞ্চালক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক পদার্থই বেশী, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়। সূতিকাবস্থায় প্রযুক্ত কতকগুলি ঔষধের নাম ও প্রয়োগ স্থলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

অমৃতাদি।—গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাঁটিমূল, গন্ধভাদালীয়া, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুথা, সমুদায়ে মিলিত ২ তোলা, জল /৷৷০ সের শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ ঘৃত ৷০তোলা। আহারের অনিচ্ছা, অল্প অল্প জ্বর এবং স্রোতোপয়াদির নিরোধ অনুমিত হইলে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়।

দশমূল।—বিল্বছাল, নাও শোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারি, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা জল /৷৷ সের, শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ ঘৃত। এতদ্দ্বারা শরীরের তীব্র বেদনা ও জ্বর উপশমিত হয়।

সূতিকা দশমূল।—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটী মূল, গন্ধভাদালীয়া মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা। এই সকল বস্তু পূর্ব্ববৎ ২ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। তীব্র দাহসংযুক্ত জ্বরে ইহা প্রশস্ত।

সহচরাদি।—ঝাঁটিমূল, কুড়, বেতের মূল, বঁইচমূল, দেবদারু মিলিত ২ তোলা। পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া সৈন্ধব ৪ মাষা ও হিং ২ রতি প্রক্ষেপ দিবে। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ কটির নিম্নে তীব্র বা অল্প অল্প বেদনা থাকিলে এবং শরীর নিতান্ত ভার ভার বোধ হইলে এই যোগ প্রয়োজ্য। ইহা জ্বর

নাশক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক। অথবা ঝাঁটিমূল, মুথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদালীয়া, শুঠ, বালা। অঙ্গ বেদনা ও জ্বর নিবারণার্থ ইহাদের ক্কাথে অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে কিম্বা কেবল ঝাঁটি মূল ২তোলা পূর্ব্ব নিয়মে পাক করিয়া ১ মাষা পিপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি ও প্রসূতির জরাদি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চজীরক গুড় *।—যোনি বিকৃতি, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, হলীমক, পাণ্ডুরোগ, অতি কষ্টে অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ, এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ইহা স্ত্রীগণ সুস্থাবস্থারও নিয়ত সেবন করিতে পারে। তদ্দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।

বজ্রকাঞ্জিক। অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, মক্কন্দশূল অর্থাৎ প্রসূতির হৃদয় বস্তি ও মস্তকের তীব্র বেদনা, স্তন্যাভাব এবং কফদুষ্ট অনুমিত হইলে এই কাঞ্জিক দ্বারা সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। মাত্রা ১ পল।

সূতিকারী রস।—ইহা সূতিকা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি সর্ব্বদাই মন্দ মন্দ জ্বর অনুভূত হয়, আর সেই সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, তৃষ্ণা, শোথ বিদ্যমান থাকে,তবে এই ঔষধ দ্বারা অতি আশ্চর্য্য রূপে ফল পাওয়া যায় অথবা ঐ সকল লক্ষণ বিশিষ্ট সবিরাম জ্বরেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এক টুকরা আদা আগুণের উপর ধরিয়া কিঞ্চিৎ পোড়াইয়া লইতে হইবে। পরে তাহারই রসের সহিত একটী করিয়া বটী মিশ্রিত করিয়া এক এক বার সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ সূতিকা বিনোদ রস।—অন্যান্য দোষ অপেক্ষা কফের আক্রমণ বেশী হইলে উৎকাশি অগ্নিমান্দ্য এবং সেই সঙ্গে একটু একটু জ্বর ও রক্তমল থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। মধুর সহিত সেব্য।

সূতিকাহর রস। যে স্থলে অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় রোগেরই প্রবলতা লক্ষিত হয়, এবং সেই সঙ্গে অবিরাম বা সবিরাম জ্বরও অনুভূত হয়, সেই স্থলেই ইহা প্রয়োগ করিবে। ২ তোলা পরিমিত ঝাঁটি দ্বারা যথাবিধি

* এই সমুদায় ঔষধ এবং অন্যান্য বটী ও তৈলাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর পার পাইয়া উঠে না। বিশেষতঃ উহা শীতলবাবু দ্বারা যতদূর সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবার আশা করা যায়, আমা দ্বারা তাহা অসম্ভব।

ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে একটী করিয়া বটী মাড়িয়া লইবে এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ সূতিকাবল্লভ রস।—গ্রহণী, অতীসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারণার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত কেবল জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রবল জ্বরের সহিত অতীসার উপস্থিত হইয়া যদি সূতিনীকে নিতান্ত বিপদগ্রস্থ করিয়া ফেলে এবং অতীসার দ্বারাই শীঘ্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহা হইলে মধু অথবা ঝাঁটিমূলের রস ও মধুর সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আর অতীসারের তত প্রাবল্য না থাকিলেও ঠিক এই নিয়মেই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। কিন্তু সেবনের পরে পূর্ব্বোক্ত সহচরাদিগণের ক্কাথ অনুপান করিবে। সূতিকাকালের মধ্যেই হউক অথবা সেই কাল অতীত হইলে অন্য কোন সময়েই হউক, গ্রহণী দোষ দ্বারা শরীর একবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি কারক। অনুপান মধু বা ছাগদুগ্ধ।

কস্তুরীভৈরব।—প্রবল জ্বর, নাড়ী নিতান্ত সূক্ষ্ম বা দুর্ব্বল এবং বিষমভাবে স্পন্দিত আরও অন্যান্য বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঈষৎ দগ্ধ আদার রসের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কাহারো কাহারো হিক্কা হইয়া থাকে, তদ্রূপাবস্থায় মধুর সহিত মরিচ চূর্ণ বারম্বার অবলেহন করা কর্ত্তব্য। আবার বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধ দ্বারা বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায় কিন্তু তখন শুদ্ধ মধুর সহিতই সেবন করা উচিত। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বৈলক্ষণ্যই সকল প্রকার বিকারোৎপত্তি ও নাড়ী বৈষম্যের প্রধান কারণ। তন্মধ্যে আবার শ্লেষ্মা কুপিত হইলে নাড়ী একবারেই সূক্ষ্ম তন্তুবৎ হইয়া যায়। এই ঔষধ দ্বারা প্রকুপিত শ্লেষ্মা অচিরে সাম্যভাব অবলম্বন করে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও সংশোধিত হয়। সুতরাং ইহা সকল প্রকার বিকারাবস্থায়ই প্রয়োগ করা যায়। জ্বর ব্যতীত অতীসার দ্বারাও যদি বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। অনুপান শুদ্ধ মধু অথবা মধুর সহিত ঈষদুষ্ণ পিপুলমূলের রস।

মহাগন্ধক।—অনেকের বিশ্বাস যে কেবল বালকদিগের উদরাময় রোগেই ইহা সবিশেষ কার্য্যকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূতিকা রোগে এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে ফল পাওয়া যায়। যদি সর্ব্বদাই অল্প অল্প জ্বর সংলগ্ন থাকে অথবা প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, আর সেই সঙ্গে উদরের পীড়াও বিলক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং দিন দিন সূতিনী নিতান্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়, তবে প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ আদার রসের সহিত একটী করিয়া সূতিকারী রস এবং অপরহ্নে মুথার রস ও মধুর সহিত বাটিয়া মহাগন্ধক সেবন ব্যবস্থা করিলে সপ্তাহ মধ্যেই সূতিনী সুন্দররূপে স্বাস্থ্যলাভ করিবে। পরে আরও এক সপ্তাহ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

মহাভ্রবটী।—দীর্ঘকাল হইতে সূতিকা সংযুক্ত উদরাময় এবং জীর্ণ জ্বরে শরীর একবারে জীর্ণ শীর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। শরীরে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। মধু ও খুদিয়া থান্‌কুণীর রসের সহিত সেব্য।

নৃপবল্লভ।—চাউল ধোয়া বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতীসার ও অজীর্ণ নিবারিত হয়। কৃমি বা বমির বেগ বর্ত্তমান থাকিলে সদ্যমুড়ি ভিজাইয়া তাহার জলের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে।

স্বল্পগঙ্গাধর চুর্ণ।—কিঞ্চিৎ মধু ও চাউল ধোয়া জলের সহিত এক মাষা পরিমাণে সেবন করিলে প্রবল অতিসার ও সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি উপশমিত হয়।

জীরকাদি মোদক। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ বা শুদ্ধ জলের সহিত ইহার অর্দ্ধতোলা সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহা অগ্নিবৃদ্ধি কারক এবং সূতিকা সংযুক্ত গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য। পরন্তু এতদ্বারা জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য ও শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হয়।

বৃহজ্জীরকাদি মোদক। দীর্ঘ কালোত্থিত অতিসার, সংগ্রহ গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, শরীর বিশীর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ, আহারে অনিচ্ছা, পিপাসা, গ্লানি, সর্ব্বাঙ্গিক দাহ, পেটের বেদনা এবং স্বাভাবিক শরীরে যে সময় ঋতু হইয়া থাকে, সেই সময় উপস্থিত হইলে সপ্তাহ, দশাহ বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত

যোনিস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পাইলে বা ইহার মধ্যে কোন কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আরও এতদ্বারা বলবীর্য্যাদিও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত। প্রাতে গব্যদুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়।

অগ্নিকুমার মোদক। দুঃসাধ্য গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য জীর্ণজ্বর এবং ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত উদর স্ফীত থাকিয়া পরে ২।১ দিন প্রবল অতিসার, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্নিকুমার মোদক প্রয়োজ্য। প্রাতঃকালে শীতল জল বা ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

সৌভাগ্য গুণ্ঠী।—স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট মোদক। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রত্যহ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য অথবা পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিয়া পরেও কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ অনুপান করা যায়। সূতিকা সংযুক্ত গ্রহণী সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধিস্থলের বেদনা, কাসি, শ্বাস, শরীর পাণ্ডু বা ফেকাসিয়া বর্ণ, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা, ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যোনিদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন এবং স্তনরোগ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা রমণীদিগের শরীর বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া অচিরে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ।—সংগ্রহগ্রহণী, উদরস্ফীত, উদরের বেদনা, অরুচি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অবলেহন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

জীরকাদ্যরিষ্ট।—এই অরিষ্টের মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালোত্থিত সকল প্রকার সূতিকা রোগ, অতীসার এবং অগ্নি বিকৃতি নিরাকৃত হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্য ঘৃত।—দুঃসাধ্য গ্রহণী, গুহ্যদ্বারের তীব্র বেদনা, গুদভ্রংশ এবং পাণ্ডুরোগ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত প্রশস্ত। ইহা অগ্নিবৃদ্ধি কারক এবং স্তন্যবিশোধক।

ধাতক্যাদি তৈল। এই তৈল মস্তক, চক্ষু, নাভি এবং তলপেটে মর্দ্দন করিতে হয়। সূতিকা রোগ দ্বারা বিশীর্ণা সূতিনী এতদ্বারা পূর্ব্ব লাবণ্য

প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসা কালে রুগিণীদিগের পক্ষে সুপথ্যাভিলাষিণী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বলা তৈল। ইহা সকল প্রকার বাতবিকার নিবারক, প্রবল সূতিকা দ্বারা যে সকল রমণী একবারে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে তাহারা অচিরে স্থিরযৌবন প্রাপ্ত হয়। হিক্কা, শ্বাস, কাস, ও আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা মস্তক ও চক্ষু স্থলে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। গুল্মরোগ শান্তির জন্য অধিকন্তু তলপেটে মর্দ্দন করিতে হইবে।

অঙ্গশোষ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত এবং কটিপার্শ্ব প্রভৃতি স্থানের অকর্ম্মণ্যতা দূরীকরণার্থ তত্তৎ স্থানে কুব্জ প্রসারিণী তৈল ও মহামাষ তৈল মর্দ্দন করাই প্রশস্ত।

প্রসূতীর হৃদয়, মস্তক ও বস্তিদেশে তীব্র বেদনা হইলে ঘৃত কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার পান করা প্রশস্ত। পিপুল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরিতকী, আমলকী ও শটী ইহাদের ক্বাথের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উক্ত স্থানে বেদনা নিবারণ হয়। ক্রমশঃ——

উমারপুর
পোঃ নাকালীয়া
পাবনা
শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

(১) লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদরের নূতন চিকিৎসা।

(এলোপ্যাথি মতে।)

যদি রক্তহীনতার জন্য শ্বেতপ্রদরের ব্যাম হইয়া থাকে, তবে আর্সেনিকের তুল্য ঔষধি আর নাই। আর্সেনিক অল্পমাত্রায় প্রত্যহ দুই তিনবার খাইতে দেওয়া উচিত। ডাক্তার ফিলিপ্‌স বলেন টীংচার পল্‌সেটিলা (Liues pulsatilla) পাঁচ ফোটা মাত্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তিন বার

করিয়া খাইতে দিলে শ্বেতপ্রদর ভাল হয়। টীংচার হেলনিয়াস (Helonias) নামক ঔষধ পাঁচ বিন্দু মাত্রায় খাইতে দিলে লিউকোরিয়া রোগের প্রতিকার হয়। নিম্নলিখিতরূপে ঔষধের জল তৈয়ার করিয়া যোনিদ্বার ধৌত করিলে উপকার হয়। যথাঃ—

সোডিয়াই বাইকার্ব	১ ড্রাম।
টীংচার বেলাডোনি	২ ড্রাম।
জল	১ পাইণ্ট।

একত্র মিশ্রিত করিয়া জল তৈয়ার করিবে। অথবা নিম্ন লিখিত লোসন তৈয়ার করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া ঐ তুলা যোনিমধ্যে স্থাপন করিবে। যথাঃ—

টীংচার পল্‌সাটিলা	২ ড্রাম।
গ্লিসেরিনাই	২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত কর।

অথবা ফ্লাইড্‌ এক্‌স্‌ট্রাক্‌ট অব হাইড্রাস্‌টিস্‌ (Hydrastis Fl. EXt.) ২ আউন্স পরিমাণ লইয়া প্রত্যহ দুইবার যোনি মধ্যে প্রয়োগ করিবে।

ডাক্তার ফ্রহক বলেন যে, যদি কিছুতেই রোগ আরাম না হয়, তবে প্রথমতঃ কার্ব্বলিক লোসন (শতকরা ১ ভাগ) অথবা বোরাসিক্‌ এসিড লোসন (বোরাসিক এসিড ৪ ভাগ ও জল ৯৬ ভাগ) দ্বারা যোনি ধৌত করিয়া তার পরে তিন গ্রেন মাত্রায় আইডোফরম (Iodoform) লইয়া তুলা সংযোগে যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। এই আয়ডফরম যুক্ত তুলার পুঁটলি যোনি মধ্যে দুই তিন দিন রাখিয়া পরে বাহির করিয়া ফেলিবে।

২। পেঁয়াজের গুণ।

—সাঁওতাল পরগণার রেভারেণ্ড হিগার্ট সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস পত্রিকায় পেঁয়াজের গুণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, পেঁয়াজ পাথরি (মূত্রাশ্মরী) রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রদ্বারি দিয়া পাথরি নামিয়া আসিবার সময় অত্যন্ত যন্ত্রনা হয়, পেঁয়াজ খাইলে ঐ সকল পাথরি গলিয়া গিয়া যন্ত্রনা নিবারণ হয়। তিনি কহেন এক ব্যক্তির দুই বৃক্কক দ্বয়ে (কিড্‌নি) পাথরি জন্মিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ একটী কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়াতে ১৪ দিনের মধ্যে এক কিডনির পাথরি আরাম হইয়া যায়। পরে

আর এক মাস ঐরূপে প্রত্যহ পেঁয়াজ খাওয়াতে উভয় কিডনিরই পাথরি আরাম হইয়া যায়। পিত্তকোষের (গলব্যাডার) ভিতর ছোট ছোট পাথরি হইলেও কাঁচা পেঁয়াজ খাইলে ভাল হইয়া যায়।

তৎপরে হিগার্ট বলেন যে পেঁয়াজের এমন কোন গুণ নাই যে, তাহাতে পাথরি জন্মাইবার কারণ দূরীকৃত হয়। তবে ছোট ছোট পাথরি জন্মাইলে পেঁয়াজ খাইলে ঐ সকল পাথরি গলিয়া যায়। পাথরি অত্যন্ত বড় হইলে পেঁয়াজ খাইলে তাহাতে তাদৃশ উপকার হয় না, তবে ছোট ছোট পাথরি (ক্যান্‌কিউলস্) সকল নিবারণ হয়। অতএব পাথরি জন্মাইবামাত্র পেঁয়াজ খাওয়া ভাল। পাথরি বাহির করিয়া উহা পেঁয়াজের ভিতর রাখিয়া দিলে উহা গলিয়া যায় না। তবে পেঁয়াজ উদরস্থ হইলে উহা পরিপাকান্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া পাথরি সকল গলাইয়া ফেলে। যাঁহাদের মূত্রমার্গ দিয়া মধ্যে মধ্যে পাথরি নামা রোগ আছে, তাঁহারা পেঁয়াজ খাইয়া দেখিতে পারেন।

ক্রমশঃ——

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি,

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ঔষধ।

(১) মৃদু বিরেচক পেঁপে ফল।

ইহার পক্ক ফল অতি সুস্বাদু। আজকাল অনেকেই ইহা আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই ফল অতি কোষ্ঠপরিস্কারক। ইহার কাঁচা ফলের ব্যঞ্জন প্রস্তুতমতে অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। একারণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি—

কাঁচা পেঁপের উপরের ছাল ও মধ্যের বিচি ফেলিয়া দিয়া কুমড়া কোটার মত খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটীয়া লইয়া প্রথমতঃ অতি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইয়া জল ফেলিয়া দিতে হয়, পরে ঐ সিদ্ধ করা পেঁপে খণ্ডগুলি অল্প তৈলে

বা ঘৃতে একটু কসিয়া লইয়া, কেবল ঐ পেঁপের অথবা তৎসহ আলু পটল দিয়া, ধনে বাটার বলক দ্বারা ডাল্‌না রান্ধিবার প্রণালীক্রমে পাক করিতে হয়, পাক সমাধার সময় অল্প একটু দুগ্ধ ও চিনি দেওয়া আবশ্যক, এই ডালেনা অরুচি নাশক, বলকারক, কোষ্ঠ পরিস্কারক। এইরূপে ইহার ঘণ্ট ও ছ্যাচ্‌কি বিশেষ উপাদেয় প্রস্তুত হয়।

(২) কাঞ্চন ফুলের কলিকার উপরের ছাল ফেলিয়া দিয়া,জলে সিদ্ধ করণান্তে পরিমিত মত লবণ মিশ্রিত ও ঐ গব্যঘৃতে সম্ভবমত ভাজিয়া ব্যবহার করিলে, অরুচি নাশ হয়, দুষ্টক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়, রক্ত পরিষ্কার করে।

(৩) বক পুষ্পের কুঁড়ি (প্রস্ফুটনোন্মুখ) জলে সিদ্ধ ও লবণ মিশ্রিত করণান্তে গব্যঘৃতে ভাজিয়া অন্নের সহিত ভোজন করিলে নক্তান্ধ্যতা (রাতকানা) রোগ নাশ হয়। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করা গিয়াছে যে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(৪) মানান্ন।

মানকচুর উপরের ছাল ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ জলে সুসিদ্ধ করিয়া পৃথক পাত্রস্থ করত জল দ্বারা মর্দ্দন ও তরলীকৃত করিয়া কচুর সমপরিমাণ সুসিন্ন অন্নের সহিত একত্র করিয়া তেজপত্র, মরিচ, দ্বারা ঘৃত সম্ভারিত করিয়া ঐ ঘৃতে তরলীকৃত কচু ও অন্ন দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া কিঞ্চিৎ জল শুষ্কতর হইলে পরিমিতমত লবণ দিয়া পাকনিষ্পন্ন করিতে হয়। কথিত মানান্ন পরিমাণ মত সেবন করিলে, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শোথ, কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন জ্বর, অরুচি নাশ হয়, ইহা বিশেষ লঘুপাকী, কোন প্রকার রক্ত দোষজনিত পীড়া থাকিলে উপযুক্তমত ভাল কুম্‌কুম্ কিঞ্চিৎ যথাযোগ্য সময়ে উহাতে যোগ দেওয়া আবশ্যক। অন্ন বা কচুর পরিমাণ কিছু লিখিত হইল না। রোগীর বয়স ও পরিপাক যোগ্য অগ্নি বিবেচনা করিয়া কচু ও অন্নের পরিমাণ স্থির করা আবশ্যক। ইহা বলা আবশ্যক যে, অন্ন পুরাতন তণ্ডুলের ও লঘুপাকী শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক।

ক্রমশঃ

বৈশাখ
সাতক্ষীরা।

} শ্রীরামনিরঞ্জন রায় চৌধুরী।

---

(১) নূতন উপদংশের (গরমির) ঔষধ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি আমার পরীক্ষিত।

"বড় গোয়ালেলতার কচি পাতা" ঐ পাতা অফুটন্ত অবস্থায় দুইটি পার্শ্ব যোড়া লাগিয়া থাকে, পাতাটি ফুটাইলে উহার উপর পৃষ্ঠা দেখিতে ঠিক মর্থমলের ন্যায় এবং কোমলও তদ্রূপ। উপদংশের ক্ষতে ঐ পৃষ্ঠা লাগাইতে হয়, সকালে ও বৈকালে এক একটী করিয়া পাতা ৪।৫ দিবস লাগাইলে উপদংশ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ছোট গোয়ালে লতায়ও ঐরূপ উপকার হয়।

(২) আমাশয় ও রক্তামাশয়ের ঔষধ।

"আমরুল গাছের রস" কতকগুলি আমরুল গাছ ডাঁটায় পাতায় তুলিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সহ রগড়াইয়া রস বাহির করিতে হয়, ২।৪ দিবসের পীড়া হইলে /০ ছটাক রস এক দিবস মাথায় বসাইলে এক দিবসেই আরোগ্য হয়, কিন্তু অধিক দিবসের পীড়া হইলে প্রত্যহ ২ তোলা পরিমাণ রস ২।৪ দিবস মাথায় বসাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

(৩) শ্বাসের ঔষধ।

"মৌরির গাছ ও মরিচ" ফল, ফুল, ডাঁটা, পাতা ও শিকড় সহ একটি মৌরির গাছ ১।০ সোয়াটি মরিচ সহ বাঁটিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটি প্রস্তুত করিয়া সকালে ও বৈকালে গরম জল সহ ৮।১০ দিবস সেবন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়।

(৪) সর্পাঘাতের ঔষধ।

"কেলেকোড়ার শিকড়" ইহার ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদেও আছে * চক্রদত্তের টীকাকার আতপ চাউল ভিজান জলে বাঁটিয়া নস্য করাইতে উপদেশ দেন এবং তিনি আরও কহেন যে, কেহ কেহ পান করাইতেও কহেন। জনৈক পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে সাপের ঔষধের

---

* কুলিকামূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি।
তণ্ডুলোদকেন নস্যংকার্য্যং কেচিৎ পানং বদন্তীতি॥

কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ গাছের সিকড় কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল সহ বাঁটীয়া সেবন করাইতে এবং ছেঁচিয়া পোটলা করিয়া উহার রস নস্য করিতে ও নির্ব্বিষ না হওয়া পর্য্যন্ত শুঁকাইতে এবং মস্তকে জল ঢালিতে কহেন। রোগীর সংজ্ঞা না থাকিলে কেবল মাত্র জল ঢালিতে ও গাছ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিষ না হওয়া পর্য্যন্ত শুঁকাইলে এবং সেবন করাইলে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। ১২৯৪ সালে এখানে একটী স্ত্রী লোককে সাপে কামড়ায়, আমি তিন কোয়াটার পরে যাইয়া দেখি, রোগিণীর কিছু মাত্র সংজ্ঞা নাই, কেবল নিশ্বাস বহিতেছে মাত্র। অনবরত লালাস্রাব হইতেছে ও পেট ফাঁপিয়া গিয়াছে, আমি তখন সকলের সম্মতি লইয়া ঐ গাছ শুকাইতে ও জল ঢালিবার ব্যবস্থা করি। কিছুক্ষণ পরে লালাস্রাব বন্ধ হইয়া রোগিণী তাকাইতেছে বলিয়া বোধ হইল কিন্তু ডাকিলে নিরুত্তর, এইরূপে জল ঢালিতে ঢালিতে ও গাছ শুকাইতে ও জল ঢালিবার ব্যবস্থা করি। কিছুক্ষণ পরে লালস্রাব বন্ধ হইয়া রোগিণী তাকাইতেছে বলিয়া বোধ হইল কিন্তু ডাকিলে নিরুত্তর, এইরূপে জল ঢালিতে ঢালিতে ও গাছ শুঁকাইতে শুঁকাইতে কতকগুলি উদ্গার উঠিয়া ও অধো বায়ু নিঃসরণ হইয়া রোগী সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করে। অনেকের অনুরোধে নির্ব্বিষ হওয়ার পরও রোগিণীকে গাছ শুঁকিতে দেওয়ায় উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে গাছ শুকান বন্ধ রাখিয়া স্নান করানয় ও মাথায় জল পটি দেওয়ায় উন্মাদের লক্ষণ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু ২।৩ মাস পর্য্যন্ত রোগী দুইবার স্নান করিত, স্নানের বিলম্ব হইলেই চক্ষু লাল হইত। আমি এই ঔষধ একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়াছি, পুনঃ পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাই নাই। যদি কেহ এই গাছ পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে পরীক্ষার ফল অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মিলনীতে লিখিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস।

পোড়াদহ

বিবিধ ঔষধ।

উদ্ধৃত।

(১) প্লীহা যকৃত। উষ্ট্রের মূত্র এক ছটাক পরিমাণে ৭ দিন প্রাতে এবং এক ছটাক শীতল জলে ২০ বিন্দু আকন্দ গাছের দুগ্ধ সন্ধ্যার সময় খাইবে, প্রবল মৎস্য মাংস ও দুগ্ধ শাক ও অম্বল না খাইলে ভাল হয়।

(২) রাত্র্যন্ধতা। স্তন্যদুগ্ধে হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে ৫ দিন রাত্রে অঞ্জন দিবে এবং পানের রসের সহিত কোমল বটপত্র বাটিয়া চক্ষুর চারি পার্শ্বে ৫ দিন প্রাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেক।

(৩) মাথাধরা। ঘোলাগাছের মূল বাটিয়া মাথার দুই পার্শ্বে লাগাইয়া দিবে, বাটিবার সময় জল মিশাইও না। এই মূল বরফের ন্যায়, ইহা এক প্রকার লতা, শতমূলীর ন্যায় আকার।

(৪)হিক্কা। ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া গলায় দিলে অথবা নারিকেল জলে মুড়ি ভিজাইয়া ঐ জল খাইলে হিক্কা তদ্দণ্ডে প্রশমিত হয়।

(৫) ছুলী। ..ছুলী হইলে আশশ্যাওড়ার বীজ জল দ্বারা চন্দনের সহিত বাটিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

(৬) অর্শ।—গাঁদা ফুলের গাছের পাতা ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতঃকালে খাইতে হইবে। পরিমাণ এক তোলার ন্যূন না হয়। মলত্যাগ করিবার পক্ষে উষ্ণ জলে শৌচকরা আবশ্যক। অধিক দিনের অর্শ হইলে উক্ত পাতা কাচা অবস্থায় বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথা স্থানে প্রলেপ দিবে।

(৭) বৃশ্চিক দংশন।...বিছা কামড়াইলে বড় যাতনা হয় এবং কখনও কখনও দুই দিন পর্য্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে, বৃশ্চিক দংশন করিয়াছে জানিতে পারিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুনে (ক্ষুদ্র নুনীয়) নামক তৃণ দষ্ট স্থানে ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণা তন্মুহূর্ত্তে লোপ পায়। ক্ষুদ্র নুনে অতি ক্ষুদ্র জাতিয় শাক, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং অনেকে পাক করিয়া শাকের মত উহা খাইয়া থাকে।

চারুবার্ত্তা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(১) রক্ত পিত্তের ঔষধ।

রোগীর মুখ হইতে রক্তস্রাব হইলে বাকসের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক কাশির চিনি অর্দ্ধ তোলা, উভয়ে মিশ্রিত করিয়া সকালে ও বৈকালে সেবন করিবে। উপরোক্ত ঔষধ ১ সপ্তাহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারণ হয়।

(২) দাঁতের কন্‌কনানি।

কিঞ্চিৎ খয়ের দাঁতের গোড়ার ফাঁকের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

(৩) স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ হওন।

ভূমি কুষ্মণ্ডের শীকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া অর্দ্ধ তোলা, আতব তণ্ডুলের গুঁড়া অর্দ্ধ তোলা, ও দুগ্ধ একতোলা মিলাইয়া সপ্তাহ সেবন করিলে অধিক দুগ্ধ হইবেক।

পরীক্ষা

শ্রীহৃদয়নাথ শর্ম্মা।

পেপিয়া ফলের ভৈষজ্যতত্ত্ব।

এলোপ্যাথি মতে।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক রিসার্চেস্ নামক কাগজে ডাক্তার ফ্লেমিং পেঁপিয়া ফলের গুণ বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতেই এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহার গুণানুসন্ধান করিতে উৎসুক হয়েন। পেপিয়া এতদ্দেশীয় ফল নহে। মার্কিণ ইহার আদি জন্মস্থান, তৎপরে ভারতবর্ষাদি বহু দেশে উপ্ত হইয়াছে। হেন্‌ফ্রে, তদীয় উদ্ভিদবিচার শাস্ত্রে ইহাকে 'পেপো জাতীয় বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইহার যতগুলি নাম, আছে তাহার অধিকাংশই এই কথার অপভ্রংশ বা রূপান্তর ভিন্ন আর

কিছুই নহে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় সময়ে এই বৃক্ষ এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না *।

কিন্তু পেপের যে রোগনাশক ধর্ম্ম আছে, তাহা এক্ষণে আর অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের খ্যাত নামা ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ওশানশি পেপিয়া ফলের কৃমিনাশক গুণ আছে শুনিয়া ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি পেপিয়া ফলের দুগ্ধবৎ নির্য্যাস বিশ হইতে ষাইট ফোটা মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন রোগীকে খাওয়াইতে থাকেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। তৎপরে মরিশাশদ্বীপে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক এই নির্য্যাস কৃমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না। কিন্তু মরিশশের চিকিৎসকগণ ইহার মাত্রা ও প্রয়োগরূপ একটু বিভিন্ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়ারিং তদীয় ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাকোপিয়া নামক গ্রন্থে মরিশশে ব্যবহৃত ঔষধের এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

কাঁচাপেপের দুগ্ধ বা আঠা———	৪ ড্রাম
মধু	৪ ,,
স্ফটিতজল	২ আউন্স

পেপের আটা ও মধু উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে গরম জলটুকু ঢালিয়া দিয়া তৎপরে শীতল হইলে সমস্তটুকু যুবা ও প্রৌঢ় রোগীকে একেবারে পান করিতে দিতে হইবে। দুই ঘণ্টা পরে পূর্ণ মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল ও তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণ পাতি লেবুর রস বা সির্কা মিশাইয়া খাইতে দিতে হইবে। ইহাতেই দাস্তের সঙ্গে কৃমি সকল বাহির হইয়া যাইবে, যদি এক দিনে ভালরূপ কার্য্য না হয় তাহা,হইলে দ্বিতীয়বার এইরূপ করিয়া পেপের নির্য্যাস ও কাষ্টর অয়েল খাওয়ান যাইতে পারে। বালক ও শিশুগণকে ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় দিতে হইবে।

* চিকিৎসা-সম্মিলনীর সুযোগ্য কবিরাজ সম্পাদক মহাশয় এই বৃক্ষ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কোথাও বর্ণিত হইয়াছে কি না, তাহা জানাইয়া এ প্রবন্ধ লেখক ও সম্মিলনীর পাঠকগণকে উপকৃত করিবেন, কেননা বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এত অজ্ঞ যে, এ সম্বন্ধে কোন মত দিতে সমর্থ নহেন।

মহীলতার ন্যায় কৃমি (Ascaris lunbricoides or round worm) বিনাশ করিতে পেপিয়া দুগ্ধ যত উপকারী, এত আর অন্য কোন শ্রেণীর কৃমির পক্ষে নহে। ফিতার ন্যায় কৃমি ইহাতে বিনষ্ট হয় না। এ হিসাবে পেপে ও সাণ্টোনাইন একই প্রকার গুণবিশিষ্ট।

দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে বালক বালিকাগণের কৃমিনাশার্থ পেপের আটা বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অনেকে পেপের বীজগুলিও কৃমি নাশক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং মরিশশ প্রভৃতি স্থানে বীজগুলি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ওয়ারিঙ্গের মতে বীজ গুলি আটার ন্যায় উপকারী নহে।

অনেক চিকিৎসক প্লীহা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পেপিয়া রন্ধন করিয়া খাইতে পরামর্শ দেন। আমিও কখন কখন ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু কেবল পেপিয়া খাইতে পরামর্শ দিয়াই কোন চিকিৎসক রোগীকে ছাড়িয়া দেন না। তৎসঙ্গে রীতিমত ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং যখন রোগের উপকার হয়, তখন পেপিয়ার গুণে প্লীহা কমিল কিম্বা ঔষধের দ্বারায় ঐ উপকার হইল, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না।

পাকা পেপে খাইলে অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। পাকা বেল অপেক্ষা পাকা পেপে লঘু ও জীর্ণ করা সহজ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পাকা বেলে দাস্ত যেরূপ পরিষ্কার হয়, পেপে দ্বারা সেরূপ কিছুই হয় না।

কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি স্বাদবিশিষ্ট ঔষধের সংখ্যা এত অধিক যে, 'আহার ও ঔষধ' দুইই হয়, এমন ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা দেখিলে মন বড়ই প্রীত হয়। সেই জন্যই পেপিয়া ফলের গুণ বর্ণনা করিয়া একখানি মান্দ্রাজি সংবাদ পত্রের জনৈক সংবাদ দাতা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ঐ প্রবন্ধের সারাংশ সম্প্রতি ষ্টেটস্‌মান সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। লেখকের মতে সূর্য্যের উত্তাপে চর্ম্মের উপর যে সকল কণ্ডু, দাগ ও স্ফীতি দেখা যায়, পেপিয়া ফলের শস্যের রস মর্দ্দন দ্বারা তৎসমুদায় বিদূরিত হয়। ঐ রস মর্দ্দনে দদ্রু

(দাদ) রোগেরও উপকার হইয়া থাকে, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে অদ্যাপি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই।

উল্লিখিত লেখক ও ডাক্তার ওয়ারিং উভয়েরই মতে পেপিয়া ফলের বীজগুলি রজোনিঃসারক এবং ফলের শস্য ভ্রূণনিঃসারক গুণবিশিষ্ট। এই জন্যই দাক্ষিণাত্যের ঋতুমতী ও গর্ভবতী রমণীগণ এই ফল ভক্ষণ করে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও বঙ্গদেশে এই বৃক্ষ এক্ষণে বহুল পরিমাণে জন্মাইতেছে, তথাপি অত্রত্য অধিবাসীগণ পেপিয়ার এই সকল ধর্ম্মের প্রতি কিছুই লক্ষ্য করেন না।

পেপিয়ার আঠা বা দুগ্ধবৎ নির্যাস জরায়ু মুখে লাগাইলে ইহার জরায়ু সঙ্কোচন ক্ষমতা বশতঃ গর্ভস্রাব হইতে পারে, এ বিশ্বাসও অনেকের আছে। কিন্তু ইহাতেও আরও ভূয়োদর্শন প্রয়োজন।

কিন্তু মাংসতন্তু ও জান্তব পেশী সমূহের উপর পেপে ফলের যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে যে, কোন অদূরবর্ত্তী দিনে এই ফল ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্বের মধ্যে অতি উচ্চ স্থানাধিকার করিবে। এই ফলের দুগ্ধবৎ নির্যাস বা আটা দ্বারা মাংস-সূত্র সকল শিথিল হইয়া যায়। যে সমযোগাকর্ষণগুণে শারীরিক তন্তু বিধানগুলি স্ব স্ব প্রকৃতির সূত্রের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন থাকে, এবং যাহার গুণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংস সূত্র সকল পরস্পরের গাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া এক একটী মাংসকে দড়ার মত স্থূল করিয়া রাখে—পেপিয়ার রস সেই সমযোগাকর্ষণ ধ্বংস করিতে সমর্থ। অস্মদ্দেশীয় মাংস ভোজীগণের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, কঠিন ছাগ মাংস বা অন্য কোন কঠিন মাংস সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া যখন দেখাযায় যে, বহুক্ষণেও মাংস কোমল হইল না। তখন পেপিয়ার আটা, রস বা শাঁস খানিকটা ফেলিয়া দিলেই কিয়ৎ-ক্ষণের মধ্যে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সেই মাংস কোমল হইয়া যায়।

কিরূপে এই ফলের রস দ্বারা মাংসসূত্র সকল বিদীর্ণ হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। যে অণ্ডলাল-প্রধান সৌত্রীন্ পদার্থ দ্বারা মাংসসূত্র সকল পরস্পর আবদ্ধ থাকে, পেপিয়ার বীর্য্য তাহাকে কেবল দ্রব করিয়া বা রাসায়-

নিক বিশ্লেষণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সূত্রগুলিকে বিভিন্ন করিয়া দেয় এবং কিয়ৎপরিমাণে সূত্রগুলির সমযোগাকর্ষণ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করে অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাদিগকে বিভিন্ন করে তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু ইহা দ্বারা মাংসসূত্র সকলের বিভিন্ন হওয়ার বিষয় আর কেহই সন্দেহ করেন না।

জলের সহিত পেপিয়ার আটা মিশাইয়া তাহাতে কঠিন মাংস ১০।১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিলে বা ধুইয়া লইলে ঐ মাংস অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। মাংসের উপর পেপিয়ার পাতা জড়াইয়া উহা শূল বিদ্ধ করিয়া অগ্নি সন্তাপ লাগাইলে অতি শীঘ্র সুসিদ্ধ শূল্যমাংস প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই গাছের ডালে দুই তিন ঘণ্টা কাল মাংস ঝুলাইয়া রাখিলে উহা কোমল হইয়া যায়।

পেপিয়ার বীর্য্য কেবল মাংস সূত্রগুলিকে কোমল ও বিচ্ছিন্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। সম্ভবতঃ এই বীর্য্য রক্তস্রোতের সঙ্গে শরীরের সর্ব্বত্র গমন করিয়া কতকগুলি বড় বড় যন্ত্রের উপর কার্য্য করে এবং রক্তেরও কোন কোন উপাদান নষ্ট করে। উপরোল্লিখিত লেখক বলেন যে, এই জন্যই বীর্বেডোস দ্বীপের অধিবাসীগণ জলের সহিত পেপিয়ার আঠা মিশাইয়া ঘোড়াকে পান করিতে দেয়—তাহাতে ঘোড়া শান্তপ্রকৃতি হয়। প্লীহার উপর এই পদার্থের যে ক্ষমতার কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহাও এই কারণেই দেখা গিয়া থাকে। যাহা হউক এই ফল যে নানা কারণে মানুষের উপকারী, মনুষ্য শরীরের উপর ইহার যে ক্ষমতা আছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহার আরও অধিক ক্ষমতা আছে কি না অন্য কোন রোগ আরোগ্য করিতে ইহা সমর্থ কি না, তাহা বঙ্গীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর অনুসন্ধানের বিষয় বটে।*

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, এম, বি,

* পেঁপিয়া ফলের উল্লেখ বৈদ্যশাস্ত্রে নাই, সুতরাং লেখক মহাশয় যে ভার দিয়াছেন, তাহা পালন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তবে বৈদ্যশাস্ত্রে এই ফলের উল্লেখ না থাকিলেও সচরাচর আমরা পেঁপিয়ার যে সমস্ত গুণের পরিচয় পাইয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের মতের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। চি, স, ক, স,

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বি, এ, এম্, বি, ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক জন বিলক্ষণ চিন্তাশীল লেখক বলিয়া সুপরিচিত। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তাঁহার লিখিবার শক্তিও তাদৃশ অসীম, বস্তুত একাধারে এরূপ উভয় গুণের সমাবেশ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা কয়েকবৎসর হইতে বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসাবিষয়ক যে কোন পত্রিকা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় তাহার অধিকাংশ পত্রিকাতেই তাঁহার লেখার পরিচয় আমরা পাইয়া আসিতেছি, চিকিৎসা-সম্মিলনীর সৃষ্টি হইতেও আমাদের সে আশা বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এপর্য্যন্ত তাহা ঘটে নাই, সুতরাং ছয় বৎসরের অশা আজ ফলবতী হইতে চলিল দেখিয়া অন্তঃকরণে যথার্থই যারপর নাই আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি নিয়মিত লিখিবেন বলিয়া যেরূপ আভাস দিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আশা করি, পাঠকগণ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর সুখী হইতে পারিবেন। চি, স, ক, স,

---

হোমিওপ্যাথিক ঔষধতত্ত্ব।

ইস্কিউলাস হিপক্যাস্টেনাম।

সুপক্ক ফলের অরিষ্ট ক্লাস III

মাত্রা ৩, ৬

বৃহদন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য লক্ষিত হয়। বৃহৎ অন্ত্র তিন অংশে বিভিন্ন কোলন, সরলান্ত্র, ও মলদ্বার; এই সকল স্থানে রক্ত সঞ্চার ও রক্তস্রাব দৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে এই ঔষধ ব্যবহারে নিম্ন কসেরুকা মজ্জার ক্রিয়াধিক্য বশতঃ যকৃতের পোর্টাল নামক ধমনিতে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত কোলন ও

সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ উৎপাদন করে; অন্ত্রের ঐ সকল স্থান শুষ্ক ও স্ফীত হয়, সরলান্ত্রের যে সকল রক্ত শিরার রক্তাধিক্য বশতঃ অর্শ উৎপন্ন হয়, এই ঔষধ প্রয়োগে ঐ সকল শিরায় অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চার হওয়ায় সরলান্ত্র ও মলদ্বার প্রচণ্ডরূপে প্রদাহিত হইয়া দুরূহ অর্শ রোগ উৎপন্ন করে। কশেরুকা মজ্জা হইতে যে সকল চালনাশক্তি উৎপাদক (মটর) স্নায়ু বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগের সূত্র সকলের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করায় ঐ ঝিল্লি হইতে রস ক্ষরণ বন্ধ হইয়া যায়। এই হেতু এই ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ ও সাদা মলত্যাগ হইতে দৃষ্ট হয়।

যাহারা পোর্টাল ধমনীর রক্তাধিক্য হেতু অর্শরোগগ্রস্থ, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। সেক্রাম ও পৃষ্ঠবংশের সংযোগ স্থানে অনবরত কন্‌কনে বেদনা বোধ হয় যেন ঐ স্থান ভগ্ন হইয়াছে, বিশেষ ইহার সহিত অর্শ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাই প্রধান ঔষধ।

প্রকাণ্ড অর্শের বলি দ্বারা সরলান্ত্র সম্পূর্ণ আবদ্ধ, অর্শে অতিশয় বেদনা কিন্তু রক্তস্রাব হয় না, সরলান্ত্র ও মলদ্বার শুষ্ক এবং বোধ হয় যেন ঐ স্থান কোন প্রকার বাহ্যিক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

মলদ্বারে অতিশয় বেদনা, রোগী শয়ন করিতে, বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে না, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব হেতু রোগী উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠে।

মলদ্বার হইতে অর্শের বলি বহির্গত হওয়া; উহারা নীল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট, উহাতে তীরবেধনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ও জ্বালা এবং সেক্রাম অস্থিস্থানে অতিশয় কন্‌কনানি। এ স্থলে সিরেট স্কুলাষবাহ্য প্রয়োগ এবং দুই ক্রমের ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আরোগ্য হইবে। দাস্ত কঠিন অথবা কোমল ও পাতলা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

মলদ্বারের অধঃপতনের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও গোলাকার, এবং নিম্ন পৃষ্ঠে কন্‌কনানি।

কেহ কেহ বলেন যে কামল রোগে ইহা প্রয়োগ হয়। ডাক্তার হার্ট লিখিয়াছেন যে, উদর ও বস্তিগহ্বরে দপদপানি ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ, ইহাতে ঐ গহ্বরস্থ যন্ত্রের রক্তসঞ্চার নিবারণ করে।

শ্বেতপ্রদরের সহিত পৃষ্ঠে, সেক্রাম ও ইলিয়াম অস্থির সংযোগ স্থানে অসাড়তা এবং চলিয়া বেড়াইলে কান্তি ও বেদনা বোধ।

মূত্র ঘোর রক্তবর্ণ, ঘোলাটে বা পীত বর্ণ এবং শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ সংযুক্ত ও উষ্ণ।

পদদ্বয় এত দুর্ব্বল যে রোগী অতি কষ্টে চলিতে পারে, কশেরুকা মজ্জার বিকার হেতু হাত পায়ের অসাড়তা ও পক্ষবাত, এবং সবিরাম জ্বর ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে।

বৃদ্ধি ঃ—চলিয়া বেড়াইলে উদরাময়ের উপসর্গের বৃদ্ধি।

উপশম।—স্থির ভাবে থাকিলে।

এলোজ।

ইহার অরিষ্ট চতুর্থ শ্রেণী অনুসারে প্রস্তুত হয়।

বিষম গুণ।—উদ্ভিজ্জ হইতে যে সকল এসিড প্রস্তুত হয়।

সমগুণ।—ইস্কুলাস, কোলিনসোনিয়া।

মাত্রা।— ৩, ২০০,

উদরস্থিত সমবেদন স্নায়ুর (সিমপ্যাটিক) উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া থাকায় নিম্নলিখিত যন্ত্রত্রয়ে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ হয়।

১। **যকৃত।** (লিবার) পোর্টাল ধমনীর রক্ত সঞ্চার এবং অতিরিক্ত পিত্ত সঞ্চার।

২। বৃহৎ অন্ত্র (লার্জ্জ ইণ্টেষ্টাইল) ঐ অন্ত্রের পেশীর পেরিষ্টল্টিক গতির বিবৃদ্ধি।

৩। ত্বক চর্ম্মরোগ বিশেষ পামা (একজিমা)।

অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহারে যকৃতস্থিত পোর্টান ধমনীর রক্তাধিক্য এবং অধিক পরিমাণে পিত্ত সঞ্চার হইয়া থাকে। ডাক্তার লুথর ফোর্ড বলেন যে, এলোজের পিত্তনিঃসরণ গুণ থাকায় ইহা একটী বিরেচক ঔষধ; কারণ,

অন্ত্রের পেশীর সহিত পীত্ত সংযোগ হইলে উহার সংকোচক ক্রিয়ার এবং রসস্রাবের বৃদ্ধি হয়।

বৃহৎ অন্ত্রের পেশীর উপর যে ইহার কার্য্যাধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্নায়ুর ক্রিয়া জনিত কিম্বা পেশী সূত্রের উপর পিত্তের ক্রিয়া হেতু উৎপন্ন হয় কি না তাহা বলা কঠিন, সম্ভবত উভয় কারণ এস্থলে কার্য্য করে। প্রথমে স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং স্নায়ু হইতে পেরিষ্টল্টিক গতি এবং পেশীসূত্র হইতে রসস্রাব বৃদ্ধি হয়।

ইহা ব্যবহারে সরল অন্ত্রের (রেক্টম) রক্ত সঞ্চার হইয়া অর্শ এবং মলত্যাগ কালীন নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে। সরলান্ত্রের ন্যায় বস্তি গহ্বরের অন্যান্য যন্ত্র সমূহের রক্ত সঞ্চার হয়। রজসাধিক্য এবং অধিক পরিমাণে সেবনে গর্ভপাত হইতে দেখা গিয়াছে, পুরুষদিগের পুনঃ পুনঃ লিঙ্গ উচ্ছাস হইয়া থাকে।

ত্বক। চর্ম্মের উপর ইহার সামান্য কার্য্য দৃষ্ট হয় যথা ঃ—পামা রোগ এবং মস্তকের কেশ পক্ক ও স্থানে স্থানে কেশ স্খলন হইতে দেখা যায়।

ব্যবহার লক্ষণ।

প্রাতে উদরাময় ;—দাস্ত পীত বর্ণের জলবৎ তাল শাঁসের ন্যায় অথবা বায়ু সংযুক্ত, ইহার সহিত নিম্ন উদরে অসহনীয় কামড়ানি ও বেদনা। মলত্যাগ কালীন বেগ, দাস্ত অন্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা, আহার অন্তে মলত্যাগের ইচ্ছা।

জলবৎ দাস্ত কোন ক্রমেই উহার বেগ এক মূহুর্ত্তর জন্য নিবারণ করা যায় না। দাস্তের সহিত বায়ু নিঃসরণ, প্রচণ্ড অন্ত্রশূল, অন্ত্রে গড় গড় শব্দ। মলদ্বার হইতে মল নিঃস্মরণ অনবরত হইতেছে অনুভব। সরলান্ত্রের মধ্যে জল পূর্ণ থাকা অনুভব বোধ হয় যেন নিঃসরণ হইল, দাস্ত কালীন ও পরে অতিশয় ক্লান্তি বোধ। রক্তাতিসার রোগ অতিশয় বেদনাদায়ক পুনঃ পুনঃ দাস্ত। মলদ্বারে জ্বালা ও কুঁতুনি (ডাঃ এসমল)

অর্শের বলি,—বলি সকল হইতে মধ্যে মধ্যে প্রচুর রক্তস্রাব, আড়ুর ফল সদৃশ বলি দৃষ্ট হওয়া।

মলদ্বারের ভগন্দর অর্থাৎ নালি ঘা ডাক্তার বয়েড বলেন যে তিনি এ রোগে এলোজ ব্যবহার করিয়া কখন অকৃতকার্য্য হন নাই।

পিত্ত প্রধান ব্যক্তির নেবা (জনডিস) রোগের সহিত জিহ্বা লেপযুক্ত, শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ, এবং উদর স্ফীত ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্যবস্থা (ডাঃ বারথোলো)

জননেন্দ্রিয়-স্ত্রী;—নিয়মিত সময়ের অগ্রে অধিককাল স্থায়ী এবং অতিশয় প্রচুর রজস্রাব, উহার সহিত জরায়ু (ইউট্রাস) স্থানে পূর্ণতা ও ভারবোধ এবং সরলান্ত্রে (রেক্‌টম) বেগ।

"বহুদর্শিতা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে জরায়ু সংক্রান্ত রক্তশিরা সকল উত্তেজনা করায় এলোজ একটী প্রধান ঔষধ। এই হেতু যে সকল স্নায়বীয় শিথিল স্ত্রীলোকদিগের ঋতু (মেন্স) প্রকাশ কালীন অতিরিক্ত অধিক কাল স্থায়ী ও ক্লান্তিজনক রক্তস্রাব হয়, তাহাতে ইহাই একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।" (ডাঃ এবারল)

"রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত শ্বেত প্রদরের সহিত জরায়ুর (ইউট্রাস) অধঃপতন, ও নিম্ন পৃষ্ঠে বেদনা" (ডাঃ হেরিংস্)

মূত্রযন্ত্র,—'পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগের বেগ, মূত্র মার্গে জ্বালা, মূত্র ত্যাগ কালীন বোধ হয় যেন তরল মল নিঃস্মরণ হইবে।' (ডাঃ হেরিংস)

"বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রষ্টেড গ্রন্থির বিবৃদ্ধির সহিত মূত্র ধারণে অক্ষমতা' (ডাঃ হেরিংস)

মস্তক;—পিত্তাধিক্যের সহিত মস্তকে ভার বোধ ও শীরঃপীড়া।

"ললাটে চেপে ধরার ন্যায় এক প্রকার বেদনা ও ভার বোধ। উহা যদিও প্রখর নহে তথাচ কোন কার্য্য করিতে বিশেষ মানসিক পরিশ্রমে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ঘটায়।" (ডাঃ ওয়েলস্)

"কেশ স্খলন;—শিরঃপীড়া গরমে বৃদ্ধি এবং শিতলতা প্রয়োগে শান্তি' (ডাঃ হেরিংস্)

জীবন ধারণে অনিচ্ছা;—এক সপ্তাহে মৃত্যু হইবে ইহা নিশ্চয় করা। সহজে উত্তেজনা, রাগ প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা, রাগের কারণ যদি কোন পদার্থ হয় তবে তাহাকে নষ্ট করা (ডাঃ হেরিংস্)

বৃদ্ধি;—প্রাতে ও সন্ধ্যায়। শিক্ত, উত্তপ্ত বায়ুতে।

শান্তি;—শীতলতায়, মস্তকে শীতল জল দেওয়া, বায়ু নিঃসরণে।

ক্রমশঃ——

কলিকাতা
বৈশাখ

শ্রীশিখরকুমার বসু এল, এম, এস,
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিসনার।

———

আবার একটী নূতন কথা।

কথাটী শুনিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ হয়ত একটু বিরক্ত হইবেন এবং কেহ কেহ উপহাস করিতেও বোধ হয় ত্রুটি করিবেন না। তা করুন, কিন্তু যে বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য পর্য্যালোচনা করিতে আজ অবশ্যই কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব। কোন সহৃদয় সুবিজ্ঞ পাঠক আমার এই সংশয় অপনীত করিতে যত্ন করিবেন কি? তাপমান যন্ত্র (Thermometer) দ্বারা কি প্রকারে জ্বর পরীক্ষিত হয়? উহা দ্বারা জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ বিশেষ করিয়া জানা যাইতে পারে, না কেবল শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করিবার জন্যই উক্ত যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে? যদি শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করাই উহার উদ্দেশ্য হয়, আর শরীর অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে জ্বরও কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের সহিত এই কথার সম্পূর্ণ মিলনাশা করা যাইতে পারে না এবং আয়ুর্ব্বেদার্থী কবিরাজদিগেরও উক্ত যন্ত্র প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কেন না এমন অনেক রোগী নয়নগোচর হইয়া থাকে যে, তাহার শরীরে তাপমান যন্ত্র সংলগ্ন করিলে তন্নিহিত পারদ ১০৫।৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হয়, অথচ সেও সেই দুরন্ত জ্বরের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করে। আবার যাহার শরীরে কিছুমাত্র তাপ নাই সুতরাং তাপমান যন্ত্রের পারদও কিছু মাত্র বিচলিত হয় না, তাহাকেও

কোন মতে বাঁচাইতে পারা যায় না। তবে উক্ত যন্ত্র দ্বারা শরীরের উত্তাপের একটী কাল্পনিক পরিমাণ স্থির করিয়া অথবা এত ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারদ উত্থিত হইয়াছে এই কথা জানিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? আমার বিবেচনায় যে উদ্দেশে বৈদেশিক মতে তাপমান যন্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, কবিরাজগণ তাহা হস্ত দ্বারাই সুসিদ্ধ করিতে পারেন। তবে যে অবিচক্ষণ স্পর্শজ্ঞানশূন্য কবিরাজ স্বীয় হস্ত দ্বারা শীতোষ্ণাদিও কিছু মাত্র অনুভব করিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে কবিরাজী গ্রন্থ প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া লাঙ্গল মুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক ভূমি কর্ষণ করিতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। কোন জ্বরিত ব্যক্তিকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন $106\frac{1}{2}$ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইয়াছে, আবার কবিরাজ মহাশয় না হয় সেই সময় দেখিয়া বলিলেন শরীর অত্যন্ত গরম হইয়াছে। এই দুই কথাতে জ্বরের আধিক্য ভিন্ন ত আর কিছুই উপলব্ধি হইল না। জ্বরের বেগ বেশী হইলেই যে তাহা অসাধ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। যে পর্য্যন্ত দৈহিক কার্য্যের ব্যতিক্রম সংঘটিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনও অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। সেই ব্যতিক্রমও আবার আর্য্যদিগের নাড়ীপরীক্ষা ব্যতীত অন্য প্রকারে জানিবার উপায় নাই। অন্যান্য বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াও কথঞ্চিৎ জানা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অনিশ্চিত। এইক্ষণ নাড়ী পরীক্ষার বিষয়ই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহা হিন্দুদিগের যোগসিদ্ধ আদরের ধন—অমূল্য রত্ন। ইহারই প্রভাবে প্রাচীন হিন্দুগণ এক সময়ে আত্মতত্ত্বে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সহজ হইলে কোন্ দিন বৈদেশিক শাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়া তাঁহাদিগের নিজ আবিষ্কৃত বলিয়া দেশে বিদেশে প্রকাশিত হইত। হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শী ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না, কেবল মাত্র মরা মানুষ লইয়া টানাটানি করিলে নাড়ী পরীক্ষার বিষয় কিছু মাত্র জানা যাইতে পারে না। ইহা জানিতে হইলে সজীব দেহের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানোপার্জ্জন আবশ্যক। বর্ত্তমান হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে একবারে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দৈহিককার্য্য সম্বন্ধে তন্ন তন্ন

মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সজীব দেহের কার্য্য প্রণালী অবগত হইতে হইলে যোগসিদ্ধির আবশ্যক। প্রাচীন হিন্দু ভিন্ন আর কেহই সেই যোগতত্ত্বে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান হিন্দুদিগের নাড়ী পরীক্ষা সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের যোগরূপ কল্প-বৃক্ষের একটী অমূল্য ফল। আজ এই ফলের কিঞ্চিৎ রস বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

বহু গবেষণার পর আর্য্য ঋষিগণ স্থির জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সর্ব্বলোক-নিয়ন্তা অব্যয় পরম পুরুষ হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, তৎ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম মিশ্রিত। এই গুণত্রয়ের অধিদেবতা সৃষ্টিপতিও আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে ইঁহারাই আবার বায় পিত্ত কফরূপে প্রত্যেক জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত দেহের উৎপত্তি রক্ষা ও বিনাশ সাধন করিতেছেন। এই বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা পঞ্চম বর্ষ হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত রীতিমত ভাষাজ্ঞান শিক্ষা করিয়া পরে উপনয়নের পর হইতে অনন্ত শাস্ত্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত জীবন কাল তাহাতেই পর্য্যবসিত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বি, এ, কিংবা ভূষিত এম্, এ, মণ্ডিত মহোদয়গণের নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট শিক্ষায় ত ইহার কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। তথাপি যে তাঁহারা জোর করিয়া মীমাংসা করিতে গিয়া অবশেষে উপহাস করিতে করিতে ফিরিয়া আইসেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

আত্মবিস্মৃত নব্য বাবুগণ ভ্রান্তিমদে উদ্‌ভ্রান্তবৎ সকল সময়ই বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ঋষিগণ কেবল পাঁচটী মাত্র মূল পদার্থের বিষয় জ্ঞাত হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়ায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা ত্রিঃষষ্টি মূল পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। যে প্রকার ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এতাধিক মূল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, যদি সেই প্রকারই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আর্য্যঋষিগণ দ্বারা আরও অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা একশত আশিটী মূলপদার্থ আবি-

ষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল কোন না কোন প্রকারে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতেরই অন্তর্গত। তাই সকল স্থলেই তাহাদের পৃথক পৃথক নাম উল্লেখ করা হয় নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের কথা দূরে থাক, কেবল মাত্র মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় পাঠ করিলেও ইহার অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের "ন্যায় দর্শনই" প্রকৃত পক্ষে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, না বর্ত্তমান বৈদেশিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রই উহার চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে? আবার শরীরের স্থান বিশেষে সহসা বেদনা করিয়া উঠিলে কবিরাজ মহাশয় সাধারণের নিকট অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে কেবল শ্লেষ্মা বা রসের সঞ্চার বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। আর ডাক্তার বাবু শ্লেষ্মা বা রসের কার্য্যাদি বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন এবং নিজের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বলিয়া ফেলিলেন যে বেদনা স্থানে Lacticacid অর্থাৎ কোন একপ্রকার অম্লবিশেষ সংযুক্ত শারীরিক রস গমন করায় ঐ স্থানে বাতের ন্যায় এক প্রকার রোগ জন্মাইয়াছে। এই দুই কথার পরস্পর পার্থক্য কি এবং ইহার মধ্যে কোন্‌টীই যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টার্থজ্ঞাপক; তাহাই বা কে মীমাংসা করিবেন? কিন্তু কবিরাজদিগের এই সম্বন্ধে আরও কিছু বিবেচ্য আছে কি না তাহাও এক বার আলোচনা করা যাউক। কোন প্রকার অভিঘাত বা অঙ্গ সঞ্চালনাদি ব্যতীত শরীরের স্থান বিশেষে বেদনা হইলে কবিরাজদিগকে অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। দৈহিক কফের নানা প্রকার কার্য্য ও নানা প্রকার প্রকৃতি লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে শ্লেষ্মা নামক কফ দ্বারাই হাড়ে মাংসে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রয়োজনানুরূপ দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ রহিয়াছে, শারীরিক উষ্মা বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই স্থান বিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের শ্লেষ্মা অপেক্ষাকৃত তরল হইতে পারে, আরও দেখা যাইতেছে যে শরীরস্থ ব্যান বায়ু সকল সময় সমান ভাবে পরিচালিত হইয়া রসরক্তাদি নিয়মিতরূপে সমস্ত দেহে অভিব্যাপ্ত করিতেছে, সুতরাং যে যেস্থলের শ্লেষ্মা তরল হইয়াছে, সেই সেই স্থলে উক্ত বায়ুর গতিও অবশ্য প্রতিহত হইবে। এই সমস্ত কারণ বশতই হঠাৎ কোন স্থলের বেদনা অনুভূত হইবে। আবার কেনই বা স্থান বিশেষের শ্লেষ্মা তরল হইল? ইত্যাদি বিষয় দেখিলেও দেখা যাইতে পারে। তবেই একবার

বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, বর্ত্তমান ডাক্তারী বিদ্যারই দৌড় বেশী, না ভূতপূর্ব্ব কবিরাজী শাস্ত্রেরই দৌড় বেশী? সংসারে যখন যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন তার কর্কশভাবও সাধারণের নিকট নিতান্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। আজ হতভাগ্য ভারতবাসীর ভাগ্য কুপিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে তাহাদিগের শিক্ষা দীক্ষারও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সুতরাং অমূল্য-রত্নাদির অধিপতি হইয়াও তাহা ভোগ করিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু যে ইচ্ছা করিতেছে, সেই তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া এক মুটা ধুলা ছিটাইয়া দিতেছে।

গত বারের চিকিৎসা-সম্মিলনীতে (৭ম, ৮ম ও ৯ম সংখ্যাতে) ধাতু নামক প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরবিদ্যা ও ডাক্তারী শারীর বিদ্যা এতদুভয়ের পরস্পর মিল হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। এই সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন না কেন, কিন্তু ইহাতে আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। অর্থাৎ আমার বিবেচনায় ঐ উভয়বিধ শারীরবিদ্যার সমুদায় অংশে মিল হওয়া একান্ত অসম্ভব। আধুনিক ডাক্তারগণ শব বিচ্ছেদ করিয়া মরা মানুষের শরীরস্থ অস্থি, মাংস, ধমনী, পেশী, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা, আমাশয়, পক্বাশয়, বৃক্কক ও অন্ত্র প্রভৃতি দৈহিক উপকরণ ও যন্ত্রগুলির সংখ্যা নিরূপণ এবং অবস্থিতির বিষয় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পূর্ব্বতন ঋষিগণও এক সময় এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলিয়া উভয়বিধ শারীরবিদ্যার এই অংশে সম্পূর্ণ মিলনাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সজীব দেহের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ডাক্তারগণও কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেস্থলে তাঁহারা কল্পনা পথেই বিচরণ করিতেছেন। উহা সাধারণ দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত নহে যোগ-জ্ঞান-সাধ্য। প্রাচীন আর্য্যার্ষিগণ এক সময় সেই অসীম জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইতে পারিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে তাঁহারা নিজ-দেহের কথা দূরে থাক, লক্ষযোজন দূরবর্ত্তী বিমানমার্গস্থিত কোন্ গ্রহ, কোথায় কি ভাবে গমন বা অবস্থিতি করিতেছে, তৎসমুদায় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই অসীম জ্ঞানের একটী মূর্ত্তিমান্ ফল আজ ভারতবাসীর প্রতি ঘরে পঞ্জিকারূপে বিরাজ করিতেছে। এই সমুদায় বিষয়

পর্য্যালোচনা করিলে সজীবদেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মতই যে প্রশস্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন তাহা ডাক্তারদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যোগ-তত্ত্বের কথা আপাততঃ ডাক্তারদিগের নিকট নিতান্ত শ্রুতিকটু অসভ্যের কথা বলিয়া প্রতীত হইলেও যদি কোন দিন ভাগ্যক্রমে কোন বিলাতী পুরুষ ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তখন ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। এস্থলে আরও একটী কথা উল্লেখ করিতেছি। যে প্রকার সাধারণ লোকদিগের ব্যবহারোপযোগী অঙ্কাদি সাধন করিবার জন্য মহাত্মা শুভঙ্কর অসীম বিদ্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া কতকগুলি আর্য্যারচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল আর্য্যা দ্বারাই প্রায় সকল প্রকারের অঙ্কই কষিতে পারা যায়। কিন্তু কি প্রকারে তদ্রূপ হয়, তাহা কখনও তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। সেইরূপ চিকিৎসার্থীদিগের সহজ জ্ঞানের জন্যই চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল মাত্র ব্যবসায়ী, তাঁহাদের পক্ষে এই নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু যাঁহারা জীবদেহের প্রকৃত নিগুঢ়তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সাংখ্য, পাতঞ্জলি, কপিল প্রভৃতির ন্যায়দর্শন এবং বেদান্ত, যোগোপনিষৎ প্রভৃতির সারমর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। তাহাও আবার এমনি দুর্ব্বোধ্য যে, গুরুর উপদেশ ব্যতীত অনেক স্থলের কোন তাৎপর্য্যই গ্রহণ করা যায় না। যাহা হউক এই সম্বন্ধে আর অধিক বাক্য-ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। প্রস্তাবিত বিষয় লিখিবার সময়ই পূর্ব্বোক্ত "ধাতু" প্রবন্ধস্থিত প্রতিবাদসমূহ যথাস্থানে উত্থাপিত করা যাইবে। সময়াভাব বশতঃ এবারে ক্ষান্ত থাকিলাম।

উমারপুর
নাকালিয়া
বৈশাখ

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সূতিকাতরুণজ্বর বা প্রসূতির পচাজ্বর।

এলোপ্যাথি মতে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সূতিকাজ্বর কখন কখন প্রচ্ছন্নভাবে আরম্ভ হয়। নানাবিধ কারণে প্রসূতির নাড়ীর উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং কোন কোন স্থলে অন্যান্য রোগ হইতে সূতিকার জ্বর চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল স্থলে দুই একদিন মনোযোগ সহকারে রোগীর গতি দেখিলেই রোগটী প্রকৃত পক্ষে ধরা পড়ে। অতি সামান্য কারণে প্রসূতির উত্তাপ বৃদ্ধি এবং নাড়ী চঞ্চল হইতে পারে, অতএব প্রসূতির নাড়ী দ্রুত ও উত্তাপ বৃদ্ধি হইলেই যে সূতিকাজ্বর হইয়াছে এমন বিবেচনা করিতে হইবে না। প্রসূতির স্তনে দুধ সঞ্চয়ের সময় সামান্য জ্বর হইতে পারে, আবার প্রসব হইবার সময় প্রসূতি অত্যন্ত কষ্ট পাইলে অথবা আঘাত প্রভৃতি লাগিলে তাহার সন্তাপে প্রসূতির জ্বর হইতে পারে, লোকিয়া বা জরায়ুস্রাব সামান্য পরিমাণে দূষিত হইলেও জ্বর হইতে পারে, আবার এমনও হইতে পারে যে, সে সময় হয়ত প্রসূতি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। কম্পজ্বর অনেক সময় সূতিকাজ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, আবার প্রসূতির রেমিটেণ্ট ফিবার হইলেও সূতিকাজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে। সূতিকাতরুণ জ্বরের এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নাই যে, তদ্দ্বারা প্রথম প্রথম রোগীটী চেনা যাইতে পারে, অতএব যে কারণেই হউক, সদ্য প্রসূতির নাড়ীর গতি ও উত্তাপ বৃদ্ধি হইলেই সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। গুরুতর রেমিটেণ্ট ফিবারে রোগী রাত্রে প্রায়ই প্রলাপ বকিয়া থাকে, কিন্তু পচাজ্বরে রোগীর প্রায়ই প্রলাপ থাকে না। মেট্রাইটিস্, পেরিটোনাইটিস্, ভলভাইটিস্ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রসূতির হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা গুরুতর জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা—সূতিকা পচাজ্বর চিকিৎসায় নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) নাড়ীর গতি ও উত্তাপের হ্রাস করিতে হইবে।

(২) বেদনা থাকিলে রোগীর যন্ত্রণা যাহাতে নিবারণ হয় অথবা রোগী অস্থির থাকিলে যাহাতে স্থির থাকে, তাহা করিতে হইবে।

(৩) রোগীর বল বজায় রাখিতে হইবে।

(৪) পেট ফাঁপা, পেটে ব্যথা, পেরিটোনাইটিস্ প্রভৃতি নানা উপসর্গ নিবারণ করিতে হইবে।

(৫) যে ভয়ঙ্কর বিষ দ্বারা পচা জ্বর উৎপন্ন হয়, সেই বিষনাশক ঔষধ ও উপায় সকল প্রয়োগ করিতে হইবে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। এক্ষণে নিঃসংশয় স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, পচাজ্বর হইলে পচন নিবারক ঔষধ সকল নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সেপ্‌টিসিথিয়া দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তে এক প্রকার জীবাণু জন্মে, উহাদিগকে ব্যাক্‌টিরিয়া কহে। যদিও এমন কোন পচন নিবারক ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা সূতিকাজ্বরের বিষ একবারে ধ্বংস করা যাইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক ঔষধ আছে যাহাতে এই সকল ব্যাকৃটিরিয়ার (Bacteria) জীবাণু পরিবর্দ্ধন কতক পরিমাণে নিবারণ হইতে পারে, এখনকার নিদানজ্ঞ ডাক্তার দিগের মত এই যে, কলেরা, ম্যালেরিয়া, সেপ্‌টিসিথিয়া প্রভৃতি সমস্ত পীড়াই বিশেষ বিশেষ জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক এই সকল রোগাক্রান্ত রোগিদিগের রক্তে বিশেষ বিশেষ আনুবিক্ষণিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিকে ব্যাক্‌টিরিয়া বা মাইক্রো-ককাই (Micrococci) বলা যায়। সূতিকাতরুণজ্বর এই সকল ব্যাক্‌টি-রিয়া বা জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হউক বা না হউক, সেপ্‌সিথিয়া রোগমাত্রেই পচন নিবারক ঔষধ মহোপকার সাধন করে। কোন প্রসূতির সন্তান হই-বার পর হইতেই কোন ভাল পচননিবারক ঔষধ দ্বারা যোনিদ্বার কয়েক দিন ধরিয়া প্রত্যহ ধৌত করিলে তাহার সূতিকাজ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইবার খুব কম সম্ভাবনা।

(১) নাড়ী ও উত্তাপের সমতা রক্ষা করা।—যে সকল ঔষধ দ্বারা জ্বরের উত্তাপ হ্রাস হয়, তাহাদিগকে উত্তাপ নিবারক বা এণ্টি পাইরেটিক (Anti-pyretic) ঔষধ বলা যায়। এই সকল ঔষধ সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবে কার্য্য-

করী হয়। (১) স্নায়ুযন্ত্রের উপর কোন বিশেষ ক্রিয়া দর্শাইয়া তাপোৎ-পত্তি নিবারণ করে বা হ্রাস করে। অথবা (২) শরীরের অভ্যন্তরে এরূপ রাসা-য়নিক পরিবর্ত্তন সকল সংঘটিত করে, যদ্দ্বারা তাপোৎপন্নকারী বিষের ধ্বংস হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না (৩) অথবা চর্ম্ম বা রক্তসঞ্চালন যন্ত্র সকলের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া উত্তাপের লাঘব করে অথবা (৪) শরীর হইতে তাপ হরণ করিয়া কার্য্যকারী হয়। সূতিকাজ্বরের উত্তাপ নিবারণপক্ষে কুইনাইন অতি উৎকৃষ্ট। যদি উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া ১০৪ ডিগ্রী বা ততোধিক হয়, তবে তৎক্ষণাৎ দশ বা ১৫ গ্রেণ কুইনাইন এক গ্রেণ পরিমাণ অহিফেনের সহিত প্রয়োগ করিলে উত্তাপ কমিয়া যায় এবং রোগী সুস্থতানুভব করে। অত্যন্ত অধিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার দশ বা কুড়ি গ্রেণ মাত্রায় কেহ কেহ কুইনাইন খাওয়াইতে বলেন। আবার সেই সেই উপদেশ দেন, প্রতি চারি ঘণ্টায় ১০ গ্রেণ মাত্রায় কুই-নাইন দেওয়া উচিত। ডাক্তার লিথ নেপিয়ার বলেন তিনি এইরূপ প্রতি চারি ঘণ্টান্তর দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সমস্ত দিন রাত্রে (২৪ ঘণ্টায়) প্রায় ১০০ একশত গ্রেণ কুইনাইন দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অতিরিক্ত কুই-নাইন সেবনজনিত কোন উপসর্গ হইতে দেখেন নাই। তিনি বলেন এইরূপ কুইনাইন খাওয়াইতে খাওয়াইতে যদি কুইনাইন সেবনজনিত লক্ষণ (যথা ঃ—কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি) সকল উপস্থিত হয়, তবে সেগুলিকে সুলক্ষণই বলিতে হইবে। কুইনাইন মিক্‌চারে হাইড্রোব্রোমিক এসিড মিশ্রিত করিয়া দিলে কুইনাইন সেবনজনিত কষ্টদায়ক লক্ষণ সকল উপস্থিত হইতে পারে না। অতিরিক্ত কুইনাইন প্রয়োগে রোগীর সময় সময় খুব বমি হয়, এইরূপ অবস্থায় কুইনাইনের সহিত কার্ব্বনেট্ অব্ এম-নিয়া মিশ্রিত করিয়া দিলে আর বড় একটা বমি হয় না। ডাক্তার নেপিয়র বলেন কার্ব্বনেট অব এমনিয়া মিশ্রিত করিয়া দিলে বমি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যদি এমনিয়া এবং স্যালিসিলেট অব্ সোডা একত্র মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে বমি বরঞ্চ কম হয়। রোগীর উত্তাপ কম থাকিলে প্রতি তিন চারি ঘণ্টান্তর ৩। ৪ গ্রেণ মাত্রায় দিলেই চলিতে পারে। যদি রোগী কুই-নাইন পুনঃ পুনঃ বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে, তবে হাইপোডার্মিক ইন্‌জেক্‌সন

দ্বারা (চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী) কুইনাইন দেওয়া কর্ত্তব্য। হাইড্রোব্রোমেট অব্ কুইনাইন এই জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। হাইড্রোব্রোমেট অব্ কুইনাইন ১৬ অংশ জলে দ্রব হয়। অন্ততঃ ১ ড্রাম কি ২ ড্রাম ইন্‌জেক্‌ট না করিলে কাজ হয় না। নিউট্রাল সল্‌ফেট অব্ কুইইনাইন ইন্‌জেক্‌ট করা যাইতে পারে। ১৫ বা ২৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইনের সপোজিটরি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহিফেন বা বেলাডোনা এবং কুইনাইন একত্রে লইয়া সপোজিটার প্রস্তুত করিলে সমধিক উপকারক হয়। অএল অব্ থিওব্রোমা দ্বারা সপোজিটার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্রসান্ন্যাল এম, বি,

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লৌহপর্পটী।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্য পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া সুসিদ্ধ একখানি পরিস্কার লৌহখল্লে কজ্জলী করিবে। কজ্জলী হইলে তাহার সহিত পারদের তুল্য পরিমাণ লৌহ ভস্ম মিশ্রিত করিয়া পুনরপি মর্দ্দন করিতে হইবে। কজ্জলীর সহিত লৌহ উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে, রস পর্পটী প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। স্বর্ণপর্পটী প্রস্তুতার্থে যেরূপে পারা গন্ধক শোধন করিয়া লইতে হয়, এস্থলেও তত্তৎ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া পারা গন্ধক শোধন করিয়া লইবে।

লৌহ পর্পটীর উপাদান দ্রব্যত্রিতয় তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে। প্রত্যেক দ্রব্য গ্রহণে তোলক কর্ষাদি কোন বিচ্ছিন্ন পরি-

মাণ বলিয়া দেওয়া হয় নাই, সুতরাং আবশ্যকানুরূপ প্রত্যেক দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, সচরাচর ২ তোলা পরিমাণ প্রত্যেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করা গিয়া থাকে।

লৌহ পর্পটী প্রস্তুত হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। রস ও স্বর্ণ-পর্পটী যেমন পাতলা করিয়া প্রস্তুত করা যায় এবং বিভাজনাদিতে যেমন সুবিধা থাকে, এই পর্পটী সেরূপ হয় না। লৌহপর্পটী অন্য অন্য পর্পটী অপেক্ষা পুরু ও সহজে ভাঙ্গা যায় না, সেই জন্য খুব ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিলে সকল দিকে সুবিধা হয়।

পঞ্চামৃত পর্পটী।

একখানি পরিষ্কার লৌহখল্লে চারি তোলা শোধিত শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃত গন্ধক রাখিয়া তাহার সহিত ৪ তোলা শোধিত পারা দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কজ্জলী সুসিদ্ধ হইলে তাহার সহিত আরো চারি তোলা গন্ধক চূর্ণ দিয়া মাড়িয়া লইবে। তার পর লৌহ ২ তোলা অভ্র ১ তোলা তাম্র ॥০ তোলা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া পূর্ব্ব কথিত পর্পটী পাকের নিয়মানুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চামৃত পর্পটী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পারদ এবং গন্ধক শোধনের ক্রম এবং পাক সুসিদ্ধির লক্ষণ পূর্ব্ববৎ।

মাগুরা
বারুইপাড়া। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল বা অত্যন্ত কঠিন হইলে তাহাতে জলের মাত্রার তারতম্য হওয়া আবশ্যক, সুতরাং সেই তারতম্যের বিষয়ই এবার বলিতেছি। মনে কর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধস্থ ক্বাথ্য দ্রব্যের মধ্যে

গুলঞ্চ, রাস্না, নিসিন্দা, প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য অতি কোমল, সেইরূপ অশ্বগন্ধা, সোনাছাল, বেলছাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য এবং রক্ত-চন্দন ও দেবদারু প্রভৃতি দ্রব্যের ক্বাথ করিতে হইলে ইহারা অতি কঠিন ক্বাথ্য দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই ত্রিবিধ দ্রব্যের ক্বাথ করিতে হইলে ইহাঁদের জলের মাত্রার ন্যূনাধিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ ক্বাথ্য দ্রব্য অতি কোমল হইলে উহার চতুর্গুণ জল দেওয়া উচিত, ক্বাথ্য দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলে অষ্ট গুণ জল দেওয়া উচিত এবং ক্বাথ্য দ্রব্য অতি কঠিন হইলে ষোড়শ গুণ পর্য্যন্ত জল দেওয়ার বিধি শাস্ত্রে আছে। বাস্তবিকও যথার্থ বলিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ক্বাথ্য দ্রব্য ও জলের পরিমাণ সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখ নাই। এখন কথা এই যে, কেবল শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া অথবা কেবল বই পড়িয়া এসমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তবে একথা সত্য যে বুদ্ধিমান চিকিৎসক শাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ আভাস লইয়া এ সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন।

ক্বাথাদির সহিত যেরূপ তৈলাদি পাক করিতে হয় সেইরূপ দুগ্ধ, দধি এবং কাঁজি প্রভৃতি দ্রবপদার্থের সহিত তৈলাদির পাক করিতে হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যদি কোন একটী তৈল, দুগ্ধ, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি পাঁচটী কিংবা তাহা হইতেও অধিক দ্রব পদার্থ দ্বারা পাক করিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য ঐ সকল দ্রব পদার্থের সমান পরিমাণ হইবে, আর যদি চারিটী দ্রব পদার্থ দ্বারা কোন একটী তৈল পাক করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তৈল দ্রবপদার্থের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। তৈল পাকসম্বন্ধে অন্য যে সকল নিয়ম অর্থাৎ গন্ধ-পাক ও পাকশেষের লক্ষণ প্রভৃতি জ্ঞাতব্যবিষয় আছে, তাহা আজ এস্থলে না বলিয়া প্রত্যেক তৈলপাকের আবশ্যক স্থলে বলিব। তৈল বিশেষে গন্ধপাকেরও তারতম্য হইয়া থাকে বলিয়া এ স্থলে আর উল্লেখ করিলাম না। শেষপাক সম্বন্ধে যদিও তৈলে বিশেষ কোন তারতম্য নাই, তথাপি এস্থলে সম্প্রতি জানিবার আবশ্যক বিষয় বলা গেল না। তৈলপাক সম্বন্ধে যেসকল নিয়ম জানা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে এক প্রকার বলা গেল অর্থাৎ তৈলপাক সম্বন্ধে কটাপাক, মূর্ছাপাক, কল্ক-

পাক ও ক্বাথপাক এই কয়েকটী পাকই প্রধান, এবং এই সকলের বিশেষ বিশেষ নিয়ম সমূহ বলা হইল। এই সকল বিস্তার ক্রমে প্রত্যেক তৈল পাক স্থলে বলিব।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা
বৈশাখ। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

পুরাতন প্লীহারোগের চিকিৎসা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্লীহারোগে সময় সময় স্থানীয় চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। প্লীহা হইলে প্লীহার উপরিভাগে ডাক্তারেরা প্রায়ই আয়ডীনের আরক লাগাইয়া দিয়া থাকেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যকৃত প্রদেশে বেদনা হইলে বা যকৃত বৃদ্ধি হইলেও ঐরূপ আয়ডিন প্রলেপ দেওয়া গিয়া থাকে। আয়ডিন দিতে হইলে বেশ টাটকা তেজাল আয়ডিনের আরক প্রস্তুত করা আবশ্যক। সচরাচর যে টীংচার আয়ডিন ব্যবহৃত হয়, তাহা না দিয়া ফারমাকোপিয়ার লিনিমেণ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক চিকিৎসক অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আয়ডিন লইয়া রেক্‌টিফায়েড স্পীরিটে মিশ্রিত করিয়া প্লীহা ও যকৃতে লাগাইয়া দেন। এ সকল পুরাতন কথা সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আয়ডিনের অয়েণ্টমেণ্ট, পেঁপিয়ার আঠা প্রভৃতি প্লীহাতে লাগাইয়া দেওয়া প্রথা আছে। এ সকল দ্বারা সময় সময় উপকার হইতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদিগের মতে খাইবার ঔষধেই প্লীহা রোগের বিশেষ উপকার করে। দুর্ব্বল রোগীর উদরে অধিক দূর পর্য্যন্ত খুব তেজাল আয়ডিনের প্রলেপ দিলে তাহার এত যাতনা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। প্রবন্ধ লেখক সুধু আয়ডিনের জ্বালা থামাইবার জন্য দুই

এক স্থলে আহূত হইয়াছেন। আবার ছোট ছোট শিশুদিগের পেটে আয়ডিন দিলে তাহার যন্ত্রণায় শিশুর তড়কা উপস্থিত হইয়া মারাও পড়িতে পারে। অতএব এই সকল ডাকাতি চিকিৎসা এখনকার দিনে আর আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। বিশেষ পুরাতন বৃহৎ প্লীহা ও যকৃত সকল দুই এক দিন আয়ডিনের প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল স্থানে আমাদিগের মতে বিনয়াইড অব মার্কুরি অয়েণ্টমেণ্ট নিম্নলিখিত মাত্রা ক্রমে প্রস্তুত করিয়া প্লীহা ও যকৃত স্থানে মধ্যে মধ্যে মালিশ করা কর্ত্তব্য যথা ঃ—

বিনয়াড্ অব্ মার্কুরী—৮ গ্রেণ

সিম্পেল অয়েণ্টমেণ্ট-১ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া মালিস—

এই মলমে বড় একটা জ্বালা করে না। দুই এক দিন ব্যবহার করিয়া আবার দুএকদিন বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করিবে। তদ্ভিন্ন ছোট ছোট শিশুদিগের উদরে উষ্ণ জলের সেক দিলেই যথেষ্ট উপকার হয়। অস্মদ্দেশে অনেক হাতুড়িয়া চিকিৎসক প্লীহা প্রদেশে গুল বসাইয়া বড় বড় ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহাতে কোন কোন স্থলে বড় বড় প্লীহা আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ঐ ক্ষতের জন্য রোগী মারা পড়িয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি ধনুষ্টঙ্কার হইয়া রোগী মারা পড়িয়াছে। দুর্ব্বল রক্তহীন রোগীতে এইরূপ ক্ষত ক্রমে ক্রমে বাঘের ঘায়ে পরিণত হয়, এবং অতি শীঘ্রই জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

প্লীহা রোগের সহিত রক্তামাশয়, শোথ এবং কাশ রোগ জন্মাইতে পারে, এরূপ হইলে তত্তৎ রোগের চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রায় সেই সেই ঔষধ ব্যবহারেই উপকার দেখা গিয়া থাকে। প্লীহা রোগে সর্ব্বদা দাস্তকারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়, অনেক স্থলে এই দোষেই রক্তামাশয় দেখা গিয়া থাকে, কোন স্থলে অতিরিক্ত কুইনাইন দেওয়াতে আমাশয়ের পীড়া উপস্থিত হয়। প্লীহা রোগে রক্তামাশয় ও শোথ এক সঙ্গে উপস্থিত হইলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। আমাশয় ও উদরাময় সংযুক্ত প্লীহারোগে উগ্র লৌহ ঘটিত ঔষধ প্রযোজ্য নহে, তবে এই সকল স্থলে ডায়ালাইজ্‌ড আয়রণ, টার্‌টারেট অব্ আয়রণ প্রভৃতি দিতে পারা যায়। প্লীহার শোথে মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক ঔষধ না দিয়া কেবল লৌহ-ঘটিত ঔষধ প্রয়োগেই উপকার হয়। প্লীহারোগে অত্যন্ত বল হ্রাস হইলে মাংসের জুস প্রভৃতি পথ্যের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে, তদ্ভিন্ন ফস্‌ফাইড অব্ জিঙ্ক প্রভৃতি ঔষধে উপকার হয়। নিতান্ত নিরক্তাবস্থায় এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে ফস্‌ফাইড অব্ জিঙ্ক এবং লৌহঘটিত ঔষধ একত্রে মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে পারা যায়। প্লীহা রোগের উদরাময়ে বিস্‌মথ বেশ উপকার করে। অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায় লাইকার বিস্‌মথ এট্ এমন্ সাইট্রাস এবং কিছু পোর্ট ওয়াইন এক সঙ্গে দিতে পারা যায়। প্লীহা রোগের সহিত কাশী সর্দ্দি বা ব্রন্‌কাইটিস দেখা দিলে, নানাবিধ কফ মিক্‌চার না দিয়া গ্রিমল্টের সিরপ অব্ হাপ পক্ষাইট্ অব্ লাইম্ দিলে যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। ঐ সিরপে যে কেবল কাশী আরাম করে এমত নহে, উহাতে রোগীর বলবিধানও করে। প্লীহারোগে এমনিয়া, সিলি প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে কাশীর উপকার হউক বা না হউক, উহাতে উদরাময় ও আমাশয় আনয়ন করে। সর্ব্বদা জোলাপ পাউডার, রুবার্ব এলোজ প্রভৃতি ব্যবহারেও আমাশয় উপস্থিত হইতে পারে। তবে রুবার্ব এলোজ প্রভৃতি সর্ব্বদা না দিয়া সময় সময় খুব অল্প পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমাশয় বা উদরাময় দেখা দিলে কুইনাইন একবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। রুবার্ব ১ গ্রেণ, পল্‌ভ ইপিকাক ১-৪ গ্রেণ করিয়া খাইতে দিলে রোগীর ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং যকৃতের পীড়া থাকিলে তাহার প্রতিকার হয়। অনেক প্লীহা রোগে কেবল মাত্র বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা আরাম হয়। ডার্জিলিঙ্গ, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে এই সকল রোগীর গমন করা কর্ত্তব্য। পশ্চিম প্রদেশে যে সকল দেশে ম্যালেরিয়ার সংস্রব নাই, সেই সকল দেশে প্লীহা রোগীর গমন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম,বি,

প্লীহা রোগ।

বৈদ্যমতে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, প্লীহারোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও এসম্বন্ধে যিনি যেরূপ মতই অবলম্বন করুন না কেন, প্রায়শঃ সকল মতে সকলকেই কৃতকার্য্য হইতে দেখা গিয়া থাকে। কেননা যে প্রকাণ্ড প্লীহারোগের শান্তি ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়েরা নানাবিধ অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ দ্বারা করিয়া থাকেন, আবার স্থলবিশেষে দেখা যায়, সেইরূপ প্রকাণ্ড প্লীহার শান্তি ফকীরসাহেবের জলপড়া পান করিয়াই হইয়া থাকে। আবার স্থলবিশেষে এমনও দেখা গিয়া থাকে যে, সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ নিরন্তর চিকিৎসা করিয়া যে প্লীহারোগের কিছুমাত্রও উপকার দর্শাইতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু সেই স্থলে স্বভাব স্বকীয় অসাধারণ শক্তিতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সেই রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে। বস্তুত স্বভাবের ক্ষমতার সহিত যে আর কাহারও শক্তির তুলনা হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহ। পাঠক বোধ হয় বেশ মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সহযোগী পুলিন বাবু এই প্লীহা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যতগুলি কথা লিখিয়াছেন, সেই কথাগুলি সমস্তই অতি সারগর্ভ। এমন কি, তিনি ভিন্ন মতের চিকিৎসক হইলেও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস যে, অনেক কবিরাজ মহাশয়ের চক্ষু ফুটিতে পারে। সে যাহা হউক, পুলিন বাবুর লিখিত প্লীহা রোগীর রক্তস্রাব হইয়া আরাম হওয়া সম্বন্ধে আজ একটী দৃষ্টফল প্লীহারোগীর আরোগ্যের বিষয় পাঠকবর্গের গোচরার্থে এস্থলে বিবৃত করা হইতেছে।—

ম্যালেরিয়া দেশবাসী ১৮। ১৯ বৎসর বয়স্ক একটী তরুণ যুবক শৈশবকাল হইতেই প্রকাণ্ড প্লীহা ও তৎসংযুক্ত পুরাতন জ্বরে আক্রান্ত ছিল।

প্রতিদিনই তাহার অল্প অল্প জ্বর হইত, অথচ সে আহারাদির কোনরূপ বিচার না করিয়া যথেচ্ছভাবে কালযাপন করিত। কেবল অত্যাচার নহে, তাহার পানভোজনের পরিমাণ যিনি এক দিন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, জলের জালার মত একটা প্রকাণ্ড প্লীহাগ্রস্ত অথচ দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ রোগী কি ভয়ানক মাত্রায় আহার করিতে পারে। যাহা হউক, বাল্যকাল হইতে রোগীর দিন দিন যতই বয়সের বৃদ্ধি হইতে থাকিল, সে যেন মৃত্যুর জন্য ততই প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম তবু আত্মীয়স্বজনের তাড়নায় ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিল, কিন্তু অনেক রকম চিকিৎসাতেই কোনরূপ উপকার না পাইয়া শেষটা মৃত্যু অব্যর্থ ভাবিয়া ঘোর অত্যাচারে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিল। আর বলা বাহুল্য যে, তাহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও তাহার মৃত্যুসম্বন্ধে আর কাহারও কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা! স্বভাবের কি অদ্ভুত শক্তি! উপরোক্ত রোগী এক দিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়া আকণ্ঠ ভোজনের পর তাহার আত্মীয়ের চণ্ডীমণ্ডপে রাত্রিতে শয়ন করে। ইতিমধ্যে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আসাতে সেই চণ্ডীমণ্ডপখানি ভূতলশায়ী হয়, এবং তাহার কতকটা দেওয়াল ঐ প্লীহারোগীর পেটের উপর পড়ে। এইরূপ আঘাত পাইয়া যদিও রোগীর তৎক্ষণাৎ নাক মুখ ও গুহ্যদ্বার দিয়া ভয়ানক বেগের সহিত প্রচুর রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয় এবং রোগীও এক বারে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৪। ৫ ঘণ্টা পরে রোগী জ্ঞানলাভ করিয়া বলিল যে, আমার শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইয়াছে। বিশেষতঃ দেখা গেল যে, তাহার প্লীহার অর্দ্ধেকেরও বেশী ভাগ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত ঐ রোগীর রক্তস্রাব থাকে, এবং সেই ৪।৫ দিনের মধ্যেই তাহার প্লীহার আর চিহ্নমাত্রও ছিল না। এখন সে শারীরিক বেশ সবল ও সুস্থ থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাই বলিতেছি যে, রক্তস্রাব দ্বারা যে প্লীহারোগের আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইতে পারে, ইহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ আমারা পাইয়া থাকি। সে যাহা হউক, প্লীহারোগের শান্তির জন্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ,

বাহ্যিক প্রলেপাদি; গুল বসাম ও রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ বলিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ——

কবিরাজ শ্রী অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।

পাঁচনের অসীম ক্ষমতা।

বাল্যাবস্থায় যকৃৎ প্রভৃতির পরীক্ষিত ঔষধাদি।

গতবৎসর কয়েকটী শিশুর যকৃত ও নেবার পূর্ব্বে রীতিমত বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়া আমার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অধীন হইলেও তাহাদের কোন উপকার করাইতে না পারায়, আমি আপনার সম্মিলনীর "দাস্যাদি পাঁচনটীর" সমস্ত মশলা একত্র করিয়া দস্তরমত পরিমাণে থেঁতলাইয়া আমার জনৈক বন্ধুর বকযন্ত্র দ্বারা উক্ত মশলাদি ডিস্‌টীলারি যন্ত্রে প্রস্তুত করিয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে শিশুগণকে প্রত্যহ ২ বার ব্যবহার করান হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! উক্ত পাঁচনের মহিয়সী শক্তিতে সকল বালকগুলিই ১ সপ্তাহের মধ্যে উপকার প্রাপ্ত হয়, ও পরে আর ২।১ সপ্তাহ ব্যবহার হওয়াতে উক্ত রোগীগণের প্লীহা, যকৃত, নেবা, শোথ, এমন কি উদরি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল। সেই অবধি আমি উক্ত পাঁচনটীর সমস্ত মশলা ও বকাল উপরোক্ত প্রকারে ডিস্‌টীলারি যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া বহুদিনের উৎকট উৎকট প্লীহা যকৃতজনিত জীর্ণ জ্বরে ব্যবহার করিয়া বাস্তবিকই ধন্বন্তরির ন্যায় উপকার পাইতেছি। ইহাতে কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রীলোক প্রভৃতি সকল রোগীরই জীর্ণজ্বর ও তদানুসঙ্গিক প্লীহাযকৃতাদির বিশেষরূপে শান্তি হইয়া যাইতেছে। ধন্য মৃতমহাত্মা কবিরাজ রমানাথের উপদেশ! যাঁহার দাস্যাদি পাঁচনের উপর অটল বিশ্বাস থাকায়, আপনার সম্মিলনীতে প্রকাশিত হয়, এবং আপনার সম্মিলনী দেখিয়াই আমি খুব বিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি ও

এখনও বহুল রোগীর আরোগ্য সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইতেছি। তবে যে পাঁচনটী শুদ্ধ সিদ্ধ না করিয়া উক্ত প্রকারে এক যন্ত্র দ্বারা ডিস্‌টিলারিতে প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তাহার কারণ, শিশুদিগকে পাঁচন খাওয়ান অতি কষ্টকর বিবেচনায়, উক্ত রূপে প্রস্তুত করি। তাহাতে কোনরূপ কষায় বা তিক্ত আস্বাদন হয় না, বরং একপ্রকার সুগন্ধ ও আস্বাদহীন জলের ন্যায় হওয়ায় সকলরোগীরই বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক হয়। তদ্ভিন্ন উপরোক্তরূপ প্রস্তুতে, যে গুণের হ্রাস হইয়াছে, তাহাও নহে, কারণ, প্রচুর উপকার পাওয়া গিয়াছে। আমার বিবেচনায় আজ কাল সাধারণে যেরূপে পাঁচনাদি খাইতে ঘৃণা, অস্বীকার ও অসুবিধা বোধ করেন, তাহাতে এরূপ নিয়মে সকল পাঁচন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে সকলেই ভক্তি ও আনন্দের সহিত ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হয়। আর বাস্তবিকই ওরূপ প্রকার প্রস্তুতে শিশু সন্তানদিগকে অনায়াসে পানীয় জলের ন্যায় ব্যবহার করান হইতে পারে। তাহাতে রোগ, রোগীর ও ডাক্তারের প্রাণ, ধন ও মান সকলই সুচারুরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া ও গোঁড়ামি ছাড়িয়া সরল হৃদয়ে ও মুক্তকণ্ঠে সাধারণের যথার্থ ধন প্রাণ রক্ষাপূর্ব্বক উপকার সাধন বাসনায়, পাঁচনটীর আমার দ্বারা বহুল পরীক্ষিত গুণ ইহাতে প্রকাশিত হইল, তবে ঐ যে বকযন্ত্রে ডিস্‌টীলারি দ্বারা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, ও কোন্ কোন্ বকালের কত অংশ ও কত জল দিয়া চড়াইয়া ছিলাম, ও কতক্ষণ বাদে অবতরণ করাইয়াছিলাম প্রভৃতি বিষয় আগামী বারে বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিব।

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রচোময়েৎ"

চন্দননগর
৮।১।৯৬।

উপরোক্ত মহদ্বাক্যের শিষ্য:—
শ্রীগণচন্দ্র নন্দী
(হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক)

পোলটিস্।

(এলোপ্যাথি মতে।)

পোল্‌টিস্ দেওয়া কাহাকে বলে, তাহা আজকাল ডাক্তারি চিকিৎসার কল্যাণে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত জানেন। পোলটিস্ নানাবিধ দ্রব্যে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে মসিনা, মসিনার খোল বা ময়দার পোলটিস্ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গমের চেলটে (ভুষি) ও পোলটিস্ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেক দেওয়াই পোলটিসের উদ্দেশ্য। কোন স্থানে অধিকক্ষণ ধরিয়া ফোমেণ্টেসন্ করিলে যে ফল হয়, পোলটিস প্রয়োগেও সেই ফল দর্শে।

পোলটিস্ নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন স্থানের রক্তাধিক্যতা (কন্‌জেন্‌সন) নিবারণার্থ ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। গরম পোলটিস কোন বেদনাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে সেই স্থানের শিরা সমস্ত প্রসারিত হয় এবং ঐ স্থানের রক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ঐ স্থান প্রকৃতিস্থ হয়। প্রদাহ নিবারণার্থ পোলটিসের ব্যবহার হয়। পেরিটোনাইটিস বা অন্ত্রাবরণ ঝিল্লির প্রদাহ হইলে সমস্ত পেট জুড়িয়া পোলটিস প্রয়োগে অতি সত্বর বেদনা নিবারণ হয়। কেবল মাত্র উদরাধ্মান হইলেও পোলটিস প্রয়োগে উপকার হয়। যকৃত অথবা প্লীহা বড় হইলে ঐ সকল যন্ত্রের উপর পুনঃ পুনঃ পোলটিস দিলে ক্রমে প্লীহা ও যকৃত স্পর্শে নরম এবং আয়তনে ছোট হয়। যে কোন স্থানে কোনরূপ বেদনা হইলে পোলটিস প্রয়োগে নিবারণ হয়।

রিউম্যাটিজম্ বা গাউট হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে গরম পোলটিস প্রয়োগে আশু বেদনার ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। কোন কোন চর্ম্মরোগে যাহাতে চর্ম্ম কঠিন হইয়া যায়, তাহাতে পোলটিস প্রয়োগে চর্ম্ম নরম হয় এবং ঐ স্থানের মলিনত্ব দূর হইয়া পরিস্কার হয়, তাহার পর ঐ স্থানে মলম প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে সত্বর উপকার হয়। একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ক্ষতের সর প্রভৃতি জমিয়া ঐ সকল শুষ্ক পদার্থ সহজে না উঠিলে পোলটিস

প্রয়োগে নরম হইয়া উঠিয়া যায়। কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া পাকিয়া উঠিবার উপক্রম হইলে পোলটিস প্রয়োগে হয় প্রদাহ সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। নচেৎ স্থানটী শীঘ্রই পাকিয়া যায়। পোলটিসে যে কেবল ফোড়া পাকিয়া যায় তাহা নহে, ফোড়া বসিয়াও যাইতে পারে। অনেক লোকের সংস্কার আছে যে, ফোড়া পাকাইবার জন্যই পোলটিস দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ফোড়া যদি পাকিবার দিকে বেশী অগ্রসর হইয়া থাকে, তবে পোলটিস প্রয়োগে অতি সত্বর পাকিয়া যায়। যে সকল স্থানের ফোড়া অনেক দিন ধরিয়া শক্ত হইয়া আছে, শীঘ্র পাকিতেছে না, বা বসিতেছে না, সেসকল স্থানে পোলটিস দিলে অতি শীঘ্রই ঐ ফোড়া পাকিয়া যায়, আর না হয় বসিয়া যায়। কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ঐ স্থান বহুকাল বেদনাযুক্ত বা শক্ত হইয়া থাকিলে পোলটিস প্রয়োগ করিলে ঐ স্থানের জমা রক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্রই ফুলা ও বেদনা ভাল হইয়া যায়। জ্বর বিকারের রোগী প্রলাপ বকিলে উহার উভয় পদে (হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত) সমস্ত স্থান পোলটিস দিয়া ঢাকিয়া দিলে সমস্ত মাথার রক্ত নিচের দিকে নামিয়া আসিয়া রোগীর প্রলাপ ভাল হইয়া যায় এবং সুনিদ্রা হয়। এই কার্য্যের জন্য মষ্টার্ড বা রাইসরিসার পোলটিস বেশী উপকারী। এই মাষ্টার্ডের পোলটিস গরম করিবার প্রয়োজন নাই।

সচরাচর পোলটিস তৈয়ার করিতে হইলে ময়দা বা মসিনা বাঁটা জলে গুলিয়া ঐ ময়দা বা মসিনা অগ্নিতে গরম করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে লেপিয়া ঐ বস্ত্র খণ্ড যে স্থানে পোলটিস দিতে হইবে, সেই স্থানে স্থাপন করিতে হয়। পোলটিস বস্ত্র খণ্ডের এক ধারে লেপন করিয়া অপর ধারে দোপাট করিয়া পোলটিস ঢাকিয়া দিতে হয়, নচেৎ ঐ ময়দা বা মালিস বাঁটা ঐ স্থানে লাগিয়া পরে শুষ্ক হইয়া এমন শক্ত হইয়া যায়, যে আর সহজে উঠান যায় না। যাহা হউক, এই প্রকারের পোলটিস পুনঃ পুনঃ বদ্‌লাইয়া দিতে হয়, নচেৎ উহার উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র জুড়াইয়া যায়। অতএব নিম্নলিখিত প্রকারে পোলটিস তৈয়ার করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে পোলটিস প্রয়োগ করিতে হইবে, ঐ স্থানের মাপ লইয়া একটা ফ্লানেল বস্ত্রের খোল তৈয়ার করিতে হইবে।

ঐ খোল বা থলির তিন ধার সেলাই করিয়া এক দিক ফাক রাখিতে হইবে। তার পর মসিনা বাঁটা বা ময়দা জল দিয়া গুলিয়া বেশ করিয়া গরম করিয়া ঐ থলিতে ঢালিয়া দিয়া উহা পূরণ করিবে, তারপর খোলা দিকেও অতি শীঘ্র শীঘ্র সেলাই করিয়া ঐ মুখ বন্ধ করিবে, তবে একদিকে এরূপ ভাবে সেলাই করিবে যে, প্রয়োজন হইলে অতি শীঘ্রই সেলাই খুলিতে পারা যায়। তারপর হাতের তেলর দ্বারা থাবা দিয়া উহাকে বেশ চ্যাপ্টা করিয়া যে স্থানে দিতে হইবে, তাহার উপর স্থাপন করিবে এবং পরিশেষে উহার উপর আর একখান ফ্লানেলের ন্যাকড়া দিয়া তারপর একটা বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ পোলটিস প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উহার উত্তাপ স্থায়ী হইবে এবং ঐ পোলটিস আর শীঘ্র শীঘ্র বদ্‌লাইবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাতে সুবিধা বই অসুবিধা নাই, কারণ পুনঃ পুনঃ পোলটিস পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ায় অনেক সময় নষ্ট এবং খেজানত বোধ হয়। কিন্তু এইরূপে একবার একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া থলি তৈয়ার করিয়া লইলে আর পুনঃ পুনঃ পোলটিস তৈয়ার করিতে হইবে না।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল, এম, বি,

শিশুচিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথি মতে)।

মুখক্ষত।

বোরাক্স। সন্তান স্তনপান কালীন ক্রন্দন করে, বোধ হয় যেন মাড়ীতে বেদনা হেতু ক্রন্দন করিতেছে, উহাকে উপরে তুলিয়া ঈষৎ নিম্নাভিমুখে আনিতে গেলে ক্রন্দন করে ও চমকে উঠে; দিবারাত্র ক্রন্দন করে, জিহ্বায় রক্তবর্ণের জল পূর্ণ স্ফোট প্রকাশ, স্থানে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক অনুভব হওয়া, ঈষৎ পীত বর্ণের আমসংযুক্ত দাস্ত ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ব্রায়োনিয়া। মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও ফাটা, শিশু স্তনপান করিতে ভীত হয়, কিন্তু একবার স্তন ধরিলে নিয়মিত পান করে।

ক্যাল্‌কার্ব্ব। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট বালকদিগের দন্তোদ্গম কালীন পীড়ায়, বিশেষ যাহাদিগের মস্তকের ফণ্টানেল অর্থাৎ অস্থিশূন্য স্থানদ্বয় অসম্পূর্ণ থাকে ও যাহারা অজীর্ণ অথবা কঠিন মলত্যাগ করে এবং পদদ্বয় সর্ব্বদা শীতল থাকে। এই সকল শিশুর মুখের ক্ষতে ইহা উৎকৃষ্ট।

ক্যাপসিকাম। স্থূলকার বলিষ্ঠ শিশুদিগের পীড়া, মুখে ও জিহ্বায় জলপূর্ণ স্ফোট প্রকাশ ও জ্বালা, মাড়ী অতিশয় স্ফীত হওয়া ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কার্ব্বভেজ। মুখ গহ্বর অতিশয় উষ্ণ, জিহ্বা অসাড় ও নিশ্চল, মুখ হইতে রক্ত বর্ণের লালাস্রাব, মাড়ী শিথিল; উহাতে ক্ষত ও বেদনা এবং প্রচুর রক্তস্রাব, দন্ত শিথিল এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ।

ক্যামমিলা। শিশু নিদ্রাবস্থায় চম্‌কে উঠে ও জাগ্রতাবস্থায় অসুস্থ বোধ করে ও সর্ব্বদা লইয়া বেড়াইলে ভাল থাকে, নানা প্রকার দ্রব্য লইতে ইচ্ছা করে কিন্তু দিলে গ্রহণ করিতে চাহে না।

কর্ণাস্‌-সর্সিনেটিস। মুখে জাড়ি ক্ষত, হিমলাগা বা পাকাশয়ের বিকৃতিহেতু মুখগহ্বরের ক্ষত, গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের জিহ্বায়, ওষ্ঠে ও মাড়ীতে ক্ষত প্রকাশ হইলে ব্যবস্থা।

ডালকামারা। সামান্য হিম লাগিলে পীড়ার উৎপত্তি, গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ইউপেটোরিয়ম এরো। মুখের যে কোন প্রকার পীড়ায় এই ঔষধের প্রথম ক্রমের চূর্ণ ব্যবহারে অনেক উপকার হইয়া থাকে।

হামামেলিস। মাড়ী শিথিল ও স্পঞ্জের ন্যায়, উহা হইতে অনবরত রক্তস্রাব, মুখ শুষ্ক, জিহ্বার জ্বালা ও পার্শ্বে ব্লিষ্টারের ন্যায় জলপূর্ণ স্ফোট প্রকাশ হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

হেলিবোরাস। স্ফিত ও প্রদাহিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর উচ্চধার বিশিষ্ট ঈষৎ পীত বর্ণের চ্যাপ্টা ক্ষত, মুখে পচাগন্ধ, গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত বা প্রদাহিত হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

হাইড্রাসটিস। মুখে প্রচুর চট্‌চটে লালা সঞ্চার, উহা এত অধিক যে লম্বা সূত্রাকার হইয়া অনবরত পতিত হয়, জিহ্বা শুষ্ক ও খস্‌খসে এবং আরক্ত। উহাতে উচ্চ প্যাপিলি সকল দৃষ্ট হয়, মুখের বিকৃতি আস্বাদ বা আস্বাদের বৈলক্ষণ্য থাকিলে ব্যবস্থা।

আইরিস-ভার্স। মুখে ও গলায় জ্বালা ও বেদনা, অনবরত লালা-স্রাব, গণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত থাকিলে উপকার দর্শে।

লাইকোপোডিয়াম। জিহ্বার পশ্চাতে ঠিক মধ্য স্থলে যে শিরা আছে তাহার নিকটে ক্ষত প্রকাশ হইলে ইহাতে উপকার দর্শিবে।

মার্ক-সল। মাড়ী আরক্ত শিথিল ও স্পঞ্জের ন্যায় কোমল, হাত ক্ষত প্রকাশ হওয়া রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি, ঐ স্থান স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়, জিহ্বা প্রদাহিত, স্ফিত ও ধারে ক্ষতযুক্ত, অতিরিক্ত লালস্রাব এবং মুখে পচাগন্ধ, এই সকল লক্ষণের সহিত অতিসার, উদরাময়, অন্ত্রশূল ও মলত্যাগে বেগ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

নেট্রাম-মিউ। মাড়ী স্ফিত ও সহসা উহা হইতে রক্তস্রাব, উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য মাড়ি তে লাগিলে বেদনা ও রক্তস্রাব হয়, মুখে ক্ষত ও জল-পূর্ণ স্ফোট প্রকাশ, শিশু কথা কহিতে অপারগ হয়, জিহ্বা অসাড় ও কঠিন বিশেষ এক পার্শ্বে অধিক অনুভব হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। ক্রমশঃ—

কলিকাতা
বৈশাখ

শ্রীশিখরকুমার বসু এল, এম, এস,
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিসনার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আষাঢ় মাসের সম্মিলনীর মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। খুব সত্বর এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইবেন।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

মানবশত্রু—স্ত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্ত্রীলোক পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ, স্ত্রীলোক অমৃতের আধার, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীতে এবং শ্রীতে বিশেষ নাই। যে ঋষিগণ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে এত কথা বলিয়া গেলেন, কার্য্যেতে কিন্তু তাঁহারা কেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে শত্রুতা সাধিলেন ? তাহার অর্থ আছে, অর্থ এই—স্ত্রীলোকের সঙ্গে শত্রুতা না থাকিলে যথাভাবে তাহাদিগকে শাসনে না রাখিলে সুপ্রজা বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লোকে কিছুই লাভ করিতে পারে না, জগৎসংসারের উন্নতি সাধিত হয় না এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যথাভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে স্ত্রীলোক হইতে অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী এবং যাবতীয় লোক নষ্ট হয় একথা কে না স্বীকার করিবে ? আমরাও প্রত্যক্ষ কি দেখিতেছি ? আমরাও কি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি না যে, সংসারে যত কিছু বাদবিসম্বাদ, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি সকলি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত আসক্তি হইতে উৎপন্ন হইতেছে। স্ত্রীজাতির প্রতি সহজেই আসক্তি জন্মে—তাহা পুস্তক পড়িয়া শিখিতে হয় না এবং সে জ্ঞানশিক্ষায় অধঃপতিত হইতে হয়, কিন্তু যেরূপ অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের উপর আসক্তিরহ্রাস হয়, সেই অনুষ্ঠান ও অনুশাসনকে শ্রেয়ঃ বলিতে হইবে। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যে কয়েকটী কারণে উত্তরোত্তর আসক্তি বৃদ্ধি হয়, সেই কয়েকটী কারণ রোধ করিবে না অথচ স্ত্রী আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিবে একথা স্বভাবের বিপরীত এবং কোন লৌকিক বিদ্যাতে এরূপ স্বভাবের বিপরীত কার্য্য সংঘটিত হয় না। ঋষিগণ সংসারের মূলতত্ত্বগুলির বিশেষরূপে অবগত ছিলেন—মনুষ্যের স্বভাবও বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন—স্ত্রীলোকসম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে একথা স্পষ্ট বোধ হয়। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে শত্রুবোধ করিতেন—এইজন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট অনুশাসনও করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের ন্যায় এমন প্রলোভন কি আছে ? স্ত্রীআসক্তি হইতে দুর্গতি না ঘটিতে পারে, এমন

দুর্গতিই নাই। আয়ু, বল, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সকলি স্ত্রী আসক্তি হইতে নষ্ট হয়। যদ্দ্বারা জীবনের চতুর্ব্বর্গই নষ্ট হয়—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে শত্রু বলিবে—না মিত্র বলিবে? তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবে, না তাহার পদানত হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিবে? বা তাহাকে জীবনের বরেণ্য জ্ঞান করিবে? পুরুষের কিছু গর্ভ হয় না, পরন্তু স্ত্রীলোক একটু স্খলিত হইলেই গর্ভধারণ করিতে সক্ষম, একারণ পুরুষকে শাসন করা কর্ত্তব্য? না অগ্রে স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য? দেখ, সংসারে যত কিছু পঙ্গু, বধির, জড়, মহাব্যাধিগ্রস্ত জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, সকলি স্ত্রীপ্রসক্তি হইতে। স্ত্রীপ্রসক্তি হইতেই সংসারে অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে ও অল্পায়ু নিস্তেজ ও জীবনভারাক্ষম সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে দুঃখময় করিতেছে। স্ত্রীপ্রসক্তি হইতেই সংসারে সঙ্করবর্ণ প্রসূত হইতেছে-মদ্যাদি বিবিধ মাদকদ্রব্য সকল সৃষ্ট হইয়াছে—লোকমধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুবর্গ উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পাইতেছে; দান, ধ্যান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলি লোপ পাইতেছে—ইহপর উভয় লোকই নষ্ট হইতেছে। এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিতেছ—অথচ যাহাতে আবার এই স্ত্রীপ্রসক্তি জনসমাজে বর্দ্ধমান হয়—তজ্জন্য আইনকানুন প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ রহিয়াছ?

বিষও যথাকালে গ্রহণ করিলে অমৃত হয়—অন্নও অযথাভাবে গ্রহণ করিলে বিষে পরিণত হয়। স্ত্রীলোককে যথাভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লাভ করা যায়, নতুবা ঐহিক পারত্রিক উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যথাভাবে গ্রহণ করা চাই—সমাজে এবং গৃহস্থালীর মধ্যে তাহার যে উপযুক্ত স্থান, তাহা প্রদান করা চাই। এক্ষণে কথা এই যথাভাবে গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রীলোক "আদরের আদরিণী" না মানবশত্রু?

স্ত্রীলোককে শাস্ত্রকারগণ কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা মনুসংহিতা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিলাম—কারণ মনুই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের প্রধান। মনুতে আছে:—

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশং।"
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥

স্বামী প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্ত্রীলোককে দিবারাত্রির মধ্যে স্বাধীনতা দিবেন না—অনিষিদ্ধ রূপরসাদি বিষয়ে তাহাদিগকে প্রসক্ত করিয়া আত্মবশে রাখিবে।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

কুমারী অবস্থায় পিতা, যুবতী অবস্থায় ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা তাহাকে রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোকের কোন অবস্থাতেই সাতন্ত্র্য নাই।

"কালেঽদাতা পতি বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপয়ন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥

কুমারী অবস্থায় পিতারক্ষক থাকিয়া যদি তাহাকে যথাপাত্রে দান না করেন, তবে তিনি নিন্দনীয় হন, যুবতী অবস্থায় পতি যদি পত্নীগমন না করিয়া তাহাকে রক্ষা না করেন, তবে পতি নিন্দনীয় হন্।

"সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হিকুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥

অতিসূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ হইতে বিশেষ যত্নে স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবে, যেহেতু রক্ষণে উপেক্ষা করিলে পিতৃ ও ভর্তৃ উভয়কুলের সন্তাপ জন্মাইয়া দেয়।

ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমং।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলাঽপি॥

সকলবর্ণের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্ব্বল হইলেও তথাপি ভর্ত্তা ভার্য্যারক্ষণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥

আপনার সন্তান সন্ততি, চরিত্র, বংশ, আত্মা এবং ধর্ম্ম, এ সমুদায় রক্ষা পায়, যদি ভার্য্যা সুরক্ষিতা থাকেন।

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥

স্ত্রলোক যেরূপ পুরুষ ভজনা করে, সেইরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়—একারণ প্রজাবিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীলোককে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিবে।

ন কশ্চিদ্‌যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুং।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুং॥

স্ত্রীলোককে পুরুষ বলাৎকার বা সংরোধে বা তাড়নাদি দ্বারা কখন রক্ষণ করিতে শক্ত হয় না, তবে এই এই উপায়ে তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে যথাঃ—

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মে অন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহস্যবেক্ষণে॥

অর্থের সংগ্রহে, ব্যয়ে, শৌচে, ধর্ম্মকার্য্যে, অন্নাদিপাকে এবং গৃহের উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণে সদাই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারী সংদূষণানি ষট্॥

মদ্যপান, অসৎ পুরুষের সহিত সংসর্গ, ভর্ত্তৃ-বিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালে শয়ন ও পরগৃহবাস—এই সকল স্ত্রীলোকের ব্যভিচারাদি দোষের কারণ হয়।

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

স্ত্রীরা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ ইহাও দেখে না—সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সম্ভোগ করে।

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃরেতা বিকুর্ব্বতে॥

পুরুষ দর্শনমাত্রে স্ত্রীলোকের উহার সহিত ক্রীড়ার ইচ্ছা জন্মে—এজন্য এবং চিত্তের স্থিরতা নাই, এপ্রযুক্ত এবং স্বভাবতঃ স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করে।

এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজং।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি॥

প্রজাপতি নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব অবগত হইয়া পুরুষ তাহাদিগের প্রতি অতিশয় যত্নবান্ থাকিবেন।

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবং।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥

শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা এবং ঘৃণিত ব্যবহার এ সমুদয়ই স্ত্রীলোক হইতে উৎপন্ন হয়।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতিস্থিতিঃ॥

স্ত্রীলোকদিগের বেদস্মৃতি বা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে অধিকার নাই—ইহারা নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনোবর্জ্জিত এবং অমন্ত্র—এই হেতু ইহারা বৃথা পদার্থ।

তথাচ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নির্গীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্য পরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ॥

স্ত্রীদিগের ব্যভিচার স্বভাবসম্বন্ধে শ্রুতির অনেক প্রমাণ আছে।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥

তবে সন্তানোৎপাদনের জন্যই স্ত্রীলোক মহাভাগ্যবতী, অলঙ্কারাদি দ্বারা বহুসম্মানীয়া এবং গৃহের শোভাজনক হন, এমন কি শ্রী এবং স্ত্রী এই উভয়ের একটুমাত্র ভেদ নাই।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥

অপত্যের উৎপাদন ও জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রতিদিন অতিথিসেবা ও ভিক্ষাদান প্রভৃতি গৃহস্থালীর কার্য্যসমূহের প্রত্যক্ষ করা হয়।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি সুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

অপত্যের উৎপাদন, যাগযজ্ঞ, আত্মসুশ্রূষা, উত্তমরতি এবং পিতৃ ও আত্মার স্বর্গলাভ এসকল দারাধীন।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

মন্তব্য।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের এত আন্দোলন দেখিয়া যে সমস্ত পাঠক কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি শরীর ও মন

এই উভয়েই তুল্যরূপে স্বাস্থ্যরক্ষার মূলভিত্তি হয়, তবে এক স্ত্রীজাতি হইতে যে প্রতিনিয়ত কিরূপে শারীরিক ও মানসিক প্রভূত বিকৃতি ঘটে, এই প্রবন্ধ-পাঠে তাহা তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই ভরসা করিতে পারি।

স্ত্রী ও পুরুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্ত্রী ও পুরুষের মানসিকবৃত্তি বিষয়েও বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। হিন্দুদার্শনিকগণ বলেন—দেহ এবং আত্মা বা মন সম্পূর্ণ পৃথক্। পূর্ব্বতন কালের ইউরোপীয় দার্শনিকগণেরও এই মত। অধুনাতন কালের অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতে শরীর ও মনে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বেন্, মড্স্‌লে প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতে মন মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসকল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র। যেমন যকৃতযন্ত্রের ক্রিয়া পিত্তনিঃসরণ এবং হৃদয়ের ক্রিয়া রক্তসঞ্চালন, তেমনি মস্তিষ্কের ক্রিয়া মননিঃসরণ। (Mind is a secretion from the brain gland)। শরীর ও মন পৃথক্ কি না এ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নহে। যাহা বড় বড় পণ্ডিতগণ পারেন নাই, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির দ্বারা কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে? তবে শারীরতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, লোকচরিত প্রভৃতি শাস্ত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে অন্ততঃ এরূপ ধারণা হয় যে, শরীর ও মন পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হইলেও উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অত্যন্ত জড়িত। চারিমাস কি পাঁচমাস বয়স্ক ভ্রূণের জীবনসঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু সে সময়ে উহার মন থাকে কি না সন্দেহ এবং থাকিলেও তাহা এত ক্ষুদ্র (Rudimentary) যে তাহার কোনই ক্রিয়া থাকে না। তারপর দশমমাসের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে, তাহার মনের কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না। তাহার পর বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবামাত্র ক্রমে মনের বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে উহার গাত্রে শীতল বায়ু লাগিবামাত্র শিশু কাঁদিয়া উঠে। অর্থাৎ তখন উহার কষ্টবোধ (বোধশক্তি) ঈষৎ বিকশিত হইয়াছে বুঝা যায়। ক্রমে আহারাদির দ্বারা (অর্থাৎ

বাহ্যবস্তুর সহিত সংঘর্ষে) শিশুর শরীর ও যন্ত্রাদি যতই বড় হইতে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকবৃত্তি সকলেরও স্ফূরণ হইয়া থাকে। যেমন অঙ্গ-বিশেষে পরিচালনদ্বারা সেই অঙ্গ ক্রমে দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে, সেইরূপ শিশুর বাহ্যবস্তুর সহিত যতই সম্বন্ধ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উহার মনের ও ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ হইতে থাকে। অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে দর্শনশক্তি বৃদ্ধি হয়, স্পর্শ করিতে করিতে স্পর্শশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে করিতে ঘ্রাণশক্তির ক্রমে বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই সমুদয় ইন্দ্রিয় কার্য্য এবং মানসিকশক্তি বিকাশের মূল হইতেছে, আহার গ্রহণ ও শরীরের পুষ্টিবিধান। আহার গ্রহণদ্বারা (অর্থাৎ বাহ্যবস্তু শরীরে গ্রহণ) শরীরের পুষ্টিবিধান হওয়া চাই এবং বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংঘর্ষণ হওয়া চাই, নচেৎ ইন্দ্রিয় ও মন বিকশিত হইতে পারে না। যদি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে অন্ধকারগৃহে আবদ্ধ রাখা যায় এবং চারি পাঁচ বৎসর পরে তাহাকে ঘরের বাহির করা যায়, তবে সে বোধ হয় হটাৎ ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। যদি শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, তবে সেই সঙ্গে মনের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়। যদি শিশু দুর্ব্বল ও হীনমস্তিষ্ক (বিকলাঙ্গ) হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার মনও সেই পরিমাণে যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়, অথবা তাহার কতকগুলি মানসিকবৃত্তির স্ফূরণ আদৌ হয় না অথবা নিতান্ত অল্পপরিমাণে হয়। অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে অংশে যে মানসিক শক্তি বা বৃত্তির আধার নিহিত থাকে, সেই অংশের অভাব হইলে সেই বৃত্তিটীরও অভাব থাকিয়া যায়। সন্তান ক্রমে ক্রমে বড় হইলে তাহার দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, ক্রোধ, লোভ অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিগুলির ক্রমে ক্রমে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ শিশুর স্পর্শশক্তির স্ফূরণ, তদ্‌পর ভয় ও ক্রোধের স্ফূরণ হয়। নবজাত শিশুর ভয় থাকে না। নূতন নূতন ভূমিষ্ঠ গোবৎস নির্ভয়ে ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের নিকট গমন করে। পরে ভূয়োদর্শন (Experience) দ্বারা ক্রমে ভয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্য শিশু যখন ক্রমে মানুষ ও দ্রব্য চিনিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার অল্প অল্প ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রথমতঃ উৎকট শব্দ শ্রবণে শিশুর কষ্ট বোধ হয়, পরে সেই উৎকট শব্দশ্রবণে ভয়ের বিকাশ হয়। (Experience) তদ্ভিন্ন কোন বিকটাকার পদার্থ দেখিলে বা ভীতিব্যঞ্জক ঘটনা হইলে তাহার

ভয়ের সঞ্চার হয় না। পরে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ জ্ঞান হইলে ঐ সকল পদার্থ দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। একবৎসরের শিশুর ক্রোধ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বালকদিগের যত ভয় বেশী, তত বড় মানুষের নহে। ছেলেবেলায় মস্তিষ্কের ভয়ের অংশ (মস্তিষ্কের যে অংশে ভয়ের উৎপত্তি হয়) খুব বড় থাকে। মাথার উভয় পার্শ্বে যে দুইটী উচ্চস্থান আছে, ঐ দুইটী ছেলেবেলায় খুব বড় থাকে। এজন্য ছেলেবেলায় অত ভয় থাকে। পরে বালক বড় হইলে ঐ দুইটী উচ্চস্থান ছোট হইয়া যায় এবং ভয়ও কমিয়া যায়। মনুষ্যের মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে সে তৎক্ষণাৎ অচেতন হয় এবং তাহার সমুদয় মানসিক শক্তি লোপ হয়। মনুষ্যকে ক্লোরফরম শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিলে তাহার মন বা আত্মার ক্রিয়া কিছুই থাকে না। অঙ্গ বিশেষের স্নায়ু (nerve) কর্ত্তন করিলে সে অঙ্গে বোধশক্তি (মন) থাকে না। ভেকের মস্তক ছেদন করিলে এবং তাহার পায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া দিলে পা নাড়িতে থাকে। (মস্তিষ্ক ব্যতীতও শরীরের অন্যস্থানে মন থাকিতে পরে)। মনুষ্যদেহ রোগ বিশেষ দ্বারা দুর্ব্বল হইলে তাহার মানসিক শক্তি ও স্মরণ শক্তি সমস্ত কমিয়া যায়। হৃদয়ের পীড়া হইলে মানুষের সাহস কমিয়া যায় এবং মন সর্ব্বদা হুহু করে। লিভার বা পাকস্থলীর পীড়া হইয়া অজীর্ণ হইলে বিমর্ষোন্মাদ রোগ হয়। মানুষ বৃদ্ধ হইয়া তাহার শরীরের ক্ষয় হইলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বালকের ন্যায় হয়। জীব জন্তুগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রমের সীমায় পদার্পণ না করিলে তাহার কামবৃত্তির স্ফূরণ হয় না। যখন বালকদিগের শুক্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া অল্প অল্প শুক্রক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং জননেন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়, তখন তাহাদিগের মনে আর কতকগুলি নূতন মানসিক বৃত্তির (যথা দাম্পত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, মান, বিরহযন্ত্রণা, সমাজমমতা প্রভৃতি) স্ফূরণ হইয়া থাকে, জননেন্দ্রিয় ও তৎক্রিয়া পরিচালক মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের যতদিন না স্ফূরণ হয়, ততদিন এইসকল নূতনবৃত্তির স্ফূরণ হয় না। নপুংসকদিগের এই সকল বৃত্তি আদৌ থাকে না।

তবেই হইল-মনের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। স্ত্রী ও পুরুষের শরীর ও যন্ত্র পরস্পর যেরূপ বিভিন্ন, তাহাতে তাহাদের মানসিক বৃত্তিগত পার্থক্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক

পুরুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এজন্য স্ত্রীলোকের মনও পুরুষের মন অপেক্ষা দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র। স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় মানসিক শক্তির পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ নহে। উহারা পুরুষের ন্যায় জটিলবিষয়ের আলোচনা করিতে সমর্থ নহে। শিক্ষা-বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিলেও স্ত্রীলোক পুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। স্ত্রীলোক Light reading অর্থাৎ নাটক নভেল এবং উপন্যাস প্রভৃতি পড়িতেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। গুরুতর উচ্চ দর্শনশাস্ত্র বা কঠোর গণিতশাস্ত্র পাঠে তাহারা তাদৃশ সমর্থ নহে। এই সকল কথা পরে আরও ভাল করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল। যে সকল বিষয়ে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম এবং প্রভূত সাবধানতার প্রয়োজন, সে সকল উৎকট মানসিক পরিশ্রমে স্ত্রীলোক তত পটু নহে। স্ত্রী হৃদয় (heart) পুরুষের হৃদয় অপেক্ষা ওজনে কম এবং ছোট, এজন্য স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় সাহসী নহে। স্ত্রী মস্তিষ্কের দাঁড়ি (convolution) পুরুষের মস্তিষ্কের কন্‌ভোলিউসন অপেক্ষা কম জড়িত, এজন্য পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর মন সরল। এজন্য সচরাচর লোকে উহাদিগকে "অবলা সরলা বালা" বলিয়া থাকে। উহাদের কল্পনা শক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য, মানঅভিমান, ভালবাসা প্রেম প্রভৃতি পুরুষের অপেক্ষা বেশী। পরশ্রীকাতরতা ইহাদের বেশী। ইহারা অত্যন্ত রূপাভিমানী। প্রায় সকল স্ত্রীলোক ভাবে, তাহার ন্যায় রূপবতী আর কেহই নহে। ইহারা নিজের জীবনোপায় নিজে করিতে সমর্থ নহে। স্ত্রীলোক জন্ম গ্রহণের পর হইতেই বুঝিতে পারে যে, তাহাকে পুরুষকে সন্তুষ্ট ও সাধনা করিয়াই পৃথিবীর সুখ সঞ্চয় করিতে হইবে; এজন্য ইহারা পুরুষের মন আকর্ষণ করিতে অত্যন্ত পটু হয়। বালক অপেক্ষা বালিকা তাহার পিতার মমতা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা অত্যন্ত মায়া আকর্ষণ করিতে পারে। কেমন হাব ভাব মিষ্ট কথা এবং হাসিহাসি মুখ। বালকের এরূপ হাব ভাব ও পিতৃস্নেহ আকর্ষণের ক্ষমতা দেখা যায় না। পুরুষের মন আকর্ষণ ব্যতীত ইহাদের উপায় নাই, এজন্যই ইহারা এত সৌন্দর্য্যাভিমানী যে, কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন নব পরিণীতা বধূ আনয়ন করিলে ইহারা তন্ন তন্ন করিয়া তাহার রূপ বাছাই করে, এবং সে অপরূপ সুন্দরী হইলেও যেমন করিয়া হউক তাহার কোন না কোন খুঁত

(ত্রুটী) বাহির করিয়া থাকে। এটা স্থধু বাঙ্গালী স্ত্রীদিগের প্রকৃতি নহে। সর্ব্ব জাতীয় স্ত্রীচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে এইটী লক্ষিত হইবে। ইউরোপীয় স্ত্রীদিগেরও প্রকৃতি এইরূপ। ইউরোপীয় স্ত্রীগণও পুরুষের মন ভুলাইবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করে। কুমারী কন্যারা পিতামাতার নিকট পুরুষের মন ভুলাইবার উপযোগী শিক্ষা (যথা, ভাব ভঙ্গী, নৃত্যগীত) পাইয়া থাকে এবং বেশভূষায় যথেষ্ট মনোযোগী হয়। বৃদ্ধা স্ত্রীগণও কুমারী সাজিতে ভাল বাসে। এবং সৌন্দর্য্য বিষয়ে সকলেই সকলকে হারাইয়া দিবে এইরূপ চেষ্টা করে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি ফ্যাসনের দাস। ইউরোপে যখন কোন নূতন পোষাক বা ফ্যাসন্ প্রচারিত হয়, তখন সমস্ত স্ত্রীলোকে তাহার অনুকরণ করে। আমাদিগের দেশেও নূতন অলঙ্কার বা নূতন ধরণের বস্ত্র উঠিলে বৃদ্ধা স্ত্রীগণও ক্ষেপিয়া উঠে। এত স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও ইহারা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হয় না। স্ত্রীও পুরুষের রূপ বিচার পক্ষেও ইতর বিশেষ আছে। কোন্ স্ত্রীলোক রূপবতী ইহা বিচারে পুরুষ ও মেয়ের পছন্দ স্বতন্ত্র। কয়েক জন পুরুষ একত্র হইয়া কোন বিবাহের পাত্রী সুন্দরী ও রূপবতী বলিয়া পছন্দ করিলে মেয়েমহলে সে রূপবতী না হইতে পারে। পুরুষে মোটামুটী সৌন্দর্য্য দেখে। সে দেখে যে মেয়েটী মোটের উপর দেখিতে কেমন এবং তাহার পুরুষমন বিমোহিত করিবার উপযুক্ত রূপ ও সৌন্দর্য্য আছে কি না? কিন্তু স্ত্রীলোকে মোটের উপর (গড়পড়তা) রূপ না দেখিয়া প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করে। এবং ঐরূপ পরীক্ষায় ফেল হইলে আর সে রূপবতী বলিয়া গণ্য হয় না। চোখ, নাক, মুখ, কপাল, চুল, হাত, পা হাটন, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখে এবং যদি এই সকল অঙ্গে কোন খুঁত না থাকে, অথচ মোটের উপর মেয়েটী দেখিতে ভালও না হয়, তত্রাচ সে স্ত্রী সমাজে সুন্দরী ও রূপবতী বলিয়া গণ্য হয়। এমন অনেক স্ত্রী ও পুরুষ আছে, যাহাদের নাক, মুখ, চক্ষু, কপাল, হাত, পা, প্রভৃতি একে একে লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহার কোন অঙ্গে খুঁত ধরিবার যো নাই, অথচ ঐ স্ত্রী বা পুরুষ মোটের উপর সমস্ত অঙ্গে মেলাইয়া দেখিলে তত সুন্দর ও রূপবান্ বলিয়া বোধ হইবে না। আবার এমন অনেক স্ত্রী এবং পুরুষ আছে, যাহাদের অঙ্গ বিশেষে কিঞ্চিৎ খুঁত থাকিলেও মোটের উপর রূপের মাধুর্য্য

আছে। অনেকের নাসিকা সামান্য খাঁদা হইলেও তাহার মুখ চোখ মোটের উপর এমন ঢল্‌ঢলে যে, সে সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ। স্ত্রীলোকে মোটের উপর রূপ (অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ মিলাইয়া যে একটা রূপ হয়) বুঝিতে পারে না। ইহারা নধর গঠন এবং গোল গোল হাত পা পছন্দ করে। খুব্ রূপবতী স্ত্রীলোকের বাহু যদি সম্পূর্ণ গোলাকার না হয়, অথবা তাহার হাতের চেটোর যদি অল্প শির দেখা যায়, তবে সে পুরুষের নিকট মহারূপবতী হইলেও স্ত্রীসমাজে রূপবতী বলিয়া গণ্য হয় না। ইহারা খাঁট চেহারা ভাল বাসে। ইহারা স্ত্রীরূপ বিচারে অধিকারীও হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ত্রীর নিকট পুরুষ এবং পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক সুন্দর ও রূপবতী বলিয়া বোধ হয়। যে স্ত্রী, পুরুষের মনোমোহিনী হয়, সেই প্রকৃত সুন্দরী; অতএব স্ত্রীপছন্দ কার্য্য এবং স্ত্রীলোকের রূপ বিচার পুরুষেই করিতে পারে, স্ত্রীলোকে পারে না। এবং পুরুষের রূপবিচার, স্ত্রীলোকে যেমন করিতে পারে পুরুষে তেমন পারে না। অনেক পুরুষ এমন আছে যে, তাহারা পুরুষ সমাজে তত রূপবান্ বলিয়া গণ্য নহে। পরন্তু বোকা হাবা বলিয়া গণ্য, অথচ স্ত্রীমহলে ইহাদের অত্যন্ত পসার প্রতিপত্তি। এমন অনেক চেহারার লোক আছে, যাহাদিগকে দেখিলেই স্ত্রীলোকের মন আকর্ষিত হয়। অথচ এই শ্রেণীর লোক ধনমানমর্য্যাদাহীন। ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

অধর্ম্ম হইতে রোগ উৎপত্তি।

পাপ হইতে রোগ জন্মে এবং পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানে শরীর সুস্থ ও নীরোগী হইয়া লোক দীর্ঘজীবী হয়, একথা হিন্দুসমাজের সাধারণধারণা। দুঃখ, যে কোন প্রকারের উপস্থিত হউক না কেন, তাহা পাপজনিত এবং সর্ব্বপ্রকারের সুখ পুণ্যজনিত, ইহা হিন্দুমাত্রেই বলিয়া থাকেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও অধর্ম্মই রোগের মূলনিদান বলিয়া স্বীকার করেন। একারণ চরকাদিবিস্তৃত বৈদ্যকগ্রন্থে সদাচার, জিতেন্দ্রিয়তা, গুরুজনের সেবা, জপ, হোম ও গর্ভাধানাদি পুণ্যানুষ্ঠানের উপদেশ, সর্ব্বত্রই উল্লিখিত হইয়াছে।

রোগের নিদানস্থলে চরক বলেন "কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ। দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥" অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক যতপ্রকার রোগ আছে, এই তিনটীই তাহাদের কারণ। যথা—কাল বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থগণের বিরুদ্ধসম্বন্ধ, অসম্বন্ধ বা অতিসম্বন্ধ। "শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ। তথাসুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ॥" শরীর এবং মন এই উভয়ই রোগ বা অরোগ্যের আশ্রয়। কাল, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থগণের সমযোগই অরোগ্যের হেতু। অধর্ম্ম যে স্বকীয় রোগের কারণ, কেবল তাহা নহে, লোকের পাপে দেশের জলবায়ু ও ঋতুপ্রভৃতিও বিকৃত হয়, তাহা চরকাদিগ্রন্থে বিবৃত আছে। চরকে আছে "বায্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপাদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎকর্ম্ম পূর্ব্বকৃতং, তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব। অর্থ এই যে, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির বিগুণতাও অধর্ম্ম হইতে জন্মে, পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্মই অধর্ম্ম-প্রজ্ঞাপরাধই অধর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মের মূল। "তেষাং তথান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানানামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেন নাপো যথাকালং দেবো বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি। বাতা ন সম্যক্ অভিবান্তি ক্ষিতির্ব্বাপদ্যতে সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায় আপদ্যন্তে বিকৃতিং॥" অর্থ এই যে, অধর্ম্ম হইতে ঋতুসমূহ বিকৃত হয়, যথাকালে বর্ষণ হয় না। বায়ু সম্যক্ প্রবাহিত হয় না। জল শুষ্ক হইয়া যায়, ওষধিসমূহ স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে জল হইতেছেনা বা প্রবল বন্যা আসিল এদেশের অজ্ঞবিজ্ঞ সকলেই বলিবে যে, লোকের পাপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাই বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি সংঘটিত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ আছে, লোকেও তদ্রূপ প্রতিধ্বনি করে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রবল বাত্যা বা মহামারীর সহিত লোকের অধর্ম্মের কিরূপ যোগাযোগ আছে, তাহা এ প্রস্তাবে আলোচ্য নয়, পরন্তু পাপ হইতে কিপ্রকারে রোগের উৎপত্তি হয় তাহাই আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বেদের অনুশাসন সকল লঙ্ঘন করার নাম পাপ ও প্রতিপালন করার নাম পুণ্য; একথা যাঁহারা মানেন, তাঁহাদিগকে পাপ হইতে যে রোগ জন্মে, এ কথা আর পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে হয় না। কারণ আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করিলে অবশ্যই রোগভোগ করিতে হয়। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বেদ,

স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি এ সমুদায়ই মান্য করার নাম ধর্ম্ম ও তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। "আচারো ধর্ম্মমূলং হি" অর্থাৎ আচারই ধর্ম্মের মূল, বেদের অনুশাসনই ধর্ম্মের মূল। একারণ আমরা মিথ্যাকথা কহাকেও যেমন পাপ বলিয়া থাকি, সূর্য্যোদয়ের পর নিদ্রা যাওয়াকেও তদ্রূপ পাপ মনে করিয়া থাকি। এমন কি, কোন কোনস্থলে মিথ্যাকথাদি অপেক্ষা দেশ ও কালবিশেষে বিশেষ বিশেষ আচারের অনুষ্ঠানকে গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি এবং তজ্জন্য শাস্ত্রেও গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেরূপ আচরণে দেহ মন আত্মার সামঞ্জস্য উন্নতি হয়, সেইরূপ আচারই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীত পাপ। একারণ পলাণ্ডু, গৃঞ্জন অথবা দ্বাদশী তিথিতে পূতিকা ভক্ষণাদি গুরুতর পাপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যে কিছু আহার, বিহার, শয়ন, স্নান, দন্তধাবন, মৈথুন ইত্যাদি আচরণ, দেহমন আত্মার সামঞ্জস্য উন্নতির বিরোধী, সে সমুদয় পাপ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। আধুনিকগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, মৈথুনে, কিরূপে পাপ জন্মায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, একারণ একাদশী বা অমাবস্যার দিন কালোপযোগী আহার করিয়া কেহ পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন এ কথা শুনিলে তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আহার, বিহার, দন্তধাবন, ক্ষৌরকরণ ইত্যাদির সহিত ধর্ম্মকর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই। ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল দয়াদাক্ষিণ্য অহিংসা সত্য ও ক্ষমাদি মানসিকবৃত্তিগুলিনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ঋষিগণের মতে যমসেবাও যেমন কর্ত্তব্য, নিয়মগুলিন প্রতিপালনও তদ্রূপ। ইহার মধ্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই। উভয়ই ধর্ম্মকর্ম্ম। তাঁহারা বলেন "সত্ত্বং আত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্ত্রিদণ্ডবৎ। লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥" অর্থ এই যে যেমন তিন খানি দণ্ড একত্র সংযোগে অবস্থান করে, তদ্রূপ শরীর, আত্মা ও মন ইহারাও পরস্পর সংযোগে অবস্থিত। কেহই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে না। যাহা শরীরে পৌঁছিবে, তাহাই মন এবং আত্মাতে সূক্ষ্মভাবে পৌঁছিবে। কে না জানেন যে, মদ মাংসাদিভক্ষণে মনের ক্রোধ হিংসাদি কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, সাত্ত্বিকদ্রব্য ভোজনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করা যায় অথবা ক্রমাগত উপবাসে বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়? যদি বাহ্য আচরণের উপর আত্মা মনের উন্নতি অবনতি নির্ভর না করিবে, তবে বাহ্যদ্রব্যে চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইবে

কেন? দেশ ও কালের ক্ষমতা যে, আত্মা ও মনের উপর যথেষ্ট আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রভাতকালে বা বিশেষ বিশেষ কালে চিত্ত যে স্ফূর্ত্তিমান্ থাকে, অথবা অত্যুচ্চগিরিশিখরে বা বিস্তৃত সমুদ্রদর্শনে যে মন প্রফুল্ল হয়, এ কথা কেনা জানেন? অতএব বাহ্য আচরণে যে মন ও আত্মার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি সম্পাদন হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবন্ধবিস্তারের আবশ্যক করে না। আধুনিকগণ যথায় শরীর স্থূল হয়, রক্তবৃদ্ধি হয় অথবা অস্থি শক্ত হয় দেখিয়া কোন দ্রব্যকে ভাল বলেন, প্রাচীনগণ তথায় যদি তাহাতে মনের ও সত্ত্বগুণের উদয় দেখিতে না পান, তবে তাহাকে ভাল বলিতে পারেন না। সমুদয় সামঞ্জস্য উন্নতিই তাঁহাদের মতে উন্নতি। তাঁহারা বলেন "সমঃ কায়ঃ.....স্বাস্থ্য ইত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ যখন সমুদায়ই সমান চলিবে, তখনই লোককে সুস্থ বলা যায়। নতুবা কেবল দেহের অস্থি মাংস ও রক্তের চলাচল দেখিয়া সুস্থ নির্ণয় করা প্রাজ্ঞজনের উচিত নয়। আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সদাচারবিষয়ক এত উপদেশ আছে যে, তাহা দেখিলে ইহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা হঠাৎ বুঝিয়া উঠা যায় না। অতএব সদাচারাদি প্রতিপালন যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে পক্ষে অধর্ম্মই যে রোগোৎপত্তির কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা কেবল সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, ঋজুতা ইত্যাদি মানসিকবৃত্তিগুলিনকে ধর্ম্মের মূল বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারাও যদি স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পান যে, অধর্ম্মই অধিকাংশ রোগের মূলকারণ। জ্বর, অতিসার, যক্ষ্মা, উদরী, অপস্মার, উন্মাদ, মেহ, প্রদরাদি সংসারে যতপ্রকারের রোগ আছে, প্রায় সকলি অধর্ম্মমূলক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির অযথা আচরণই যে অধিকাংশ রোগের কারণ, তাহা কেনা বলিবে? কামের অযথা পরিচালনে যতপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়, অথবা লোভাদির অভিযোগে যে সকল রোগের উৎপত্তি, তাহার পৃথক্ তালিকা করিলে বোধ হয় একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিতে হয়। মদ বা মাৎসর্য্যের প্রাবল্যে, গুরুজনের অবমাননাদিকার্য্যেও যে বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাও আয়ুর্ব্বেদে উল্লেখ আছে। একারণ জিতেন্দ্রিয়তা, সদাচার, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই আমাদের আয়ুর্ব্বেদের বিষয়। কোন্ জাতির চিকিৎসাগ্রন্থকে এমন ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে? চিকিৎসাস্থান অপেক্ষা যাহাতে চিকিৎসা

করিতে না হয়, রোগ না জন্মে এই সকল প্রকরণই চরকাদিগ্রন্থে বিস্তৃত দেখা যায়। ধন্য ঋষিগণ! ধন্য আর্য্যগণ! তোমরাই যথার্থ বুঝিয়াছিলে যে, ধর্ম্মই আয়ু ও নিয়োগিতার কারণ এবং অধর্ম্মই একমাত্র রোগের নিদান। তোমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রই অধ্যাত্ম, ইহাই ধর্ম্মগ্রন্থ। তোমরাই বুঝিয়াছিলে যে, আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই রোগ, শোক, জরা ব্যাধি এবং আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই আয়ু, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, যেমন সমুদায়ই আত্মার শক্তি, তেমন ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করা, বাহ্যদ্রব্যকে সাত্ম্য করা, ইহাও আত্মশক্তি। এক আত্মার অভাবে মৃতদেহে যন্ত্র সকল ঠিক্ থাকিলেও চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। অথবা মৃতশরীরে উদরস্থ যন্ত্র সকল ঠিক্ থাকিলেও আহার্য্যদ্রব্য ভরিয়া দিলেও তাহা পাক পায় না। তোমরাই আত্মজ্ঞানেই যথার্থ বুঝিয়াছিলে যে, এই চেতনরূপী পুরুষেরই শক্তিবলে প্রাণাপান বায়ু সকল বিবৃত রহিয়াছে, দেহে রক্তের স্রোত ধাবিত হইতেছে, জীর্ণক্রিয়া সকল সম্পাদিত হইতেছে এবং কি দৈহিক কি মানসিক, সমুদয় ব্যাপারই সম্পাদিত হইতেছে। তোমরা এই আত্মশক্তিকে সমুদায় স্বাস্থ্য ও আয়ুর কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলে বলিয়াই যাহাতে জপতপঃ ধ্যান ধারণাদির দ্বারা আত্মশক্তির বৃদ্ধি হয়—জীর্ণ-শক্তি বৃদ্ধি হয়—রক্তস্রোত যথাপ্রবাহিত হয় এবং সমুদায় অসাত্ম্যকে সাত্ম্য করা যায়, তদ্রূপ ধর্ম্ম উপদেশ সকল তোমাদের চিকিৎসাগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছ। অধর্ম্ম দ্বারা এই আত্মশক্তির হ্রাস হয় ও ধর্ম্ম দ্বারা ইহার বৃদ্ধি হয় দেখিয়া তোমরাই অধর্ম্মকে রোগের একমাত্র নিদান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছ।

কবিরাজ সম্পাদক।

(উদ্ধৃত)

দ্রব্যগুণতত্ত্ব।

হরীতকী।

আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যসংগ্রহে হরীতকীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে হরীতকীর বুৎপত্তি স্থলে লিখিত আছে;—

"হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ,
হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী।"

মহাদেবের ভবনে জন্ম, স্বভাব-সিদ্ধ সবুজ বর্ণবিশিষ্টা, সকল রোগ হরণ করে, তজ্জন্যই হরীতকী নাম। অন্যত্র আছে;—

"হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভূয়স্তকতি যদ্বপুঃ,
হরীতকীতু সা প্রোক্তা তকতির্দীপ্তি বাচকা।"

হঠাৎ ব্যাধি হরণ করে, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, তজ্জন্যই হরীতকী নাম। তকতি শব্দে দীপ্তি বুঝায়।

আয়ুর্ব্বেদ-দক্ষ ভগবান্ দক্ষ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন;—

"পপাত বিন্দুমেদিন্যাং শক্রস্য পিবতোঽমৃতং,
ততো দিব্যাৎ সমুৎপন্না সপ্তজাতি হরীতকী।"

ইন্দ্রের অমৃত পান কালে পৃথিবীতে অমৃতবিন্দু পাত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় পদার্থ হইতে সপ্তজাতি হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

"বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া,
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয়ঃ।"

বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী, ও কেতকী নামে হরীতকী সপ্তপ্রকার।

"অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা,
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলা মৃতা,
পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী,
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ।"

বিজয়ার অলাবুর ন্যায় আকার,—রোহিণী গোল; পূতনার অস্থিই অধিক, ইহার অবয়ব ক্ষুদ্র; অমৃতার শস্য অধিক, (১) ইহা ত্রিদল বিশিষ্টা, পঞ্চরেখা বিশিষ্টা অভয়া; জীবন্তী স্বর্ণ বর্ণা, চেতকীর তিন শির; ইহাই সপ্তপ্রকার হরীতকীর আকৃতি। অন্যত্র ইহার আরও বিশদ বর্ণন আছে;—

(১) জীবন্তী স্বর্ণবর্ণাভা পূতনাস্থিতামতী মতা, অমৃতা ত্রিদলা প্রোক্তা বিজয়া ত্বরূপিণী, পঞ্চাঙ্গীত্বভয়া জ্ঞেয়া মৃতাবৃত্তাত্তরোহিণী, ত্র্যঙ্গীত্ত চেতকীজ্ঞেয়া।"

মদনপাল নির্ঘণ্টঃ।

"অলাবু বৃত্তা বিজয়া সুবৃত্তা রোহিণী মতা,
স্বল্পত্বক্ পূতনা জ্ঞেয়া স্থূলমাংসামৃতা স্মৃতা,
পঞ্চাস্রা চাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণভাক্,
ত্র্যস্রাতু চেতকী বিদ্যাদিত্যাসাং রূপলক্ষণং।"

বিজয়া অলাবুর ন্যায় গোল, রোহিণী সুগোল, পূতনার ত্বক্ অতি অল্প, অমৃতার শস্যই অধিক, অভয়া পঞ্চশিরা বিশিষ্টা, জীবন্তীর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, এবং চেতকীর তিন শিরা; ইহাই তাহাদিগের রূপ ও লক্ষণ। এই সপ্ত জাতি হরীতকী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জন্মে;—

"বিন্ধ্যাদ্রৌবিজয়া, হিমাচলভবা স্যাচ্চেতকী,
পূতনা সিন্ধৌ স্যাদথরোহিণী তু বিজয়া জাতা প্রতিষ্ঠানকে,
চম্পায়ামমৃতাভয়াচ জনিতা দেশে সুরাষ্ট্রাহ্বয়ে,
জীবন্তীতি হরীতকী নিগদিতা সা সপ্তভেদা বুধৈঃ।

বিন্ধ পর্ব্বতে বিজয়া জন্মে, চেতকী হিমালয়ে জন্মে, সিন্ধুদেশে পূতনা ও রোহিণী জন্মে, বিজয়া হরীতকী প্রতিষ্ঠানেই হয়। চম্পা—অর্থাৎ ভাগলপুর অঞ্চলে অভয়া ও অমৃতা হরীতকীর জন্মস্থান, সুরাটে জীবন্তী হরীতকীর উদ্ভব হয়। সেই সপ্তপ্রকার হরীতকীর প্রয়োগও ভিন্ন ভিন্ন রোগে হইয়া থাকে;—

সর্ব্বপ্রয়োগে বিজয়াথ রোহিণী
ক্ষতেষু লেপেষু চ পূতনোদিতা,
বিরেচনে স্যাদমৃতা গুণাধিকা
জীর্ণান্তিকা স্যাদিহ জীর্ণরোগজিৎ,
স্যাচ্চেতকী সর্ব্বরুজাপহারিকা,
নেত্রাময়ঘ্নীমভয়াং বদন্তি তাং।
ইত্থং যথারোগমিয়ং প্রযোজিতা,
জ্ঞেয়া গুণাঢ্যা ন কদাচিদন্যথা।"

সকল স্থলে বিজয়া, ক্ষত রোগে রোহিণী, লেপে পূতনা, বিরেচনে গুণাধিকা অমৃতা, জীর্ণরোগে জীবন্তী, সকল রোগ নাশ করিতে চেতকী ও নেত্ররোগে অভয়া হরীতকী প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যথা রোগে যথা নাম হরীতকী প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই বিশেষ ফল পাওয়া যায়, নতুবা ফল পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প।

"সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানং বিজয়া স্মৃতা,
সুখ-প্রয়োগসুলভা সর্ব্বব্যাধিষু শস্যতে,
ক্ষিপ্তাপ্সু নিমজ্জতি যা সা জ্ঞেয়া গুণবতী ভিষগ্বরৈঃ।
যস্যা যস্যা ভূয়ো নিমজ্জনং সা গুণাল্পা স্যাৎ॥"

সকল জাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়াই প্রধান, ইহা সুখ প্রয়োগ সুলভ, সকল রোগেই প্রয়োগ করা প্রশস্ত। যে হরীতকী জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই গুণবিশিষ্টা, যাহা ডুবিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠে, তাহার গুণ অল্প। অন্যত্র আছে;—

"চূর্ণার্থং চেতকী শস্তা যথা যুক্তং প্রয়োজয়েৎ,
চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ।
ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা চৈকাঙ্গুলায়তা।
কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্ গন্ধেন ভেদয়েৎ,
কাচিৎস্পর্শেন দৃষ্ট্যাস্যা চতুর্দ্ধাভেদয়েচ্ছিবা।
চেতকী পাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ,
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষীমৃগাদয়ঃ।
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ,
তাবদ্ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ।
নৃপাদিসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাং,
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখ-বিরেচনী॥"

চূর্ণার্থে চেতকী হরীতকীই প্রশস্ত, তাহাই যথাযুক্ত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চেতকী হরীতকী দুইপ্রকার, শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা; শ্বেতবর্ণা চেতকী হরীতকী ছয় অঙ্গুলি পরিমিতা; কৃষ্ণবর্ণা চেতকী হরীতকী একাঙ্গুলি পরিমিতা, কোন কোন হরীতকী আস্বাদ মাত্রেই, কোন কোন হরীতকী গন্ধ মাত্রে, কোন কোন হরীতকী স্পর্শ মাত্রে, কোন কোন হরীতকী বা দর্শন মাত্রেই ভেদ করায়। চেতকীহরীতকীবৃক্ষের ছায়ায় যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা মৃগাদি যায় তাহার ভেদ হয়। চেতকীহরীতকী যে পর্য্যন্ত হস্তে ধারণ করিয়া রাখা যায়, সেই পর্য্যন্ত তাহার প্রভাবেতেই নিশ্চয় ভেদ হয়। রাজা প্রভৃতি সুকুমার অবয়বের, কৃশের এবং ভেষজদ্বেষ্টার পক্ষে চেতকীহরীতকী পরম প্রশস্ত; ইহা সুখ-বিরেচনকারিণী।

এই সকল পাঠ করিলে আর্য্যেরা যে হরীতকীর গুণে মোহিত হইয়াছিলেন, স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু আজ সে কাল কই? তাহার কারণ হরীতকীর জাতিগত বিভাগের উপর কাহারও লক্ষ্য নাই; সেই স্থানভেদে বর্ণভেদে হরীতকীর জাতি বিচার করিয়া প্রয়োগ করা ঘটে না। হয় ত কাথ বাহির করিয়া লওয়া, অপক্ক অঘন্য হরীতকীর প্রয়োগ হইয়া থাকে, সুতরাং ফলও ঘটে না; তখন প্রত্যক্ষফল আর্য্য আয়ুর্ব্বেদে উৎপ্রেক্ষা প্রিয়তার দোষারোপ হয়! কিন্তু কয়জন স্থানভেদে, বর্ণভেদে, আকারভেদে সুপুষ্ট হরীতকী সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

মদনপাল নির্ঘণ্টুতে আছে—

"নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বীক্ষিপ্তা চয়াম্ভসি,
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা স্যাদ্রোণঘ্নীতত্তু গুণপ্রদা।
শোণাচ্ছিন্না গুড়নিভা কিঞ্চিদল্পা কষায়িণী,
স্থূলত্বক্ সরসা স্বল্পবীজা গুর্ব্বীহরীতকী।
চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী,
স্বিন্না সংগ্রাহিণী প্রোক্তা ভৃষ্টা পথ্যান্নদোষঘ্নুৎ॥"

নূতন, স্নিগ্ধা, ঘন, সুপুষ্ট, গুরু, ও যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সেই হরীতকীই রোগনাশ করে এবং গুণপ্রদা হয়। লাল আভাযুক্ত, ছেদন করিলে যাহার ভিতর গুড়ের ন্যায়, অল্প কষায়রসযুক্তা, যাহার ত্বক্ স্থূল, সরস ও স্বল্পবীজ এবং ভারি, তাহাই প্রশস্ত। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্রাধিকর্ষতা,
হরীতক্যা ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

ঐ নূতনাদি গুণযুক্ত একটি হরীতকী ৪ তোলা পরিমাণ হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, বাটিয়া খাইলে মলশুদ্ধি, আদ্রসেবনে মল সংগ্রহ ও ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত কফ) নষ্ট করে।

হরীতকীর গুণবর্ণন স্থলে আছে;—

হরীতকী পঞ্চরসালবণা তু বরা পরং,
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।

চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী,
শ্বাস-কাস-প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ-শোথোদর-কৃমীন্।
বৈস্বর্য্য-গ্রহণীরোগ বিবন্ধ-বিষম-জ্বরান্।
গুল্মাধ্মান-ব্রণ-চ্ছর্দ্দি-হিক্কা-কণ্ডু হৃদাময়ান্,
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা,
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চনাশয়েৎ,
স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃত্তু সা,
কটুতিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাৎ বাতহৃচ্ছিনা।"

হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্টা, লবণরস হীন, কষায়বাহুল্য, রুক্ষ, উষ্ণ, অগ্নি-দীপ্তিকরী, মেধাকারিণী, পাকে স্বাদু এবং জরা ও ব্যাধিনাশিনী, চক্ষুরোগ নাশিনী, পাকে লঘু, আয়ুর হিতকারিণী, পুষ্টিকারিণী, অনুলোমকত্রী, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, স্বরভেদ, গ্রহণীরোগ, কোষ্ঠ-বদ্ধ, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান, ব্রণ, চ্ছর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নষ্ট করে। স্বাদু তিক্ত ও কষায় বলিয়া পিত্তনাশক, কটুতিক্ত ও কষায় বলিয়া কফনাশক, অম্ল বলিয়া বাতনাশক।

"পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লোব্যবস্থিতঃ,
বৃন্তে তিক্ত স্ত্বচি কটু বস্থিস্থস্তবরোরসঃ।"

হরীতকীর মজ্জায় স্বাদুরস, স্নায়ুতে অম্ল, বৃন্তে তিক্ত, ত্বকে কটু ও অস্থিতে কষায় রস।

তাহার মজ্জার গুণঃ—

"পথ্যা-মজ্জা তু চক্ষুষ্যোবাতপিত্তহরো গুরুঃ।"

হরীতকীর আঁঠি চক্ষুর হিতকর, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং গুরুঃ।

"উন্মীলনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ানাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাং,
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহভোজনেন।"

আহারকালে হরীতকী খাইলে বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয় শক্তির স্ফূর্ত্তি করে, পিত্তকফ ও বায়ু নষ্ট করে এবং মূত্র, যকৃৎ ও মলকে পরিষ্কার করে।

"অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্,
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরিভোজনাৎ।"

আহারের পর হরীতকী খাইলে অন্নপানকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত দোষ নষ্ট করে।

"লবনেণ কফং হন্তি পিত্তংহন্তি সশর্করা,
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা।"

লবণের সহিত খাইলে কফ নষ্ট হয়, শর্করার সহিত খাইলে পিত্ত শান্তি করে, ঘৃতের সহিত খাইলে বায়ুরোগ নষ্ট করে এবং গুড়ের সহিত খাইলে সকল রোগই নষ্ট হয়।

আর ঋতু হরীতকীর নিয়ম ;—

"সিন্ধূথশর্করা শুণ্ঠী কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ,
বর্ষাদিষ্বভয়া প্রাশ্যা রসায়ণগুণৈষিণা।"

যাঁহারা রসায়ণ অর্থাৎ জরা ও ব্যাধি নষ্টকারক গুণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শিশিরকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত সেবন করিবেন।

হরীতকী ভক্ষণ নিষেধ ব্যবস্থা।—

"অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘন-কর্ষিতশ্চ,
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥"

পথ-শ্রম ক্লিষ্ট, বলহীন, রুক্ষ, কৃশ ও উপবাস-ক্লিষ্ট, পিত্তাধিক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ও যাহার রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহারা হরীতকী খাইবে না।

হরীতকী রীতিমত সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে যে বহুফল পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদবক্তারা তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করেন নাই, এই সামান্য হরীতকীর কথা মনে করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। আজ সিকি পয়সার হরীতকীতে যে ফল পাওয়া যায়, সামান্য জ্ঞানে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। দেশ বিলাতি বাহ্য চাক্‌চিক্যেই মুগ্ধ। তজ্জন্যই হতভাগ্য বঙ্গবাসী চিররুগ্ন—তজ্জন্যই দেশের এ দশা! হরীতকীর গুণে, সেই তপোযোগ বলে নিখিল জ্ঞানশালী ভবিষ্যদর্শী মুনিগণ কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন—দেশের কত স্থায়ী উপকারের জন্যই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—তাহা হতভাগ্য আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না; করি, কেবল অসার অন্বেষণ—

ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যজাতের আয়োজন—আর বিজাতীয় ব্যাপারের অনুসরণ। ভারতে একদিন সম্রাট্‌কেও উপদেশ দেওয়া হইত,—

"হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ্য রাজন্ মাতেব হিতকারিণী,
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥" ধন্বন্তরি।

কবিরাজ শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়।

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিমতে।

মুখ ক্ষত।

এসিড-নাইট্রীক। সমস্ত মুখে পচা ক্ষত ও পচা গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, মুখ হইতে উগ্র ললাস্রাব হইয়া ওষ্ঠে, গণ্ডে ও থুথ্‌নিতে ক্ষত উৎপাদন করে, মাড়ী সাদা ও স্ফীত এবং উহা হইতে রক্তস্রাব হয় ও দন্ত শিথিল হইতে থাকে। শিশুর দেহে উপদংশের বিষ থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

নাক্সভমিকা। প্রফুল্লচিত্ত, কৃশ শিশুদিগের পীড়া, মাড়ীস্ফীত ও বেদনাযুক্ত, উহা হইতে লালাস্রাব ও দপ্‌দপানি, মুখে পচা ক্ষত ও বিষ্টারের ন্যায় স্ফোট দৃষ্ট হওয়া, কোষ্টবদ্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের ইচ্ছা। পীড়াহেতু স্বভাবের উগ্রতা, জিহ্বা সাদাপুরু লেপযুক্ত থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ফাইটোলাক্কা। তালুতে এবং জিহ্বায় বেদনা ও উষ্ণতা অনুভব, পীতবর্ণের লালাস্রাব, উহাতে ধাতব আস্বাদ, অথবা গাঢ়, চট্‌চটে ও সুত্রাকারে প্রচুরলালাস্রাব, দন্ত আবদ্ধ এবং ওষ্ঠ উণ্টান ও দৃঢ় থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ।

পডোফাইলাম। প্রচুর লালাস্রাব ও মুখে দুর্গন্ধ, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে অধিক কষ্ট অনুভব, জিহ্বা আরক্ত, শুষ্ক ও ফাটা, কখন কখন অল্প স্ফীত হয় এবং উহা হইতে সহসা রক্তস্রাব হইতে দেখিলে ব্যবস্থা।

রাস-ভেন। জিহ্বার, গণ্ডের ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অতিশয়

আরক্ত, উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট প্রকাশ হওয়া ও ঐ স্থানে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় জ্বালা অনুভব করিলে ব্যবস্থা।

ষ্টাফিসাগেরিয়া। মাড়ীতে ও মুখে স্পঞ্জের ন্যায় কোমল স্ফোট প্রকাশ হইয়া সহজে রক্তস্রাব হয়, জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ক্ষত ও জলপূর্ণ স্ফোটদ্বারা আবৃত, জিহ্বার নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট, শিশু অতিশয় রুগ্ন, চক্ষু কোঠরগত ও নিলিমাদ্বারা বেষ্টিত থাকা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

সালফার। মুখে জাড়িক্ষত ও বিষ্টারের ন্যায় স্ফোট প্রকাশ হওয়া, আহার করিবার সময় মুখের জ্বালা ও বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা সাদা পুরু অথবা ধুষরবর্ণের লেপযুক্ত, প্রচুর অথচ রক্তমিশ্রিত লালাস্রাব, উগ্র আমমিশ্রিত অথবা ঈষৎ সবুজবর্ণের উদরাময় হেতু মলদ্বারে ক্ষত প্রকাশ হওয়া ও অনিদ্রা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ।

এসিড-সালফিউরিক। দুর্ব্বল ও কৃশ শিশুর মুখে অতিশয় বেদনা, গালের মধ্য পার্শ্বে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট ও মাড়ীতে ক্ষত দৃষ্ট হয়, মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব, উদরাময়, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সামান্যকারণে ঘর্ম্ম হইলে ইহাতে বিশেষ ফল দর্শিবে।

মুখের গলিত ক্ষত। এ দুরূহ ও সংঘাতিক পীড়ার যথার্থ কারণ এ পর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই, অনেকে অনুমান করেন যে, শৈশবাবস্থায় দৈহিক রক্তের পরিবর্ত্তন হইয়া সম্ভবত এ পীড়া উৎপন্ন হয়, ঐ পরিবর্ত্তন অনাহার বা পীড়া যথা হাম, মোহ বা সন্নিপাতিক জ্বর হেতু সচরাচর ঘটে। প্রথমে গালের মধ্য পার্শ্বে কোন এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র স্ফোট প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোটের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গণ্ড স্ফীত, কঠিন, উজ্জ্বল ও চাকচিক্য-শালী হইয়া উঠে এবং প্রদাহের ঠিক মধ্যস্থানে একটী উজ্জ্বল রক্তবর্ণের চিহ্ন প্রকাশ পায়, গণ্ডদেশ এত স্ফীত হয় যে, রোগী মুখব্যাদন করিতে পারে না; গণ্ডের মধ্য পার্শ্বের পূর্ব্ব উল্লিখিত স্ফোটের স্থানে ক্রমে একটী গভীর ক্ষত প্রকাশ হয়, ঐ ক্ষতের ধার সকল অসমান ও উপরে কৃষ্ণবর্ণের এক খানি ময়লা পর্দা (শ্লাফ) দ্বারা আবৃত হয়। বাহিরে প্রদাহ ক্রমে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং মধ্যস্থিত উজ্জ্বল রক্তবর্ণের চিহ্নটী যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে তেমনি উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে পর্য্যন্ত উহা একটী অতিশয় আরক্ত চক্র

দ্বারা পরিবেষ্টিত না হয়। এই সময় পীড়ার গতি রোধ হইয়া পচা স্থান স্খলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং যাহাদের অচিকিৎসা হেতু মৃত্যু হয় তাহাদের প্রায় অতিশয় ক্লান্তি, মোহ অথবা তড়কার ন্যায় আক্ষেপ হইয়া মৃত্যু ঘটে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা একটী গুরুতর ও সাংঘাতিক পীড়া কিন্তু আরোগ্য অসম্ভব নহে। প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা ব্যতীত বলকারক আহারের সুচারু বন্দবস্ত করা অতীব কর্ত্তব্য।

দূষিত স্ফোট বা ঔষ্ঠব্রণ। ইহা উপরোক্ত গলিত ক্ষতের প্রায় অনুরূপ। উহারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিও ত্বকের সংযোগ স্থানে সচরাচর প্রকাশ হয়। সচরাচর মুখমণ্ডলের কোন স্থানে, বিশেষ নিম্ন ঔষ্ঠে প্রথমে একটী অনুচ্চ স্ফোট প্রকাশ হয় এবং ঐ স্থান হইতে প্রদাহ ব্যাপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ঘোর রক্তবর্ণ, স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে। উহাতে জ্বালা, হুল বেধন-বৎ বেদনা ও চুলকনা বোধ হয়। সচরাচর ইহার সহিত দৈহিকক্রিয়াবিকার উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, ক্রমিক উদ্বেগের বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ভয় এবং স্নায়বীয় উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। এই প্রদাহ ও শোঁথ ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্ত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু কখনই উহাতে পুঁয উৎপন্ন হয় না; এইরূপে মুখমণ্ডল অতিশয় স্ফীত হইয়া আকৃতির বিকৃতি জন্মে ও সচরাচর অষ্টাহকাল মধ্যে অতিশয় ক্লান্তি বশতঃ রোগীর মৃত্যু হয়। এ রোগে জ্ঞান মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে।

উপরোক্ত দুইপ্রকার রোগের চিকিৎসা নিম্নে দেওয়া হইল।

ডাক্তার ইলিয়ট বলেন যে, এই সকল রোগে প্রথমে সিলিসিয়া ও ল্যাকে-সিস্ পর্য্যায় ক্রমে ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে যে পর্য্যন্ত পীড়ার গতিরোধ না হয়। এই প্রকার চিকিৎসায় তাহার মতে আরোগ্য হওয়ার বিশেষ সম্ভব।

এপিস-মেল। বিসর্পের ন্যায় প্রদাহের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি ও উহাতে জ্বালা এবং হুল বেধনবৎ বেদনা ও শোঁথ থাকিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এন্থ্রাসিনাম। আক্রান্ত স্থানে প্রচণ্ড জ্বালা ও বেদনা, পুঁয উৎপন্ন হইলে শোষিত হওয়া ও আক্রান্ত স্থান পচিয়া উঠিলে এবং পুঁজে দুর্গন্ধ ও মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যবস্থা।

আর্শেনিকাম। অসহ্য জ্বালা, অতিশয় অস্থিরতা; অনবরত তৃষ্ণা

কিন্তু অল্পপরিমাণ জলে তৃষ্ণা নিবারণ, নির্জ্জীবাবস্থা, রাত্রে উপসর্গের বৃদ্ধি, উত্তাপে যন্ত্রণার হ্রাস হইলে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেলেডোনা। আক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, উহাতে দপদপে বেদনা, নিদ্রাবল্য কিন্তু নিদ্রা না হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কার্ব-ভেজ। পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উহাতে পচা গন্ধ থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শিবে।

ল্যাকেসিস্। আক্রান্তস্থান নীলবর্ণ দৃষ্ট হওয়া, গ্রীবায় বস্ত্রাদী বা কোন পদার্থ অসহনীয়, মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা এবং নিদ্রান্তে পীড়ার বৃদ্ধি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

রাস্-টক্স। অতিশয় অস্থিরতা; চলিয়া বেড়াইলে বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হওন ইহার প্রধান লক্ষণ।

এ রোগের অন্যান্য ঔষধ চায়না, হায়স, ক্রিযজোট, এসিড্-মিউ, পালস্ নিকেল, সিপিয়া ও সিলিসিয়া। ঐ সকল ঔষধের ১৮ বা ৩০ ক্রমের অরিষ্ট বা বটীকা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু এল্, এম্, এস্,
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্টীসনার।

লক্ষণতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বেদনা বা যন্ত্রণা ব্যতীত আরও নানারূপ বোধবিপর্য্যয় আছে। চুল-কানি বা কণ্ডুয়ন একরূপ বোধবিপর্য্যয়। ইহা প্রায়ই একরূপ বেদনার ন্যায়। চুলকানি বা কণ্ডুয়নকে সামান্যাকারের বেদনা বলিলে বলা যায়। যে কারণে বেদনা উৎপন্ন হয়, চুলকানিও সেই কারণে উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত অধিক স্থানিক উত্তেজনায় বেদনার উৎপত্তি হয়। সামান্য উত্তেজনায় বেদনা না হইয়া চুলকানী হয়। স্নায়ুতে বেশী উত্তেজনা হইলে বেদনা এবং অল্প উত্তেজনা হইলে চুলকানী উপস্থিত হয়। অনেক প্রকার চর্ম্মরোগে

চুলকানী উপস্থিত হয়। সাধারণ পাঁচড়া বা চুলকানী রোগ একরূপের কীটের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই কীট চর্ম্মের নিম্নে জন্মায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত তৈয়ার করে, যখন তাহারা নড়িতে থাকে, তখন স্নায়ু সকলের অগ্রভাগে সুড়সুড়ী বা সামান্য আঘাতে চুলকানী উপস্থিত হয়। গাত্রে কোন পোকা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে এবং মস্তকে ইকুন জন্মাইলে চুলকানী উপস্থিত হয়। একজিমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইলে তাহার রসে স্নায়ুসূত্রের অগ্রভাগ সকল সামান্য উত্তেজিত হইয়া কণ্ডুয়ন উপস্থিত করে। প্রুরাইগো নামে একরূপ চর্ম্মরোগ আছে, তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। এই প্রুরাইগো রোগ সচরাচর শরীরের কোন বাহ্যিকরন্ধ্রে উপস্থিত হয়। পেটে ছোট ছোট ক্রিমি জন্মাইলে উহারা নিম্নে নামিয়া আসিয়া মলদ্বারে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন উপস্থিত করে। ইহাও একপ্রকার প্রুরাইগো। মলদ্বারের প্রুরাইগো পীড়াকে প্রুরাইগো পডিসিস্ কহে। ক্রিমি ব্যতীত অন্যান্য নানাকারণেও প্রুরাইগো পডিসিস্ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যোনিতে বা যোনির উপরিভাগে একরূপ অত্যন্ত কণ্ডুয়ন রোগ জন্মে, উহাকে যোনিকণ্ডুয়ন বা প্রুরাইগো পিউডেন্ডাই রোগ কহে। এই সকল প্রুরাইগো রোগ হইলে রোগী কণ্ডুয়নের জ্বালায় অস্থির হয় এবং রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। সর্ব্বদা লোকের মধ্যেও মিশিতে পারে না। পেটের অন্ত্রে অজীর্ণদ্রব্য বা নানাবিধ উত্তেজক দ্রব্য সঞ্চয় হইলে অন্ত্রের মধ্যে একরূপ চুলকনার সদৃশ রোগ উপস্থিত হয়। এই চুলকনা অন্য স্থানের চুল্‌কনার ন্যায় আমরা বুঝিতে পারি না। এইরূপ চুলকনা হইলে পুনঃ পুনঃ দাস্তের বেগ আইসে। আমাদের যে স্বাভাবিক দাস্তের বেগ হয়, তাহাও একরূপ চুলকার সদৃশ। আমরা কাসিবার পূর্ব্বে যে আমাদের গলার ভিতর সুড় সুড় করে তাহাও একরূপ চুলকনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক সময় আমাদিগের গাত্র চুলকায় অথচ চুলকাইলে তাহার নিবৃত্তি হয় না, যেন চর্ম্মের নিম্নে কোন পোকা বেড়াইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। এইরূপ চুলকানী কোন অভ্যন্তরিক কারণদ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনা হইয়া সংঘটিত হয়। সেই স্থানে কোনরূপ খারাপ রক্ত বা ময়লা বা কীট সঞ্চয় হইয়া এরূপ চুলকনা উপস্থিত হয়।

গা বোমি বোমি করা (বোমি হইবার পূর্ব্বে গা কেমন করা) একরূপ বোধবিপর্য্যয়। ইহা সচরাচর পাকস্থলীর পীড়া অথবা পাকস্থলীর উত্তেজনা বশতঃ হইয়া থাকে। অন্যান্য নানা ব্যাধিতেও গা বোমি বোমি করে। সে পীড়ার সহিত পাকস্থলীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। যথাঃ—মস্তিষ্কের পীড়া হইলে যথাঃ—মাথা ধরিলে বোমির বেগ হয়। অত্যন্ত উৎকট চিন্তা হইলে বোমির বেগ হয়। কোনরূপ দুর্লক্ষ বা গলিত দ্রব্য দর্শন করিলে বোমি আইসে! নৌকায় বা পাল্কীতে ভ্রমণ করিলে অনেকের বোমি হয়। স্ত্রীলোক অন্তঃস্বত্বা হইলে জরায়ুতে উত্তেজনা হইয়া তাহাদের বোমি হয়। তবেই দেখ পাকস্থলীর পীড়া না থাকিলেও নানাবিধ যান্ত্রিক উত্তেজনা বশতঃ বোমি হইয়া থাকে। মূত্রমার্গ দিয়া পাথরি নামিয়া আসিবার সময় বোমির বেগ আইসে। অতএব বৃক্ক বা কিড্‌নির উত্তেজনায় বোমি হইতে পারে। স্ত্রীলোকের জরায়ুর নানাবিধ পীড়ায় (যথাঃ—Endemetritis এণ্ড মেট্রাইটিস্) বোমি হয়। কিন্তু যে কারণেই বোমি হউক, যে যান্ত্রিক উত্তেজনা বশতই বোমি হউক না কেন, পাকস্থলীর সহিত সেই সকল যন্ত্রের সাক্ষাৎ বা মুখ্য সম্বন্ধ না থাকিলেও গৌণসম্বন্ধ থাকে। আমাদিগের দেহে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহাদিগের দ্বারাই বোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল স্নায়ু বা বোধসূত্রের মধ্যে এক শ্রেণির স্নায়ু আছে, উহাদিগকে সিম্‌প্যাথেটিক্ বা সমবেদোনোৎপাদক স্নায়ু কহে। এই সকল সমবেদোনোৎপাদক স্নায়ু সকল প্রায়ই পরস্পর সংযুক্ত; এজন্য এক স্থানের পীড়া হইলে অন্য স্থানে সেই পীড়ার লক্ষণ সূচিত হয়। স্ত্রীলোকের জরায়ুর সমবেদনোৎপাদক স্নায়ুর সহিত পাকস্থলীর সমবেদনোৎপাদক স্নায়ুর সংযোগ আছে, এজন্য গর্ভে সন্তান জন্মাইয়া বা জরায়ুর কোন পীড়াবশতঃ জরায়ুর স্নায়ুতে উত্তেজনা হইলে ঐ উত্তেজনা স্নায়ুসূত্রদ্বারা পাকস্থলীতে নীত হইয়া পাকস্থলীর উত্তেজনা উপস্থিত করিয়া বোমির বেগ আনয়ন করে।

আর একরূপ বোধবিপর্য্যয় আছে, উহাকে মাথাঘুরাণী (গিডিনেস্) কহে। রোগী যেন বোধ করে যে, তাহার গা বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছে। ইহা কোন মস্তকের পীড়া হইতেও সমুদ্ভূত হয়, কর্ণরোগ হইতেও উপস্থিত হয় অথবা কোন কারণে শরীরদুর্ব্বল হইলেও হয়। পাকস্থলীর পীড়াবশতঃ যথা (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) হইলেও মাথা ঘুরিয়া থাকে। শরীর নিরক্ত হইলেও মাথা ঘোরে। অতিরিক্ত মৈথুন বা রাত্রিজাগরণ করিলে

বা স্নানের সময় অতীত হইলেও মাথা ঘুরিয়া থাকে। অনেক উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে চাহিলে মস্তক ঘুরে। যাহাদিগের শরীর দুর্ব্বল, তাহারা অল্প উচ্চ হইতে নিম্ন চাহিলে তাহাদিগের গা ঘুরিয়া উঠে। এইরূপ গা ঘোরা মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভব। অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলে বা মানসিক পরিশ্রম করিলে মথা ঘুরিয়া থাকে। হৃদয় দুর্ব্বল হইলে, যথা হৃদ্‌স্পন্দন রোগ হইলে মস্তক ঘূর্ণন হইতে পারে। মূর্চ্ছারোগ (Thinting) রোগ হইবার পূর্ব্বে মস্তক ঘূর্ণন উপস্থিত করে।

আর একরূপ বোধবিপর্য্যয় আছে, উহা পাকস্থলীতে অনুভূত হয়। এক দুই দিন ধরিয়া উপবাস করিলে পাকস্থলীতে যে একরূপ কষ্ট বোধ হয় (যেন পেটে ও পিঠে এক হইয়া যাইতেছে) উহাকে সিন্‌কিং (Sinking) কহে। অনেক কঠিন কঠিন পীড়ার রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

আরও নানাবিধ বোধবিপর্য্যয় আছে। সে গুলি জানিবার জন্য রোগীর কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এমন অনেক বোধবিপর্য্যয় আছে, যাহা ভালরূপ প্রকাশ করিয়া বলাও যায় না। যথা, অনেক রোগী তাহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তোমাকে বলিবে, যে কেমন একরূপ করিতেছে। দৌর্ব্বল্যবোধও একরূপ বোধবিপর্য্যয়। সব শরীর যেন ডাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দুর্ব্বল হইলে এইরূপ বোধ হয়। আলস্য বোধ, গা ঘুম ঘুম করা, কোঁতপাড়া, মাজা খসিয়া পড়া, বুকজ্বালা করা, প্রস্রাবকালীন কোঁতপাড়া, কান ভোঁ ভোঁ করা, ঝাপ্সা দেখা, অন্ধকার দেখা, প্রভৃতি নানা-রূপ বোধবিপর্য্যয় আছে।

প্রায় অধিকাংশ পীড়াতে রোগীর ক্ষুধা থাকে না বা আহারেচ্ছা থাকে না। কিন্তু কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত ক্ষুধা উপস্থিত হওয়া রোগের পরিচায়ক। যথা শর্করামেহ (ডায়েবেটিসের পীড়া) হইলে রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়া থাকে। শর্করা মেহরোগগ্রস্ত রোগী অত্যন্ত অধিক আহার করিয়া থাকে। এই রোগকেই অনেকে ভস্মকীট রোগ বলিয়া থাকে। কবিবর ভারতচন্দ্র এই ভস্মকীট রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পিপাসাবোধও একটী উপসর্গ। জ্বররোগে ও শর্করামেহ প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। প্রদাহ (ইন্‌ফ্লামেসন্) হইলেও পিপাসা হইয়া

থাকে। কখন কখন অস্বাভাবিক দ্রব্যের উপর লোভ হইয়া থাকে। ইহাও একরূপ ক্ষুধাবিপর্য্যায়। যথা অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীলোকে নানাবিধ অস্বাভাবিক দ্রব্যে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

নাসিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তিনি পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যদি কোন গৃহের বায়ু ৪৩° উষ্ণ হয়, তবে ঐ বায়ু নাসিকা পথ ভ্রমণ করিলে উহা ৪৬° ডিগ্রী উষ্ণ হইয়া উঠে। যে বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জানা আছে, এরূপ বায়ু নাসিকার দ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া এবং তাহার পর অপর ছিদ্র দিয়া ঐ বায়ু নির্গত করাইয়া উহার রাসয়ানিক পরীক্ষায় আসন্‌ব্রাণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, আমাদিগের শ্বাসবায়ু নাসিকা হইতে প্রতি মিনিটে ০৩৬৫৬ গ্রাম জল গ্রহণ করে অর্থাৎ দিন রাত্রে প্রায় অর্দ্ধসের জল আমা-দিগের শ্বাসবায়ুতে মিশ্রিত হয়। সাধারণ বায়ু অপেক্ষা আমাদিগের শ্বাস, পরিত্যক্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, অর্থাৎ যে বায়ু আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, ঐ বায়ু শ্বাসপথে ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হইলে পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উহার জলীয় ভাগ অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা লিখাইয়া আসিতেছেন যে, আমাদিগের শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুর এই অতিরিক্ত জলীয় ভাগ কেবলমাত্র ফুস্‌ফুস্ হইতেই গৃহীত হয়। কিন্তু আসেন্‌ব্রাণ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই জলীয় ভাগের অধিকাংশই নাসিকা দ্বার হইতে গৃহীত হয়। যদি এই জলীয় বাষ্পের অধিকাংশ ফুস্‌ফুস্ হইতে গৃহীত হইত, তাহা হইলে ফুস্‌ফুসের বায়ু কোষের জলীয় ভাগ ফুস্‌ফুসের বায়ুতে মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তন হইবার সময় ফুস্‌ফুস্‌স্থিত রক্তকে অত্যন্ত অধিক শীতল করিয়া সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত করিত। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে

ভূমিস্থ জল বাষ্প হইবার সময় ভূমি হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে শীতল করে, এজন্য গ্রীষ্মকালে উঠানে জল ছিটাইলে ঐ জল বাষ্প হইবার সময় উঠান শীতল হয়। ফুষ্‌ফুষের বায়ু কোষের গাত্র দিয়া যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, ঐ জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তন হইবার সময় ফুষ্‌ফুষের রক্তকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে পারে। এই অনিষ্ট নিবারণার্থই শ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুর জলীয়ভাগের অধিকাংশই ফুষ্‌ফুষ হইতে গৃহীত না হইয়া নাসিকা হইতে গৃহীত হইবারই সম্ভাবনা। জল বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত না হইলে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

আসেন্‌ব্রাণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি সূক্ষ্মতম রাসয়ানিক পরমাণু সকল নাসিকা পথে অবরুদ্ধ হয় না, কিন্তু ধূলি পরমাণু সকল সম্পূর্ণরূপে নাসিকাদ্বারে অবরুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য ফুষ্‌ফুষে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ুর সহিত উত্তমরূপে রাসয়ানিক ভাবে বিমিশ্রিত পদার্থ বায়ুসহকারে নাসিকা দ্বার দিয়া ফুষ্‌ফুষে গমন করিতে পারে, কিন্তু বায়ুতে যে সকল ধুলিকণা ও রোগ বীজ (জীবানু প্রভৃতি) থাকে, তাহা ফুষ্‌ফুষে নীত না হইয়া নাসিকা দ্বারেই অবরুদ্ধ থাকে। টিন্‌ডাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ফুষ্‌ফুষে অভ্যন্তরস্থ বায়ুতে ধুলিকণা থাকে না। অতএব দেখা যায়, যে আমরা যদি নাসিকা বন্ধ করিয়া মুখ শ্বাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে বায়ুর সহিত রোগের বীজ সকল ফুষ্‌ফুষে গমন করিয়া আমাদিগের নানা অনিষ্ট উৎপন্ন করিতে পারে।

এখনকার অনেক নিদানজ্ঞ চিকিৎসগণের মত এই যে, হাম, আন্ত্রিকজ্বর, কলেরা প্রভৃতি অনেক ব্যাধি বিশেষ বিশেষ জীবানু দ্বারা সংঘটিত হয়। ঐসকল জীবানু কোন সুযোগে দেহের রক্তের সহিত বিমিশ্রিত হইলেই ঐ সকল পীড়া সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু কখন কখন পীড়াবীজ শরীরে নীত হইলেও পীড়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে নিদানজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, আমাদিগের রক্তে যে শ্বেতকণিকা সকল আছে *

* দৈহিক রক্তে দুই প্রকার গোলাকার আনুবীক্ষণিক পদার্থ আছে। কতকগুলি লাল এবং কতকগুলি সাদা। শ্বেতবর্ণ গোলাকার পদার্থ গুলিকে white corpuscle কহে। এবং লালবর্ণ গোলাকার পদার্থ গুলিকে red corpuscle বা লোহিত কণিকা কহে।

ঐ সকল শ্বেতকণিকা ভাল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে রোগবীজ সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি কোন কারণবশতঃ আমাদিগের রক্তের শ্বেতকণিকা সকল দুর্ব্বল বা রুগ্ন অবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে রোগবীজ সকলই ঐ সকল দুর্ব্বল শ্বেতকণিকা সকলকে ধ্বংশ করে এবং পারশেষে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। নাসিকা বন্ধ করিয়া মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে রোগবীজ সকল অনায়াসেই ফুষ্‌ফুষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। অধিকন্তু রক্তের শ্বেতকণিকা সকলকে বিনাশ করিয়া উহারা সংখ্যাতেও বৃদ্ধি হইতে পারে। নাসিকা বন্ধ করিয়া মুখ দিয়া শ্বাস লইলে কিপ্রকারে রোগবীজ সকল রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়; তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। কারণ নাসিকা দ্বারের রোগবীজ অবরোধ করিবার যেমন ক্ষমতা আছে, মুখের তাহা নাই। কিন্তু ঐ সকল রোগের বীজ কিপ্রকারে রক্তের শ্বেতকণিকা সকল নষ্ট করে, তাহা বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু নাসিকা দ্বার দিয়া গমনকালে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কেবল মুখ দিয়া গমন করিলে উহা প্রায় বাহিরের বায়ুর ন্যায় শীতল অবস্থাতেই ফুষ্‌ফুষে গমন করে। কিন্তু শীতল বায়ু সংযোগে রক্তের শ্বেতকণিকা সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল বা বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই অবস্থায় রোগবীজ ফুষ্‌ফুষের রক্তে প্রবিষ্ট হইলে রক্তস্থ শ্বেতকণিকা সকল আর ঐ রোগবীজ সকলকে গ্রাস বা বিনাশ করিতে না পারিয়া উহারাই রোগবীজ দ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করা সমূহ অনিষ্টকর।

আধুনিক নিদানজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মাকাসেও রোগ জীবানু দ্বারা উৎপন্ন হয়। অতএব মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে ঐ দুই রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। পাঠকগণ এইস্থলে মনে রাখিবেন যে, প্রায় যাবতীয় রোগের বীজ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধুলিকণার ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায় এবং শ্বাস গ্রহণকালে ফুষ্‌ফুষে প্রবেশ করে।

এতদ্ভিন্ন আমরা অবগত আছি যে, মোটা মোটা ধুলিকণা, কয়লার গুঁড়া, পাথরের গুঁড়া, ইটের গুঁড়া প্রভৃতি শ্বাসসহকারে ফুষ্‌ফুষে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষ্মাকাশ ও হাঁপের ব্যাম সৃষ্ট করে। নাসিকাদ্বার বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে

প্রায়ই সকল আবর্জ্জনা ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। রাজমিস্ত্রী, পাথর খোদাইকারী, যে সকল লোক পাথুরে কয়লার খনিতে কাজ করে, তাহারা এবং স্যাক্‌রা, কাসার প্রভৃতিরা কেবল এক নাসিকার গুণেই যক্ষ্মারোগের হাত হইতে মুক্তি পায়। যে সকল মজুরলোক সুরকিরকলে কাজ করে, যাহারা ধুলামিশ্রিত চাল, ডাল, শস্য প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বদা কায করে, তাহারাও নাসিফার গুণেই বাঁচিয়া যায়। ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্তন রোগ।

স্নেহের অল্পতাবশতঃ অথবা জাতাপত্যা রমণীর কোন প্রকার পীড়াবশতঃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইতে পারে না, তজ্জন্য নবপ্রসূত বালক দিন দিন ক্ষীণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় নিম্ন লিখিত যোগগুলি প্রয়োগ করা বিধেয়; যথা—

১। কাঞ্জিকের সহিত বনকার্পাসমূল চূর্ণ ২ তোলা প্রসূতিকে সেবন করাইলে উপকার হইয়া থাকে।

২। ৮ তোলা ইক্ষুমূল চূর্ণও ঐ রূপে সেবন করিতে দেওয়া যায়।

৩। এক ছটাক মদ্যাম্লের সহিত ২ তোলা ভূমিকুষ্মাণ্ড মূল সেবন করিলে অচিরাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

৪। প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলা শালী তণ্ডুল চূর্ণ এক ছটাক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে এবং দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থা দিবে।

৫। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, অথবা বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। যথা নিয়মে ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অচিরে স্তন্য দুগ্ধের বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু আমাশয়ের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলেও এতদ্দ্বারা সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে দূষিত স্তন্যের বিষয় কথিত হইতেছে। বাতপিত্তাদি ধাতুদ্বারা কখনো কখনো রমণীদিগের স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়া থাকে। সেই অবিশুদ্ধ স্তন্য পান করিলে বালকদিগের নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধজীবী শিশুদিগের পীড়া হইলেই প্রথমে তাহার জননীর অথবা স্তন্যদায়িনীর দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে দোষে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবে, তদনুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নতুবা হাজার ঔষধ প্রয়োগ করিলেও পীড়িত বালকের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুগ্ধ

পীতবর্ণ, মধুর এবং জলের উপর নিঃক্ষেপ করিলে সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। উহা পান করিলে বালকদিগের কোন প্রকার পীড়াই হইতে পারে না। যে দুগ্ধ কষায় এবং লঘু অর্থাৎ জলের উপর পতিত হইলে ভাসিয়া উঠে, তাহাকে বাতদূষিত; যাহা তিক্ত, অম্ল ও লবণাস্বাদযুক্ত এবং পিত্তরেখাবিশিষ্ট, তাহাকে পিত্তদূষিত, আর যাহা ঘন, পিচ্ছিল ও জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে কফদূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই প্রকার দূষিতস্তন্যই বালকদিগের নানাপ্রকার রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ।

এতদ্ভিন্ন আরও এক প্রকার স্তনরোগ আছে, তাহাকে স্তনবিদ্রধি কহা যায়। এই রোগ স্তনদেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে উভয় স্থলেই প্রকাশ পাইতে পারে। পণ্ডিতগণ ইহাকে ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নিপাতজ, আগন্তুজ এবং অবরোধজ। প্রকুপিত বাতপিত্তাদি দ্বারা স্তনস্থ রক্তমাংস দূষিত হইলে প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। অভিঘাত দ্বারা আগন্তুজ বিদ্রধি এবং কোন কারণবশতঃ দুগ্ধনিঃসরণের রন্ধ্র অবরুদ্ধ হইলে অবরোধজ বিদ্রধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। মেয়েলোকেরা সাধারণ ভাষায় ইহাকে ঠুন্‌কা রোগ কহিয়া থাকে। অনেক স্থলে ইহার জন্য কোনও প্রকার চিকিৎসার আশ্রয় লইতে হয় না। আপনা হইতেই আরাম হইয়া থাকে। হিন্দুমহিলাদিগের প্রায় সর্ব্বদাই এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু একটু গুরুতর আকার ধারণ না করিলে আর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। আবার অসময়ে বা অনুপযুক্ত লোক দ্বারা অস্ত্র প্রয়োগ করাইলে কাহারো কাহারো সমগ্র স্তন পর্য্যন্তও পচিয়া যায়। তাদৃশ অবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে জীবনাশায় নিরাশ হওয়াই সিদ্ধ। এইক্ষণ এই রোগের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় স্তনাভ্যন্তরে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগিণীকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। পরে উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। এই সময় কাহারো কাহারো প্রবল জ্বরও হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে দূষিত স্তন্যের যে প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক্ সেই অনুসারে এবং নাড়ী স্পন্দনের তারতম্যানুসারে দোষাদি বিবেচনা করিয়া ইহার চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

প্রথমে শোথ বসাইয়া দিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্তন মধ্যে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চিত না থাকে, এজন্য নিঃশেষরূপে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

বাতজ বিদ্রধিতে সজিনামূলের ছাল দ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। যব, গোধূম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি শীঘ্র উপশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূলের ক্বাথে গুগ্‌গুল বা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পৈত্তিক শোথে অনন্তমূল, খই ও যষ্টিমধু চিনির সহিত; ক্ষীর কাকোলী, বেনারমূল ও রক্ত চন্দন দুগ্ধের সহিত; বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, বেত, ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্লৈষ্মিক স্তনশোথে ইষ্টক চূর্ণ, বালি, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষচূর্ণ একত্রে গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া শোথের উপর প্রলেপ দিবে।

রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অন্তর্বিদ্রধিতে দুগ্ধবাহী পথ অবরুদ্ধ হইলে স্তন অতিশয় কঠিন ও বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও জ্বর প্রকাশ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে শ্বেত পুনর্নবামূল ও বরুণ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিতে দিবে। আকনাদি মূল, মধুও আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি প্রশমিত হয়। জলধৌত সজিনামূলের রস মধুর সহিত পান করিলে শীঘ্র যন্ত্রণা লাঘব হয়। ইহাতেও দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ধুতূরা মূল ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার স্তনশোথ শীঘ্র উপশমিত হয়। রাখালসসার মূলের দ্বারা প্রলেপ দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। অগ্নিতপ্ত সির্কাতে কোন বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া তাহা স্ফীত স্থানের উপর বসাইয়া দিবে এবং বস্ত্র খণ্ড শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে পুনর্ব্বার তাহা উক্ত সির্কা দ্বারা সিক্ত করিবে। ইহা স্তনরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি শোথস্থান ক্রমে ক্রমে পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে উহা বসাইয়া দিবার চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে। তদ্রূপাবস্থায় কোন কৃতকর্ম্মা বিজ্ঞ শস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার অর্পণ করাই একান্ত যুক্তিসিদ্ধ। শস্ত্রপাতের কথা শুনিয়া যে সকল রমণী একান্ত ভীতা ও চমকিতা হইয়া উঠেন, তাহাদিগের স্তনশোথে প্রথমতঃ নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলিই প্রয়োগ করিবে।

গরুর দাঁত জলে ঘসিয়া তাহার কিছুমাত্র স্তনশোথে লাগাইয়া দিলে উহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সাপের খোসা ভস্ম করিয়া তাহার সহিত সার্ষপ তৈল মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে শোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হয়। তদ্রূপ পায়রা, শকুনী ও কঙ্কপক্ষীর বিষ্ঠা দ্বারাও শোথ বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ি মূল, যষ্টিমধু, নিমপত্র এই সমুদায় সমভাগে বাঁটিয়া সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে পূয় প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়।

নিমপত্র, তিল, দন্তীমূল, তেউড়ি, এই সমুদায় সমভাগে বাঁটিয়া সৈন্ধব লবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ উপশমিত হয়। ইহা অতিশয় শোধক ও পূয়াদি নিঃসারক। কেবল অনন্তমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও ব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া যায়।

মানুষের কপালাস্থি গোমূত্রে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারণ হয়।

উচ্ছেপত্র, শালিঞ্চা শাক, কানছিড়া ও তুলসীপত্র ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দ্বারা ব্রণ নষ্ট হয়।

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রসের সহিত শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত নিবারণ হয়।

শ্বেতকরবী মূলের রস ।০ এক পোয়া ও গব্যদুগ্ধ ১ সের একত্রে মিশ্রিত করিবে, ইহাতে যে দধি উৎপন্ন হইবে তাহা মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধৃত করিয়া লইবে, এই নবনীত দ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত নিবারণ হয়। হাপর মালীর আটাদ্বারাও ক্ষত উপশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকীও বহেড়া মিলিত ২ তোলা, ॥০ অর্দ্ধ সের জলে পাক করিয়া

৵০ অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত গুগ্‌গুল ৪ মাষা উত্তম রূপে গুলিয়া পান করিবে। ইহাতে ক্লেদ, পাক, পূযাদিস্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথ বিশিষ্ট প্রবল ব্রণ উপশম প্রাপ্ত হয়। জাতাদ্য ঘৃত এবং ব্রণ রাক্ষস তৈল সকল প্রকার ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইক্ষণ আরও কয়েকটী সাধারণ ঔষধের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রসবান্তে কোন কোন রমণীর স্তন নিতান্ত শিথিল হইয়া লম্বিতভাবে ঝুলিয়া পড়ে। সেইরূপ অবস্থায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

মাহিষ নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষ চাকুলে এই সমুদায় পেষণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তন স্থূল ও কঠিন হয়।

গাম্ভারীর মূলের ক্বাথ ও কল্কের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপরি স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয়।

আবার কটিদেশ স্বাভাবিক অপেক্ষা স্থূল হইলে যদি পিপুলমূল বাঁটিয়া নির্জ্জল তক্রের সহিত পান করা যায়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্ববৎ ক্ষীণতর হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

অষ্টম অধ্যায়।

একদা সর্ব্বসন্তাপহারী জরামৃত্যুরহিত অনাদি পুরুষ, ত্রিলোক-তৃপ্তিকর উত্তুঙ্গ কৈলাসোপরি উপবিষ্ট হইয়া রজতপ্রভায় দিক্ সমূহ আলোকিত করিতেছিলেন। সহসা সত্ব রজঃ ও তমগুণান্বিতা প্রকৃতি রূপিণী পার্ব্বতী সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুবিশাল নভোমণ্ডল স্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি তাঁহারই সহিত যুক্ত হইবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেই বিশাল দেহসমুদ্ভব অপূর্ব্ব রুদ্রতেজকে পরাভব

করিয়া কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেবল উভয় শক্তিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শূন্য-পথে ক্রমাগত ঘুরিয়াবেড়াইতেছে। তদ্দর্শনে মহাদেবী ভক্তিভাবে বিগলিতা হইয়া সেই মহাপুরুষকে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কুন্দোবিনিন্দিতশুভ্রকান্তি মহাদেব ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমাকে আর অধিক পতিভক্তি দেখাইতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে এক দিন শিশুদিগের রোগের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, এইক্ষণ তাহাই কহিতেছি। যে সকল পীড়া দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, যুবতী সকলেই আক্রান্ত হইয়া থাকে, সেই সকল পীড়া ভিন্ন শিশুদিগের আরও কতকগুলি বিশেষ পীড়া আছে। কেবলমাত্র প্রসূতি বা ধাত্রীর কদাচার হইতেই তৎসমস্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শিশুদিগের পীড়া হইলে তাহারা বাক্য দ্বারা শরীরের অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না, সুতরাং নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা বড়ই কঠিন এবং বিবেচনা সাপেক্ষ; তবে ক্রন্দনের তারতম্যানুসারে বেদনার আধিক্য ও অল্পতা অনুমান করিয়া লইতে হয়। দুগ্ধজীবী শিশু পীড়িত হইলে অনেক স্থানে প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে লঙ্ঘনাদি নিয়মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। আবার সময় সময় স্তন্য শোধক ঔষধও সেবন করা কর্ত্তব্য। কেননা অশুদ্ধ স্তন্যই শিশুদিগের রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। প্রথমতঃ নাড়ীকাটা সম্বন্ধীয় পীড়ার কথা কহিতেছি।

নাড়ীকাটা সম্বন্ধীয় পীড়া।

নাভি একটী সদ্য প্রাণনাশক শিরা-মর্ম্ম। ইহা হইতে চতুর্ব্বিংশতিটী ধমনী সমুত্থিত হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সকল ধমনীর সহিত আপাদমস্তক স্থিত স্নায়ুমণ্ডলী ও প্রত্যেক লোমকূপের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। তদ্দ্বারা জীবদিগের বাক্যকথন, অঙ্গসঞ্চালন ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়। যদি এই মর্ম্ম কোন রূপে আহত হয়, তবে জীবের জীবনাশা কোথায়? তাদৃশ দেহ বিনষ্ট হওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত। কিন্তু আহত হইবার তারতম্যানুসারে অবস্থা ভেদে দুই একজন অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে। ইহারই বহির্ভাগকে সদ্যপ্রসূত সন্তানের

নাভিরজ্জু কহে। যদি সেই রজ্জু গোড়া ঘেঁসিয়া, ঘষিয়া ঘষিয়া, অসমান করিয়া অথবা যাহাতে মর্ম্মস্থানে বিশেষরূপে আঘাত লাগে, এরূপ করিয়া ছেদন করা যায়, তবে সেই সন্তানের মঙ্গল কামনা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নাড়ীকাটাদোষেই প্রসূত বালকের নাভিমর্ম্মে প্রথমতঃ ভয়ানক শোথ জন্মে। কাহারও বা বহির্ভাগে শোথের কোন স্পষ্টতর লক্ষণ দৃষ্টীভূত না হইলেও অভ্যন্তরস্থ মর্ম্মস্থান সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া থাকে। পরে তাহা আরও স্ফীত হইয়া উল্লিখিত ধমনী ও স্নায়ুসমূহকে আক্রমণ করে, তাহাতে পাচক ও রঞ্জক পিত্তের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে এবং ব্যান বায়ুর গতিরোধ হওয়ায় রস রক্তাদি সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতে পারে না। ইহাতেই বালকের বর্ণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন নিতান্ত বিকটাকার হইয়া পড়ে। মুহুর্মুহু বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। আক্ষেপাদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া সময় সময় বালককে ধনুকাকারে নমিত করে। বায়ুর ভাবান্তর বশতঃ অথবা তীব্র যন্ত্রণায় অবিরত কণ্ঠ হইতে শ্রুতিকটু শব্দ সমূহ নির্গত হইতে থাকে। মাড়িদ্বয় দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হয়, সুতরাং বালক স্তন্যপান করিতে পারে না। আবার নাভি মর্ম্মের অব্যবহিত নিম্নে বস্তিমর্ম্ম নামে আরও একটী মর্ম্ম আছে, উহাও আক্রান্ত হইলে বালকের মলমূত্রাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা ভূত, প্রেত প্রভৃতির দৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, সেই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীব-তরিকে আরও ক্ষণ-ভঙ্গুর করিয়া, কাণ্ডারী-বিহীন কাষ্ঠ-তরির ন্যায় দুস্তর সংসার-সমুদ্রে অকালে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে তাদৃশ অবস্থাপন্ন সকল বালকেরই যে জীবন রক্ষা হইবে, এমন কোন কথা নাই। মর্ম্মস্থান গুরুতর রূপে পীড়িত হইলে কেহই তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না। আবার মর্ম্মস্থানের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল থাকিলে বিচক্ষণ লোকের চিকিৎসা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। তবে কে বাঁচিবে কে মরিবে, কে কি পরিমাণে আহত হইয়াছে, কিরূপেই বা কার নাড়ীকাটা হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় চিকিৎসক ভিন্ন সাধারণ লোক দিগের পক্ষে বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব। সুতরাং পীড়া যে প্রকারই হউক না কেন, চিকিৎসকের দ্বারা তাহার চিকিৎসা করাই যুক্তি সঙ্গত।

দানবারি ওঝাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে। এই পীড়া সচরাচর নাভিকাটার পর হইতে ছয় দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পরিণাম ফল বিলম্বেও হইতে পারে। কেহ কেহ আবার এই পীড়াকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উত্তণ্ডিতা, পিণ্ডালিকা, বিনামিকা ও বিজৃম্ভিকা এই চারিটী নাম প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইহাকে যিনি যত ভাগেই কেন বিভাগ না করুন, সমস্তেরই নিদান এবং চিকিৎসা একইরূপ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা।—নাভিতে শোথ হইলে কোন মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া প্রথমে দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে কিঞ্চিৎ উষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা নাভিতে স্বেদ প্রদান করিবে। ইহাতে নাভির শোথ এবং বেদনাদি নিবারিত হয়। নাভি পাকে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাখাইবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিবে। ইহা বিশেষ উপকারক। পীড়া কঠিন হইলে যে যে উপদ্রব উপস্থিত হয়, তত্তৎরোগাধিকারোক্ত মৃদুবীর্য্য ঔষধ সমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। সেই সকল ঔষধ এবং যে যে অবস্থায় তাহা নিতান্ত উপযোগী, তৎসমুদায় এই প্রবন্ধের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে প্রকাশিত হইবে। মূলব্যাধি এবং তাহার উপদ্রবাদি এক সঙ্গেই শীঘ্র শীঘ্র নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা সেই কোমল মাংসপিণ্ডের জীবনী-শক্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন।

ক্রমশঃ

উমারপুর পোঃ নাকালীয়া
পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধতত্ত্ব।

এলিউমিনা।

ক্ষণিজ। বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

সমগুণ।

বিষমগুণ।

মাত্রা। ১২। ৩০। ২০০। ১৫০০। ২০০০।

মস্তিষ্ক ও মজ্জার স্নায়ু দ্বারা ইহার দুইটী বিশেষ কার্য্য লক্ষিতহয়।

(১) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় শুষ্কতা।

(২) মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার স্নায়ুর ঘোরতর দুর্ব্বলতা। ইহা বৃহৎ অন্ত্রের কোলন ও রেকটম এই দুই অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা প্রতিপন্ন করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ উৎপন্ন করে। ঐ প্রকার জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের প্রণালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা জন্মিয়া শ্বেত প্রদর উৎপন্ন হয়।

রোগের প্রধান প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

(১) পাকাশয় ও অন্ত্রের সামান্য প্রদাহ—ইহার সহিত বমন, জলবৎ কখন বা রক্তমিশ্রিত উদরাময়, অন্ত্রে উত্তাপ ও বেদনা অনুভব।

(২) পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি—উহার সহিত মুখে জল উঠা পাকাশয়ে কষ্ট ও পূর্ণতা অনুভব, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অজীর্ণ লক্ষণ।

ডিপথিরিয়া—(কৃত্রিম ঝিল্লি বিশিষ্ট কণ্ঠ প্রদাহ) স্বরভঙ্গ, শুষ্ক খক্ খক্ কাসী ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কাসীতে কাসীতে অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ।

কোষ্ঠবদ্ধ—সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা ও অন্ত্রপেশীর পেরিষ্টল্‌টিক গতির অভাব হেতু মল কঠিন, এবং কঠিন না হইলেও অতিকষ্টে ত্যাগ হয়, মল অল্প, গুটুলে ও শুষ্ক, সাদা ধূষরবর্ণ ও খড়ির ন্যায় শুষ্ক। নিঃসরণকালে শিশু ক্রন্দন করে ও অতি কষ্টে মলত্যাগ হয়।

শ্বাসকাস—প্রত্যহ প্রাতে অধিকক্ষণ স্থায়ী শুষ্ক কাসী। অনেক কষ্টে সামান্য সাদা শ্লেষ্মা উদ্গম। ২০০ শত ক্রমের ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। বক্তাদিগের গলাবেদনায়, কণ্ঠ আরক্ত, শিথিল, উহাতে কোন পদার্থ

রহিয়াছে অনুভব, স্বর কর্কশ, কণ্ঠেখিল ধরা, শুষ্কতা ও চুলকনা অনুভব, রাত্রে ও সন্ধ্যায় উপসর্গের বৃদ্ধি। উষ্ণ জল পানে উপশম।

মূত্রযন্ত্র—রক্তবর্ণ প্রস্রাব, ত্যাগকালিন অতিশয় বেগ।

জননেন্দ্রিয় পুরুষ—প্রমেহ, অণ্ড কোষের কঠিনতা, অতিশয় সঙ্গম ইচ্ছা অথবা ইচ্ছার একেবারে অভাবের সহিত রেতঃপাত, মূত্রাশয়ের ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা।

জননেন্দ্রিয় স্ত্রী—প্রচুর উগ্র শ্বেত প্রদর, চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি; অতিশয় দুর্ব্বলতা,জলের ন্যায়ও স্বচ্ছশ্বেতপ্রদর এত অধিক যে বাহিয়া পতিত হয়, কখন কেবল দিবাভাগে দৃষ্ট হয়; ঋতুর অগ্রে প্রচুর স্রাব ও ঋতু বিলম্বে প্রকাশ হয় এবং অল্প পরিমাণে ও ঈষৎ রক্তবর্ণের দৃষ্ট হয়, ঋতুর পরে শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সামান্য কারণে মন ও দেহ নিস্তেজ ও ক্লান্তি বোধ হয়। ঋতুর পরে দুর্ব্বলতা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। ঋতুকালীন উগ্র স্রাব দিবা রাত্র হইতে থাকে এবং নিম্ন উদরে প্রসবের ন্যায় যে বেগ অনুভব হয়, তাহাতে বোধ হয় জননেন্দ্রিয়ের সমস্ত যন্ত্রাদি বহির্গত হইবে।

ভগের বামপার্শ্বে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বক্ষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং ভগ মধ্যে দপদপানি বোধ হয় (গা)। জননেন্দ্রিয়ে ও সরলান্ত্রে জ্বালা ইহার আর ও একটী প্রয়োগ লক্ষণ। গর্ভাবস্থায় অজীর্ণতার সহিত অতিরিক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ।

কর্ণ—বাহ্যকর্ণের প্রদাহ, কর্ণ হইতে পূঁজ স্রাব।

চক্ষু—চক্ষু প্রদাহ, চুলকনা; রাত্রে পাতাদ্বয় সংযুক্ত থাকা, দিবসে জলস্রাব, চক্ষে জ্বালা, শুষ্কতা এবং বাতির আলোকের চতুস্পার্শ্বে পীতবর্ণের চক্র দৃষ্ট হওয়া (হে)

দৃষ্টির ব্যাঘাত, দৃষ্টিপথে কুয়াসা বা পাখনা দর্শন অথবা উজ্জ্বল চিহ্ন দৃষ্ট হয় (হে)। পাতাদ্বয়ের অতিশয় শুষ্কতা ও জ্বালা, দানাময় পাতা, পাতার অস্ম-পূর্ণ পক্ষাঘাত।

নাকিসা—নাসিকা হইতে উগ্রস্রাব, পুরাতন শর্দ্দি; বিশেষ বৃদ্ধ-দিগের, নাসারন্ধ্রে ক্ষত: গাঢ়, পীতবর্ণের শ্লেষ্মাস্রাব; শুষ্ক, কঠিন, পীত বা সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গম; নাসিকা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত (হে)

নাসারন্ধ্র মধ্যস্থিত পর্দার প্রদাহ ও ক্ষত; মুখের ত্বকে বোধ হয় যেন ডিমের সাদা অংশ কেহ মাখাইয়া দিয়াছে (হেনিমান)

সান্নিপাতিক জ্বর—ডাক্তার লিপি বলেন যে, এই জ্বরে রক্তস্রাব হইলে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার প্রয়োগ লক্ষণ দাস্তের সহিত জমা খণ্ড খণ্ড রক্ত প্রচুর পরিমাণে নিস্রাব, বেদনা রহিত, কিন্তু রোগী অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

পৃষ্ঠদেশ—পৃষ্ঠে বেদনা, বোধ হয় যেন উত্তপ্ত লৌহ নিম্নপৃষ্ঠ—বংশে প্রবেশ হইতেছে। (লিপি) পৃষ্ঠের মধ্য স্থানে প্রচণ্ড খিল ধরা (হে)

হস্তপদ—উর্দ্ধ ও অধঃশাখায় ভার বোধ, হাত পায়ে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা, বোধ হয় যেন মধ্যস্থিত অস্থি টেনে কেহ সরু করিতেছে (হে)

অধঃশাখায় অতিশয় ভার বোধ, চলিয়া বেড়ান অতিশয় দুষ্কর, পা টানিয়া হাটা ও বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া। (হেনিমান)

পদদ্বয়ের বাত ও আভিঘাতিক পক্ষাঘাত (লোবেথাল)

জানুতে পুনঃ পুনঃ খিল ধরা, জানু সন্ধির কম্পন, পায়ের গোড় মুড়ায় অষাঢ়তা ও বেদনা, পায়ের পাতা স্ফীত হওয়া অনুভব (হে)

কৃশ শুষ্ক ব্যক্তিদিগের পুরাতন পীড়া।

ত্বক—সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য চুলকনা, বিশেষ শয্যায়-শয়নকালীন অর্থাৎ শয্যার উত্তাপে; চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত ক্ষরণ।

বৃদ্ধি—উষ্ণগৃহে, সন্ধ্যায়, এক দিবস অন্তর, স্থিরভাবে থাকিলে; অমা-বস্যায় ও পূর্ণিমা তিথিতে।

শান্তি—বহির্বাতাসে; শীতল জলে ধৌত করিলে, রাত্রে, ও চলিয়া বেড়াইলে।

এমব্রো গ্রিসিয়া ধূষর এমবার।

সমুদ্রে ভাষে, জল কীট, উহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

বিষম গুণ—কর্পূর নাক্স, ও পালস্।

সমগুণ—

মাত্রা—

মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জাস্নায়ুর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া হেতু সমস্ত স্নায়ু মণ্ডলির উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ হয়। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকদিগের মুর্চ্ছার ন্যায় একপ্রকার স্নায়ু রোগ উৎপন্ন হয়। এলোপ্যাথিক মতে এই ঔষধ স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি হেতু প্রয়োগ হয়।

ব্যবহার লক্ষণ।

কোমল, কৃষ ও দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছা রোগে, বিশেষ যাহাদের পুনঃ পুনঃ মোহ প্রকাশ হয়, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

স্মরণশক্তির হ্রাস, বিভিষিকা মূর্ত্তি দর্শন, বিষাদ বায়ু, অনবরত কিছু-কাল পর্য্যন্ত ক্রন্দন, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কোষ্ঠবদ্ধ (হে)

প্রাতে নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব (হে) স্নায়ু বিকৃতি হেতু বধিরতার সহিত উদরে শীতলতা অনুভব; মস্তকের ত্বক উষ্ণ, শুষ্ক ও কেশ স্খলন; মস্তকে দুর্ব্বলতা অনুভব, শির ঘুর্ণন, অনিদ্রা; (হে)

পরিপাক যন্ত্র—গলা আবদ্ধ হেতু আক্ষেপিক শ্বাসরোধ; কাসিয়া গলা হইতে শ্লেষ্মা উদ্গমকালীন শ্বাসবন্ধ ও বমন নিবারণ করা দুঃসাধ্য (র) শূন্য বা অম্ল উদ্গার, প্রচণ্ড আক্ষেপিক হিক্কা; মূর্চ্ছাবায়ু গ্রস্থ স্ত্রীলোক-দিগের উষ্ণ জলপানে বৃদ্ধি; যকৃত স্থানে বেদনা ও উদরে অতিশয় শীত-লতা অনুভব (হে) কোষ্ঠবদ্ধের সহিত মানসিক নিরুৎসাহ।

মূত্রযন্ত্র—প্রচুর জলবৎ প্রস্রাব, মূর্চ্ছাবায়ু ও স্নায়বীয় ব্যক্তিদিগের অতিশয় প্রস্রাব; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট মূত্র (হে)

জননেন্দ্রিয় (পুরুষ)—সঙ্গমান্তে শ্বাসকাস।

জননেন্দ্রিয় (স্ত্রী)—দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে সামান্য কারণে যথা; কঠিন মল ত্যাগ বা অধিক ক্ষণ চলিয়া বেড়াইলে রক্তস্রাব, (গা)। নিয়মিত সময়ের অগ্রেও বহুকাল স্থায়ী ঋতুস্রাব, স্নায়বীয় ও মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগের ঈষৎ নীলবর্ণের সাদা শ্বেতপ্রদর, রাত্রে স্রাব হওয়া; ডিম্ব কোষে খিল ধরা, ঐ স্থান চাপিলে বৃদ্ধি (গা) জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ অতিশয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; চুলকনা; মূত্রত্যাগে জ্বালা এবং অনবরত চুলকাইতে ইচ্ছা।

শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র—স্নায়বীয় কাসী, শ্বাসকাস, প্রচুর মূত্রত্যাগ, বৃদ্ধ ও কৃশ ব্যক্তির আক্ষেপিক কাসী, কাসীর সহিত প্রচুর উদ্গার। রাত্রে অতিশয় শুষ্ক আক্ষেপিক কাসীর বৃদ্ধি; বৃদ্ধ ও বালকদিগের শ্বাসকাস (হে) বক্ষ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ, প্রচণ্ড হৃদ্‌ব্যাপন, ও শ্বাসকৃচ্ছ্র।

বৃদ্ধি—প্রাতে ও সন্ধ্যায়, উষ্ণগৃহে, উষ্ণপানে, গানবাদ্যে, কথা বলায় ও শয়নে।

শান্তি—শীতল বাতাসে, শীতল জলপানে ও শীতল দ্রব্য সেবনে, চলিয়া বেড়াইলে।

এমন-কার্ব—কার্বনেট অব এমনিয়া।

নিসেদল ও খটীকা হইতে প্রস্তুত। এই রাসায়ণিক পদার্থের বিচূর্ণ বা জলিয় অরিষ্ট ব্যবস্থা।

বিষম গুণ—কর্পূর, ল্যাকে, হিপার—সালফ, আর্নি; উদ্‌ভিজ্জ হইতে প্রস্তুতি এসিড।

সমগুণ—

মাত্রা—

কশেরুকা মজ্জার দ্বারা ইহা শরীরস্থ তিন প্রকার যন্ত্রে কার্য্য করে।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ—ইহাতে প্রদাহ ও শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ ক্ষরণ।

২। রক্ত সঞ্চালন—(সার-কিউলেসন) হৃদ্‌পিণ্ড ও কৈশিক ধমনীর উত্তেজনা।

৩। রক্ত—রক্ত পাতলা হওয়া, রক্তস্রাব।

পাকাশয় ও অন্ত্রের এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার বিশেষ কার্য্য লক্ষিত হয়। বিষাক্ত মাত্রায় বিবমিষা, বমন, পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ, আম ও রক্ত মিশ্রিত দাস্ত, কণ্ঠস্থ গ্লটিসের শোথ বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, আক্ষেপ ও মৃত্যু হয়। এমনিয়া সেবনে যে ধমনীর রক্ত সঞ্চার হয়, তাহা হৃদ্‌পিণ্ডের কিম্বা ধমনীস্থ স্নায়ু (ভাজো মোটর) অথবা ধমনীর পেশীসূত্রের উপর উহার কার্য্যবশতঃ উৎপন্ন হয়, সম্ভবতঃ শেষ উক্ত কারণই সত্য; (ডা উড) রক্তের আরক্ত গ্লোবিউল সকল এবম্‌বিধ প্রকারে

পরিবর্ত্তিত হয় যে, রক্ত জমিতে পারে না ও রক্তস্রাব প্রচুর পরিমাণে সহজে হইতে পারে।

প্রয়োগ লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন পীড়ায় বিশেষ শিথিল ও স্থূলাকায় ব্যক্তির।

আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা, মনের সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ (হে) ললাটে ভার ও পূর্ণতা, বোধ হয় যেন ফাটীয়া যাইবে। (হে) মস্তকে অতিশয় রক্ত সঞ্চার রাত্রে বৃদ্ধি, শির ঘূর্ণন, দৃষ্টি পথে উজ্জল চিহ্ন দর্শন।

নাসিকার রোগ—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব ও ললাটে অতিশয় বেদনা, শির নত করিলে নাসিকার অগ্রভাগে রক্ত আইসে (হে) নাসিকায় শুষ্ক শর্দ্দি, বিশেষ রাত্রে মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ, নাসিকা হইতে উষ্ণ জল স্রাব। (হে) মানসিক পরিশ্রমে মুখে উত্তাপ অনুভব।

মুখ গহ্বর ও কণ্ঠের পীড়া—মুখে ধাতব বা অম্ল আস্বাদ, দন্তে হুল বেধনবৎ বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহের সহিত প্রচুর লালাস্রাব, তালু পার্শ্বে গ্রন্থির (টন্‌সিলে) প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি "পচাগলা ক্ষত আরক্ত, জ্বরে ঐ স্থান পচার উপক্রম"(হে) "ডিপ্‌থেরিয়া রোগে নাসিকা আবদ্ধ হওয়া, শিশুর নিদ্রা হইতে শ্বাসাবরোধ,চম্‌কে উঠে ও কণ্ঠ ও অন্নবহানলীর জ্বালা; (হ)" "অতিরিক্ত ক্ষুধা, সামান্য কিছু সেবনে তৃপ্তি" (নেনিং) "আহারান্তে বা রাত্রে পাকাশয়ে অতিশয় চাপ অনুভব;" (হে) "অতিরিক্ত শূন্য উদ্গার" হেনিমান; "যকৃত স্থানে জ্বালাযুক্ত বেদনা ও প্লীহার পীড়া" (হে); শূলবেদনার সহিত পৃষ্ঠের উভয় স্কেফুলা অস্থির মধ্যস্থলে বেদনা" (গা)

দান্ত—"ঋতু প্রকাশের প্রারম্ভে বিসূচিকার লক্ষণ সকল প্রকাশ হওয়া" (হেলবিন) "তরল দান্তের অগ্রে ও পরে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দান্তের সময় ও পরে রক্তস্রাব" (হেনিমান); সান্নিপাতিক জ্বরে প্রচুর রক্তস্রাব; "কোষ্ঠবদ্ধের সহিত অর্শ" (হে)।

মূত্র যন্ত্র—"মূত্রাশয়ের প্রচণ্ড বেগ ও কুতনি, নিদ্রা কালীন অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ" (হা); বোর রক্তবর্ণের অথবা প্রচুর সাদা প্রস্রাব।

জননেন্দ্রিয়—(স্ত্রী) ঋতু অগ্রে প্রকাশ ও রক্তখণ্ডমিশ্রিত প্রচুর নিস্রাব; "ঋতুকালীন উদরাময় ও বমন" (লিপি।)

"উগ্ররজ, বাহ্যিক জননেন্দ্রিয় (ভালভা) স্ফীত, উহাতে জ্বালা ও চুলকনা; প্রচুর জলবৎ, উগ্র রক্তস্রাব; গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবের সহিত এলবিউমেন পতন, দৃষ্টি পথে পীত বর্ণের চিহ্ন দর্শন, দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিলে বেদনা" (হে) "ঋতুকালীন রক্ত মিশ্রিত দান্ত" (গা)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—গাত্রের কোন প্রকার স্ফোট বিলুপ্ত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র।

"অতিশয় কাসী, শেষ রাত্রে ৩।৪ টার সময় স্বরযন্ত্রে এক প্রকার অস্বাভাবিক অনুভব হেতু উৎপন্ন" (হিউজ)

"শ্বাসকাসের ন্যায় কাসীর সহিত বক্ষে আক্ষেপিক সঙ্কোচন ভাব; শ্লেষ্মা পাতলা ও ফেণাময়, গলার ঘড়ঘড়ানি শব্দ; বৃদ্ধদিগের বায়ুনলী ভুজ প্রদাহ" (হে)

"শুষ্ক কাসী রাত্রে বৃদ্ধি. কণ্ঠে ধূলার ন্যায় কোন পদার্থ অনুভব হেতু উৎপত্তি" (নেনিং)

"বক্ষে ভার বোধ ও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট" (হানি)

"ফুষ্‌ফুষ্‌ আবরক থলিয়া রূপ ঝিল্লী (প্লুরা) মধ্যে জল সঞ্চার, বক্ষে জ্বালা, প্রচণ্ড হৃদ্‌ ব্যাপন; হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে যন্ত্রণা, চলিয়া বেড়াইলে মোহ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র; হৃদ্‌শূল" (হে)

পৃষ্ঠ—দক্ষিণ পার্শ্ব বামপার্শ্ব অপেক্ষা যে কোন রোগে অধিক আক্রান্ত।

"ঋতু স্তম্ভের সহিত নিম্ন পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেদনা" (হে)

ঊর্দ্ধ ও অধঃশাখা—বাহুদ্বয়ে অতিশয় ভার বোধ, স্ফীত ও শোথযুক্ত।

"বাহুর আক্ষেপ হেতু পশ্চাৎ দিকে আকর্ষিত হওয়া" (হানি)

"আঙ্গুলহাড়া, আক্রান্ত ও অঙ্গুলি প্রদাহযুক্ত, উহার অস্থিতে বেদনা" (হে)

"কুচ্‌কিতে বেদনা হেতু সিধা হইয়া দাড়ান কষ্টকর" (হানি)
"রাত্রে সকল হাত পায়ে বেদনা; হাত ও পায়ের পাতায় জ্বালা" (হে)
"বৃদ্ধ অঙ্গুলি আরক্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত বিশেষ রাত্রে অধিক" (হে)
বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, রাত্রে, এবং শীতলবায়ুতে।
শান্তি—দুই প্রহরের অগ্রে, শুষ্ক বায়ুতে ও উত্তাপে।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। আষাঢ়। } শ্রীশিখরকুমার বসু এল, এম, এস।
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিসনর।

——০০——

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

(এলোপ্যাথিক মতে।)

এরমেটিক সল্‌ফিউরিক এসিড—গ্রেভ্‌স্ ডিজিজ্ অথবা এক্‌স্‌এপ্‌থ্যালমিক্ গয়টার নামক রোগে উপকার করে। সম্প্রতি ডাক্তার ম্যাগ্রুডার ফিলাডেল্‌ফিয়া মেডিকেল নিউস নামক পত্রিকায় উক্ত পীড়াক্রান্ত একটী ২২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, প্রায় দুই মাসাবধি ডিজিট্যালিস্, কুইনাইন, একনাইট্, আয়রণ, এবং ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রয়োগ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ের দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল বুঝিতে পারেন না; শেষে তিনি ডিজিট্যালিস্ এবং এরমেটিক সল্‌ফিউরিক এসিড্ এই দুই ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করান, তাহাতে তিনি দেখিলেন যে, স্বল্প কাল মধ্যেই স্ত্রীলোকটীর পীড়ার অনেক প্রতিকার হইল। তাহার পর রোগীর উক্ত মিশ্রণ অসহ্য হওয়ায় তিনি ডিজিট্যালিস্ বাদ দিয়া কেবল মাত্র এরমেটিক্ সল্‌ফিউরিক এসিড্ খাওয়াইতে লাগিলেন। এই ঔষধ ২০ ফোটা মাত্রায় চারি ঘণ্টান্তর প্রয়োগ

করিতে লাগিলেন। রোগও দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, রোগীর নাড়ী ধীরগতি অবলম্বন করিল, থাইরইড্ গ্ল্যাণ্ড প্রকৃতিস্থ হইল, চক্ষুদ্বয় স্বাভাবিক হইল। তাহার পর প্রায় বৎসরাধিক কাল উক্ত ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

সল্‌ফোনাল (Sulphonal) সল্‌ফোনাল একটী নূতন ঔষধ, গুণ নিদ্রাকারক। সম্প্রতি ডব্‌লিন্ নগরের রিচ্‌মণ্ড এসাইলমের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ডাক্তার কৌনলি নর্‌ম্যান কুড়িটী উন্মাদ রোগে সল্‌ফোনাল্ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সুফল বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি এই সকল রোগীতে সল্‌ফোনাল নিদ্রাকারক এবং মস্তিষ্ক অবসাদক রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই বিশ জন রোগীর মধ্যে কেবল ২ জনের সলফোনাল দ্বারা কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু এই দুই জন অত্যন্ত খারাপ রোগী ছিল, ইহাদের অন্য কোন ঔষধিতে উপকার বুঝিতে পারা যায় নাই। অন্য রোগীর মধ্যে অনেকের আহারে অরুচি ছিল। কিন্তু সলফোনাল প্রয়োগে সকলেরই ক্ষুধা ও আহারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। যাহারা হস্তমৈথুনে আশক্ত ছিল তাহারাও, সল্‌ফোনাল ব্যবহারে উক্ত অসৎ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিল। যাহারা মধ্যে মধ্যে ভাল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত হইত, তাহাদিগের আক্রমনের মধ্যবর্ত্তী ভাল কাল ক্রমে দীর্ঘ হইতে লাগিল এবং আক্রমণের তেজ কমিয়া আসিল। এই বিশটী রোগীর মধ্যে প্রায় অনেকেই বিমর্ষোন্মাদ পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত ছিল। কিন্তু ইহাতে এবং অন্য প্রকার উন্মাদ রোগেও সল্‌ফোনাল দ্বারা উপকার হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকটী রোগী বিবরণ দেওয়া যাইতেছেঃ—একটী ৩২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে মধ্যে বিমর্ষোন্মাদ (মেলানকোলিয়া) রোগ হইত এবং আক্রমণ সময়ে মোটেই নিদ্রা হইত না। ইহাকে প্রত্যহ রাত্রে ৮টার সময় বিশ গ্রেণ মাত্রায় সল্‌ফোনাল প্রয়োগ করা হইত। ইহাতে রাত্রি দশটা হইতে চার দিন প্রাতে সাতটা পর্য্যন্ত বেশ সুনিদ্রা হইত। এই ঔষধ প্রয়োগে কোনরূপ উদ্বেগ বা উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই। একটী ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবন বশতঃ বিমর্ষোন্মাদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার সর্ব্বদা আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত এবং মনে নানাবিধ ভ্রমও কল্পনা উপস্থিত হইত।

তাহার যেন বোধ হইত কে তাহাকে খুন করিতে আসিতেছে। মন সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিত। আদৌ নিদ্রা হইত না। স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল এবং শরীর নিরক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তিকে প্রত্যহ ৮ গ্রেণ মাত্রায় তিনবার করিয়া সল্‌ফোনাল দেওয়া হইত। ইহাতে ক্রমে রাত্রিতে সুনিদ্রা এবং পরে দিবসেও সুনিদ্রা হইতে লাগিল। রোগীর প্রকৃতি স্থির হইল এবং মন ভাল হইতে লাগিল। শরীরও ক্রমে ক্রমে ভাল এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল দেখা গেল। সল্‌ফোনালের গুণ এইযে, ইহার কোনদুর্গন্ধনাই, খাইতে বিশেষ কটু নহে, ইহাতে পেট খারাপ করে না, অথবা শিরঃপীড়া উপস্থিত করেনা। ইহাতে ক্ষুধা মান্দ্য করে না ইহাতে বেশ স্বাভাবিক সুনিদ্রা হয়। সল্‌ফোনালের দোষ এই যে, ইহা কিছুতে গলে না, সুতরাং আস্ত খাওয়াইতে হয়, তাহাতে খাইতে কিছু কষ্ট হয়। ইহার ক্রিয়া কিছু বিলম্বে প্রকাশ হয়। আর এক দোষ এই যে, ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে, সল্‌ফোনাল একটী উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক ঔষধ। ইহা প্রয়োগে আশু কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা প্রয়োগে বিশেষ কোন কুউপসর্গ উপস্থিত হয় না। (ডব্‌লিন্ জরনাল্ অব্ মেডিকেল সায়েনস, জানুয়ারি ১৮৮৯)

এণ্টি পাইরিণ—এণ্টিপাইরিণ জ্বরের উত্তাপের লাঘব করে। সম্প্রতি ইহার আর একটী গুণ প্রকাশ হইয়াছে। এণ্টিপাইরিণ প্রয়োগে স্তনদুগ্ধ কমাইয়া ফেলে। ৮গ্রেণ মাত্রায় তিন বার করিয়া এণ্টিপাইরিণ সেবনে একটী স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ দুই তিন দিনের মধ্য একবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। কোন স্ত্রীলোকের কোন কারণবশতঃ স্তনদ্বয়ে অত্যন্ত দুগ্ধ-সঞ্চার হইয়া কষ্ট ও যন্ত্রণা হইলে এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কোপেবা—কোপেবা খাইলে প্রমেহের পীড়ার উপকার করে। ডাক্তার মার্‌টিন্ রাইভেলি বলেন যে, মূত্র নালীতে কোপেবা লাগাইয়া দিলে অতি শীঘ্র প্রমেহের প্রতীকার হয়। ডাক্তার রাইভেলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী রোগীর বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। একটী যুবা পুরুষের প্রমেহ বা গণরিয়ার ব্যাম দেখাদিলে তিনি একটী ২৩নম্বরের বুজি বালসাম কোপেবাতে মাখাইয়া লইয়া মূত্রনলীতে মেম্‌ব্রেনস্ পোর্‌সেন পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দেন এবং

প্রায় ৬ কি ৮ মিনিট কাল রাখিয়া পরে তুলিয়া লন।, সেই তারিখেই রোগীর প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণ হইল এবং পরদিন প্রাতে হরিদ্রাবর্ণ মেহ স্রাব আর দেখা গেলনা। পরদিন পুনরায় ঐরূপ চিকিৎসা করা গেল, তার পর আরও দুই দিন করাগেল। কিন্তু প্রথম দিনের ঔষধ প্রয়োগেই রোগী ভাল হইয়া গিয়াছিল। তার পর চারি বা পাঁচ সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে, গণরিয়ার ব্যাম আর দেখা যায় নাই। ডাক্তার রায়ভেলি আরও ৮টী রোগীকে এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিয়া সাত জনকে আরাম করেন। কেবল এক জনের কোন উপকার হয় নাই। এইরূপ চিকিৎসা গণরিয়ার পীড়া দেখা দিবা মাত্রই করা কর্ত্তব্য। এই চিকিৎসায় বুজি প্রবিষ্ট করার পর সামান্য জ্বালা করে মাত্র কিন্তু তাহাতে শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। গ্লিট্ (Gleet) বা পুরাতন মেহেতে এই চিকিৎসা ফলদায়ক নহে। ডাক্তার সম্পাদক।

—০০—

বমনকারক ঔষধ

(এমেটিক্‌স্)

(এলোপ্যাথিমতে)

যে ঔষধে বমন উপস্থিত করে, তাহাকে বমনকারক ঔষধ বলা যায়। বমনকারক ঔষধের ক্রিয়া বুঝিতে হইলে কিরূপে বমন উপস্থিত হয়, সেইটী জানা আবশ্যক। বমন হইবার সময় ডায়েফ্রাম্ (diaphragm) নামক মাংসপেশী এবং উদরের অন্যান্য মাংপেসী সঙ্কোচিত হয় তাহাতে ষ্টমাক্ বা পাকস্থলীতে চাপ পড়ে, ওদিকে পাকস্থলীর মুখ খুলিয়া যায়, সুতরাং সজোরে পাকস্থলীর দ্রব্যজাত নির্গত হইয়া পড়ে। যদি এক যোগে পাকস্থলীতে চাপ পড়ে এবং উহার মুখ খুলিয়া যায় তবেই বমন হয়। যদি

কেবল মাত্র পাকস্থলীতে চাপ পড়ে অথচ উহার মুখ খুলিয়া যায় না তবে বমন না হইয়া বমনের উদ্যোগ বা রেচিং মাত্র হইতে থাকে এবং রোগী হক্ হক্ করিতে থাকে।

মস্তিষ্ক স্নায়ুর যে অংশ দ্বারা বমন কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সে অংশ মেডুলা অব্ লংগেটা নামক স্থানে স্থিত। বমন কার্য্য শ্বাস পরিত্যাগের রূপান্তর মাত্র। কারণ বমনের সময় সজোরে শ্বাস নির্গত হয়, অতএব অনুমান হয় যে, মেডুলার যে অংশ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কায্য নির্ব্বাহ হয়, সেই অংশের দ্বারাই বমনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়; অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে অনেক পরিমাণে বমন নিবৃত্তি হয়। নিউমোগ্যষ্ট্রিক্ নার্ভ বা অষ্টম স্নায়ু যুগল চ্ছেদন করিলে অনেক স্থলে ঔষধ প্রয়োগেও আর বমন উপস্থিত হয় না।

মস্তিষ্কের বমন কারক অংশ হইতে উত্তেজনা নীত হইয়া উদরের মাংস পেশী, ডায়েফ্রাম, পাকস্থলী এবং অন্ন নালীতে নীত হয় এবং তাহাতেই বমন উপস্থিত হয়। যে সকল স্নায়ুসূত্র দ্বারা মস্তিষ্কের বমনকারক কেন্দ্র উত্তেজিত হয়, সে গুলি নিম্নে লিখিত হইল।

(১) আমাদিগের জিহ্বার গোড়ায় এবং টাকরায় (প্যালেট) যে সকল স্নায়ু সূত্র আছে, তাহারা উত্তেজিত হইলে বমন উপস্থিত হয়। এ জন্য গলায় সুড়্সুড়ি দিলে বা গলায় আঙ্গুল দিলে বমন উপস্থিত হয়। বালকদিগের টন্সিল, টাকরা অথবা ক্যারিংক্স প্রদাহ যুক্ত হইলে বমন উপস্থিত হয়।

(২) পাকস্থলিতে যে স্নায়ু সূত্র আছে, তাহারাও উত্তেজিত হইলে বমন হয়। দুষ্পাচ্য দ্রব্য, বমনকারক ঔষধ খাইলে পাকস্থলীর স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া বমন উপস্থিত হয়।

(৩) হার্নিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ হইলে মেজেনটরিক্ স্নায়ুসূত্র দ্বারা বমন হয়।

৪। পিত্তকোষ এবং যকৃতের পীড়া হইলে ঐ ঐ স্থানের স্নায়ু সূত্র দ্বারা বমন উপস্থিত হয়।

(৫) বৃক্ক (মূত্র যন্ত্র) পীড়া হইলে মূত্র যন্ত্রের স্নায়ু দ্বারা বমন উপস্থিত

হয়। এই জন্য মূত্রযন্ত্রে পাথরি জন্মাইয়া পাথরি নামিয়া আসিবার সময় বমন হয়।

(৬) মূত্রাধার (ব্ল্যাডার) পীড়িত হইলে বমন হয়।

(৭) জরায়ুতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহারা উত্তেজিত হইলে বমন হয়, এজন্য স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তাহাদের বমন হয়, অথবা জরায়ু পীড়িত হইলে বমন হয়।

(৮) ফুস্ফুসে মিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুসূত্র আছে। এজন্য যক্ষ্মা কাস হইলে বমন হয়।

বমন কারক ঔষধ সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ডাইরেকট্ (২) ইন্ডাইরেকট্। অর্থাৎ মুখ্য এবং গৌণ বা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বমনকারক ঔষধ। যে সকল ঔষধ খাইবামাত্র পাকস্থলীর উপর সাক্ষাত ক্রিয়া দর্শাইয়া বমন উপস্থিত করে তাহাদিগকে "ডাইরেক্ট্" বমনকারক কহে। এবং যে সকল ঔষধ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া বমন উৎপন্ন করে উহাদিগকে "ইনডাইরেকট্" কহা যায়।

কিন্তু এই দুই প্রকার বমনকারক ঔষধের ক্রিয়া ঠিক উল্টা। যে সকল ঔষধ খাইবা মাত্র বমন উপস্থিত হয়, তাহারা পাকস্থলীতে নীত হইয়া তদপর মস্তিষ্ক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া বমন উপস্থিত করে। কিন্তু যে সকল ঔষধ রক্তে সংযুক্ত হইয়া বমন উপস্থিত করে, উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে নীত হইয়া বমন উপস্থিত করে। অতএব ডাইরেকট্ গুলি ইন্ডাইরেকট্ ভাবে কার্য্য করে এবং ইন্ডাইরেকট্ ঔষধ গুলি ডাইরেকট্ ভাবে কার্য্য করে।

এই দুই প্রকার বমনকারক ঔষধকে স্থানীয় এবং সাধারণবমন কারক ঔষধ নাম দেওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় বমনকারক ঔষধ পাকস্থলী বা অন্ন নালীর উপর স্থানীয় ক্রিয়া দর্শাইয়া বমন উৎপন্ন করে এবং সাধারণ বমন কারক ঔষধ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া বমন উপস্থিত করে। বমন কারক ঔষধ এই গুলি।

স্থানীয় বমন কারক ঔষধ।	সাধারণ বমন কারক ঔষধ।
এলম (ফটকিরি)	টার্টার এমেটিক্

এমনিয়া কার্ব্বনেট
কপার সল্‌ফেট (তুতে)
মষ্টার্ড (সরিষা)
সল্‌ট (লবণ)
ওয়াটার (জল)
জিঙ্ক সল্‌ফেট্‌
ক্যাম মাইন ইন্‌ফিউসন্‌
কোয়া সিয়ার ইনফিউসন্‌
অন্যান্য তিক্ত গাছ গাছড়ার
ইন্‌ ফিউসন্‌ যথা ভাণ্টি
ইত্যাদি।

ইপিকাকুয়ান হা—
এপমর্‌ফাইন্‌
সেনেগা
স্কুইল

ডাক্তার সম্পাদক।

—০০—

মুষ্টিযোগ ঔষধ।

মহাশয়! পূর্ব্ববারের ন্যায় আমার নিম্ন লিখিত মুষ্টিযোগ কয়েকটিকে আপনাদিগের জগত বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

১ম বমন বা বমনভাব নিবারণ হইবার মুষ্টিযোগ।

লাউয়ের পাতার রস ২ দুই তোলা খানিকটা পরিস্কার চিনী মিশাইয়া বারেক দুইবার সেবন করিলে বমন বা বমনভাব নিবারণ হয়।

২য় চক্ষু উঠা আরোগ্য হওয়ার মুষ্টিযোগ।

১। চোক্‌ উঠিবার সময় কর্‌কর্‌ করে, চুলকায় ও অল্প অল্প লাল হয়। এরূপ অবস্থায় কাঁচা কলার ডেগোর নীল অর্থাৎ ডেগোর উপরের পাত্‌লা ছাল ছুরি দিয়া চাঁচিয়া পরিস্কার অথচ পাত্‌লা নেকড়ায় করিয়া

চিপিয়া রস চক্ষের মধ্যে দিলে এবং আকন্দের আঁঠা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির চাড়ার উপর দিলে চক্ষু উঠা আর বৃদ্ধি হয় না, দুই তিন দিবসেই চক্ষু স্বাভাবিক হয়।

২। চক্ষের পাতায় শোথ না হইয়া যদি চক্ষের মধ্যভাগে অত্যন্ত লাল হয়, জল পড়ে এবং যন্ত্রণা করে, তাহা হইলেও কলার ডেগোর ছালের গুগ্‌লি শামুক ভিজান জল চক্ষের মধ্যে দিলে এবং সকালে ও বৈকালে এক ধান ফট্‌কারি বেশ গুঁড়া করিয়া ৵০ এক পোয়া দেড় পোয়া আন্দাজ জলে ভিজাইয়া চক্ষু ধৌত করিলে বেশ্‌ উপকার হয়।

৩। খানিকটা উষ্ণ দুগ্ধ একটি চুম্‌কি ফেরোয় কিম্বা ঘটে পুরিয়া চক্ষে ভাপ্‌ দিলে যন্ত্রণা কম হয়।

৪। চক্ষের পাতা যদি অল্প অল্প স্ফীত হয়, জল ও পিচুটী পড়ে তাহা হইলে রক্ত চন্দন, বচ, শুঁট, গেরীমাটী ও খড়িমাটী জলে বা সিজের পাতা ঝল্‌সাইয়া হাতে রগড়াইলে রস বাহির হয়, সেই রসে দ্রব্য কয়েক খানা পর পর ঘসিয়া কপালে ও চক্ষের পাতা দুইটীতে প্রলেপ দিতে হয় ইহাতে চক্ষের পাতার শোথের জল স্রাবের ও চক্ষের মধ্যের লাল বর্ণের উপকার করে। সকালে ও সন্ধ্যার সময় লোহার হাতা উত্তপ্ত করিয়া স্বেক দিলেও যন্ত্রণা অনেক কম হয়। জলে ফট্‌কারি ভিজাইয়া চক্ষু ধৌত করিতে হয়।

৫। যদি চক্ষের পাতা দুইটী অত্যন্ত ফুলিয়া সংলগ্ন হইয়া যায়। চক্ষু ও মাথার ভিতর বেদনা হয় এবং জল পড়িতে থাকিলে আফিং ৵০ দুই আনা খয়ের ॥০ আদ তোলা জামের পাতার রসে মাড়িয়া কপালে ও চক্ষের পাতার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় লোহার হাতা উত্তপ্ত করিয়া স্বেক এবং প্রাতে ও বৈকালে গরম জলে ফট্‌কারি ভিজাইয়া ধৌত করিতে হয়। এইরূপে ৪। ৫ দিবস গত হইলে চক্ষের পাতায় শোথ ও জল স্রাবাদি কম হইলে নিম্ন লিখিত অঞ্জন ব্যবহার করিলে সত্বর চক্ষের লাল রং যাইয়া চক্ষু স্বাভাবিক হয়। এই অঞ্জন ৪। ৫ দিবস পরে সকল প্রকার চোখ উঠাতে ব্যবহার করা যায়।

অঞ্জন।

৬। আদ্‌তোলা আন্দাজ স্তনের দুগ্ধ একখানি পেতলের থালায় রাখিয়া তাহাতে ১টী লবঙ্গ কিছু ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঘষিতে হইবে লবঙ্গটী কিছু ক্ষয় হইলে ঘষা বন্দ করিয়া লবঙ্গটী অন্য স্থানে রাখিয়া দিবে, পরে ঐ দুগ্ধে ১০।১৫ টী বেলের কুশি (অকুটণ্ড পাতা দিয়া অপর একটি পিতলের ঘটী কিম্বা বাটী দিয়া বেশ করিয়া বাঁটীতে হইবে। থালা ঘটী বা বাটী সদ্য মাজা না হয়। বাঁটিতে বাঁটিতে যখন চন্দন ঘষার ন্যায় হইবে তখন একটী ঝিনুক কিম্বা কাচের বাটিতে রাখিতে হয়। চক্ষের অবস্থানুসারে সকালেও বৈকালে কিম্বা দিবসে ২। ৩ বার কবুতরের পালকে করিয়া চক্ষের মধ্যে দিতে হয়। পাল্‌কটী কান চুল্‌কাইবার পালকের ন্যায় করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

চোক উঠিলে মোটামুটি নিয়ম রক্ষা করিতে হইলে চক্ষে বাতাস লাগান, রাত্রিতে অনাহার ও স্নান করা উচিত নহে।

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কবিরাজ।
পোড়াদহ।

——oo——

(উদ্ধৃত)

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

কান পাকার ঔষধ।

দুগ্ধসহ জল মিশ্রিত করিয়া কাঁচের পিচকিরির দ্বারায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া ধৌত করিতে হইবে; পরে তুলির দ্বারায় পুঁচিয়া তুলো পিঁজিয়া কান ঢাকিয়া রাখিবে, কোনরূপে যেন বাতাস প্রবেশ করিতে না পায়, তিন চারি দিবস এইরূপ করিলেই আরোগ্য হইবে।

বাত।

বেদনার স্থলে পাতিনেবুর রস, ও সন্দবলবণ এই দুই দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া মালিস করিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে বাত আরোগ্য হয়।

পোড়া ঘা।

শরীরের কোনস্থানে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার শুষ্ক তুলা দিয়া জড়াইবে এবং বাতাস না লাগে তজ্জন্য তদুপরি পরিষ্কার কাপড় দিয়া বাঁধিবে। যে পর্য্যন্ত তুলা খুলিতে না পারা যায় সে পর্য্যন্ত খুলিবে না এবং যাহাতে পরিষ্কার থাকে এরূপ চেষ্টা করিবে, কখন কখন নূতন কাপড়ের দ্বারায় বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে অতি মন্দ ঘা ও ৪। ৫ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবে। আর তুলা যদি না পাওয়া যায়, তবে মধু ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ পোড়া ঘায়ের উপর লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হইবেক। কিন্তু ফোস্কা পড়িলে, তৎক্ষণাৎ জল বাহির করিয়া দিবে, পরে শুষ্ক কলিচুন এক ছটাক এক সের গরম জলে মিশ্রিত করিবে, যখন দেখিবে যে ঐ জল স্থির হইয়াছে, তখন জল ঢালিয়া লইবে যতটুকু জল হইবে ততটুকু গর্জ্জন তৈল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া একটা পালকের দ্বারায় ৫। ৭ বার করিয়া ঐ ঘায়ে লাগাইলে ৩। ৪ দিবসে আরোগ্য হইবে। আর ইহাতেও যদ্যপি ঘা আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে সাবানের দ্বারায় পরিষ্কার করিয়া ময়দা ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিলে আরোগ্য হইবে।

বালকদিগের পেটকামড়ানির ঔষধ।

বালক বালিকাদিগের পেটকামড়ানি হইলে সর্ব্বদাই ক্রন্দন করে এবং

শয়নকালীন ছট্‌ফট্ করে ও চীৎকার করে, এরূপস্থলে নিম্নলিখিত ঔষধি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মৌরি ১ রতি চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ ২। ৩ বার সেবন করাইলে আরোগ্য হয়।

ক্রিমীরোগের ঔষধ।

এক ছটাক ডালিমের শিকড় ও এক ছটাক শেওড়ার শিকড় এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ চারবার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্রিমী নাশ হয়।

বক্ষঃস্থলে সর্দ্দি বসিয়া কাশি হইলে তাহার প্রতিকারক মুষ্টিযোগ।

গোলমরিচ, লবঙ্গ, পিপ্পলি, বচ, শুট্, জেষ্ঠমধু, বাকসের ছাল, ব্যাকুড়ের শিকড়ের ছাল এক এক তোলা গ্রহণ করিবে। পরে আট তোলা মিশ্রী মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় পোয়া থাকিতে নামাইবে, পরে উত্তমরূপ সেকিয়া লইয়া এক এক ছটাক ওজনে প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে, বুকে বেদনা থাকিলে বাকসের পাতার পুলটীস্ করিয়া বেদনার উপরে মোটা কাগজে করিয়া বসাইয়া দিবে, কিন্তু ইহা আদ ঘণ্টার অধিক রাখিবে না।

দদ্রুনিবারণের ঔষধ।

মদনগৌরি, সিমপাতার রস ও মাখন এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া দদ্রু চুলকাইয়া তাহাতে প্রলেপ দিলে সপ্তাহমধ্যে আরোগ্য হয়।

পরীক্ষা।

শ্রীহৃদয়নাথ শর্ম্মা।

শূলরোগের মহৌষধ।

আজকাল বাঙ্গালীদের মধ্যে, অম্লরোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শূলরোগ, অম্লরোগের শেষ ফল। অনেকে শূলরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। চিকিৎসায় শূলরোগ ভাল হয় না, ইহা অনেকের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। বহুব্যয় সাধ্য ইংরাজী ঔষধ সেবন করিলে শূলরোগ আরোগ্য হয় কিনা, জানি না। কিন্তু দেখিয়াছি, আমাদের সামান্য দেশীয় ঔষধে যেমন অনেক দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য

হইয়া যায়, তেমনই শূলরোগও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২৫।৩০ বৎসর হইল, এই দুঃসাধ্য রোগের এক ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তদবধি ঐ ঔষধের ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন। ঐ ঔষধ সেবন করিয়া অনেক রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। সেই ব্যবস্থাপত্র এই;—

যে যে দ্রব্যে, যে প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার নিয়ম।

দ্রব্য	ওজন
শুঁটচূর্ণ	৫ পাঁচ ভরি
বিটলবণ	২৷৷০ আড়াই ভরি
সোহাগা	১।০ সওয়া ভরি
মূল্‌তানী হিং	৷৷৵০ দশ আনা

(বিটলবণ ও সোহাগা) ওজনের পর খৈ করিয়া লইতে হয়।

সজনাগাছের ছালের রস দিয়া, প্রথমে হিং মাড়িতে হয়; তৎপরে, উহাতে বিটলবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়; তৎপরে, সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়; তৎপরে, শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া, চুয়ান্নটি বড়ি বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই; যত দিলে, সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ীবাঁধা যায়, তাহাই দিতে হয়।

ঔষধের সেবনের নিয়ম।

২৭ দিন, প্রাতঃকালে একবড়ী ও সায়ংকালে একবড়ী, মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্যাপথ্যের নিয়ম।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ। মৎস্য নিষিদ্ধ নহে, ঘৃতে পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ-শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচাঘৃত, ডাইল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা-দ্রব্য, মাদকদ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

"যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই কয়েক দিন পথ্যের নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়।"

প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইল, এই ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। সকলে এ সংবাদ জানেন না। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

নিকট হইতে "ব্যবস্থাপত্র" আনিয়া থাকেন। জনসাধারণের উপকারার্থ, আমরা ইহা মুদ্রিত করিয়া দিলাম। এই ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহারা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আরোগ্য সংবাদ পাইলে, আমরা হিসাব করিয়া দেখিব, শতকরা কত রোগী এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন। আমরা জানি, এপর্য্যন্ত কত রোগী আরোগ্য হইয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই।

—— সুরভীপতাকা।

রোগ হইলে চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ হিন্দুসমাজের ধারণা এইরূপ যে, আমাদের আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট আছে—মরণের অবধারিত কাল আছে—চাই চিকিৎসা কর—চাই না কর। এবং এই কথার প্রতিপোষক স্থলে তাঁহারা "না কালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধশরৈঃ শতৈরপি" ইত্যাদি নানা চলিত বচন প্রমাণ দেন। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—তিনই দৈবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এধারণা অনেক হিন্দুরই আছে—এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কোষ্ঠীগণনা দ্বারা আয়ুষ্কাল পর্য্যন্তও স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এঁকারণ রোগ হইলে চিকিৎসা করান না, অথবা মূর্খ বৈদ্য দ্বারা অযত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করাইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে কত লোক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছেন, তাহা বলা যায় না। আয়ুষ্কাল যে নির্দ্দিষ্ট নাই, উহা পুরুষকার প্রভাবে যে হ্রস্ব ও দীর্ঘ হইয়া থাকে, ইহা বৈদ্যকগ্রন্থ মাত্রেই আছে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি যে যে রূপ চেষ্টা করিলে দীর্ঘায়ু হইতে পারেন ইহার স্বতন্ত্র প্রকরণ প্রত্যেক বৈদ্যগ্রন্থে আছে।

আয়ুর কাল নিয়মিত না অনিয়মিত? অগ্নিবেশ দ্বারা এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছিলেন যে—

"দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলং।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকং
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরং॥"

হে অগ্নিবেশ? আয়ুর বলাবল দৈব ও পুরুষকার উভয়ের উপর নির্ভর করে। পৌর্ব্বদেহিক যে আত্ম-কৃত কর্ম্ম, তাহা দৈব ও বর্ত্তমান দেহকৃত কর্ম্মকে পুরুষকার বলে।

"বলাবল বিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমং॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তি দীর্ঘস্য স্ব সুখস্য চ।
নিয়তসরায়ুষো হেতুর্ব্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরং॥"

দৈব ও পুরুষকারের আবার বলাবল বিশেষ আছে। তন্মধ্যে দৈব ও পুরুষকার উত্তম হইলে আয়ু ও সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে অথবা নিয়ত আয়ুসংখ্যা প্রাপ্তির কারণ হয়। এবং মধ্যমরূপ দৈব ও পুরুষকার কৃতকর্ম্ম মধ্যম ও হীনকর্ম্মে হীনফল লাভ হয়।

"দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে।
দৈবেন শ্চেতরং কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥"

যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবল দুর্ব্বল হয়, তবে বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকার দ্বারা তাহা নষ্ট হইতে পারে। আর যদি দৈবের বল বিশিষ্ট হয়, তবে দুর্ব্বল পুরুষকারকে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে।

"তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাদেকান্ত গ্রহণনসায়ু। নিদর্শনমপি চাত্রোদাহরিষ্যামঃ। যদি হি নিয়তকাল প্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাদায়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গল-বল্ক্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাত গমনদ্যোঃ ক্রিয়ো ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরন্॥"

যখন কর্ম্ম দ্বারা অশুভ এবং কর্ম্ম দ্বারা শুভফল দেখা যাইতেছে, এমত অবস্থায় আয়ুর যে একান্ত গ্রহণ অর্থাৎ নিয়তকালের স্বীকার—কোন প্রকারেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। এবং এস্থলে আরও প্রমাণ এই যে, যদি আয়ুর পরিমাণকাল অবধারিত থাকিত, তবে আয়ুষ্কামী ব্যক্তিগণের মন্ত্র ঔষধি, বলি, মঙ্গল, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপনয়ন, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত এবং গমনাদি ইষ্টক্রিয়াসকল করি-বার কোন আবশ্যক ছিল না।

"নোদ্‌ভ্রান্তচণ্ডচপল গোগজোষ্ট্রখরতুরগমহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ। ন প্রপাতগিরি বিষমদুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোন্মত্তোদ্‌ভ্রান্ত চণ্ডচপলমোহলোভাকুলমতয়ো নারয়ো ন প্রবুদ্ধোঽগ্নির্ন চ বিবিধ বিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ। ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্র

প্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবানাভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকাল-প্রমাণত্বাৎ॥”

যদি জীবনের কাল অবধারিত থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানীগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং ক্রোধযুক্ত গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ঘোটক এবং মহিষাদি ও দুষ্টপবনাদি প্রভৃতিকে পরিহার করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহারও প্রয়োজন করে না। অথবা পতনোন্মুখ গিরি এবং বিষম দুর্গম্য যে জলবেগ ও প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, ক্রোধযুক্ত, চপল এবং লোভ মোহের দ্বারা চঞ্চল-মতি যে সমস্ত শত্রু তাহাদিগকেও সযত্নে যে পরিহার করিবার উপদেশ আছে এবং অত্যন্ত প্রজ্বলিত যে অগ্নি ও বিবিধপ্রকার বিষাক্ত সরীসৃপ-সর্পাদি এবং অপরিমিত সাহস প্রভৃতি ত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্রকরগণ যে ভূয়োভূয় বিধান করিয়াছেন—তাহা ও নিষ্ফল হইয়া যায়। দেশকাল প্রভৃতি ঋতুভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন আচার অবলম্বন এবং নূতন দেশের বর্জ্জন প্রভৃতি যে সমস্ত হিতোপদেশ জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আছে, আয়ুর কাল নিয়তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কোন উপদেশেরই সার্থকতা থাকে না।

“ন চানভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকাণামকালমরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাং।
ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্ম্মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে॥”

যদি অকালমরণের প্রথা না থাকিত, তবে অকালমরণের ভয় কাহারও হৃদয়ে উপলব্ধি হইতে পারিত না। এবং মহর্ষিদিগের রসায়নাধিকারের প্রারম্ভও বৃথা হইত।

“নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেণাভিহন্যাৎ। নাশ্বিনাবার্ত্তং ভেষজে-নোপপাদয়েতাং, নর্ষয়ো যথেষ্টং আয়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুর্ন চ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সুসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ুরাচরেয়ুর্ব্বা।

যদি আয়ুষ্কাল অবধারিত থাকিত, তবে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিয়তায়ুষ্ক অসুর-বধের প্রসঙ্গ ও প্রলাপবাক্যের ন্যায় হইত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আচরিত ঔষধের উপচার ও কল্পিত কথা। মহর্ষিগণ যে তপস্যাদ্বারা অভীষ্টায়ু লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাও উপন্যাসের ন্যায় প্রতিপন্ন হয়। এবং তাহা হইলে শাস্ত্র বা মহর্ষিগণের আচরণ দর্শন ও উপদেশও বৃথা হইয়া যায়।

“অপিচ সর্ব্বচক্ষুষামেতৎ পরং যদৈন্দ্রং চক্ষুরিদং চাস্মাকং প্রত্যক্ষং যথা

পুরুষসহস্রাণাং উত্থায়োত্থায়াহবং কুর্ব্বতাং অকুর্ব্বতাঞ্চ তুল্যায়ুষ্ট্বং তথা জাত-মাত্রাণাং অপ্রতিকারাচ্চাবিষমপ্রাশিতানাঞ্চাপ্যতুল্যায়ুষ্ট্বং নচ তুল্যযোগক্ষেম উদপানঘটানাং চিত্রঘটানাং চোৎসীদতাং॥”

আমাদের সামান্যদৃষ্টিদ্বারাও আমরা কি দেখিতেছি? আমরা কি দেখিতে পাই না যে, সহস্রপুরুষের মধ্যে যাহারা যুদ্ধাদিকার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারা প্রায়ই শস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে এবং যাহারা শস্ত্রব্যবসায়ী নহে, তাহারা শস্ত্রাঘাতে কখনই প্রাণত্যাগ করে না। এই উভয়প্রকার লোকে-রই পরস্পর আয়ুর বৈলক্ষণ্য এবং তুল্যতা ও বিষভোজিব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রতীকারী ও অপ্রতীকারীর মধ্যে আয়ুর অতুল্যতা দেখিতেছি। অথবা চিত্রিতঘট এবং জলপানোপযোগীঘট এই উভয় ঘটের মধ্যে চিত্রিতঘট জল-বহন করে না বলিয়া হঠাৎ ভঙ্গ হয় না এবং জলপানাদিকার্য্যের উপযুক্ত ঘট পানীয়বহনাদি সময়ে অকস্মাৎ স্খলিত হইলেই ভগ্ন হইয়া যায়। এই সকল নিদর্শনদ্বারা আয়ুর নিয়তকাল কোন মতেই স্বীকৃত হয় না।

“তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং অতো বিপর্য্যয়ং মৃত্যুঃ।”

অতএব হিতোপচার মূলই জীবন এবং হিতোপচারের বিপরীত কার্য্যের দ্বারাই মৃত্যু হইয়া থাকে।

কলিকাতা। } শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি।

(জ্বরে ঘৃতপ্রয়োগ। *)

যথা প্রজ্বলিতং বেশ্ম পরিষিঞ্চন্তি বারিণা।
নরাঃ শান্তিমভিপ্রেত্য তথা জীর্ণজ্বরে ঘৃতং॥

চরকসংহিতা॥

জ্বর জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে কীদৃশ অবস্থায় ঘৃতপ্রদান করা যাইতে পারে,

* নানা স্থানে গমনাগমন বিশেষতঃ শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ যথাকালে প্রবন্ধ লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য সম্মিলনীর পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

অধুনা সংক্ষেপে তাহাই বলা যাইতেছে। জ্বরে কষায় সেবন, বমন, লঙ্ঘন ও লঘুভোজন (পেয়াযূষাদি) প্রভৃতিদ্বারা জ্বর সম্যক্‌রূপে প্রশান্ত প্রাপ্ত না হইলে এবং রুক্ষতা উপস্থিত হইলে জ্বরনাশক পক্ক-ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয় (১) যদি নবজ্বর হইতে রোগীকে যথাবৎ কষায়াদি প্রয়োগসত্বেও অথবা যেস্থলে সামানুবন্ধ হইতে কফাধিক্য পরিলক্ষিত হয় এবং রুক্ষতাদি লক্ষণগুলি সম্যক্‌রূপে উদিত না হয়, এমতস্থলে ঘৃতপান সুব্যবস্থা হইতে পারে না। (২) কেননা কফের সম্যক্‌রূপে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে বাতপিত্তাধিক জীর্ণজ্বর প্রশমনার্থে ঘৃতপ্রদান করিবার বিধি আদিষ্ট হইয়াছে। (৩)

জ্বর প্রায়শঃ অষ্টাহে নিরামতাপ্রাপ্ত হয় "সপ্তাহে ন হি পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ। নিরামশ্চাপ্যতঃ প্রোক্তা জ্বরপ্রায়োঽষ্টমেঽহনি॥" এজন্য মহর্ষি চরক দশাহ অতিক্রান্তে ঘৃতপানের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যেস্থলে সপ্তাহে দোষ পরিপাক হইয়া নিরামপ্রাপ্ত না হয় (৪) 'শ্লেষ্মলানামবাস্তানাং জ্বরঃ প্রায়ঃ কফাধিকঃ। পরিপাকং ন সপ্তাহেনাপি যাতি মৃদূষ্মণা॥" সেস্থলে দশাহপর ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ্র রায় কবিরাজ।

মন্তব্য।

স্থানাভাব জন্য এবার আপনার এবং অন্যান্য প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল না। আগামীতে হইবে। চি, স, স,

---

(১) জ্বরাঃ কষায়ৈর্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘু ভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্॥
চক্রপাণিঃ।

(২) কষায়াদি প্রয়োগে সত্যপি যদ্যপি সামানুবন্ধত্বাৎ কফোত্তরতয়া বা যত্র রুক্ষত্বং ন ভবতি তত্র সর্পির্নজাতব্যম্॥
শিবদাসঃ।

(৩) সর্পিস্যাৎ কফেমন্দে বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে।
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

(৪) কোন জ্বর কত দিবসে নিরাম প্রাপ্ত হয়, প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। যাঁহার সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হয়, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বৈদ্যক ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের জ্বরাধিকারে দৃষ্টি করিবেন।

৬ষ্ঠ খণ্ড। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

(চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা)

৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯৬ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদককর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি। ডাক্তার শিখরকুমার বসু এল, এম, এস্। কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি। বাবু রামনিরঞ্জন রায়চৌধুরী জমীদার। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত। প্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ। শ্রী——এবং সম্পাদকদ্বয়।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট, ৫নং জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৯।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনার হিসাবে এই তিন সংখ্যার একত্রে নগদ মূল্য ১৵০ টাকা মাত্র।

COLOUR PAPER

সূচীপত্র।

—*—

বিষয়	পৃষ্ঠা।
রায় সুরেন্দ্রনাথ ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন	১২৯
দেশীয়স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (মানবশত্রু—স্ত্রী)	১৩৩
স্ত্রী ও পুরুষ	১৩৭
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা	১৪১
সূতিকাতরুণজ্বর বা পচাজ্বর	১৪৪
হোমিওপ্যাথিক ঔষধতত্ত্ব	১৪৮
নাসিকা	১৫২
শিশুচিকিৎসা	১৫৬
পান—তাম্বুল	১৫৯
ধাতুব্যাখ্যা	১৬১
লক্ষণতত্ত্ব	১৬৫
মতদ্বৈধ হয় কেন?	১৭১
বাঙ্গালায় চিকিৎসকসমাজ	১৭৮
জ্বরচিকিৎসা (হোমিওপ্যাথিমতে)	১৯২
কাসরোগে বায়ুপরিবর্ত্তনের উপযোগিতা ও উপকারিতা	২০১
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী (বৈদ্যক) ...	২০৪
ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি (ঐ)	২০৬
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী (ঐ)	২০৯
কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ (ডাক্তারী) ...	২১১
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ (বৈদ্যক)	২১৫
টোট্‌কা ঔষধ (ঐ)...	২১৯
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ (ঐ সম্পাদকীয়) ...	২২১

বিশেষদ্রষ্টব্য।

স্থানাভাবজন্য যাঁহাদের বিজ্ঞাপন এবারেও প্রকাশিত হইল না, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। আগামীবার হইতে অবশ্যই যথারীতি বিজ্ঞাপন বাহির হইবেক।

রায় সুরেন্দ্রনাথ ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন।

"কালস্য কুটিলা গতিঃ।" কালের কুটিল গতির ফল জীব জগতে নিত্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাহার যখন বুকে আঘাত পড়ে, তাহাকেই তখন হাহাকার করিতে হয়। কালস্রোত অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। কিন্তু স্রোত ত অমনি যায় না। সংসারের শোভাসৌন্দর্য্য, সংসারের সুখশান্তি, সংসারের হর্ষপ্রীতি, সেই স্রোতের মুখে প্রতিনিয়ত ভাসিয়া যাইতেছে। কাল, ভালমন্দ সকলই ধ্বংস করে বটে, কিন্তু মন্দের দিকে জগতের আসক্তি নাকি নাই; জগৎ সৌন্দর্য্যকামী, জগৎ সুখপ্রত্যাশী, জগৎ হিতান্বেষী, তাই সৌন্দর্য্যে যখন হাত পড়ে, জগতের চক্ষু তখনই উন্মীলিত হয়, জগৎ শতমুখে কালের কুটিলতা কীর্ত্তন করিতে থাকে। সংসারকাননে যে কুসুমরাশি ফুটিয়া আছে, ভবের ভাণ্ডারে যে রত্নরাজি সাজান আছে, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক একটিকে মুখে করিয়া লইয়া দুরন্তকাল যখন ছুটিয়া পলায়, তখনই আমরা যেন প্রবুদ্ধ হইয়া শিহরিয়া উঠি; ললাটদেশে কাতরে করাঘাত করি; চারিদিকে চাহিয়া দেখি, যে গিয়াছে তাহার চিহ্নমাত্রও আর কোন দিকে লক্ষিত হইতেছে না।

সদাগতি কুটিলমতি কাল সম্প্রতি সংসারের দুইটি অমূল্য রত্ন আবার হরণ করিয়াছে। একটি, টাকীর সুবিখ্যাত মুন্সীবংশের অলঙ্কার রায় সুরেন্দ্রনাথ চোধুরী; আর একটি প্রথিতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সুযোগ্য মধ্যম পুত্র বাবু হরিপ্রসন্ন সেন। এ দুই জনেই বয়সে নবীন, দুই জনেই অশেষগুণে গুণবান্ ছিলেন। এ দুই জনের অকালবিয়োগে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত, সাধারণে শোকাকুল হইয়াছেন। সাধারণের যাঁহারা মুখপাত্র, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহাঁদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু সাধারণের অপেক্ষা ইহাঁদের সহিত বিশেষতঃ রায় সুরেন্দ্রনাথের সহিত আমার সম্বন্ধ কিছু ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং আমার এই শোকাবেগ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। বাবু সুরেন্দ্রনাথের নাম অনেকের কাছেই সুপরিচিত।

COLOUR PAPER

বঙ্গের একটা প্রসিদ্ধ ধনী ও সম্ভ্রান্তকুলে ইহাঁর জন্ম। অল্পবয়সেই কুলোচিত সদ্‌গুণসমূহে ইনি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। দানাদিপুণ্যকর্ম্মে, দেশের কীর্ত্তিরক্ষায় ও সাহিত্যাদির শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ইহাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল; সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যেই ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর প্রকৃতি স্বাভাবিক এমন মধুর ও হৃদয় এতদূর সরল ছিল যে, যিনি একবার ইহাঁর সহিত আলাপ করিতেন, তিনিই বুঝিতে পারিতেন যে, সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের স্বচ্ছতার সহিত এসংসারের খুব্ কম লোকের হৃদয়েরই তুলনা হইতে পারে। যদিও ইহাঁর আধুনিক কোনরূপ উচ্চ উপাধি বা প্রাচীন সংস্কৃত মুগ্ধবোধ আদি গ্রন্থে অধিকার ছিল না, কিন্তু ভগবান্ ইহাঁকে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়াছিলেন,—যে শক্তিতে ইহাঁর আলাপ পরিচয় কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক্ পণ্ডিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ফলতঃ পণ্ডিতের যে কার্য্য, বিদ্বানের যেরূপ ব্যবহার, সুরেন্দ্রে প্রায়শঃ তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইনি সেই সমস্ত সদ্‌গুণেই অর্থীপ্রত্যর্থী, ভিখারী উমেদার, বন্ধুবান্ধব ও প্রজাবর্গের নিকট নিয়ত অনুরাগভাজন ভিন্ন কখনও বিরাগভাজন হন্ নাই। অধিক কি, মৃত্যুর পূর্ব্বেও তিনি আপনার আত্মীয়স্বজন ও আপনার বন্ধুবান্ধবকে সহাস্য প্রীতিসম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিতে বিরত হন নাই। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতত্ত্বের পুনঃপ্রচারবিষয়ে যে হস্তক্ষেপকরিয়াছি, ইনি আমার সেই ব্রতের একজন প্রধান সহায় ছিলেন। গ্রাহকমাত্রেই এবং অপর সাধারণেরও অনেকেই জানেন যে, সুশ্রুতপ্রচার বিষয়ে আমি সুরেন্দ্রবাবুর নিকট যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য পাইয়াছি। যদিও ইদানীং ভগবানের কৃপায় সুরেন্দ্রনাথের নিকট আমার সুশ্রুতের প্রকাশ-জন্য অর্থ সাহায্যের আর আবশ্যক হইত না। যদিও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার চিকিৎসা সম্মিলনী নৌকার কর্ণধারস্বরূপ যতীন্দ্রনাথের নিকটও এখন আর সাম্মলনীর জন্য অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু না হইলেও এই দুই মহাত্মার সদাশয়তার বিশেষতঃ আন্তরিক বলের বিষয় মনে করিয়া আমি মনে মনে যে কিরূপ বলে বলীয়ান্ ছিলাম, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানে, আর কিছু জানেন সুরেন্দ্রযতীন্দ্রের ২।১ জন বিশিষ্ট বন্ধুলোক। আমি জানি-না বা বুঝিবারও সামর্থ্য নাই যে, সুরেন্দ্রহীন-সংসারে

কেবল যতীন্দ্রনাথের দ্বারা আমার সেই অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক বলের পরিমাণ কতদূর রক্ষিত হইতে পারিবে? আর যদিও আমার সে বলের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস না হউক, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যে আমি সুশ্রুতের মুদ্রণকার্য্য সমাধা করিতে পারিলাম না, এ গভীর দুঃখ আমার ইহজন্মে আর যাইবার নহে! বাস্তবিকও বড়ই পরিতাপের কথা যে, আমার সে চিরাভিলষিত ব্রতের উদ্যাপন না হইতেই আমি এমন একজন পরমোদ্‌যোগী বন্ধুকে অকালে হারাইলাম! ভগবানের কৃপায় আমার কর্ত্তব্য আমি যেমন করিয়া হউক পালন করিব। সুশ্রুতপ্রকাশে তিলমাত্রও ত্রুটি হইবে না বটে; কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সাহিত্যসেবায় আমি যাঁহাকে সহায় করিয়াছি, তিনিই আমায় অকূলে ভাসাইয়া অকালে প্রস্থান করিয়াছেন। না হলে চিকিৎসা-সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক ডাক্তার খাস্তগির্ ও ডাক্তার রুদ্রের বিয়োগদুঃখ সম্বরণ করিতে না করিতে, আজ আবার সুরেন্দ্র নাথের জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইবে কেন?

কিন্তু এত গভীর দুঃখরূপ অন্ধকারেও কিঞ্চিৎ আলোকের আভাস বাহির হইয়াছে। পুত্রহীন সুরেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে মুন্‌সীবংশ যেমন ঘোর অন্ধকারের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সমধিক আশ্চর্য্য ও কথঞ্চিৎ আহ্লাদের বিষয় এই যে, সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দিবসরাত্রিতেই তাঁহার শোকাতুরা স্ত্রী একটী নবকুমার প্রসব করায় সে গাঢ় অন্ধকার যেন কতকটা দূর হইয়াছে বলিয়াই আপাততঃ বোধহয়। এখন ভগবানের কৃপায় যদি সুবাতাসের বলে অবশিষ্ট অন্ধকারটুকু ক্রমশঃ দূর হইয়া যায় ভালই এবং তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আবার অচিরাৎই মুন্‌সীবংশ সুবিমল আলোকে পূর্ণ আলোকিত দেখিতে পাইব। অন্যথা এ দুরন্ত সময় যদি কোনপ্রকারের মনোমালিন্যরূপ অন্ধকারের সূচনা ও তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে টাকীর চিরপ্রসিদ্ধ মুন্‌সীবংশের প্রকৃত গৌরবসূর্য্য যে একবারেই অস্তমিত হইবে না, সে কথা কে বলিতে পারে?

শেষকথা সুরেন্দ্র যতীন্দ্রনাথের দ্বারা লেখক নিজজীবনে অশেষবিধ উপকারে উপকৃত আছেন; তদ্ভিন্ন ভাবী প্রত্যাশার ত ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু এ সকল উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ যে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতা দেখাইব, সে

শক্তি মৎসদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তির কিছুই নাই। তাই আজ্ শোকসন্তপ্ত যতীন্দ্র-বাবুর ও সুরেন্দ্রনাথের অভাগিনী বিধবা স্ত্রীর এ গভীর দুঃখের সময় সম্যক্ সহানুভূতিস্বরূপ কথঞ্চিৎ লিখিয়া এস্থলে তাঁহার জীবনী সমাধা করিলাম।

বাবু হরিপ্রসন্ন সেনের পরিচয়ও আমি আর অধিক করিয়া কি দিব? ইঁহার পিতা গঙ্গপ্রসাদ সেন মহাশয় বঙ্গের একজন বিখ্যাত কবিরাজ। হরি-প্রসন্ন সুযোগ্য পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তরুণবয়স্ক হইলেও ইহাঁর প্রবীণোচিত বিজ্ঞতা, ধীরতা ও শান্তস্বভাব ছিল। ইহাঁর কথাবার্ত্তা অতি নম্র, অতি মধুর এবং অতিশয় প্রীতিপ্রদ ছিল। লোকের উপকার করি-বার প্রবৃত্তি ইহাঁর হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকিত। আর চিকিৎসাবিষয়ে এবং অন্যপ্রকার বিবিধগুণে ইহাঁর মান প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ লোক-সমাজে বিস্তৃত হইতে ছিল। তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনী নামক বৈদ্যচিকিৎসা-বিষয়ক একখানি মাসিকপত্রিকার সম্পাদকীয় ভারও ইহাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি আমার পরম বন্ধু এবং সৎকর্ম্মের সহায় ছিলেন। ইহাঁদের পিতা পুত্রের সহিত অনেকপ্রকারেই আমার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ছিল। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের পুত্রশোকে সহানুভূতি না করিবে, এমন লোক এ সংসারে কেহই নাই। কিন্তু এ দুর্ঘটনায় তাঁহার মূল্যবান্ জীব-নের কি যে গুরুতর ক্ষতি হইল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

দুঃখপ্রকাশের ভাষা নাকি কোন দেশেই নাই, আর এরূপ দুঃখের প্রতিকার পন্থাও কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মনের দুঃখ মনে রাখিয়া এই দুইজন বন্ধুর অসম্পূর্ণ জীবনের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শেষ করিলাম।

কবিরাজ সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

মানবশত্রু—স্ত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

কেমন করিয়া ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে শত্রু বা মিত্র ভাবিতেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা ক্রমশঃ দেখান হইয়াছে। পাঠকগণও দেখিয়াছেন যে, সংসারক্ষেত্রে প্রকৃতরূপে পরিচালিত স্ত্রীজাতিদ্বারা মানব, কতদূর স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীজাতির বিশৃঙ্খলতা-জন্যও যে সংসারে প্রতিনিয়ত কিরূপ অশান্তি ঘটিতে পারে, তাহারও আভাস দিয়াছি। এক্ষণে কথা এই যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা স্ত্রীজাতি হইতে শাস্ত্রানুগত যে সকল সুখ দুঃখের উল্লেখ করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে যথার্থ কথা বলিতে গেলে এক্ষণকার দিনে আর সে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিতে পারে না। কেননা সে দেবোপম হিন্দুরাজা আর নাই, সে রাজগুরু মনুর উপদেশও এখন ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে; সুতরাং এখনকার যেমন রাজা, যেমন রাজগুরু, প্রজাবর্গ বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিও ঠিক্ তথৈবচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বেদবেদান্ত বা পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্র সকল আর সমাজকে কতদূর ধরিয়া রাখিতে পারিবেন?

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, স্ত্রীজাতি হইতে উৎপন্ন শারীরিক ও মানসিক স্থায়ী সুখদুঃখের মাত্রা অপরে সমান বলিতে চাহেন বলুন, আমাদের বিবেচনায় কিন্তু সুখের অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই সম্পূর্ণরূপে অধিক দেখিতে পাইয়া থাকি। এবং সেই জন্যই আমরা "মানবশত্রু স্ত্রী" এইরূপ আখ্যা দিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক, "মানবশত্রু স্ত্রী" এস্থলে স্ত্রীশব্দের অর্থ কি? কেননা স্ত্রীজাতি

বলিতে গেলে মা, মাসী, পিশী, ভগ্নী, কন্যা ও পরস্ত্রী প্রভৃতি সমস্তই বুঝাইয়া থাকে।" অধিক কি, গণিকা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীজাতিকেই আমরা মাবনশত্রু বলিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হইব না। কি জন্য কৈমন করিয়া সাধারণতঃ অনেকের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীজাতিদ্বারা শারীরিক বা মানসিক সুখ অপেক্ষা যে দুঃখের ভাগই অধিক ঘটিয়া থাকে, তাহা ও আমরা দেখাইতে যথাসাধ্য ক্রটী করিব না। তাই আজ্ আমরা স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখের পরিচয় দিতে ক্রমশঃ চেষ্টা পাইব। তন্মধ্যে মা, মাসী, পিশী, ভগ্নী, বিবাহিতা স্ত্রী ও কন্যা প্রভৃতি স্বকীয় পারিবারিক স্ত্রীজাতি ১ম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পরকীয়া বিধবা বা সধবা যে কোন স্ত্রীর সহিত গোপনভাবে অবৈধ-প্রণয়-জনিত যে শারীরিক ও মানসিক প্রভূত কষ্ট বা ভয়ানক অশান্তি ঘটে, তাহাকে ২য় শ্রেণী, আর সাধারণ বেশ্যার সহিত প্রকাশ্যভাবে যে প্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টা-জনিত শরীর ও মনের যে অশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়, সেই মহাশত্রুকেই আমরা তৃতীয় শ্রেণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইব।

কিন্তু স্বীয় পরিবারস্থ পরমপূজনীয়া মা মাসী প্রভৃতি বা প্রাণাধিকা স্ত্রী বা কন্যা যে, মনুষ্যের পক্ষে শারীরিক বা মানসিক সুখজনক না না হইয়া বরঞ্চ অতি দুঃখদায়ক হন, একথা যেন নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবেক। বাস্তবিকও এমন পাগল সংসারে কয়জন আছে যে, জননীকে পর্য্যন্ত দুঃখের কারণ বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিতেও প্রয়াস পায়? আর এমন মূর্খই বা সংসারে কয়জন আছেন, যাঁহারা এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নে হাস্যসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু স্বধর্ম্ম-বিহীন ভারতে বিশেষতঃ বৈদেশিক রাজত্বে এখন আর সে ভাণ করিলে চলিবে না। মার নামেই একবারে গলিয়া যাওয়া বা অজ্ঞান হইয়া পড়ার কাল আর নাই। রাজা বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী হওয়াতে সমাজমধ্যে দেশীবিদেশী সংমিশ্রণে এত গাঢ়তম বিপ্লব পৌছিয়াছে-দেশের লোক দিন দিন এতই অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, বেশ ধীরভাবে এসব কথা চিন্তা করিলে চক্ষে জল না আসিয়াই যায় না। কেন যে চক্ষে জল আইসে, তাহা অবশ্যই ক্রমশঃ দেখাইব। এবং ইহাও বুঝাইব যে, স্বধর্ম্মলোপের সঙ্গে সঙ্গে সে মা, সে ভগ্নী, সে কন্যা ও সে স্ত্রী এখন কেবল শব্দমাত্রই আছে। কার্য্যতঃ বিন্দুমাত্র নাই। কিন্তু আত্ম-

জ্ঞানহীন, স্বধর্ম্মবর্জ্জিত ও পরধর্ম্মে অত্যাশক্ত বর্ত্তমান হিন্দুনামধারী মহাত্মাগণকে সে সব কথা বলিয়া তাঁহাদের চক্ষের জল আনিতে পারিব কি? না পারি, অন্ততঃ নিজেই তাঁহাদের চরণপ্রান্তে ২।৪ বিন্দু চক্ষুজল ফেলিয়া প্রাণের আবেগ সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে আর হানি কি আছে? তাই বলিয়াছি যে, বৈদেশিক রাজত্বে আর ভাণ করিলে চলিবে না। নচেৎ যে জননীকে হিন্দুশাস্ত্র স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন-যে জননীর ক্রোড়দেশে শয়ন করিলে সন্তান পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়, অধিক কি, জননীর যে সুধাময় নাম "মা" বলিয়া ডাকিলেই প্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হয়, সেই পরমারাধ্যা জননীকে আবার শত্রুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে প্রয়াস পায়, এমন আস্পর্দ্ধা কার আছে?

কিন্তু আধুনিক হিন্দুসমাজের মধ্যে বেশ ধীরভাবে বহুল গৃহস্থের গৃহমধ্যে হাঁড়ীর সংবাদটা বেশ তন্ন তন্ন করিয়া এই মাতাপুত্রঘটিত সুখদুঃখের মাত্রা যাঁহারা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, আমার বোধহয় যে, তাঁহারা অধিকাংশ গৃহেই মাতাদ্বারা পুত্র অথবা পুত্রের দ্বারা মাতাকে সুখী হওয়ার অপেক্ষা বরঞ্চ জ্বালাতনের ভাগই অধিক দেখিতে পাইবেন। কেমন পুত্রবতী মাতা কিংবা মাতৃবান্ পুত্রের পক্ষে এ সকল কথা ঠিক্ খাটে কি না, তাহা সম্মিলনীর সুযোগ্য পাঠক পাঠিকারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। আর যদি আপত্তি থাকে, তবে যথার্থ বলুন দেখি, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমন পুত্র কয়জন আছেন, যিনি জননীর স্নেহপূর্ণ অমৃতময় বাক্যসুধাপানে অহোরহ আত্মাকে সুখীবোধ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এমন মাতাই বা সংসারে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি পুত্রের যথার্থ অকৃত্রিম পুত্রোচিত সদ্ব্যবহারে জীবনকে ধন্য বলিয়া মনে করিতে সমর্থ হন্। তবে অবশ্য একবারেই যে কেহ নাই, একথা কিন্তু আমরা বলিতেছি না। আর আমাদের অভিপ্রায়ও তাহা নহে, যেহেতু সেরূপ বলিতে যাওয়াও যে সম্পূর্ণই বাতুলের কার্য্য। কেননা সে কালের সে সমস্ত রামলক্ষণমূলক ঐতিহাসিক মাতৃভক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি বর্ত্তমান অধঃপতিত সমাজেও লক্ষ্য করি, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পাই যে, ডাক্তার গুরুদাসের ন্যায় এমন রত্ন এখনও ২।৪ জন বর্ত্তমান আছেন। যিনি মাতৃপ্রেমবিচ্ছিন্ন অথচ প্রচুর মানসম্ভ্রম ও পুত্রকন্যাদি আটঘাট পরিবেষ্টিত হইয়াও তথাপি জগৎ অন্ধকার

দেখিতেছেন। অধিক কি, যাঁহার মাতৃভক্তি আজ্ বঙ্গের অনেক গৃহে পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মানমর্য্যাদা কিংবা পাণ্ডিত্য ও সম্পত্তি হীন এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে মায়ের পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শ্রেণীর লোক সংসারে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? বাস্তবিকও এ শ্রেণীর লোক অতি বিরল। দুর্লভ বলিয়া মাতৃপ্রেমে প্রেমিকের সংখ্যা যথার্থই অত্যন্ত কম দেখিয়া আজ্ স্ত্রীজাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে জননীকেই মানবশত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইব। পদেপদেই দেখাইব যে, মাতৃভক্তি বা প্রকৃত পুত্রপ্রেম অভাবে হিন্দুগণ একটী অত্যাশ্চার্য্য স্বর্গমুখে বঞ্চিত, সুতরাং দিন দিন উৎসন্নপ্রায় হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু একদিকে প্রকৃত পুত্রস্নেহের অভাব যেমন বড়ই কষ্টকর, পক্ষান্তরে এ সংসারক্ষেত্রে এমন পাঁঠা পুত্রেরও বড় অভাব নাই, যিনি সকালসন্ধ্যা দুইবেলাতেই মায়ের চক্ষের জল না ফেলাইয়া একদিনও ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। পাঠকমহাশয়-দিগের ধৈর্য্য থাকে ত সে সমস্ত ছাগলকেও আপনাদের নিকট ক্রমশঃ হাজির করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আধুনিক রাক্ষসী মাগুলাদ্বারা যে শারীরিক মানসিক কতদূর অশান্তি অহোরহ ঘটিতেছে, তাহাই আপা-ততঃ দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

স্ত্রী ও পুরুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির গাম্ভীর্য্য কম। ইহারা অত্যন্ত আমোদ এবং হাস্যরস-প্রিয়। জিহ্বার শাসন ইহাদের কম। বালক অপেক্ষা বালিকা বেশী হাঁসিয়া থাকে এবং বেশী কথা কয়। অব্যবস্থিত-চিত্ততা ইহা-দের নিত্য সহচর; ইহাদের মতি স্থির নাই। এখন যাহা মন্দ বলিয়া ঠিক্ করিল, কিয়ৎকাল পরেই আবার তাহাকেই ভাল বলিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহার বিষবৃক্ষ নামক পুস্তকে হরিদাসী বৈষ্ণবীর রূপ বিচারস্থলে স্ত্রীজাতির অব্যবস্থিতচিত্ততার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যে হরিদাসী বৈষ্ণবী স্ত্রীমহলে প্রথমতঃ অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী এবং সুমধুর গায়িকা বলিয়া সুখ্যাতিলাভ করিল, সেই হরিদাসী কিয়ৎকাল পরেই নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত হইল এবং তাহার গলার রব ষাঁড়ের ন্যায় হইল। স্ত্রীজাতির নিকট কোন কথা গোপন থাকে না, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির নিকট গোপনীয় কথা ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যে কথাটী বলিতে বারণ করিয়া দিলে, সেই কথাটী তারপর দিনই পাড়াপ্রতিবেশী-নীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকের কানে কথা তোলা এবং ঢেড়া দিয়া কথাটী প্রচার করিয়া দেওয়া একই কথা। এইটী সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রকৃতি। স্ত্রীজাতি লজ্জাশীলা কিন্তু এইরূপ লজ্জাশীলতা ইহারা পুরুষজাতির নিকটই প্রকাশ করে, স্বজাতির নিকট করে না। যাঁহারা গূঢ়ভাবে স্ত্রীচরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন—কতকগুলি লোকাচার ও সাংসারিক আচার থাকার সম্বন্ধে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির চরিত্রের বিভিন্নতা আছে। পুরুষজাতি সকল পুরুষজাতির নিকট সমানভাবে মনের কথা ব্যক্ত করে না। ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্রভৃতি সম্পর্ক বিচার করিয়া কথাবার্ত্তা বলে। কিন্তু স্ত্রীজাতিমধ্যে এইরূপ সম্পর্ক বিচার করিয়া কথোপকথন করিবার রীতি তাদৃশ দেখা যায় না। মাতা কন্যার নিকট কোন প্রতিবেশীনীর সন্তান সম্ভাবনা আছে কি না তদ্বিষয়ে অবাধে কথোপকথন করিবে। স্ত্রীমহলে ছোটবড় সকলে মিলিয়া যেরূপ মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলে, পুরুষ মহলে সেরূপ দেখা যায় না। এবং এইরূপ

কথাবার্ত্তার সম্পর্ক বিচার টা প্রায়ই দেখা যায় না। স্ত্রীজাতি মাসি পিসি খুড়ির নিকট আপন স্বামী-ঘটিত কথা তুলিয়া রহস্য করিতে দোষ বিবেচনা করে না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কার্য্য, যে সকল কার্য্য পুরুষ, পুরুষের নিকট করিতে দোষ বিবেচনা করে, স্ত্রী, স্ত্রীজাতির নিকট সে কার্য্য করিতে তাদৃশ দোষ বিবেচনা করে না।

স্ত্রীজাতির মন নিম্নগামী জলের ন্যায়। যে দিকে মন একবার ধাবিত হইল, ক্রমাগত সেই দিকেই চলিতে লাগিল। ইহারা সহসা মনের বেগ ফিরাইতে পারে না। স্ত্রীচরিত্রে যেরূপ বিপরীত ভাব দেখা যায়, পুরুষ চরিত্রে সেরূপ দেখা যায় না। খুব ধর্ম্মভীরু স্ত্রীলোক কোনরূপে একবার স্খলিতপদ হইলে এমনিই অধর্ম্মের দিকে তার মতি গতি হয় যে, সে পুরুষকে হারাইয়া দেয়। কুলবধুর লজ্জাশীলতা মনপ্রাণ মুগ্ধকর। যে স্ত্রীলোক আপন স্বামীর সহিত মুখ তুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লজ্জাবোধ করে, সেই স্ত্রীলোকই কুলটা হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া পুরুষকে আহ্বান করিতে লজ্জাবোধ করে না। পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কম লজ্জাশীল, কিন্তু পুরুষজাতি শত শিক্ষা পাইলেও লজ্জাহীনতার চূড়ান্ত সীমায় পদার্পণ করিতে পারে না। কিন্তু এহেন নম্রপ্রকৃতি লজ্জাশীলা স্ত্রীজাতি কোনরূপে স্খলিতপদ হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলে কি ভয়ানক বিভৎস লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকে। যে স্ত্রীলোক স্নেহের আদর্শস্থল, সেই স্ত্রীলোক কার্য্যানুরোধে আপন ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকে বিনাশ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যে স্ত্রীলোক পতিব্রতার আদর্শস্থল, সে কুলটা হইয়া উপপতির পরামর্শে স্বামীকে বিষপ্রয়োগ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত ইউরোপদেশেও এইরূপ ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু প্রণয়িণীর সন্তোষসাধনার্থ পুরুষজাতি আপন স্ত্রীর প্রাণবিনাশ করিয়াছে, এরূপ ঘটনা সংসারে অতি বিরল। স্ত্রীলোক নিষ্ঠুর হইলে তাহার আর ক্ষমা নাই।

স্ত্রীজাতির মনের আবেগ প্রবল নদীর ন্যায়। স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে একবারে মনপ্রাণ সমর্পণ করে। পুরুষ এইরূপ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে না। স্ত্রীলোক যাহাকে দেখিতে না পারে, তাহার নাম পর্য্যন্তও সহিতে পারে না।

দাম্পত্যপ্রণয় এবং কামবৃত্তি-বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষে সম্পূর্ণ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পুরুষের কামবৃত্তি একটী শারীরিক রসের উপর নির্ভর করে, উহাকে শুক্ররস বলে। এই শুক্ররস সঞ্চিত হইয়া পুরুষজাতিকে একরূপ অসাধারণ সাহস ও তেজপ্রদান করে। সেই সাহস ও তেজকেই পুরুষত্ব কহা যায়। পুরুষজাতির এই বিশেষ গুণ স্ত্রীজাতিতে লক্ষিত হয় না। এই পুরুষত্ব গুণ থাকাতেই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে বশীভূত করিয়া সংসারে আধিপত্য করিতেছে। পুরুষের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, সাহস ও ধৈর্য্য এই শুক্ররসের উপর নির্ভর করে। এই গুণ থাকাতেই পুরুষজাতি সংসারের দুর্ব্বহভার সকল বহন করিতে ক্ষমবান্ হয়। এই গুণ থাকাতেই পুরুষজাতি বাটীর পরিবারদিগের উপর এবং সমাজের উপর আধিপত্য করিতে পারে। এই শুক্ররস সঞ্চিত হইয়াই পুরুষকে পুরুষোচিত সাহস, স্থর ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। এই রস শরীরে পরিচালিত হইয়া পুরুষের দাড়ি নখ প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতিতে যে এত প্রকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই এই শুক্র এবং তাহার অভাব দ্বারাই সংঘটিত হয়।

এখনকার প্রায় সমস্ত শারীরতত্ত্ববিৎপণ্ডিতদিগের মত এই যে, শুক্র রস মুষ্কনামক যন্ত্রদ্বারা নিঃসৃত হইয়া উহার কতকাংশ পুনর্ব্বার পরিপাক হইয়া শরীরস্থ হয় এবং এইরূপে শরীরস্থ হইয়া পুরুষকে পুরুষোচিত স্ফূর্ত্তি এবং বল ও সাহস প্রদান করে। যদিও শুক্র রক্ত হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু রক্ত হইতে ইহার গুণ সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার ন্যায় ওজঃ গুণশালী পদার্থ জীব দেহে আর লক্ষিত হয় না।

ইউরোপে রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে কোন খোজাকে পৌরহিত্যকার্য্যে বরণ করিবার প্রথা নাই। ইউরোপীয় পুরোহিতগণ যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকেন। পুরোহিতগণ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কামরিপুর বশবর্ত্তী হইয়াও উক্ত রিপু দমন করিতে সমর্থ হইবেন। এইটীই পুরোহিতদিগের বিশেষ গুণ হওয়া চাই। এই জন্যই খোজা বা নপুংসকগণ পুরোহিত হইতে পারে না। পুরোহিত বা প্রিষ্টগণ রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট হইয়াও রক্ত মাংসের প্রলোভন দমন করিতে সক্ষম হইবেন। এভিন্ন পুরোহিতগণকে অকৃতদার রাখিবার আরও অন্যান্য কারণ আছে। পুরোহিত অকৃতদার হইয়া সংসারের অন্নচিন্তা ও সন্তান সন্ততির ভাবনা হইতে দূরে থাকিয়া

অপরের মঙ্গল কামনায় দিন অতিবাহিত করিবেন। ওদিকে শুক্র রস সঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে প্রভূত মানসিক ও শারীরিক বল প্রদান করিবে এবং সেই প্রভূত মানসিক বল থাকাতে তিনি অপর মনুষ্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং নিজের মনের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা সকলেরই জ্ঞাত থাকা উচিত যে, শুক্র রস শরীরে পরিপাক হইয়া প্রভূত পরিমাণে মানসিক ও শারীরিক বল বৃদ্ধি করে। এই জীবন সঞ্জিবনী রস সমস্ত শরীরকে উষ্ণতায় পরিপূর্ণ করে, সকলকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও উৎসাহ সম্পন্ন করে। ইহার গুণে পুরুষ কার্য্যতৎপর হয় এবং কঠোর মানসিক পরিশ্রমে সক্ষম হয়। নিম্নশ্রেণীর জীব জন্তুগণ মধ্যে সন্তান হইবার কালে উহাদের পুরুষজাতি কি অসাধারণ সাহস ও তেজ সম্পন্ন হয়। শরৎকালে কুক্কুরগণ এইরূপ অসাধারণ সাহসসম্পন্ন হয়।

এই শুক্ররসে এতদূর সাহস ও বল বৃদ্ধি করে যে, পূর্ব্বকালে মল্লগণ স্ত্রীসহবাস করিতে পাইত না। moses মুসেস্ (মোসা) নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ইজ্‌রালেরা (Israelites) যুদ্ধের সময় স্ত্রীসহবাস করিতে পাইবে না।

যে সকল জন্তু এবং মনুষ্য যথোচিত পরিমাণে শুক্রশালী হইয়াও শুক্রবেগ দমন করিতে সমর্থ, তাহারা অত্যন্ত সাহসী ও বলবান্ হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে যথোচিত পরিমাণে কামরিপুর প্রাবল্য থাকা চাই। জননেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ ও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা চাই। ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগে পীড়িত ব্যক্তি (যে স্ত্রীসহবাসে একান্ত অক্ষম) এরূপ সাহস ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতে পারে না। অপরন্তু খোজাগণ (যাহাদের শুক্র নিঃসৃত হইতে পারে না) তাহারাও এরূপ সাহস সম্পন্ন হয় না। অনেক লোকের সংস্কার আছে যে, খোজাগণ অত্যন্ত বলশালী, সাহসী এবং তেজীয়ান্, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই শুক্ররস ক্ষরণে বঞ্চিত হইলে জীবগণের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। শৈশবকালে ছাগের অণ্ডকোষ চ্ছেদন করিয়া দিলে খাসী হয়। এই খাসী ও একটী পাঁঠা ছাগের চেহারা ও গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইরূপ ষাঁড় ও বলদের আকার গত বিভিন্নতা লক্ষিত হইবেক। ষণ্ডের যেরূপ ঝুট হয় এবং গলার মাংস খণ্ড লম্বিত হয়, বলদের সেরূপ হয় না। বলদের আকৃতি অনেক পরিমাণে গাভীর ন্যায় হইয়া থাকে। ষাঁড় যেরূপ তেজ ও সাহসসম্পন্ন হয়, বলদ সেরূপ হয় না। ষাঁড়ের স্বর গম্ভীর। বলদের স্বর ও শব্দ গাভীর ন্যায়। বলদের শরীর বৃহৎ হইলেও এবং অত্যন্ত বলশালী হইলেও ইহারা ষণ্ডের ন্যায় তেজ ও সাহসসম্পন্ন নহে। বলদ নিতান্ত ভীরু। আক্তা ঘোড়া এইরূপ ভীরু স্বভাব সম্পন্ন। টাটুঘোড়া অত্যন্ত দুরন্ত হইলে উহার সাহস ও তেজ কমাইবার উদ্দেশে উহাকে আক্তা করিয়া দেয়। আক্তা ঘোড়া অত্যন্ত ভয় করে। সামান্য কোন বস্তু সম্মুখে দেখিলেই সোয়ার লইয়া আর এক দিকে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। কোন একটী অসাধারণ সাহস সম্পন্ন দুরন্ত ঘোড়াকে আমরা আক্তা করিবার পর নিতান্ত ভীরু হইতে দেখিয়াছি। সে কালের নবাবের হাব্‌সি খোজাগণ প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট হইলেও তাদৃশ সাহস সম্পন্ন নহে। খোজাদিগের গোঁফ ও দাড়ি উঠে না। চেহারা স্ত্রীলোকের সদৃশ এবং গলার স্বর মিহি। ইহারা অত্যন্ত ভীরু স্বভাব।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সকলপ্রকার বর্ণবৈষম্য, আক্ষেপ, গাত্রকম্পন ও হিক্কা প্রভৃতি দূরীকরণার্থ বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্রতৈল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই তৈল নাভির চতুঃপার্শ্বে এমনভাবে প্রলিপ্ত করিয়া রাখিবে যে, ইহা অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন মস্তক, কণ্ঠ, বক্ষ এবং বস্তিস্থানেও এই তৈল মাখাইবার নিয়ম আছে। অন্যান্য উপদ্রবের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে যে বিশেষ করিয়া বর্ণন করিব, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি। কেন না, সেই সকল দুইবার করিয়া বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে গ্রহদোষজনিত পীড়ার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব।

গ্রহদোষজনিত পীড়া।

প্রসূতি বা ধাত্রীর অশুচী ব্যবহারে এবং সূতিকাঘর বা নবপ্রসূত সন্তানকে সর্ব্বদা অপরিষ্কার রাখিলে স্কন্দাদিগ্রহগণ কুপিত হইয়া শিশুর

নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কুপিত হইলে শিশুর যে যে প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহাই বলা যাইতেছে।—

স্কন্দগ্রহ—এই গ্রহ কুপিত হইলে বালকের এক চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত হয়, গাত্রে ঘর্ম্ম, স্পন্দন ও কম্প উপস্থিত হয়, দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামী, মুখবক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং শরীরে অত্যন্ত রক্তগন্ধ হয়। শিশু অবসাদযুক্ত হইয়া স্তন্যপানে বিরত হয় এবং অল্প অল্প রোদন করে।

স্কন্দাপস্মার—এই গ্রহ দেহে প্রবেশ করিলে শিশু জ্ঞানশূন্য হইয়া মুখ হইতে ফেণা নির্গত করে। অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে। শরীরে পূয় এবং রক্ত গন্ধ হয়।

শকুনী—এই গ্রহ কুপিত হইলে বালকের দেহ শিথিল, বেদনাযুক্ত ও মাংসভোজী পক্ষীর ন্যায় বিগ্রগন্ধ এবং সর্ব্বাঙ্গে দাহ, পাক ও স্রাবযুক্ত পীড়কা এবং স্ফোটক নির্গত হয়। আরও শিশু ভীত হইয়া সর্ব্বদা কাঁপিয়া উঠে।

রেবতী—ইহাদ্বারা অভিভূত হইলে শিশুদিগের শরীর পঙ্কগন্ধবিশিষ্ট এবং ব্রণ ও স্ফোটকদ্বারা আচিত হয়। ঐ সকল ব্রণ ও স্ফোটক হইতে রক্তনির্গম, দ্রবমলরেচন, জ্বর, দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূতনা—ইহাদ্বারা বালকের অতীসার, জ্বর, তৃষ্ণা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, অনিদ্রা, এবং চিত্তের উদ্বিগ্নতা উপস্থিত হয়।

অন্ধপূতনা—এই গ্রহ প্রদুষ্ট হইলে শিশুর প্রবল জ্বর, কাস, তৃষ্ণা, দুগ্ধপানে বিদ্বেষ, বমন, অতীসার, অতিশয় রোদন এবং গাত্রে চর্ব্বির ন্যায় গন্ধ হয়।

শীতপূতনা—ইহাতে কম্প, কাস, দুর্ব্বলতা, বমন, অতীসার ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়।

মুখমুণ্ডিকা—এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিশুর বদনমণ্ডল প্রসন্ন ও শিরাদ্বারা আবৃত হয়, দেহ মূত্রগন্ধ এবং আহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

নৈগমেয় বা পিতৃগ্রহ—কণ্ঠ ও মুখশোষ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বমন, ঈষৎ কম্প, মূর্চ্ছা, দেহের দৌর্গন্ধ্য এবং দন্তকড়মড়ি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—উপরোক্ত লক্ষণদ্বারা যে গ্রহের প্রকোপ বুঝিবে, সেই গ্রহ শান্তির জন্য প্রথমতঃ তন্ত্রবিৎ পুরোহিত আনাইয়া যথাবিধি পূজা ও হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। সেই সকল পূজার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পুরোহিতগণই তাহা আবশ্যকমত তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবেন। পরিশেষে জ্বর, অতীসার, তৃষ্ণা ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য তত্তৎ রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। অচির জাত শিশু যদি স্তন্যপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকা উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। মাড়িদ্বয় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের সহিত ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (অত্যল্প) তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ মধু নিক্ষেপ করিবে এবং অঙ্গুলীদ্বারা বালকের মাড়িতে ঘর্ষণ করিবে। অথবা শুদ্ধ ঘৃতদ্বারা ও উপকার হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বকুল ফল ও পানের বোঁটা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়। সাপের খোসা, রশুন, মুগরামূল, সর্ষপ, নিমের পাতা, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগ লোম, মেষ শৃঙ্গ, বচ ও মধু, এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার ধুপ প্রদান করিলে শিশুর জ্বর ও গ্রহাদির শান্তি হয়। গ্রহ দোষজনিত পীড়া সমূহ উপশম হইলে মুরামাংসী, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক, ও মুথা এই কয়েকটী পদার্থ ভিজাইয়া সেই জলে বালককে স্নান করাইবে। ইহাদিগকে সর্ব্বৌষধি বলে। ইহাতে স্নান করাইলে বালকের ব্যাধি নিবৃত্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও লাবণ্যোৎপত্তি হয়। কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক ও অত্যল্প পরিমাণে ধুতূরামূল, চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত বালককে অবলেহ করাইলে বর্ণ, কান্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

পশ্চারুজ।

এই পীড়া কেবল বালকদিগেরই হইয়া থাকে। ইহা অতি কষ্টদায়ক। মাতার কদন্নাদি ভোজন জন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুর দেহস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা ঐস্থানে জোঁকের উদর সদৃশ এক-প্রকার ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে গুহ্যদেশে দাহ ও উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ এবং প্রবল জ্বর হয়।

চিকিৎসা।—পশ্চারুজরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চোর-কাঁচ্‌কি এই সমুদায়ের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত। কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা. মুথা, কুল আঁটীর শস্য, এই সমুদায় পেষণ করিয়া মধু সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা শিশুকে সেবন করাইলে জ্বর, অতীসার, দুর্ব্বারগ্রহণী, বমি, রক্তস্রাব, শ্বাস, কাস, ও পশ্চারুজ রোগ প্রশমিত হয়। বালকের গুহ্যপাকে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রসোতের প্রলেপ দেওয়া এবং তাহা সেবন করান বিশেষ হিতজনক। ক্রমশঃ—

সাং উমারপুর,
পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সূতিকা তরুণজ্বর বা পচাজ্বর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যদি রোগিণী কুইনাইন বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে, তবে কুইনাইন অধঃত্বাচরূপে (hypo dermically) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুইনাইন হাইড্রোব্রোমেট্ (hydrobromate of quinine) এক হইতে ষোল অংশ জলে দ্রব হইতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ দমন করিবার নিমিত্ত অন্ততঃ ১ ড্রাম হাইড্রোব্রোমেট্ ইন্‌জেকট্ করা কর্ত্তব্য। ১৫ হইতে ২৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন বড়ি পাকাইয়া (সপোজিটরি) গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই কুইনাইনের সপোজিটরিতে বেলেডোনা বা অহিফেণ সংযোগ করিয়া দিলে কার্য্য ভাল হয়। সপোজিটরি তৈয়ার করিতে হইলে অয়েল অব্‌থিওব্রোসা দ্বারা তৈয়ার করা কর্ত্তব্য।

কুইনাইন	... ...	২৫ গ্রেণ
একসট্রাক্‌ট বেলেডোনা	...	½ গ্রেণ
একসট্রাক্‌ট্ ওপিয়াই	...	½ গ্রেণ
অয়েল অব্‌থিওব্রোমা	...	9. S.

মিশ্রিত করিয়া একটী সপোজিটরি কর। এইরূপ সপোজিটরি প্রতি

৪ বা ৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক রোগীতে ওয়ারবর্গের টিংচার উপকার করে (Warburg's tincture.)

একনাইট্ প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপের লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে একনাইট্ প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার হয়, কিন্তু খুব বেশী উত্তাপ লাঘব করিবার একনাইট্রের ক্ষমতা নাই। যদি শারীরিক উত্তাপ ১০১° ডিগ্রির কম হয়, তবে একনাইট্ খাওয়াইলেই যথেষ্ট। প্রথমতঃ টীংচার একনাইট্ একমিনিম মাত্রায় প্রতি ১০ মিনিট অন্তর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঘণ্টা মধ্যে ছয়বারে ছয় মিনিম্ খাওয়ান কর্ত্তব্য, তাহারপর প্রতি ঘণ্টান্তর অর্দ্ধ হইতে দুই মিনিম্ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। তাহারপর যদি উত্তাপ ১০২ ডিগ্রির উপর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ ১৫ গ্রেণ কুইনাইন প্রয়োগ করিবে। কখন কখন একনাইটের সঙ্গে তিন হইতে পাঁচ মিনিম্ মাত্রায় টীংচার বেলেডোনা মিশাইয়া দিলে আরও অধিক উপকার হয়। কখন কখন টীংচার একনাইটের সঙ্গে টীংচার জ্যাবরাণ্ডি মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি জিহ্বা শুষ্ক থাকে এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি না হয়, তবে জ্যাবরাণ্ডি দ্বারা উপকার হয়। জ্যাবরাণ্ডিতে পিপাসা নিবারণ করে। টীংচার জ্যাবরাণ্ডি ১০ হইতে ১৫ মিনিম্ মাত্রায় প্রতি দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি রোগিণী অত্যন্ত সবল হয়, তবে তাহার উত্তাপ লাঘব করিতে পাইলোকার্পিন্ তুল্য ঔষধ আর নাই। পাইল কার্পিন্ ½ গ্রেণ পরিমাণে অধঃত্বাচরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে সকল রোগীণীর তরুণ পেরিটোনাইটিস্ বর্ত্তমান থাকে তাহাদিগের সূতিকা তরুণজ্বরে পাইল কার্পিন্ মহোপকার সাধন করে। পাইল কার্পিন্ বড় শক্ত ঔষধ ইহাদ্বারা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইতে পারে এজন্য পাইল কার্পিন্ প্রয়োগ করিবার ১ ঘণ্টা মধ্যে রোগীকে পুনর্ব্বার দেখা কর্ত্তব্য। কারণ যদি অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয় অথবা ধাতু বসিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ ১/৫০ গ্রেণ এট্রপাইন্ হাইপডার্মিকরূপে (অধঃত্বাচ) প্রয়োগ করিয়া অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নিবারণ করা প্রয়োজন হইয়া উঠে।

এণ্টিপাইরিণ্ অতি উত্তম উত্তাপ লাঘবকর ঔষধ। ইহা ১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা প্রথমতঃ প্রতি ঘণ্টায় ২।১ ডোজ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তারপর একটু উত্তাপ লাঘব হইলে

তখন ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তারপর ১০০ ডিগ্রির নীচে উত্তাপ থাকিলে তখন ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি ৩০।৪০ গ্রেণ মাত্রায় এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগ করিয়াও উত্তাপের লাঘব বুঝিতে না পারা যায়, তবে উক্ত ঔষধ প্রয়োগে ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। অতিরিক্ত মাত্রায় এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগে অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বেগ হয়। এজন্য এণ্টিপাইরিন্ একার্ ভেসিং ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে এণ্টিপাইরিনের একরূপ প্রয়োগরূপ চলিত হইয়াছে। উহাকে গ্র্যানুলার্ একার্ ভেসিং এণ্টিপাইরিন্ কহে। ইহার প্রতি ড্রামে ১০ গ্রেণ পরিমাণে এণ্টিপাইরিন্ থাকে। এই একার্ ভেসিং এণ্টিপাইরিন্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন রোগিণী কুইনাইন বা এণ্টিপাইরিন্ খাইয়া বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে তখন এই একার্ ভেসিং এণ্টিপাইরিন্ অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। এণ্টিপাইরিণের সপোজিটরি (Suppository) প্রস্তুত করিয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১ ড্রাম মাত্রায় একটী সপোজিটরি তৈয়ার হইবে। এণ্টিফেব্রিন্ নামক ঔষধ ও মন্দ নহে। ইহাতে বেশ উত্তাপ লাঘব করে। ইহা ১২ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এণ্টিপাইরিন্ অপেক্ষা এণ্টিফেব্রিণের (Antifebrin) ক্রিয়া মৃদু।

নিউমোনিয়া বর্ত্তমান থাকিলে কেয়ারিণ নামক ঔষধ উত্তাপ লাঘব করণার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। সূতিকা তরুণজ্বরে ইহা তাদৃশ উপকার করে না।

স্যালিসিন অথবা স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়ম্ অতি উত্তম ক্রিয়া করে। স্যালিসিলিক্ এসিড্ কোন কাযের নহে। ইহাতে পাকস্থলীর উত্তেজনা করে। স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা অপেক্ষা স্যালিসিন্ ভাল। স্যালিসিন্ শরীরে হজম হইয়া স্যালিসিলিক্এসিড্ হইয়া কার্য্য করে। সুতরাং ইহা স্যালিসিলিক্এসিডের ন্যায় পচন নিবারক এবং উত্তাপ নিবারক হইয়া কার্য্য করে, অথচ স্যালিসিলিক্ এসিডের ন্যায় পাকস্থলীর উত্তেজনা উপস্থিত করে না। স্যালিসিন্ (Salicin) ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি তিন বা চারি ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়াম্ ২০ হইতে ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কার্ব্বলিক্ এসিড্ তিন মিনিম্ মাত্রায় গ্লিসেরিণের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে পচন নিবারক হইয়া উত্তাপের লাঘব করে। কার্বলেট্ অব্কুইনাইমরূপেও কার্ব্বলিক এসিড্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্ন লিখিত প্রেস্ক্রপ্সন্ বড় উপকারক :—

Rs.

কার্ব্বলিক এসিড্	... ...	
কুইনাইন	... ...	A A 3 ।̄
ডাইলুট্ সল্ফিউরিক্ এসিড্	...	3 ॥
গ্লিসেরিণ	... ...	ZSS
জল	... ...	ZX ॥

এই মিক্চারের অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে প্রতি দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যায়। একটী রোগিণীর বেলা ১০ টার সময় নাড়ীর গতি ১২০° ছিল এবং উত্তাপ ১০৩'৭° ছিল। উক্ত মিশ্রন তিনবার সেবন করিবার পর বেলা চারিটার সময় উহার উত্তাপ ১০২০ হয় এবং নাড়ী ১০৪ হয়। রাত্রি ৮ টার সময় উত্তাপ ১০০'৭ ৭° হয়।

কার্ব্বলিক এসিড সল্ফোকার্বলেট্ অব্সোডিয়মরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু সল্ফোকার্ব্বলেট্ অব্ সোডিয়মের ক্রিয়া অনিশ্চিত এবং মৃদু। ইহা সম্ভবতঃ এণ্টিজাইমোটিক্ এবং পচন নিবারক। অপরাপর ঔষধের দ্বারা উত্তাপ লাঘব করিয়া তাহার পর দুই এক ডোজ সল্ফোকার্বলেট্ প্রয়োগ করিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

বেল্জোয়েট্ অব্ এমনিয়া পচন নিবারক কিন্তু ইহা সেবন করিতে কষ্টকর। বোরিক্ এসিড্ অথবা সোডিয়ম্ বোরেট্ (Sodium Borate) ইথার (ether) সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিলে সূতিকার পচাজ্বরে উপকার করে। ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এমাইল নাইট্রিকাম।

ইহা একটী রাসায়নিকপদার্থ সুরাদ্বারা ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়

বিষম গুণ-গ্লোনয়ন, এট্রোপিয়া, একোন, কফিয়া, জেলসি, কর্পূর—

মাত্রা—৩০,২০০

এই তেজস্কর ঔষধ মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মর্জ্জাদ্বারা নিম্নলিখিত যন্ত্রে বিশেষ কার্য্য প্রকাশ করে।

১। রক্তসঞ্চালনক্রিয়া—ধমনীর স্নায়ু সকল (সমবেদনস্নায়ু) এই ঔষধ ব্যবহারে পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় রক্ত শিরার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া উহাতে অধিক-পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন হয়; এই হেতু অধিকমাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহারে শরীরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম প্রকাশ হইয়া থাকে। সমবেদন বা ভাজোমোটর স্নায়ু রক্তশিরার পেশীনির্ম্মিত আচ্ছাদে থাকিয়া উহার সঙ্কোচন ও প্রসারণক্রিয়ার সমতা সম্পাদন করিয়া একভাবে রাখে অর্থাৎ অস্বাভাবিক সঙ্কোচন বা প্রসারণ হইতে দেয় না কিন্তু এই ঔষধে উহাদিগের পক্ষাঘাতহেতু ধমনীনলি সকল প্রসারিত হয়।

২। হৃদ্‌পিণ্ড—এই যন্ত্রের ভেগাস স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মাইয়া উহার প্রচণ্ড কার্য্যাধিক্য উৎপাদন করে। ভেগাস বা নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুদ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য সমতা হয় অর্থাৎ উহার অস্বাভাবিকগতির (দ্রুততা বা ধীরতা) বাধা জন্মায়। উহার পক্ষাঘাত হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুততার অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

৩। দৈহিক উত্তাপ—দৈহিক উত্তাপের প্রচুর হ্রাস হয়। ইহার কারণ দেহমধ্যে যে অনবরত কার্ব্বনিক এসিড্ নামক গ্যাস প্রস্তুত হইতেছে তাহার সম্যক্‌রূপে নিষ্ক্রামণ না হওয়া, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাসদ্বারা রক্তের উত্তাপ বৃদ্ধি ও পেশীসূত্র সকল পরিবর্ত্তীত হয়, অধিকপরিমাণে এই ঔষধ ব্যবহারে তাহা না হইতে পারায় গাত্রের উত্তাপ ক্রমে কমিতে থাকে।

৪। স্নায়ুমণ্ডলি—প্রতি স্নায়ুর চালনাশক্তি-উৎপাদক স্নায়ুসূত্রের

পক্ষাঘাত জন্মায়। কশেরুকা মর্জ্জার যে অংশ হইতে ঐ সকল সূত্র বাহির হইয়াছে তাহার কার্য্য খর্ব্ব হওয়ায় ইহা উৎপন্ন হয়। যে সকল স্নায়ুসূত্র দ্বারা চেতনাশক্তি প্রকাশ হয় তাহাদের উপর আর কোন কার্য্য লক্ষিত হয় না, প্রতি স্নায়ুতে এই দুইপ্রকার স্নায়ুসূত্র আছে।

৫। মূত্রগ্রন্থি—এই ঔষধ অধিকপরিমাণে ব্যবহারে মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ের কার্য্যাধিক্য উৎপাদন করে, এই হেতু মূত্রপরিমাণে অধিক সঞ্চার হয় ও রক্তের শর্করা অধিকপরিমাণে আচুসিত হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়।

৬। বাহ্যিকপ্রয়োগে—যে কোন স্থানে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ করিলে ঐ স্থানের কার্য্য খর্ব্বতা ও ক্রিয়াবিকার জন্মায়। ঐ স্থানের পেশী সূত্র স্নায়ু ইত্যাদি সমস্তই নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

প্রয়োগলক্ষণ—মুখমণ্ডল মস্তক এবং গ্রীবা আরক্ত, উহাতে উত্তাপ বোধ ও ঘর্ম্মের সহিত হাত ও পায়ের পাতা শীতল থাকা যেকোন পীড়ায় ইহার প্রয়োগলক্ষণ (বার্ট। স্ত্রিলোকের ঋতুকালিন মস্তকে ও মুখে ঐ প্রকার অনুভবে ইহাই উৎকৃষ্ট। "কটীদেশে একপ্রকার প্রচণ্ড জ্বালা আরম্ভ হইয়া উত্তাপের সহিত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া ঘর্ম্ম হওয়া। এই অনুবোধ এত অসহনীয় হয় যে, রোগী অস্থির হইয়া শীতল বাতাসের নিমিত্ত শীতকাল হইলেও বহির্বাতাসে যাইতে বাধ্য হয়।" (রিংগার)। দুর্ব্বলতাহেতু রাত্রে ঘর্ম্মে ইহা একটী উত্তম ঔষধ।

মস্তক—কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে এই বৃথা ভাবনায় উদ্বেগ, বহির্বাতাস নিতান্ত আবশ্যক বিশ্বাস, মস্তকে দপদপানি ও কর্ণে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভবহেতু প্রকৃত ভয়।" (হে)

মস্তকে অতিশয় ভার বোধের সহিত উহাতে দপদপানি ও ফেটে যাওয়া অনুভব কপালে ধমনীর স্পন্দন দৃষ্ট হওয়া, ঐ স্থানে টাটানি এবং রক্ত উর্দ্ধে উঠিতেছে অনুভব" হে।

ইহা ব্যবহারে মস্তকে যে রক্তসঞ্চার হয় তাহাতে কোনপ্রকার মস্তকে বেদনা বোধ হয় না কিন্তু ভার ও চাপ অনুভব হয়।

মস্তিষ্কচালনাকারীদিগের অনিদ্রা ও উদ্বেগসূচক স্বপ্নদর্শন।

মস্তকের একপার্শ্বের শিরঃপীড়া বা স্নায়ুশূলের সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কম্পন এবং সুস্থপার্শ্ব অপেক্ষা আক্রান্তপার্শ্ব রক্তশূন্য দৃষ্ট হওয়া। রক্ত-

সঞ্চারহেতু শিরঃপীড়া চলিয়া বেড়াইলে ও উষ্ণবায়ুতে বৃদ্ধি এবং শীতল বাতাসে এবং স্থিরভাবে থাকিলে শান্তি।

চক্ষু—"চক্ষে কনকনে বা দপদপে বেদনা, প্রচুর জলস্রাব ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি। চক্ষু আরক্ত ও উজ্জ্বল, বোধহয় যেন বহির্গত হইতেছে"। (হে)

কর্ণ—"কর্ণে দপদপে বেদনা ও হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে ফেটে যাওয়া অনুভব। কর্ণে জ্বালা ও উত্তাপ"। (হে)

পরিপাকযন্ত্র—"আস্বাদগ্রহণে ওষ্ঠদ্বয় যে প্রকারে চালিত হয়, সেই প্রকারে চালনা, চর্ব্বণকরার ন্যায় মাড়ীচালনা"। (হে)

"বায়ুনলির দুই পার্শ্বে কেরটিড় ধমনীতে সংঙ্কোচন অনুভব, পাকাশয়ে ভারবোধ ও চাপ অনুভব, উদ্‌গার ও পাকস্থলির শূল" (হে) পাকাশয়ে আক্ষেপ।

মূত্র—অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত প্রস্রাব। এইহেতু প্রখর বহুমূত্ররোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জননেন্দ্রিয় স্ত্রী—স্নায়ুবীয় আক্ষেপিক রক্তকৃচ্ছ্র, অতিরিক্ত রজস্রাব। ঋতুকালীন বামপার্শ্বের প্রচণ্ড শিরঃপীড়া, প্রাতে আরম্ভ হইয়া দুইপ্রহরে অতিশয় প্রবল হইয়া সন্ধ্যায় মগ্ন হয়, উহার সহিত বমন"। হে

সন্তানপ্রসবান্তে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। এই ঔষধ আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। প্রসবান্তে তড়কার ন্যায় আক্ষেপে ইহার আঘ্রাণ মহা ঔষধ।

শ্বাসপ্রশ্বাসযন্ত্র—"কণ্ঠে সঙ্কোচনভাব বক্ষঃ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া"; শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কষ্টের সহিত দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস; স্বরযন্ত্রে ও বায়ুনলিতে হাঁপানি ও শ্বাসাবরোধের ন্যায় অনুভব; আক্ষেপসহকারে শ্বাসাবরোধক কাসী ৪।৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও কোঠরের প্রসারণহেতু শ্বাসাবরোধের সহিত সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় শোথ ইত্যাদিরোগে বিশেষ উপকারী" হে।

যে সকল হাঁপানি অর্থাৎ শ্বাসকাসরোগ ফুস্ ফুস্ বা হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়াজনিত উৎপন্ন না হইয়া স্বয়ংভূত প্রকাশ হয়, তাহাতে ডাক্তার উড বলেন যে, ইহা প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ হাঁপানির ফিট (আক্ষেপ) বন্ধ হইবে। হুপশব্দ-

যুক্ত কাসীতে প্রয়োগ করিলে উহার সহিত বোধহয় কষ্টেরও লাঘব করে। এসকল স্থলে উহার আঘ্রাণ লইলেই যথেষ্ট হইবে।

"হৃদ্‌শূলের সহিত হৃদ্‌পিণ্ডে ও ধমনীতে দপদপানি, হৃদ্‌পিণ্ডস্থানে অসহনীয় বেদনা দক্ষিণবাহু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া" ডাঃ রিংগার। হৃদ্‌শূলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই ইহার আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এইহেতু যাহাদের এই পীড়া আছে তাহাদিগের এই ঔষধ সঙ্গে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ যেখানে ফিট হউক তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা যায়।

"দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্মান্তে কেরটিড় ধমনীর হটাৎ দপদপানি মস্তক ও পার্শ্বললাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া মুখমণ্ডল উষ্ণ ও আরক্ত হইয়া উঠে" হে "সামান্য কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা ও প্রবলক্রিয়ার সহিত উদ্বেগ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের দৃঢ়তা, আক্ষেপিক কাসীর সহিত হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর গতি এত দ্রুত হয় যে, গণনা করা দুঃসাধ্য।" হে

"হৃদ্‌পিণ্ডের চতুস্পার্শ্বে কনকনে বেদনা ও সঙ্কোচনভাব" হে।

হস্তপদ—হৃদ্‌শূলে দক্ষিণ বাহুতে অতিশয় বেদনা; দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধের বেদনা; হস্তের রক্তশিরা সকলের অতিশয় প্রসারণ, হাতকাঁপনি, অঙ্গুলি সকল অসাড় ও কঠিন; হস্তে অতিশয় ঘর্ম্ম; বাহু ও জঙ্ঘাতে অসাড়তা ও বেদনা" হে।

স্নায়ু—অতিশয় অস্থিরতা, বোধহয় যেন সর্ব্বাঙ্গের পেশীচালনা হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তিবোধ।

মৃগী—পুনঃ পুনঃ মৃগীর আক্ষেপ, উহার বিরামকালে চেতনারহিত্য, ঐ আক্ষেপ আরো শীঘ্র শীঘ্র হইয়া বিরামকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ একটী আক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে না হইতে পুনরায় আক্ষেপ আরম্ভ হয়। ডাক্তার উড বলেন যে, নূতন আবিষ্ক্রিয়ানুসারে মৃগীরোগের আক্ষেপ নিম্ন মস্তিষ্কের ধমনীর স্নায়ুর (ভাজোমোটর) আক্ষেপহেতু উৎপন্ন হয়, সেই জন্য যে স্থলে ঐ আক্ষেপ পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত হইতে থাকে সেখানে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং যে স্থলে মৃগীয় আক্ষেপ প্রকাশ হওয়ার অগ্রে অরা-এপিলেপটিকা সচরাচর অনুভূত হয় তাহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রেই ঔষধ ব্যবহার করিলে মৃগীয় আক্ষেপ হইতে পারে না।

"প্রসবান্তে তড়কার ন্যায় আপেক্ষ হইলে ইহার আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ আক্ষেপ নিবারণ হইবে" ডাঃ জেল্ক।

জ্বর—"সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ শীতবোধ ও মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; মুখের পাকাশয়ের লালাস্থান হইতে উত্তাপ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হওয়া, উত্তাপ আর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, উত্তাপকালীন সর্ব্বাঙ্গে দপদপানি ও তদ্‌পরে এত দুর্ব্বলতা যে, শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষমতা" হে।

সবিরাম জ্বরে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং যেসকল সবিরাম জ্বরের প্রথমাবস্থা অর্থাৎ শীত বহুক্ষণ থাকে তাহাতে ইহা প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়াবস্থা আনে। বৃদ্ধি-চলিয়া বেড়াইলেও উষ্ণ গৃহে; শান্তি, বহির্বাতাসেও স্থিরভাবে থাকিলে।

কলিকাতা
আশ্বিন।

ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু
এল্, এম্, এস্।

নাসিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নাসারোগের নিদান।

নাসিকা ফিল্‌টারের স্বরূপ। নাসিকাদ্বার দিয়া বায়ু গমনকালে বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে। বায়ুর উষ্ণতাও বৃদ্ধি হয়। অতএব কোন পীড়াবশতঃ নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ হইলে যে, কতদূর অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এবং নাসিকা দিয়া শ্বাসগ্রহণ না করিয়া মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করাও সমূহ অপকারক। বালকদিগের নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে মুখ দিয়া শীতল বায়ু গ্রহণ করে। তাহাতে তাহাদিগের ব্রংকাইটিস্ পীড়া উপস্থিত হয়।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে বধিরতা রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

অনেক ব্যক্তি প্রাতে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কহেন যে, তাঁহাদের মুখ, জিহ্বা ও তালু নীরস ও শুষ্ক হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, উহারা রাত্রে নিদ্রা যাইবার সময় মুখ দিয়া হাঁ করিয়া

শ্বাসগ্রহণ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই উহাদিগের জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক হইয়াছে। যাহারা মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করে তাহাদিগের নাক ডাকিতে থাকে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে প্রায় এইরূপ হয়।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে রাত্রে দম বন্ধ হয়। ইহাকে লোকে সচরাচর "মুখ-চাপা" বলে। দম বন্ধ হইলেই লোকে নানা বিভীষিকা স্বপ্নদর্শন করে।

নাসিকা অবরুদ্ধ হওয়াতে রোগী নিদ্রাকালীন মুখ দিয়া নিশ্বাস লইতে থাকে। দৈবাৎ রোগী পাশ ফিরিয়া শয়ন করিবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে সুতরাং তৎকালে রোগীর শ্বাসাবরোধ উপস্থিত হয় এবং রোগী যেন মনে করে, কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে গলার স্বরের পরিবর্ত্তন হয়। নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে মানুষ তোতলাও হইতে পারে।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে মানুষ ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

সর্দ্দি লাগিয়া শ্লেষ্মাদ্বারা নাক বন্ধ হইলে কোন দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায় না।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে কাসীর ব্যামও হইতে পারে। ডাক্তার বাবর (Baber) কহেন-তিনি একটী লোকের নাসিকার ভিতর প্রোব চালাইয়া দিয়াছিলেন ঐ প্রোব ইন্‌ফিরিয়ার টর্‌বিনেট্ বডিতে (Inferior turbinated body) ঠেকিবামাত্র উহার ভয়ঙ্কর কাসী উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য তিনি বলেন যে, কাসরোগ হইলে যেমন ডাক্তারেরা গলা ও বুক পরীক্ষা করেন, সেইরূপ নাসিকাদ্বার পরীক্ষা করাও কর্ত্তব্য। টর্‌বিনেটেড্ বোনের কন্‌জেস্ সন্ হইলে কাসী হইতে পারে।

এই সম্মিলনী পত্রিকায় ডাক্তার গগনচন্দ্র নন্দী মহাশয় নাসিকার নাসারোগসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কি কারণে নাসা উপস্থিত হয়, তাহার নিদানসম্বন্ধে তিনি সম্পাদক ও পাঠকবর্গের মত চাহিয়াছিলেন।

আমাদিগের মতে গগন বাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত। যদিও কোন ইংরাজি চিকিৎসা গ্রন্থে নাসারোগের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু আধুনিক কোন ইংরাজি চিকিৎসা-পত্রিকায় উহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

নাসারোগ আর কিছুই নহে, উহা নাসিকার টর্‌বিনেট্ বডির (Turbinated body) রক্তাধিক্যতা (Turgescence)। এই সকল স্থলে নাসিকা পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, নাসিকার বাহির দিকের ধার হইতে (outer wall of the nose) একটী গোলাকার ফুলা (Swelling) রহিয়াছে। ঐ ফুলা বৃহৎ হইলে নাসিকার সেপ্টম্ (Septum) পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যদি আমরা প্রোব দিয়া ঐ ফুলাটী পরীক্ষা করি, তাহা হইলে উহা কোন তরল দ্রব্য পরিপূর্ণ ফুলা বলিয়া বোধ হইবে।

নাসারোগ একরূপ সর্দ্দি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা মস্তকের সর্দ্দি অথবা (cold in the head)। নাসারোগ হইলে রোগীর মাথা ভার হয় এবং ঘাড় কামড়ায়। নাসিকাদ্বারও অবরুদ্ধ হয়। অবরুদ্ধ হইবার কারণ এই ;— নাসিকাদ্বারের ইন্‌ফিরিয়ার্ টর্‌বিনেটেড্ অস্থির (Inferior turbinated bone) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucus membrane) পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহাতে অত্যধিক পরিমাণে ইরেক্‌টাইল টিস্থ (erectile tissue) রহিয়াছে। এই (erectile tissue) অতি সহজেই রক্ত পরিপূর্ণ হয়। সর্দ্দি লাগিলে ঐ মিউকস্ মেম্‌ব্রেণে রক্তাধিক্য হইয়া ঐ স্থান রক্তপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতেই মাথা ও ঘাড় কামড়ায় এবং রোগী অত্যন্ত অসুখ অনুভব করে। সকল ব্যক্তির সর্দ্দি হইলে এরূপ অবস্থা হয় না। কারণ সকলের নাসিকার অবস্থা সমান নয়। যাহাদিগের নাসিকার (erectile tissue) দুর্ব্বল এবং সহজে সঙ্কুচিত হয় না, তাহাদিগেরই এইরূপ অবস্থা হয়, ইহাই প্রকৃত নাসারোগ। ম্যালেরিয়া রোগের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

এই কন্‌জেস্‌সন বা রক্তাধিক্যতা রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলেই পুনঃ পুনঃ নাসা হইতে থাকে। নাসা একবার ভাঙ্গিয়া দিলে আবার হয়, তাহার কারণ এই যে, যে কারণবশতঃ নাসিকার রক্তাধিক্যতা রোগ জন্মাইতেছে, সে কারণ নাসা ভাঙ্গিলে দূরীভূত হয় না। নাসা ভাঙ্গিলে তখনকারমত আপাততঃ কষ্ট দূর হয়। কিন্তু নাসিকার (chronic Turgescence) বর্ত্তমান থাকাতে নাসিকার (erectile tissue) পুনর্ব্বার রক্তপূর্ণ হয়। পুনঃ পুনঃ নাসা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্রমে ক্রমে পুরু এবং শক্ত হইয়া যায়, তখন আর সহজে সারে না এবং নাসা ভাঙ্গিতেও পারা যায় না।

নাসা হইলে কোকেন সল্যুসেন (শতকরা ১০ ভাগ) Solution of cocain) দ্বারা নাসিকা দ্বার সেপ্র করিলে নাসারোগ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়। সাধারণ মস্তক সর্দ্দি (headcold) রোগে কোকেন দ্রবদ্বারা নাসিকা সেপ্র করিলে অতি সত্বর রোগের উপশম হয়।

যদি টর্‌বিনেট্ বোনের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শক্ত ও পুরু হইয়া যায়, তবে প্রোবদ্বারা ঐ নাসার ফুলা পরীক্ষা করিলে উহা শক্ত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে অস্ত্রকার্য্যদ্বারা ঐ ফুলা কাটিয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এরূপ হইলে এক্রেজর (wire ecraseur) দ্বারা ঐ (hypertrophied lump) কর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

লোকমাত্রেরই সামান্য সর্দ্দি হইলেই টর্‌বিনেটেড্ বডিতে অল্প রক্ত জমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হইতে হইতে উহার (erectile) টিস্থর সঙ্কোচনশক্তি কমিয়া যায় এবং চিরকালের জন্য নাসিকাতে রক্তাধিক্যতা রোগ জন্মায় এবং নাসা ভাঙ্গিলেও পুনঃ পুনঃ নাসা হয়। নাসিকার টর্‌বিনেটেড্ বডির অবস্থা এইরূপ যে, উহাতে অতি সামান্য কারণেই রক্ত আসিয়া জমে এবং উহা ফুলিয়া উঠে। এই বিষয়টী অতি সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। দিবসে আমরা যে সময়ে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, সে সময়ে আমাদিগের টর্‌বিনেটেড্ বডিতে রক্ত জমিতে পারে না, যেহেতু মস্তক উচ্চ থাকে। কিন্তু রাত্রিকালে মাথা নিচু করিয়া শয়ন করিলে, সেই সময় আমরা যদি চিৎ হইয়া থাকি, তবে ক্রমে ক্রমে টর্‌বিনেটেড্ বডিতে রক্ত জমিয়া নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ প্রায় হয়, এজন্য চিৎ হইয়া শুইলে মুখব্যাদন করিয়া শ্বাসগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। যে কোন ব্যক্তি মাথা নিচু করিয়া চিত হইয়া শয়ন করিয়া এই বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই অবস্থায় মুখ বন্ধ করিয়া কেবল নাসিকা দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিলে যেন বোধ হয় শ্বাস লইতে কষ্টবোধ হইতেছে। ক্রমে এইরূপ ভাবে শ্বাসগ্রহণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। তার পর এই অবস্থায় আমরা যদি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ডানপাশে শয়ন করি, তবে দেখিতে পাই বামদিকের নাসিকা ক্রমে পরিষ্কার হইয়া যায় এবং দক্ষিণ দিকের নাসিকায় রক্ত জমিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। তার পর আবার পাশ ফিরিয়া বামপ্রাশে শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকা পরিষ্কার হইয়া যায় কিন্তু বাম নাসিকা বন্ধ

হইয়া আইসে। যাহাদিগের নাসিকাদ্বার সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, তাহাদিগের এইরূপ অবস্থা না হইতে পারে, কিন্তু সুস্থ নাসিকা প্রায় পাওয়া যায় না। আমি নিজে এই বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে আমার ঠিক পূর্ব্ব-লিখিত অবস্থা উপস্থিত হয়। অনেক ব্যক্তি কেবল একপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। অন্য পার্শ্বে শুইতে পারে না, যেহেতু এই সকল ব্যক্তির এক-ধারের নাসিকাপথ কোন কারণবশতঃ একবারেই অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থলে যেদিক ভাল আছে, সেই দিক নিচু করিয়া শুইলে ঐ নাসিকাও বন্ধ হইয়া যায়। ও ধারের নাসিকা ত বন্ধই আছে। সুতরাং উহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল ব্যক্তি ভাল নাকটী উপর দিকে করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

শিশুচিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিমতে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গলা বেদনা, গলা ক্ষত ও তালু পার্শ্ব গ্রন্থি প্রদাহ।

(এঞ্জাইনা, সোরথ্রোট, টন্‌সিলাইটিস) গলাবেদনা ও কণ্ঠপ্রদাহ নানাকারণে উৎপন্ন হইতে পারে; তন্মধ্যে কতকগুলি কোন কোন বিশেষ রোগের লক্ষণস্বরূপ বা উহাদের সহিত একত্র প্রকাশ হয় যথা ডিপ্‌থিরিয়া, আরক্ত জ্বর বা বসন্ত ইত্যাদি। স্ফোটসংক্রান্ত পীড়ায় অথবা মুখের বিসর্প ব্যাপ্ত হইয়া কণ্ঠ আক্রান্ত হওয়া কিম্বা মুখ গহ্বরের ক্ষতবৃদ্ধি হইয়া গলার মধ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এই সকল কারণব্যতীত স্বয়ম্ভূত কি কি কারণে এ পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাই এস্থলে বর্ণনা করা যাইবে।

কারণ। যাহাদের একবার গলা ক্ষত বা তালু পার্শ্বগ্রন্থি প্রদাহ হয়, তাহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়া সম্ভব, যে সকল কারণে স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য জন্মে তাহাতেই এ পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে এবং যে সকল শিশু স্বভাবতই দুর্ব্বল ও কৃশ তাহারাই সচরাচর আক্রান্ত হয়। এ রোগের উত্তেজক কারণ মধ্যে হিম লাগা সর্ব্বপ্রধান, যথা হিমে অনাবৃত থাকা,

সন্তাপের পরিবর্ত্তন বা শীতল সিক্ত বাতাস গাত্রে লাগা ইত্যাদি; কখন কখন পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতিহেতু উৎপন্ন হইতে পারে, স্থানিক উত্তেজনা যথা অতি উষ্ণ বা অতিশয় শীতল দ্রব্য সেবন করা অনেক সময় এ রোগের কারণ হইয়া উঠে, বায়ুর সহিত কোন বিষাক্ত বাষ্প মিশ্রিত থাকিয়া উহা শ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা সন্তানের কণ্ঠে লাগিলে প্রদাহ সম্ভব, অনবরত চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করাও কারণমধ্যে পরিগণিত।

লক্ষণ। কণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পীড়ায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এস্থলে একত্রে সকল প্রকার কণ্ঠের পীড়া বর্ণন করা যাইতেছে। এজন্য লক্ষণ সকল একস্থানে দেওয়া হইল। গলার মধ্য বেদনা ও এক-প্রকার অস্বাভাবিক অনুবোধ; উহা সর্ব্বত্র একপ্রকার নহে, কিন্তু সচরাচর কণ্ঠে শুষ্কতা, জ্বালা, টেনেধরা বা কোন একটী বাহ্যিক পদার্থ গলার মধ্যে সতত রহিয়াছে, অনুভবহেতু পুনঃ পুনঃ খক্‌খকে কাসী অথবা অনবরত গলাধঃকরণে ইচ্ছা থাকে, কাহার কাহার গলার উপরে চাপিলে বেদনাবোধ হয়। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে বেদনা, অতিশয় কষ্ট বা একেবারে অক্ষমতা; কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন যথা; স্বরভঙ্গ গুণের বৈলক্ষণ্য, নাকে কথা বা একে-বারে বাক্‌রোধ; খক্‌খকে বা শুষ্ক কাসী প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা; সাধারণতঃ কণ্ঠের কোনপ্রকার পীড়ায় শ্বাসাবরোধ হয় না, তবে কোন কোন অবস্থায় চিৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে কিঞ্চিৎ বাধা জন্মিতে পারে বা মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করা আবশ্যক হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং বধিরতা প্রায়ই দেখা যায়। কণ্ঠের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে হইলে সন্তানকে হা করাইয়া একখানি চামচ বা পরীক্ষকের একটী অঙ্গুলি-দ্বারা জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়া গলার মধ্য ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। যে সকল বিষয় দেখিতে হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল; গলার মধ্যে স্বাভা-বিক অবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য হইয়াছে কি না, যথা উহার বর্ণ, কোমলতা, কঠিনতা ও শীতলতা, কোনপ্রকার পদার্থ সঞ্চার হইয়াছে কিনা, গলনলির আয়তনের কোন ব্যতিক্রম, আল জিহ্বা (ইভুলা), তালু পার্শ্বগ্রন্থি (টন্‌সিল) কোমল তালু ইত্যাদির প্রকৃত অবস্থা, ঐ সকল স্থানের কোন অংশ স্ফীত হইয়াছে কিনা, উহাতে কোনপ্রকার ক্ষত বা স্ফোটক বা অর্ব্বুদ আছে কিনা এ সমস্ত বিষয় সুন্দররূপ পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত।

গলাবেদনার (সোরথ্রোট) কারণ অনুসারে চিকিৎসা।

গলাবেদনা ও তালুপার্শ্ব গ্রন্থিপ্রদাহ। টন্‌সিল বা তালু পার্শ্ব-গ্রন্থি প্রদাহ না হইলে এপ্রকার গলাবেদনা দৃষ্ট হয় না। ইহার সহিত জ্বর থাকিলে একোন ৩০ ক্রমের ৩ টীমাত্র উপবটিকা অর্দ্ধছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অর্দ্ধতোলা প্রতিবার তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে শরীরের উত্তাপ ও জ্বরের প্রতিকার হইয়া পীড়া আরোগ্য হইবে। পার্শ্বস্থ গ্রন্থির অতিশয় স্ফীততার সহিত শিরঃপীড়া ও মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চারের লক্ষণ থাকিলে বেল ব্যবস্থা। গলাধঃকরণে কর্ণে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা এবং তালুমূলের পশ্চাৎভাগে ও গ্রীবায় যন্ত্রণাবোধ হইলে হিপার। নিদ্রার পরে পীড়ার বৃদ্ধি ও গ্রীবার চৈতন্যাধিক্য থাকিলে ল্যাকে। দপ্‌দপানি ও বিদীর্ণকারক বেদনায় ও তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থির স্ফীততায় বেল ও হিপার ব্যবস্থা। ইহাতে কোন উপকার না দর্শিলে সিলি ব্যবহার্য্য। তালুপার্শ্বে স্ফোটক হইলে প্রথমাবস্থায় বেলদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পরে মার্ক ব্যবহার করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রণ হইতে পূয নির্গত হইয়া আরোগ্য হইতে পারে। তালু পার্শ্বস্থগ্রন্থির (টন্‌সিলের) কঠিনতা বা ক্ষত দৃষ্ট হইলে ইগ্নে উপযুক্ত ঔষধ। যে সকল ক্ষত অল্পসময়ের মধ্যে অতি সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে বেল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষতে মার্ক। এই প্রকার প্রদাহবিশিষ্ট গলমধ্যস্থ বেদনা ও টন্‌সিল অপেক্ষা তালু অধিক স্ফীতবোধ হইলে ফস, আর্স ও ব্রাই এবং স্থানবিশেষে বেল বা একোনদ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। আল্‌জিহ্বা অধিক স্ফীতবোধ হইলে কফি বা ল্যাকে। পুরাতন পীড়ায় বেরিটা, সিপি, সলফ ও ক্যাল ব্যবহার্য্য।

টন্‌সিল গ্রন্থিতে উপক্ষত বা জাড়ি ঘাবিশিষ্ট প্রদাহ। ইহাতে তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থিতে অল্পায়তনবিশিষ্ট ঈষৎ ধবল চেপ্‌টা বা সমান ক্ষত দৃষ্ট হয়। সচরাচর এই প্রকার ক্ষত বহুদিবস এক আকারে থাকে। সাধারণতঃ ইহা ইগ্নে মার্ক বা কার্ব ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন এসিডনাইট্রিক এস্থলে আবশ্যক হইতে পারে। ক্ষতস্থানে জ্বালা থাকিলে ক্যাপসিকাম ব্যবহার্য্য।

প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দিজনিত গলাবেদনা। প্রথমাবস্থায় একোন

ব্যবহার্য্য, ইহাতে নিষ্ফল হইলে ও পশ্চাৎ তালুর বন্ধুরতা বা চুলকান ভাবযুক্ত বেদনা থাকিলে নক্‌স। আক্রান্তস্থান উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, শুষ্ক ও গলাধঃকরণে কণ্ঠে আক্ষেপ বোধ হইলে, বেল। কণ্ঠ শুষ্কতার সহিত হুলফুটানবৎ বেদনা অনুভব ও গলাধঃকরণে কঠিন কোন বস্তু কণ্ঠে সংস্থাপিত থাকার ন্যায় ক্লেশবোধ হইলে ব্রাই বিশেষ উপকারী। অতিশয় শীতল বাতাস লাগায় বা ঘর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া তালুমূল আক্রান্ত হইলে ও গলা চুলকাইয়া কাসীর উৎপত্তি এবং লালাগ্রন্থির স্ফীততা দৃষ্ট হইলে ক্যামোমিলা ব্যবস্থা। বহির্ব্বাতাসে কণ্ঠের উপদাহ, কাসী, আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি, তালুপার্শ্বে বেদনা, গলাধঃকরণে সতত ইচ্ছা ও কণ্ঠে কোন বস্তু সংলগ্ন থাকা অনুভব হইলে কফিয়া, পিপাসা রহিত অথচ কণ্ঠ শুষ্ক, কণ্ঠস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত অনুভব ও রাত্রে বৃদ্ধি হইলে পাল্‌স্ ব্যবস্থা।

বাতজনিত বেদনা। গ্রীবায়, মস্তকে ও হস্তপদাদিতে বিদীর্ণ বা ছিড়ে ফেলার ন্যায় অনুভব হইলে একোন ব্যবহারে আশু প্রতিকার হইবে। পরে ব্রাই ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে, বিশেষতঃ যদি রোগী উগ্র স্বভাববিশিষ্ট হয়। কোমল ধীর ও শান্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে পাল্‌স ব্যবস্থা।

তালুমূলে বা টন্‌সিলে পচনশীল ক্ষত। কৃত্রিম পর্দ্দাবিশিষ্ট প্রদাহ না হইলে আর্স, বেল বা সিলি ব্যবহারে নিশ্চিত উপকার হইবে। পুরাতন বা পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল পীড়ায় ব্যারিটা, সিপি, ল্যাকে, সালফ ও ক্যাল ব্যবহার্য্য।

কলিকাতা }
আশ্বিন। }

শ্রীশিখরকুমার বসু এল্, এম্, এস্,
হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টীসনার।

পান—তাম্বূল।

(উদ্ধৃত)

কোন্ সময় হইতে পান ভারতবর্ষে পরিচিত, তাহার সবিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত, তবে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার গুণাগুণ সকল ভারতবাসীরা অবগত ছিলেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পানের রসের অনুপান ও জারণকার্য্যে পানের রসের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতে যে, ইহা এদেশে প্রচলিত, তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই। ইহা একরূপ লতার পত্র, প্রায় সকলদেশেই জন্মে, নানাস্থানে ইহার আবাদ হয়। কোন কোন স্থানে ইহা অযত্নসম্ভূতও হইয়া থাকে। যত্নপূর্ব্বক আবাদ করিলে যে পান জন্মে,

তাহার আস্বাদন, অযত্নসম্ভূত পান অপেক্ষা প্রায় ভাল হয়। ভূমির উর্ব্বরতা ও প্রকৃতিঅনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পান জন্মিতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পানের রাসায়নিক গুণের যে বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এরূপ বিবেচনা হয় না।

পানের প্রধান ক্রিয়া লালাগ্রন্থির উত্তেজক ও লালানিঃসারক এবং পাচক। এই উভয়বিধ ক্রিয়া সাধনজন্য, আহারান্তে আমরা পান খাইয়া থাকি। পানের সহিত চূণ, খদির, গুপারি, কর্পূর ও অপর নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করায় ইহা সুস্বাদু হয়; এই সকল দ্রব্যের মিশ্রণে যে কেবলমাত্র ইহার সদাস্বাদন বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, ঐ সকল দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়া আছে। চূণ অম্লনাশক ও আগ্নেয়, খদির সংকোচক ও পাচক, গুপারি সংকোচক ও আগ্নেয়, কর্পূর উত্তেজক ও আক্ষেপ নিবারক ইত্যাদি। আহারান্তে পানের সহিত এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাক সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করে। পরিপাকজন্য লালাবিশেষ আবশ্যকীয়, আহারান্তে পান চর্ব্বণে ঐ লালা ক্রমশঃ বহুলপরিমাণে উদরস্থ হয়। পান চর্ব্বণান্তে উহার সিটা ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ আমরা যেরূপ নিয়মে পান খাইয়া থাকি তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এক একজন দিবারাত্রে প্রায় শতাধিক পান খাইয়া থাকেন। অধিক পান খাওয়ায় অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। পরিমিত পরিমাণে ভক্ষণে উপকার আছে; অধিক পরিমাণে ভক্ষণে অনিষ্ট ঘটে, এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শূন্যোদরে পান খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ ঔষধের অনুপানে এবং ঔষধ দ্রব্য জারণ ও শোধন জন্য ইহার পাতার রস ব্যবহৃত হয়।

রাত্র্যন্ধতায় উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিবস পানের রস চক্ষুতে দিয়া পরে, চক্ষু জলদ্বারা ধুইয়া ফেলিলে, ইহা আরোগ্য হয় আমরা দেখিয়াছি। কি কারণে এই রস চক্ষুতে দিলে রাতকানা ভাল হয়, তাহার ঠিক কারণ বলা যায় না।

শিরঃপীড়ায় পানের ভিতরদিকে চূণ লাগাইয়া রগে দিলে মাথার যাতনা নিবারিত হয়। পানে তৈল মাখাইয়া উষ্ণ করণান্তর বক্ষে লাগাইলে সামান্য সর্দ্দিলাগা কাসী নিবারিত হয়। অসুস্থ ক্ষতে পান লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ক্লেদাদি নিঃসৃত হইয়া সুস্থ আকার ধারণ করে। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় পানের বোঁটা তৈলাক্ত ও উষ্ণ করিয়া মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া অস্মদ্দেশের স্ত্রীলোকেরা দাস্ত করাইয়া থাকেন।

মুখে দুর্গন্ধ হইলে পানের বোঁটা চিবাইলে তাহা নিবারিত হয়।

পানের রস ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ছুলিতে লাগাইলে ছুলি ভাল হয়। উপর্য্যুপরি ৭ কিম্বা ৮ দিবস প্রয়োগ করিতে হয়। পানের পাতা উষ্ণ করিয়া স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধস্রাব হ্রাস হয়। (চিকিৎসা-দর্শন)

ধাতু-ব্যাখ্যা।

(কবিরাজী মতে)

(পূর্ব্বোক্ত "আবার একটী নূতন কথার" পর।)

অসংখ্য-হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার সঙ্কলন করিলে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, নিরাকার ব্রহ্মবাদীগণ যাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া কীর্ত্তণ করিয়াছেন, তিনিই আবার অপূর্ব্ব বিশ্ব-নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে বিশালজগতের স্থিত্যুৎপত্তি ও বিনাশসাধন করিতেছেন। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবই যে আবার জীবদেহে বায়ু পিত্ত কফরূপে অবস্থিতি করিয়া উক্ত দেহের উৎপত্তি, পালন এবং বিনাশ করিতেছেন, তাহাই আজ প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ফলতঃ নির্ব্বিকার না হইলে বিকার হওয়া যে এক প্রকার অসম্ভব, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই নির্ব্বিকার অব্যক্ত মহাপুরুষই জীব-দেহে পরমাত্মা নামে অভিহিত, পূর্ব্বোক্ত বায়ু, পিত্ত, কফ তাঁহারই বিকার। আবার ইন্দ্রিয়াদির অধিদেবতা মন যখন ইহার সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই ইহাকে জীবাত্মা কহা যায়, সুতরাং জীবাত্মাও যে, পরমাত্মার বিকার, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমোক্তটী সুখদুঃখরহিত নির্লিপ্ত, দ্বিতীয়টী সুখদুঃখভোক্তা ও বিষয়-লিপ্ত। আর্য্যর্ষিগণ কহিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু বায়ু, তেজোময় ব্রহ্মা পিত্ত এবং সর্ব্বসংহর্ত্তা শিব কফরূপে জীবদেহে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁরাই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তা। কেনই বা তাঁহারা এরূপ কহিলেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। বায়ুর প্রকৃতিনির্ণয়ে মহাত্মা সুশ্রুত কহিয়াছেন;—

স্বয়ম্ভুরেষঃ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যা নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাত্তথৈব চ॥
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোক নমস্কৃতঃ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণম্॥

অব্যক্তো ব্যক্তকর্ম্মা চ রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ খরঃ।
তির্য্যগ্গো দ্বিগুণশ্চৈব রজো বহুল এব চ ॥
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট ।
আশুকারী মূহুশ্চারী পক্বাধানগুদালয়ঃ ॥
দেহে বিচরতস্তস্য লক্ষণানি নিবোধ মে ॥

"অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ম্ভূই বায়ু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি স্বতন্ত্র, নিত্যভাবা, সর্ব্বত্র গমনশীল, চরাচরস্থ সকলের পূজনীয় এবং আত্মা স্বরূপ। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং ভূতসমূহের একমাত্র কারণ। তিনি (ক্ষীণ-বুদ্ধি মানবের পক্ষে) স্বয়ং অব্যক্ত হইলেও তাঁহার কর্ম্ম তদ্রূপ নয়, সুতরাং তাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি শীত, রুক্ষ, লঘু, খর, তীর্য্যগ্‌গামী, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোবহুল, অচিন্ত্যশক্তি, দোষাদির নেতা এবং রোগ-সমূহের রাজা। তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শীঘ্র শীঘ্র করিয়া থাকেন, তিনি নিমেষ মধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়ান। জীবদেহস্থ পক্বাধানেই তাঁহার অবস্থিতির স্থান। তিনি তথা হইতেই সমস্ত দেহে অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছেন।" ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কেনই বা বায়ুকে ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করা না যাইবে? যদি কার্য্যতায় পরস্পর একতা দৃষ্ট হয়. তবে বাধ্য হইয়া সকলকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে চন্দ্র সূর্য্য সমন্বিত, গ্রহনক্ষত্র-খচিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শূন্যভরে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে যখন যেখানে যে বস্তুর প্রয়োজন হইতেছে, ভগবান বিষ্ণুই তখন তাহা পূরণ করিতেছেন। আবার এতদপেক্ষায় জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নিম্নতর সিঁড়িতে অবরোহণ করিলে স্পষ্টতঃই জানা যায় যে, পৃথিবীতলেও যখন যে বস্তুর অসদ্ভাব হইতেছে, বায়ু দ্বারাই তাহা তদ্দণ্ডে পরিপূরিত হইতেছে। এই বায়ুই জীব-দেহে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা প্রকার কার্য্য-সম্পাদন করিতেছে। এবং রস রক্তাদি যথাসময়ে সঞ্চালিত করিয়া শরীরকে পরিপোষণ করিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বব্যাপী বায়ুও পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ নহে। তবে যে ভাবে পিত্তশ্লেষ্মা দ্বয়কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া সকল প্রকার সংশয় দূর করিতে পারা যায় ইহা তদ্রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্বে সন্দীহান

হওয়া কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, চেষ্টা করিলে তাহার সম্বন্ধে আরও অন্যান্য অনেক বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহারা হিন্দু-রীত্যনুসারে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিয়া থাকেন, প্রাণায়ামের অসীম ক্ষমতার বিষয় যাঁহারা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, বায়ুর স্বরূপও কার্য্যাদি সম্বন্ধে তাঁহারাই অনেকটা জানিতে পারিবেন। ইহা প্রত্যেকেরই আপনাপন ইচ্ছাধীন। অন্যের সহিত বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিলে বায়ুর সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা হইবে না। তবে মোটা-মোটি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহার অসদ্ভাব হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ জীবনধারণ করিতে পারে না, সেই বায়ুকে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে?

ব্রহ্মা তেজোময়। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। তেজোময় পদার্থ দ্বারা কিপ্রকারে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা বিজ্ঞান-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, এই ব্রহ্মাই পিত্তরূপে জীব-দেহে বিদ্যমান থাকায় শরীরের অসামান্য রূপলাবণ্য এবং স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। শরীরস্থ পিত্ত ও তেজোময় এবং ভুক্ত বস্তু পরিপাক করাই ইহার একটী প্রধান কার্য্য। পরে তাহা হইতে যে রস, রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি শরীরপোষক অন্যান্য পদার্থ সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহাও এই পিত্তের উষ্ণতা দ্বারা। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা শরীরের সার, জীবনের আশ্রয় এবং যাহা না হইলে কখনো জীব-দেহ সংগঠিত হইতে পারে না, তাহাই তেজোময় পিত্ত দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। তবে এই পিত্তকে কেনই বা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়া স্বীকার না করিব?

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন,—"শিব সংহার-কর্ত্তা মহাকাল। স্থাবর জঙ্গম সহিত সমুদায় জগৎ একদিন সেই মহাকালের করাল কবলে বিলীন হইবে।" এদিকে দৈহিক শ্লেষ্মার কার্য্যাদি আলোচনা করিলেও তাহাই জানা যায়। দেহ-মধ্যে যে শ্লেষ্মা আছে, তাহা বহুভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ মস্তকে, কেহ কণ্ঠে, কেহ হৃদয়ে, কেহ আমাশয়ে এবং কেহবা সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিয়া বায়ু পিত্তের প্রভাবে প্রচ্ছন্নভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য-কার্য্য যথাসময় সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু যখন জীবের কালপূর্ণ হয়, যখন পূর্ব্বোক্ত বায়ুপিত্তের শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আইসে, তখন এই শ্লেষ্মাই

আবার কুপিত হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যু সময় আমাশয়স্থ কফ ভুক্তবস্তু পরিপাক করিবার জন্য আর পূর্ব্বের ন্যায় সহায়তা করে না। সুতরাং সেই সময় কিছুই আহার করিতে পারা যায় না। মস্তকস্থ কফ স্নেহ পদার্থ বিতরণে বিমুখ হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। হৃদয় এবং সন্ধিগত কফের শিথিলতা প্রযুক্ত সঙ্কোচনী ও প্রসারণী শক্তি বিলোপ হইয়া যায়। পরিশেষে কণ্ঠস্থ কফ কুপিত হইয়া কণ্ঠনলীকে আক্রমণ করিয়া বসে, এবং সহসা শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ হয়। এইরূপে জ্বর, অতীসার, উদ্বন্ধন, জলনিমজ্জন, অগ্নিদাহপ্রভৃতি যে যে ভাবেই কেন প্রাণত্যাগ না করুক, সকলেরই অন্তিমকালে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তিলোপ ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি সংহার-কর্ত্তা মহাদেবেরও যে কার্য্য, দৈহিক কফেরও সেই কার্য্য। সুতরাং জীব-ধ্বংসকারী কফই যে, পূর্ব্বোক্ত মহাদেব তাহাতে আর সংশয় কি?

এই ত গেল বায়ু পিত্ত কফ সম্বন্ধে মোটামোটি কয়েকটী কথা। এক্ষণে ইহাদিগের ন্যূনাধিক্য এবং বিকৃতাবস্থায় কোন্ সময় কি প্রকার নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই আলোচনা করা যাউক। পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারগণ রোগ পরীক্ষা করিতে আসিয়া শরীরে বিলাতী তাপমান যন্ত্র লাগাইয়া এই এত অংশ ডিগ্রী হইল, এই এত অংশ ডিস্‌মিস্ হইল ইত্যাদি বলিয়া হতভাগ্য বাবুদিগকে মোহিত করিয়া থাকেন। এবং কবিরাজদিগের এই মহোপকারী যন্ত্র নাই বলিয়া অহঙ্কার করিতেও কেহ ক্রটী করেন না। আবার অবস্থাভেদে সময় সময় এরূপও দেখা যায় যে, প্রতিবারেই ডাক্তার বাবু এই যন্ত্র দ্বারা রোগ ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়া যান কিন্তু তথাপি রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও ইহকালের খেলা সাঙ্গ করিয়া চিরকালের জন্য ডিস্‌মিস্ লইয়া যায়। কিন্তু হ্যাট্ কোট্-বর্জ্জিত তাপমান যন্ত্র-বিহীন অসভ্য কবিরাজগণ কেবল নাড়ীপরীক্ষা দ্বারাই বায়ু পিত্ত কফের বিষমতা নির্ণয় করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্য সম্বন্ধে অনেকটা বুঝিতে পারেন। এবং কিপ্রকার অবস্থাপন্ন হইলে কতদিন অন্তর মৃত্যু হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন। নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধে যোগ-শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, প্রথমে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। ক্রমশঃ

সাং উমারপুর
পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ

লক্ষণ তত্ত্ব।

(এলোপ্যাথি মতে)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, নানা রকমের বোধবিপর্য্যয় আছে। এবং এই সকল বোধবিকার রোগনির্ণয় পক্ষে প্রধান সহায়। অনেক স্থলে কেবল মাত্র বোধবিকারই প্রকৃত রোগ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বোধবিকার পীড়া বিশেষের লক্ষণ মাত্র। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, শরীরের কোন স্থান বিশেষ বা যন্ত্রবিশেষে বোধবিকার ঘটিয়াছে, তখন ঐ যন্ত্রের ক্রিয়ারও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যদি উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়া থাকে, তবে রোগটী যে, সেই যন্ত্রকেই অধিকার করিয়াছে তদ্‌পক্ষে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

স্পর্শশক্তির একবার লোপ অথবা স্পর্শশক্তির ব্যতিক্রম একটী গুরুতর বোধ বিকার। ইহাকে সহজ কথায় অসাড়তা বলে। কোন স্থান অসাড় হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থানের স্নায়ু বা সর্ব্বস্নায়ুর আধারে মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়াছে। কোন অঙ্গের পক্ষাঘাত হইলে অসাড়তা হইতে পারে। কুষ্ঠ রোগের ক্ষত হইবার প্রাক্কালে অঙ্গের স্থান বিশেষে অসাড়তা জন্মে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াও বিপর্য্যয় রোগ বলিয়া গণ্য হয়। চক্ষুর নানাবিধ রোগে দর্শন শক্তি কমিয়া যায় অথবা রোগী একবারেই অন্ধ হইয়া যায়। মানুষ হঠাৎ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই সকল স্থলে চক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গাদির কোন বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারা যায়। চক্ষু উপরে দেখিলে দেখা যায় চক্ষুটী বেশ পরিষ্কার রহিয়াছে অথচ রোগী কিছুই দেখিতে পায় না। এইরূপে হঠাৎ অন্ধ হওয়া ব্যাধিকে "এমরোসিস্" কহে। এই রোগ হঠাৎ হইতে পারে অথবা ক্রমে ক্রমে হইতেও পারে। ক্রমে ক্রমে হইলে রোগী প্রথম কিছুই বুঝিতে পারে না। এই ব্যাধি রেটিনা অথবা

অপ্‌টিক্ নার্ভের (চক্ষের স্নায়ু, যদ্দ্বারা দর্শন শক্তি জন্মে) উপর কোনরূপ চাপ পড়িয়া উৎপন্ন হয়, যথা—মস্তিষ্কে কোন রূপ অর্ব্বুদ হইলে অপ্‌টিক্ নার্ভের মূল দেশে ঐ অর্ব্বুদের চাপ লাগিয়া রোগী চক্ষু থাকিতেও হঠাৎ কাণা বা অন্ধ হইয়া যায়। চক্ষুর দর্শন শক্তির নানা বৈলক্ষণ্য আছে। অনেক লোকে একরূপ বর্ণকে আর এক প্রকার দেখে, যথা—অনেকে লালকে সাদা এবং সাদাকে লাল দেখে, ইহাদিগকে বর্ণকাণা কহা যায়। অনেক লোক দিবসে বেশ দেখিতে পায় কিন্তু সন্ধ্যার পর আর কিছুই দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে রাতকাণা কহে। এই রোগটী গরিব ও ইতর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, ভদ্রলোকে প্রায়ই রাতকাণা হয় না। রৌদ্রে পরিশ্রম করা, অপর্য্যাপ্ত আহার, তৈল ঘৃত প্রভৃতি না খাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে রাত্রান্ধতা রোগ জন্মিয়া থাকে। সময় সময় অনেক লোকের চক্ষের উপর নানাবিধ কাল পদার্থ উড়িতে থাকে এমন বোধ হয়। কিছু ক্ষণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইলে বোধ হয়, যেন নানা রকমের ফুলের পদার্থ উড়িয়া বেড়াইতেছে। অনেক ব্যক্তি নানাবিধ অবাস্তর কাল্পনিক পদার্থ দৃষ্টি করে। সিদ্ধি প্রভৃতি নেশা করিলে বোধ হয় যেন খাট পালঙ্ক এবং ঘর সমস্ত ঘুরিতেছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা স্থির হইয়া আছে। এই সময় চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেন বোধ হয় যে, সে নিজেই ঘুরিতেছে। অনেক সময় অনেক লোকের নেশার ঝোঁকে বোধ হয়, যেন খাটসুদ্ধ সমস্ত মাটীর তলে প্রবিষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ বস্তুর অর্দ্ধভাগ বই দেখিতে পায় না। কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইবার সময় সকল ব্যক্তিকেই এক-চক্ষুবিশিষ্ট বোধ করিত। ডাক্তার ওয়ালাস্‌টন্ এইরূপ চক্ষুর দর্শন বিকার দ্বারা পীড়িত ছিলেন, তিনি সকল জিনিষেরই আধখান বই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর একটী অর্ব্বুদ জন্মাইয়া ছিল। বিখ্যাত ডাক্তার এবার্‌নেথিরও এই রোগ ছিল।

অনেক ব্যক্তি তাহাদিগের সম্মুখে নানাবিধ বিভীষিকাময় পদার্থ রহিয়াছে এরূপ বোধ করে। এই সকল দর্শনশক্তিরবিকার বশতঃই ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ বোধ হয়।

মদাতঙ্ক রোগে পীড়িত ব্যক্তি এইরূপ নানাবিধ বিভীষিকাময় পদার্থ

দেখে। একজন মাতাল মদাতঙ্ক রোগে পীড়িত হইয়া সম্মুখে সর্প দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, অথচ সেখানে সাপ ছিল না। সার ডেভিড্ ব্রুস্‌টারের "ম্যাচারাল ম্যাজিক" নামক গ্রন্থে অনেক ভূতের গল্প আছে। আমাদিগের শ্রবণ শক্তিরও নানাবিধ বিকার জন্মিতে পারে। কোন কোন রোগে শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; কোন কোন রোগে কমিয়া যায়। ডাক্তার ওয়াট্‌সন কহেন যে, তিনি একটী মুমূর্ষুদশাপন্ন রোগী দেখিতে যান, দেখিবার সময় রোগীর ধাত ছিল না এবং সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় তাঁহার শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল যে, খুব ছোট ছোট করিয়া কথা কহিলেও তিনি কষ্টবোধ করিতেন। কিয়ৎকাল পরেই রোগী শ্বাস জ্বর প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইলে অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে রোগীর শ্রবণ শক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ হয় যে, সামান্য কথা বার্ত্তাতেও রোগী সমূহ কষ্টবোধ করে। অতএব এই সকল স্থলে রোগীর গৃহে কোনরূপ গোলমাল করা উচিত নহে, কারণ যে পরিমাণ গোলমালে সহজ লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না, সেই পরিমাণ গোলমালে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। এবং এইরূপ নিদ্রা ও আরামের ব্যাঘাত হইলে রোগী প্রলাপ প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অতএব রোগীর গৃহে কোনরূপ গোলযোগ হইতে দেওয়া উচিত নহে। রোগের সময় শ্রবণ শক্তি অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হওয়া বড় দুর্লক্ষণ।

শ্রবণশক্তির অল্পতাও একটী রোগলক্ষণ। কাণের রোগবশতঃ রোগী কালা হইয়া যায়। কিন্তু তা ছাড়াও জ্বর প্রভৃতি রোগে রোগীর কিয়ৎকালের জন্য শ্রবণশক্তির অল্পতা হইতে পারে। কিন্তু শ্রবণশক্তির প্রখরতা যেমন দুর্লক্ষণ, শ্রবণশক্তির অল্পতা তাদৃশ নহে। ইহা মস্তিষ্কের সামান্য বিকার বশতঃ ঘটিয়া থাকে, এবং তাহা শীঘ্রই অপনীত হয়।

এতদ্ভিন্ন নানা রোগে কর্ণে নানাবিধ শব্দ হইয়া থাকে। কুইনাইন খাইলে কাণ ভোঁ ভোঁ করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মস্তিষ্কের ধমনী ও শিরা সমুদয় পীড়িত হইলে কর্ণে এইরূপ নানা শব্দ হইয়া থাকে। সংন্যাস রোগ অথবা পক্ষাঘাত রোগ হইবার পূর্ব্বে রোগীর কর্ণে নানাবিধ শব্দ হইয়া থাকে। কর্ণের আভ্যন্তরিক অস্থি পীড়িত হইলে কর্ণে একরূপ শোঁ শো

শব্দ হইয়া থাকে। অনেক রোগী বলে, যেন তাহাদের কর্ণের কাছে ঘণ্টার বা ঢাকের শব্দ হইতেছে।

বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির বিকৃতিও রোগ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ হইলে রোগীর বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি ও স্মরণ শক্তি থাকে না। অনেক পীড়ায় স্মরণ শক্তি একেবারেই লোপ হইয়া যায়, অথবা কম পড়ে। নানাবিধ স্নায়ুরোগে এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে।

মাংস পেশীর ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি রোগলক্ষণ মধ্যে গণ্য। ধনুষ্টঙ্কার, উগ্র প্রলাপ প্রভৃতি পীড়ায় রোগীর পেশীর বল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। উগ্র প্রলাপ হইলে রোগী বিছানা হইতে উঠে। মৃগী রোগের খেঁচুনীতেও পেশীর বল বৃদ্ধি হয়।

জ্বর প্রভৃতি পীড়া বহু দিন ভোগ করিলে পেশীর বল হ্রাস হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। রোগী পাশ ফিরিয়া শয়ন পর্য্যন্ত করিতে পারে না। দৌর্ব্বল্যতা জ্বর পীড়ার একটী বিশেষ লক্ষণ। জ্বর হইবার পূর্ব্ব হইতেই রোগী দৌর্ব্বল্য অনুভব করে। অনেকেই দেখিয়াছেন, খুব সবল মনুষ্য হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হইলেই যেখানে সেখানে বসিয়া পড়ে, এবং তৎপরে বিছানায় যায়। অজীর্ণ রোগ হইলে সময় সময় অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বোধ হয়। একজন খুব সবল মানুষের শেষ রাত্রে গুরুতর ভোজন করিয়া অজীর্ণ হয়, তৎপর দিন প্রাতঃকালে তিনি হঠাৎ এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, বহির্দ্দেশে গমনে অশক্ত হন। পরে বমন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য উঠাইয়া ফেলিয়া কিয়ৎকাল পরেই বল অনুভব করেন।

কোন কোন স্থলে রোগের শেষাবস্থায় রোগীর বল হ্রাস হয়, যেমন স্বল্প-বিরাম জ্বরে। এই সকল স্থলে ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। এই দৌর্ব্বল্য দেখা দিলে পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নচেৎ ক্রমে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া রোগী মারা যাইতে পারে। এখনকার দিনে রেমিটেণ্ট ফিবারে ডাক্তারদিগের হাতে প্রায় রোগীই মারা যায় না। এই বলকারক চিকিৎসা প্রণালীই তাহার মুখ্য কারণ। ডাক্তাররা জ্বরের ভোগ কমাইতে না পারিলেও রোগীর বল হ্রাস করিতে দেন না। এজন্য রোগী বেশ কাটাইয়া উঠে।

অর্দ্ধাঙ্গপক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের প্রারম্ভে কখন কখন কোন কোন মাংসপেশীর অসাড়তা উপস্থিত হয়। একদিকের বাহু বা অঙ্গুলি, বা চক্ষের পাতার মাংসপেশী অসাড় হয়। এই সকল সামান্য সামান্য মাংসপেশীর অসাড়তা উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপে একটা মাংসপেশী দুর্ব্বল হইয়া সমুদয় বা একদিগের সমস্ত মাংসপেশী অসাড় হইয়া পক্ষাঘাত জন্মাইতে পারে। চক্ষুর কোন কোন মাংস পেশীর দৌর্ব্বল্য হইলে মানুষ টেরা হয়, এবং সমস্ত দ্রব্যই ডবল দেখে। হাইড্রোসিফেল্‌স্‌ রোগে রোগীর চক্ষু টেরা হয়। সমস্ত অঙ্গের সাধারণ পক্ষাঘাত জন্মাইবার পূর্ব্বেও কাহারও কাহারও চক্ষু টেরা হয়। সাধারণ পক্ষাঘাত জন্মাইবার পূর্ব্বে কোন কোন রোগীর কেবলমাত্র জিহ্বার পক্ষাঘাত জন্মে।

হাত পা সাঁটিয়া ধরা একটী লক্ষণ। কলেরা রোগীর এইরূপ হাত পা সাঁটিয়া ধরে। ইহাকে খিল ধরা কহে। ইংরাজিতে ইহাকে স্প্যাজাম কহে।

শ্বাসকষ্ট একটী রোগ লক্ষণ। শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে ফুস্‌ফুস্‌ পীড়িত হইয়াছে, অথবা ফুস্‌ফুসে সঙ্কাপ প্রযুক্ত হইতেছে, অথবা ফুস্‌ফুসে ভাল করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে না। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। শ্বাসকষ্টের সময় রোগী চীৎ হইয়া শয়ন করিলেই বেশী কষ্ট হয়, যেহেতু চীৎ হইয়া শয়ন করিলে ডায়েফ্রাম নামক মাংসপেশীতে উদরের প্লীহাযকৃত ও পাকস্থলীর চাপ পড়িয়া উহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। ডায়েফ্রাম নামক মাংসখণ্ড শ্বাসকার্য্যের প্রধান সহায়, সুতরাং ডায়েফ্রামে চাপ পড়িয়া উহার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলেই শ্বাসকষ্ট বেশী হইবার সম্ভাবনা। রোগী খাড়া হইয়া বসিলে ডায়েফ্রামের চাপ অপসৃত হইয়া রোগীর শ্বাসকষ্ট অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কোন কোন পীড়ায় রোগী শয়ন করিতেই পারে না, করিলেই ভয়ানক শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, এজন্য রোগী সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকে ইহাকে "অর্থপ্‌নিয়া" কহে।

হাঁপরোগে ভয়ানক শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। এই শ্বাসকষ্ট দমে দমে উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও হাঁপ দেখে নাই, সে ব্যক্তি হাঁপগ্রস্থ রোগীকে দেখিলে বোধ করে যেন সে মরিতেছে। কিন্তু হাঁপের পীড়ায় বড়ই শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হউক না কেন, রোগীর প্রায়ই কোন বিপদ ঘটে না।

কিন্তু ফুস্ফুসের তরুণ প্রদাহে, (ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্) কোন হাঁপ রোগের ন্যায় অযথা পরিমাণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে রোগী আর বেশীক্ষণ বাঁচে না। অন্ততঃ এইরূপ স্থলে পীড়া গুরুতর ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। সচরাচর হাঁপরোগে ফুস্ফুস প্রভৃতির কোন পীড়া বুঝা যায় না। ইহা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহকারী মাংস সকলের আক্ষেপ মাত্র। কিন্তু কোন কোন পীড়ায় ফুস্ফুস, হৃদয় অথবা এওয়ার্টা নামক বৃহদ্ধমনীর রোগ সূচিত করে। কোন কোন সময়ে ফুস্ফুসে রক্ত জমিয়া হাঁপ উপস্থিত হয়।

কাসী, রোগের লক্ষণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। সহজ অবস্থাতেও লোক ২।৪ বার কাসিয়া থাকে। শ্বাসনালীতে মিউকশ সঞ্চয় হইলে বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা শ্বাস নলী রোধ হইবার উপক্রম হইলেই আমরা কাসিয়া থাকি। এবং কাসিবামাত্র শ্লেষ্মা টুকু সরিয়া যায়। যতক্ষণ শ্লেষ্মা বা অবরোধক পদার্থ সারিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কাসিতে থাকি, কিন্তু কোন কোন স্থলে অবরোধক পদার্থ না থাকিলেও অন্য প্রকারে কাসী হইতে পারে, যথা গলার ভিতর সুড়্সুড়ি প্রয়োগে কাসী হয়। গলার আলজিহ্বা বড় হইলে বা উহার উভয় পার্শ্বে কন্‌জেস্‌সন্ হইলে গলা সুড়্ সুড়্ করিতে থাকে, এবং অনবরত শুষ্ক কাসি হয়।

নিউমোনিয়া ব্রংকাইটিস্ যক্ষ্মাকাস প্রভৃতি রোগে শ্বাসনলীতে অনবরত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং তাহাতেই পুনঃপুনঃ রোগী কাসিতে থাকে। এই সকল স্থলে রোগী কাস তুলিয়া ফেলিতে না পারিলে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক রোগী শেষাবস্থায় গলায় ঘড়ঘড়ি হইয়া মারা যায়, সেখানে রোগী এতই দুর্ব্বল হয় যে, গলা ঝাড়িয়া কাস তুলিয়া ফেলিতে পারে না। হৃদয়ের পীড়াতেও কাস হইয়া থাকে। পাকস্থলীর পীড়া হইলে অথবা উদরে কৃমিসঞ্চার হইলে গলায় শ্লেষ্মা না জন্মিলেও কাসি হইয়া থাকে। নানাবিধ আক্ষেপরোগে গলায় শ্লেষ্মা সঞ্চিত না হইলেও কাস হইয়া থাকে, যথা হুপিং কফ এবং ক্রুপ্। ক্রমশঃ।

ডাক্তার সম্পাদক।

মত-দ্বৈধ হয় কেন?

কবিরাজী

—*—

ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ যেভাবেই কেন চিকিৎসা না করুন, আহার বিহার সম্বন্ধে পরস্পরের মত-দ্বৈধ হওয়া কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তবে ঔষধ বিশেষ দ্বারা অনেকটা সহ্য হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সাধারণ নিয়মের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না এবং তাহাতে আশু কোন অনিষ্টের কারণ না দেখিলেও যে একবারেই অনিষ্ট হয় না, এমন নহে। জ্বরিতাবস্থায় লঙ্ঘন এবং জলপানসম্বন্ধে ডাক্তার কবিরাজদিগের বিলক্ষণ মত-দ্বৈধ লক্ষিত হয়। কিন্তু এই দুইটী বিষয়ের মূলে অনুসন্ধান করিলে উভয় পক্ষের গোঁড়ামী ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে কবিরাজদিগের গোঁড়ামীতে রোগীর পক্ষে একটু উপকার হয়, ডাক্তারদিগের গোঁড়ামীতে তাহা হয় না। প্রথমে জ্বরিত রোগীর জলপান করিতে দেওয়া সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করা যাউক। ডাক্তারগণ অবজ্বরের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে রোগীকে ইচ্ছানুরূপ শীতল জলপান করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় কবিরাজগণ গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে বলেন, অথবা কতিপয় বস্তু সহযোগে জলপাক করিয়া তাহাও ব্যবস্থা দেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ জল দেওয়াতে উপহাসও করিয়া থাকেন। ফলতঃ তাঁহারা যদি এই উভয় প্রকার জলের গুণাগুণ সম্বন্ধে একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই উপহাস করিতে পারিতেন না। ডাক্তারগণ বলেন যে, "শরীরস্থ জলীয়াংশের অভাব না হইলে কখনো পিপাসা হয় না। পিপাসা হইলে যদি উপযুক্ত সময়ে তাহা উপশম করা না যায়, তবে শীঘ্রই দেহ বিনষ্ট হইবার সম্ভব। কেন না, জলই দেহ রক্ষার প্রধান কারণ" কবিরাজগণও এই কথা অস্বীকার করিতে পারে না। মহাত্মা সুশ্রুত কহিয়াছেন—

জীবনং জীবিনাং জীবো জগৎ সর্ব্বং তু তন্ময়ম্।
অতোঽত্যন্ত তয়া সুজ্ঞো ন ক্বচিদ্বারিবারয়েৎ॥

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারিবারয়েৎ॥

জলই দেহীদিগের জীবনস্বরূপ। এমন কি সমস্ত জগতই জলময়। অর্থাৎ জল না হইলে কখনো পরমাণু সমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং তৃষিতাবস্থায় এই মহোপকারী জলপান করিতে নিষেধ করা কোনমতেই উচিত নহে। আরও অত্যন্ত পিপাসা হইলে মোহ উপস্থিত হয় এবং সেই মোহ দ্বারা জীবনও বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব যে প্রকার অবস্থাই কেন না হউক, প্রয়োজন হইলে কখনো জল নিষেধ করা যাইতে পারে না। আবার আত্রেয় শিষ্য হারীত কহিয়াছেন—

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষ্ণার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥

"অত্যন্ত পিপাসা বড় ভয়ানক, ইহাতে শীঘ্রই প্রাণবিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং তৃষিতাবস্থায় জীবন ধারণোপযোগী জল প্রদান সর্ব্বাংশেই শ্রেয়ঃ।" এই ত গেল মোটামোটি কথা। এই সকল কথায় ডাক্তারী ও কবিরাজী শাস্ত্রে কিছুমাত্র অনৈক্য লক্ষিত হয় না। আবার ডাক্তারেরা যেমন পরিষ্কার জলের পক্ষপাতী, কবিরাজগণও তেমনি সেই মতাবলম্বী। তবে কেন কার্য্য কালে উভয় পক্ষের দুই-মত হইয়া দাঁড়ায়? এই মত-দ্বৈধের মীমাংসা করাও বড় বেশী কঠিন নয়। অল্পদিন হইল ডাক্তারী মতের প্রচার হইয়াছে সুতরাং ঠেকিয়া ঠগিয়া শিক্ষা করিতে এখনও ডাক্তারদের অনেক বিলম্ব আছে, এই কথা বলিলে হয়ত ডাক্তরবাবুগণ একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িবেন। ভাল, তাহাই যেন ভয়ে ভয়ে না বলিলাম; কিন্তু হিন্দুজগৎ যে দুই চারি দশদিনের নয় অথবা বিশ পঁচিশ হাজার বৎসরের কথা বলিলেও ভারতের অবমানা করা হয় তাহাও কি বলিতে দোষ আছে? কত মন্বন্তরা, কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, এবং হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে বয়স কত হইয়াছে, সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা তাহা নির্ণয় করাও একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং অনেক ঠেকিয়া ঠগিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া হিন্দু চিকিৎসকগণ যে এক সময় অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে বোধহয় নব্য-সভ্যতার বিরুদ্ধ হইবে না। অনেক দূরের কথা দূরে থাক, এই যে সেদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়া গেলেন, তখন বর্ত্তমান ইংরেজগণ

কোথায় ছিল? এবং তাহাদের ইংলণ্ডই বা কোন্ অতল-তলে মগ্ন ছিল? একবার দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া সময়ের তারতম্য করিয়া দেখিলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। জীবনরক্ষার জন্য সকল অবস্থাতেই জলপান করিতে দেওয়া যায়, তাহা আর্য্যগণও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবলে তাঁহারা এতদ্বিষয় আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—

অতিযোগেন সলিলং তৃষ্যতেঽপি প্রয়োজিতম্।
প্রয়াতি শ্লেষ্মপিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ॥

অত্যন্ত তৃষিতাবস্থায় অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করিলে তদ্দ্বারা পিত্ত শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে। জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ বেশী হয়। তাই—

নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্ব শূলে গলগ্রহে।
সদ্যঃ শুদ্ধৌ তথাধ্মানে ব্যাধৌ বাতকফোদ্ভবে॥
অরুচিগ্রহণীগুল্ম শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতং বারি বিবর্জ্জয়েৎ॥

নবজ্বর, প্রতিশ্যায়, পার্শ্বশূল, গলগ্রহ, আধ্মান, বাতশ্লেষ্ম রোগ, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি, হিক্কা, স্নেহপান এবং সদ্য শুদ্ধির (বিরেচনের) পর কখনও অপক্ক শীতল জলপান করিবে না। অন্যান্য পীড়ার কথা উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না তাহাতে অনিষ্ট হইলেও খুব অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। জ্বরিতাবস্থায় এতদ্দেশীয় লোকদিগকে অপক্ক শীতল জলপান করিতে ব্যবস্থা করিলে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী অনিষ্ট হয় বলিয়া প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। যে সকল নবজ্বরিত ব্যক্তিকে কবিরাজগণ চিকিৎসা করেন, তাঁহারা সবল প্রকৃতিরই হউন, আর দুর্ব্বল প্রকৃতিরই হউন, পরিণামে তাঁহাদিগকে প্রায়ই কষ্ট পাইতে দেখা যায় না এবং তাঁহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইবারও কোন কারণ লক্ষিত হয় না। আবার ডাক্তারী মতে চিকিৎসিত হইলেও যাঁহারা ঠিক্ হিন্দু রীত্যনুসারে পানাহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও কখনো স্বাস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় না। যে সকল ডাক্তারগণ বিলাতী নিয়মানুসারে পান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের রোগী যদি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, তবে সেও আপনার দৈহিক শক্তির প্রভাবে ক্রমে

ক্রমে শরীরকে সুধরাইয়া লইতে পারে। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক তাহাদিগের ভাগ্যে কখনও সেই সুখ ঘটিয়া উঠে না। যদিও কুইনাইনের অমোঘ শক্তিতে দুই চারি দিনের জন্য জ্বরের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারা যায়, তথাপি আজ একটু মাথা ধরিল, কাল একটু চিম্ চিম্ করিয়া জ্বর হইল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে যকৃৎপ্লীহা প্রভৃতি বিবৃদ্ধি হইয়া শরীরকে একবারে জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। কেহবা দীর্ঘ-কাল কষ্টভোগ করিয়া আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া চিরশান্তির জন্য শান্তিময়ের শান্তিধামে চলিয়া যায়, কেহবা ৩।৪ বৎসর পর আপনা হইতেই একটু একটু করিয়া আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু এইরূপে রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও যে ব্যক্তি ৮০ বৎসর দেহধারণোপযোগী সামগ্রী লইয়া সংসার সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, ৫৮ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই যে তাহার জীবনকাল পর্য্যবসিত হইয়া যায়, বোধহয় এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে যে কারণে এই সকল অত্যহিত সংঘঠিত হইতেছে, এক্ষণে তাহাই ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। ডাক্তারগণ এই সকল কথা একবার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে খুব ভাল হয়। অথবা ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন প্রকার কটুকথা প্রয়োগ না করিয়াও যদি যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা ইহার বিরুদ্ধভাব প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও যারপর নাই আপ্যায়িত হইব।

কবিরাজি শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ ই দেখা যাইতেছে,—"সেব্যমানেন শীতেন জ্বরস্তোয়েন বর্দ্ধতে" অর্থাৎ জ্বরকালে শীতল জলপান করিলে তাহাতে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হয়। কেন না, সকল প্রকার জ্বরেই পিত্ত-দোষ প্রবল থাকে, তাহাতে আবার শীতল জল ও পিত্তশ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক। আজকাল জ্বর হইলেই বাবুগণ অমনি কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বরের বেগ হ্রাস করিয়া দেন। ইহাতে স্পষ্টরূপে জ্বর প্রকাশ না হইলেও যে কারণে জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। অধিকন্তু শীতল জলাদি পানও মিথ্যা আহার বিহারে উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এইজন্যই বর্ত্তমান সময়ে বিষম জ্বরের (ম্যালেরিয়া ফিবার)এত প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। জ্বর হইলে অত্যন্ত পিপাসা হয়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ শীতল জল প্রদান করিলেই যে, সেই পিপাসার শান্তি হইবে এমন কোন

কথা নাই। যে কারণে পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই যদি নিবারণ করিতে পারা যায়, তবে আপনা হইতেই পিপাসাও নিবারিত হয়। কবিরাজগণ যে, গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে ব্যবস্থা দেন অথবা কতকগুলি বস্তুর সহিত জলপাক করিয়া পান করিতে বলেন, তাহা অত্যন্ত লঘুপাক এবং একপ্রকার ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত। এই জন্যই কবিরাজগণ জ্বরিতাবস্থায় অপক্ক শীতল জলপান করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। এবং তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ নবজ্বরিত ব্যক্তিই যে, ডাক্তারীমতে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার আবার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় ইচ্ছামত শীতল জল পান করিতে দেওয়াও একটী প্রধান কারণ। এই ক্ষণ অন্যান্য কারণগুলিও ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

যে প্রকার অগ্নিকুণ্ডে জল নিঃক্ষেপ করিলে কুণ্ডস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে তাহার তেজ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ অন্যায় আহার বিহারের দোষে সমস্ত (বায়ু, পিত্ত, কফ) প্রকুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে (পিত্তের অংশ বিশেষ) মন্দীভূত করে, সুতরাং তজ্জাত উষ্মাও বহির্ভাগে (চর্ম্মে) নিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্যই জ্বর হইলে যে পর্য্যন্ত দোষের পরিপাক না হয়, সে পর্য্যন্ত যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা পরিপাক হইতে পারে না। সুতরাং জোর করিয়া আহার করিলে তাহাতে উপকার না হইয়া আরও অপকারই হইয়া থাকে। পরে ঔষধ দ্বারাই হউক অথবা কেবল লঙ্ঘন দ্বারাই দোষের পরিপাক হইলে যখন অন্নকাল উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে লঘুপাকি বস্তু আহার করিতে দিয়া ক্রমশঃ সহ্য করাইয়া লইতে হয়। কবিরাজগণ জ্বরিত ব্যক্তিকে এই নিয়মে চিকিৎসা করেন বলিয়া তাঁহাদিগের রোগীকে পরিণামে আর কোন প্রকারে কষ্ট পাইতে দেখা যায় না। কিন্তু ডাক্তারগণ এই কথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারা বলেন জ্বর যে প্রকারই কেন না হউক, পাকস্থলীর কার্য্য স্থগিত রাখা কোন মতেই উচিত নহে। তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা নাই। এদিকে যে সমস্ত দোষ পাকস্থলিতে সঞ্চিত থাকায় জ্বর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিপাক না হইলে যে পাকস্থলির কার্য্য স্থগিত হইতে পারে না এবং

জ্বরের বেগও হ্রাস হয় না, ইহা যদি ডাক্তারগণ নিজে নিজে রোগীর দ্বারা না বুঝেন, তবে কোন মতেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। পাকস্থলীর কার্য্য বন্ধ হইতে আরম্ভ হইলেই জ্বরের বেগ কমিয়া আইসে এবং তখনই অন্নকাল উপস্থিত হয়। যদি তখনও সময়োচিত পথ্য বিবেচনা করিয়া দেওয়া না যায়, তবে আবার জ্বরের বেগ বেশী হইয়া রোগীকে শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে। কিন্তু ডাক্তারগণ ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা রোগীকে দেখিয়াই দোষ দূষ্য কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া অমনি ১৫।১৬ রতি কুইনাইন সেবন করাইয়া দেন এবং দুধসাগুর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরদিনই রোগী ভরপেট দুধভাত খাইতে পারেন। এইরূপ দোষের সম্পূর্ণ প্রবলাবস্থায় কুইনাইন দ্বারা জ্বর বন্ধ করায় এবং অন্নকাল উপস্থিত না হইতেই দুধ ভাত খাইতে দেওয়ায় যে, রোগীর পরকাল নষ্টকরা হয়, তাহা উভয় মতের চিকিৎসিত ব্যক্তিদিগের অবস্থা সুন্দর রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তবে সন্নিপাত ও অভিন্যাস প্রভৃতি জ্বরে এত শীঘ্র শীঘ্র রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে যে, তাহাতে দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া দেখিবার কিছুমাত্র অবসর থাকে না। তাই তাদৃশ অবস্থায় অবস্থানুযায়ী কার্য্য করাই উচিত। যে কুইনাইনের জোরে ডাক্তারগণ এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, কবিরাজদিগেরও যে তদ্রূপ কোন ঔষধ না আছে এমন নয়। তাঁহারা একমাত্র দুধ ভাতই দিতে পারেন, কিন্তু কবিরাজগণ আদাবটী, চিনিবটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দই ভাত, মৎস্যমাংস প্রভৃতি ও হজম করাইতে পারেন। এইরূপে জ্বরের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও পরিণামে তাহাতে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। তজ্জন্যই পরোপকার প্রত্যাশী ধর্ম্মভীরু কবিরাজ সহসা সেইরূপ চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না। কিন্তু তদ্রূপ বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিলেও যে কুইনাইন অপেক্ষা কম ফল পাওয়া যায়, এমন নহে। তবে দ্রব্যগুণে স্পষ্টরূপে জ্বর প্রকাশ পাইতে না পারিলেও যেসকল দোষ কুপিত হওয়ায় জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ববৎ সঞ্চিতই থাকিয়া যায় এবং সময় পাইলেই আবার প্রকুপিত হইয়া উঠে অথবা একটু একটু করিয়া প্রবল হইয়া শরীরকে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। সন্নিপাত প্রভৃতি সাংঘাতিক জ্বরে যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না এবং রোগীর অবস্থাও

ক্রমে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তখন কবিরাজগণও এই সকল বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ কাল ডাক্তারগণ সকল প্রকার অবস্থাতেই অমোঘ জ্বরান্তকচূর্ণ সর্ব্বস্ব ধন একমাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিয়াই দুরন্ত জ্বরের হস্ত হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। দোষাদোষ সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করিয়া দেখেন না। কেবলমাত্র এই কারণেই যে, দিন দিন ভারতবাসী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে, বোধ করি এই কথা বলিলে বিজ্ঞমণ্ডলী আমার প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইবেন না। এবং ভরসা করি তাঁহারা নিজেও একবার ইহার সত্যতা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। ২৪ পরগণার অন্তঃর্গত নৈহাটী মোকামে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আছেন। তিনি নিজে ডাক্তার হইলে ও দোষাদোষ এবং পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে অনেকটা হিন্দুরীত্যনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সুখের বিষয় যে, তাঁহার নিকট হইতে যাঁহারা জ্বরমুক্ত হয়েন তাঁহাদিগের অধিকাংশকেই আর পরিণামে জড়িত পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতে দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন কলিকাতার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু পাড়াগাঁয় যেখানে যত ডাক্তর আছেন, সকলেই প্রায় এক গুরুর শিষ্য। যাহা হউক, এইক্ষণ কবিরাজী মতে দোষ পরিপাকের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি। জ্বর যে প্রকারই কেন না হউক, দোষের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দিয়া থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উপযুক্ত লঙ্ঘন না হইলে।

কফোৎক্লেশঃ সহল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।

কণ্ঠাস্য হৃদয়া শুদ্ধিস্তন্দ্রা——

কফ তুলিবার চেষ্টা, হল্লাস, মুহুর্মুহুঃ বমির বেগ, তন্দ্রা, কণ্ঠ, মুখ এবং হৃদয়ের অবরোধ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যখন দেখিবে—

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।

হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্ষমেগতে॥

স্বেদেজাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়ে।

বাত-মূত্র-পুরীষ নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ এবং উদ্গার শুদ্ধি, গ্লানিদূর, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও আহারে রুচি হইয়াছে, তখনই সম্যকরূপে লঙ্ঘন কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এবং এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। অমনি পথ্যের

ব্যবস্থা করিবে। ইহার পরেও যদি পথ্য না দিয়া আরও লঙ্ঘন দেওয়া হয় তাহা হইলে আবার।

পর্ব্ব ভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সংভ্রমোঽতীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নির্ব্বলহানিশ্চ———

পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, শোষ, অরুচি, অক্ষুধা, তৃষ্ণা, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা, ভ্রান্তি, অতিরিক্ত উদ্গার. অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় জ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া পীড়াকে ক্রমশঃ নিতান্ত সাংঘাতিক আকারে পরিণত করে। ক্রমশঃ——

উমার পুর
পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় করিরাজ।

বাঙ্গলার চিকিৎসক সমাজ।

——**——

(এলোপ্যাথিমতে)

পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে যখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কলিকাতার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, না জানি তখন তাঁহার মনে কতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে এখানকার সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণ ভারতবর্ষীয়গণের শরীরে ইউরোপীয় চিকিৎসার আরোপণ করিতে পারিবেন, এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ভৈষজ্য-শাস্ত্রের এক অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া না জানি সেই লোক-হিতৈষী মহাত্মা কতই প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। কিন্তু আজি যদি তিনি জীবিত হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, বাঙ্গালার চিকিৎসককুল, শিশুর ন্যায় অদ্যাপি ও ইউরোপীয় শিক্ষকগণের পদানুসরণ করিতেছেন। শিশু যেমন

নিজে কিছু বুঝেনা, গুরুজন বা শিক্ষক যাহা শিক্ষা দেন, তাহাই শিখে; তদ্রূপ আমরাও ক্রমাগতই ইংরাজ প্রভৃতিপণ্ডিতগণে যাহা বলিতেছেন তাহাই করিতেছি। নিজের স্বাধীনচিন্তা, স্বকৃত অনুসন্ধান, অভিনব মত কিছুই নাই, অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা নাই, অন্যকে শিখাইবার প্রবৃত্তি নাই। আমরা যেন মৃৎপিণ্ড, ইংরাজের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে আলোক প্রতিফলন করিতে সমর্থ নহি।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একজন চিকিৎসকও গবেষণা বা আবিষ্কারের জন্য খ্যাতনামা হয়েন নাই। একজন লোকও স্যার্ বেঞ্জামিন ব্রোডী বা সার এস্‌লি কূপারের ন্যায় শস্ত্রচিকিৎসক হয়েন নাই। একজনও সার টমাস ওয়াটসন্, কলেন্, কোপ্‌লাণ্ড্ প্রভৃতির ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন নাই। স্বাধীনচিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া হউরোপে হণ্টার, জেনার প্রভৃতি যেরূপ লোক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, বাঙ্গলার চিকিৎসকগণ তাহা জানিয়াও তাহার অনুসরণ করেন নাই। হা ধিক্, যদি মহেন্দ্রলাল সরকার না থাকিতেন তাহা হইলে কলিকাতায় যে কেহ চিকিৎসা শিক্ষা করে, তাহা বাহিরের লোক জানিতেই পারিতেন না।

এই অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের ভিতর যত সুচিকিৎসকের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺ দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও সূর্য্য গুডীব চক্রবর্ত্তী ভিন্ন সকলেই ইউরোপীয়। ওশানশি, গুডীব, বেলি, চার্লস্ প্রভৃতি যে সময়ে যশের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন এতদ্দেশীয় আর কেহই চিকিৎসাকার্য্যে খ্যাতনামা হইতে পারেন নাই।

এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর একখানিও নূতন পুস্তক বাহির হয় নাই। যতগুলি ডাক্তারি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তৎসমস্তই অনুবাদ। দুঃখের বিষয় এই যে, অনুবাদ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজের অভিজ্ঞতা তৎকৃত পুস্তকে বড় একটা সন্নিবেশিত করেন নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, অনুবাদকারিগণ ভাষা ও ভাবের দিকে অনেক সময়েই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অবশ্য ৺ মধুসূদন গুপ্ত, দুর্গাদাস কর, মীর আস্‌রফ আলি কিম্বা বর্ত্তমানে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয় দিগের অনুবাদ ভালই হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে যে কয়েক খানি নূতন ডাক্তারি পুস্তক লিখিত

হইয়াছে তাহা সমস্তই ইংরাজ কৃত। ডাং ব্রেট্, ডাং মার্টিন্, ডাং টোয়াই নিং, ডাক্তার নর্মান চেবার্স্, সার জোজেফ্ ফেরার্, ডাক্তার মুরহেড্ প্রভৃতি ইঙ্গ-ভারতীয় ধুরন্ধরগণ ইংলণ্ডের অনুসন্ধিৎসু ও মানসিক বিক্রমের পরিচয় এদেশে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা—দেশীয় চিকিৎসকগণ ইংরাজের লিখিত পুস্তকগুলি অনুবাদ ও নকল করিয়া আপনা আপনি কতই ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি। হয়ত ডাক্তার ভোলানাথ বসু, উদয় চাঁদ দত্ত ও অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়েরা বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের এ লজ্জা কতক পরিনাণে দূর করিতে পারিতেন।

যখন বাঙ্গলা দেশে ডাক্তারি চিকিৎসা নূতন আরম্ভ হইল, তখন নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ কবিরাজ সম্প্রদায় এদেশ হইতে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার পর হইতে তাঁহারা অনেক উন্নতি করিয়াছেন। কীটদষ্ট, ধূলি-ধূষরিত, হস্তলিখিত অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ, কাণ্ডজ্ঞান-বিরহিত, গণ্ডমূর্খ কবিরাজের পরিবর্ত্তে সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও সভ্য কবিরাজগণ এক্ষণে ভদ্র সমাজে চিকিৎসা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের অত্যন্ত দরিদ্রতা ঘুচিয়া অর্থেরও স্বচ্ছলতা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গেই হানিমানের শিষ্যগণ এতদ্দেশে আবির্ভূত হইয়া ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিয়া মানসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ বা হোমিওপ্যাথগণের ভিতর এমন একজনও প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যিনি আয়ুর্ব্বেদের বা হোমিওপ্যাথির উন্নতি করিতে পারিয়াছেন।

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের এই মানসিক দরিদ্রতার কারণ কি? যে বঙ্গীয় যুবকগণ বিশ্ব বিদ্যালয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, পরীক্ষাক্ষেত্রে সময়ে সময়ে ইউরোপীয়গণকেও পরাজিত করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রকার কঠিন শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে যাঁহারা প্রতিনিয়ত ব্যগ্র, শারীরিক বলের অভাববশতঃ জগতে কুখ্যাত হইলেও যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা অনেকেই স্বীকার করেন, কেন সেই বাঙ্গালী জাতির ডাক্তার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না? মার্কিন্ ও ইউরোপ যেরূপ দ্রুতপদে চিকিৎসার উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছেন,

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ কেবলমাত্র তাহার দর্শক হইয়াই কেন চিরকাল কাটাইলেন?—চিকিৎসক মাত্রেরই ইহা চিন্তা করা উচিত।

আমার মতে ইহার প্রথম কারণ-এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণের দরিদ্রতা ও অর্থ চিন্তা। মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্রসন্তান, অতি কষ্টে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েন "পঠদ্দশায় যে ঘোর দরিদ্রতার নিষ্পীড়ন সহ্য করিয়াছি, এক্ষণে তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিব। সেই নিশীথ অধ্যয়নের সময় মশক দংশন সহ্য করিয়া নীরস পুস্তক সকল আয়ত্ব করিতে যে ক্লেশ পাইয়াছি, পূতি গন্ধময়শবচ্ছেদ করিতে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার শত গুণ অধিক সুখভোগ করিবার চেষ্টা করিব"। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের এইরূপ একটা সুখ পিপাসা উপস্থিত হয়। সুতরাং নবীন চিকিৎসকগণ দিগবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সুখের আশায় ছুটিতে থাকেন। এখন ফল দুই প্রকার দাঁড়ায়। যাঁহাদের বন্ধু বান্ধব আছে, কিছু অর্থের সঙ্গতি আছে বা সাংসারিকতায় জ্ঞান আছে তাঁহারা শীঘ্রই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা দরিদ্র, লোকরঞ্জন করিতে পটু নহেন, তাঁহারা হয় প্রতিনিয়তই অর্থ চিন্তা করেন নতুবা গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়া ঊর্দ্ধতন চিকিৎসকের অধীনতা ভোগ করেন এবং কথঞ্চিৎ জীবনোপায় সংগ্রহ করেন। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাঁহারা যে নির্ব্বোধ বা মূর্খ তাহা নহে, বরং এইরূপই অনেক সময় দেখা যায় যে, বাহিরে আসিয়া যাঁহারা কিছু করিতে পারেন না, বিদ্যালয়ে তাঁহারা বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, বিদ্যাভ্যাসের সময়ে তাঁহারা ক্রমাগতই বিদ্যালাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; মনুষ্য চরিত্র বুঝিতে কিছুই চেষ্টা করেন নাই, সাংসারিকতা শিখেন নাই, কি করিলে চিকিৎসকের প্রতিপত্তি হয় তাহা ভাবেন নাই। সুতরাং সংসারের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহারা বড়ই হাবুডুবু খাইতে থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা বিদ্যালয়ে কষ্ট সৃষ্টে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা অনেক সময়ে বিদ্যা অপেক্ষা সাংসারিকতার জ্ঞান অধিক রাখেন সুতরাং তাঁহারা বাহিরে আসিয়া অধিক কৃতকার্য্য হয়েন। এই জন্যই বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের অদৃষ্টের চাকা উল্টাইয়া যায়। যাঁহারা বিদ্যালয়ে ম্লান মুখে বসিয়া থাকিতেন তাঁহারা গাড়ি ঘোড়া চড়েন, আর যাঁহারা

মেডেল ও বৃত্তি পাইয়াছেন তাঁহারা ব্যাগ হাতে করিয়া সাঁওতাল পরগণা বা কাছাড়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চলিয়া যান অথবা বাঙ্গলার পল্লী-গ্রামে বসিয়া গ্রাম্য লোকের মনোরঞ্জনার্থে তাস ও দাবা খেলিতে থাকেন এবং হাতুড়েদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন।

এইরূপে যে দুই শ্রেণীর উৎপত্তি হয় তাহার একটীও জ্ঞানোন্নতির উপযুক্ত হয় না। যাঁহারা বিদ্যাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহারা সরস্বতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং এই সময়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা মাতার ব্যয়ের জন্য বতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। আর যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই বিদ্যাভ্যাস ভালবাসিতেন না, এখন তো সঙ্গতি হওয়াতে আর বিদ্যাচর্চ্চার কিছুই প্রয়োজন বোধ হয় না। তাঁহারা বাঙ্গালীর চিরন্তনপ্রবৃত্তি বশতঃ ভোগপরায়ণতার হ্রদে নিমগ্ন হয়েন এবং (বলিতে দুঃখ হয়) অনেকেই চরিত্র, স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রম বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ ক্রয় করেন।

কেবল মাত্র যাঁহারা দরিদ্রতাকে বিস্মৃত হইয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারেন, কেবলমাত্র যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন হইয়াও বিলাসিতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নের ভার বহিতে পারেন, অথবা কেবলমাত্র যাঁহারা অধ্যয়নশীল হইয়াও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এ অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে জীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু হায় এরূপ লোক এদেশে কয়জন আছেন? তাই এদেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের এত দুর্দ্দশা।

চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক দেশীয় চিকিৎসকগণের সুশিক্ষা ও সৎপ্রবৃত্তির অভাব। সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে, "ডাক্তারেরা লেখাপড়া জানে না। তাঁহারা আপন ব্যবসায় কিছু শিখে বটে, কিন্তু তাঁহারা না জানে ভাল ইংরাজি, না বুঝে নিজ মাতৃ-ভাষা। বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বহুক্ষণ বক্তৃতা করিতে বা অনুসন্ধান-পূর্ণ পুস্তক লিখিতে সমর্থ কয়জন দেশীয় চিকিৎসক পাওয়া যায়? চক্রবর্ত্তী বা সরকারের ন্যায় দুই একটী লোক থাকিলে কি যথেষ্ট হয়? আর মাতৃভাষার উপরই বা কয় জনের দৃষ্টি আছে? যদি সমস্ত চিকিৎসক দলের মধ্যে একটী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় থাকেন অথবা একটী কবিরাজ বা একজন হোমিওপ্যাথ থাকেন, তাহা হইলে কি যথেষ্ট হইল?" এইরূপ মত সত্য কি

না, পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন কিন্তু জ্ঞানোন্নতির জন্য ভাষাজ্ঞান যে প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষার উপর দখল না থাকিলে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়। লিখিতে বসিয়া মুস্কিল বাধিলে বলিবার কথা থাকিলেও বলিতে পারা যায় না। এইজন্যই এত 'শিক্ষিত' ও 'উপাধিধারী, ডাক্তার থাকা সত্বেও বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকপত্র নাই বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। দুঃখ ক্লেশ করিয়া লিখিয়া কে হাস্যাস্পদ হইতে চাহে?

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর দোষ চিকিৎসকগণের আছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ীর ন্যায় সুলভ মূল্যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার উপায় আর কাহারো নাই। যদি জীবের প্রতি দয়া করা ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হয় তবে জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের প্রতি দয়া করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করা চিকিৎসকের পক্ষে যত সহজ এত আর কাহারো পক্ষে নহে। স্বর্ণকার যেমন মনুষ্যের অর্থ সঙ্গতি ও অলঙ্কার প্রিয়তা দেখিতে পায়, বিবাহের ঘটক যেমন প্রত্যহই আনন্দ কোলাহল, বিবাহোৎসব ও সুখোচ্ছ্বাস দেখিতে পায়, অন্যদিকে চিকিৎসক তেমনি মনুষ্যের দুর্ব্বলতা, রোগ, যন্ত্রণা, অনাহার ও মৃত্যু দেখিতে পান। ভোজের দিনে বা উৎসবের রাত্রিতে কেহ চিকিৎসকের কাছে যায় না। সুখ ও সমৃদ্ধির বসন্তানিল যখন বহিতে থাকে তখন চিকিৎসকগণকে কেহই আদর করে না। কিন্তু যখন নিশীথ সময়ে রোগ যন্ত্রণায় প্রাণ সম আত্মীয় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন, যখন উৎসব কালের বন্ধুগণ আপন আপন বাটীতে নিদ্রিত থাকেন এবং পীড়িতকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না,—যখন বিপদের ঘোর বর্ষাগম উপস্থিত হয় তখনই লোকে প্রাণপণে চিকিৎসকের উপাসনা করে। এ হেন অবস্থায় চিকিৎসকগণ মনুষ্য জীবনের ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া ও নিজের নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিতে পারিতেন। মুমূর্ষু ও ঘোর বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারিলে মনে যে অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইতেন, আর এইরূপে ধর্ম্মোপার্জ্জনের চক্ষে দেখিলে প্রত্যেক, চিকিৎসক যে অধিক মনঃসংযোগ করিতেন তাহাতে নিশ্চয়ই অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু কেবল মাত্র লাভা-লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করাতে আমরা রোগী গুলিকে কেবল অর্থোপার্জ্জনেরই

উপায় বলিয়া মনে করি। যে যেমন অর্থ দিতে পারে, তাহাকে কেবল ততটুকুই যত্ন করি। ধনী রোগী অধিক অর্থ দিবে সুতরাং তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বরফজলের গেলাসটী অগ্রসর করিয়া দিই ও মিষ্ট কথা বলি, দরিদ্রের দিকে চাহিয়াও দেখি না।

ইহার ফল এই হয় যে, মন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, রোগীকে পণ্যদ্রব্য বোধ মধ্যে হয়, মনুষ্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্লেশ হয় না, এবং 'অর্থলাভ না হইলে চিকিৎসা করিব না' এইরূপ ভাবাতে অভিজ্ঞতা লাভের প্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরানুগ্রহে এদেশীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহারা যদি একথা বুঝিতেন তবে অগাধচিকিৎসাজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিতেন। যে দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, সেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক হইতে হইলে দরিদ্রের চিকিৎসক হওয়া প্রয়োজন।

আর যদি একই উপায়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার পন্থা কিছুমাত্র থাকে, তাহা হইলে দরিদ্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে ভিন্ন কোথায় আর সে পন্থা দেখা যাইবে? অকিঞ্চন মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাহার শুশ্রূষা করেন, তিনি বনবাসী মুদিতনয়ন যোগী অপেক্ষাও অধিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন এবং কেবলমাত্র বহু উপাধি ধারীপুস্তক পাঠকারী—চিকিৎসক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদিগের পূজ্যপাদ আয়ুর্ব্বেদকারগণ বলিয়াছেনঃ—

ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্যশঃ।
কার্য্যা ভ্যাসো ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

কিন্তু এখনকার চিকিৎসকগণ পণ্ডিতগণ পণ্ডিতম্মন্য হইয়াও তাহা বুঝিলেন না বলিয়াই উন্নতি করিতে পারিতেছেন না।

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞানোন্নতির তৃতীয় প্রতিবন্ধক একতা ও সহানুভূতির অভাব। একজন মানুষের বুদ্ধি দ্বারা যে উপায় দেখা না যায়, পাঁচজন পরামর্শ করিয়া তাহা উদ্ভাবন করিতে পারে। এইরূপে ইউরোপ ও মার্কিনে সকলজ্ঞান বিশেষতঃ চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। যে ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে ও অস্ত্র চিকিৎসা করিলে ধর্ম্মযাজক পোপের নিকট উৎপীড়িত হইতে হইত, সেই ইউরোপ আজি সমবেত চেষ্টার গুণে

শস্ত্র চিকিৎসায় ভারতের শিক্ষা গুরু। ইংলণ্ডের যে রয়েল সোসাইটী দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সভা করিয়া "আকাশ হইতে শস্য পতিত হইয়াছে, তাহা বপন করিলে কিরূপ উপকার হইবে" এবং "ভেক দগ্ধ করিয়া তাহায় ভস্ম লাগাইলে পচা ঘা কতদিনে সারিবে" এইরূপ অলীক কথার বিচার করিতেন; সমবেত চেষ্টার গুণে আজি ইংলণ্ডের সেই সভাতে অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা উত্থাপিত হইতেছে। আর যে দেশে দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে সুশ্রুত লিখিত হইয়াছে, সেখানকার চিকিৎসকগণ কেবল দর্শক হইয়া রহিয়াছেন। যে দেশে এত চিকিৎসক রহিয়াছেন, সেখানে একটীও দেশীয় চিকিৎসকসভা নাই, যে একটী নাম মাত্র আছে সেটী সাহেবদের সভা। সভা হইবার একমাত্র উপাদান যে মনের মিল ও সমবেত চেষ্টা, তাহাও নাই। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ পরস্পরকে ভাল বাসেন না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুনঃ——

কলিকাতা নগরীতে চিকিৎসক দিগের চারিটী প্রধান দল, এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি ও হাকিমী। প্রত্যেক দলের মধ্যে আবার গৃহবিচ্ছেদ। এলোপ্যাথিকদের মধ্যে বিস্তর বিচ্ছেদ ও কলহ। একটী রোগীকে দেখিবার জন্য যখন নব্য ডাক্তার প্রবীণকে আহ্বান করেন, তখন প্রবীণ আসিয়া ছলে কৌশলে নবীনকে নিন্দা করা একটা নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যে বোধ করেন। আপন আপন ডাক্তার খানায় বসিয়া তাঁহারা অনেকেই পরস্পরের কুৎসা করেন। হোমিওপ্যাথ দিগের ভিতর অন্ততঃ তিনটী দল। সহরের এক একটী বড় হোমিওপ্যাথ এক একটী দলের কর্ত্তা, ইঁহারা পরস্পরের বৈরী। কবিরাজ ও হাকিমগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সুতরাং তাঁহাদের এত দলাদলি সম্ভবে না। আবার এলোপ্যাথিক ডাক্তর হোমিওপ্যাথকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, হোমিওপ্যাথ মায়সুদ তাহার উত্তর দেন। বৈদ্যগণ বলেন যে, ডাক্তরেরা নাড়ী দেখিতেও জানে না, কেবল কসাইয়ের কার্য্যে সুপটু। ডাক্তরেরা বৈদ্যগণকে 'বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া উপহাস করেন। পরস্পর কেহই কাহারও শাস্ত্র জানেন না। এরূপ অবস্থায় কি করিয়া মনের মিল হইবে; কিরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারিবে?

মফঃস্বলের অবস্থা আরও মন্দ। মফঃস্বল সহরে ছোট বড় যে সকল চিকিৎসক আধিপত্য করিতেছেন, যদি তাঁহাদের মধ্যে একজন নূতন ডাক্তার

উপস্থিত হয়েন, তবে তাঁহার বড়ই বিপদ্। শীকারে বিঘ্ন উপস্থিত হইল দেখিয়া ফেরুপালের ন্যায় তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে চিৎকার করিতে থাকে। হাটে, মাঠে, ঘাটে পাদচারী চিকিৎসকগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে কুৎসা সকল প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কল্পনা শক্তির তীক্ষ্ণ ধার বেশ দেখা যায়। ও দিকে যানবিহারী পাণ্ডিত্যাভিমানী বড় বড় ডাক্তার মহাশয়েরা পাছে আগন্তুক তাঁহাদের ভাতে ধুলা দেয়, এই ভয়ে স্বতঃপরতঃ তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে থাকেন, অল্প ছিদ্র পাইলেই সেই ছিদ্র মুখে তোপ দাগিতে থাকেন। বলিতে কি, জীবন যুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনি নিপুণ যে, ছিদ্র না পাইলেও প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। একই সহরের দুই জন পুরাতন চিকিৎসক পরস্পর শত্রু হইলেও এই তৃতীয় ব্যক্তিকে তাড়াইবার জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধু হয়েন। তৃতীয় ব্যক্তি চলিয়া গেলেই তাঁহারা পরস্পর পূর্ব্ববৎ শত্রু হয়েন। মফঃস্বলে পরস্পরের রোগী কাড়িয়া লইবার চেষ্টা বড় বিষম রোগ। এই ভয়ে দুর্ব্বল ডাক্তার সকলকে (পসারওয়ালাকে) পরামর্শ করিবার জন্য ডাকিতে সাহস করেন না। পসারগ্রস্ত চিকিৎসক আসিলেই গরপসারীর রোগীটী কাড়িয়া লয়েন, যদি কাড়িয়া লইতে না পারেন, তবে তাহার প্রতি যাহাতে গৃহস্থের ঘৃণা হয় তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে থাকেন *।

এমন যাঁহাদের মতিগতি, তাঁহারা কি কখন একত্রিত হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন?——কখনই না।

জ্ঞান বাড়াইবার চতুর্থ প্রতিবন্ধক দেশের লোকের দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা। এ দেশে অনেক লোকেই ডাক্তারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া অর্থ দিতে সমর্থ নহেন। ডাক্তারের অনুসরণ করিয়া কবিরাজ মহাশয়েরাও আজ কাল 'ভিজিটের পদ্ধতি করিয়াছেন। প্রতিবারে ভিজিট, ঔষধের মূল্য, মফঃস্বলে গাড়ি বা পাল্কীভাড়া দিয়া ডাক্তার ডাকিতে পারেন, এবং রোগীর জন্য নানা প্রকার ফরমাইসে খরচ করিতে পারেন এরূপ লোক বাঙ্গালা দেশ বড় অধিক নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে এদেশের লোক সম্পূর্ণ নির্দোষী, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? মফঃস্বল সহরে ও পল্লীগ্রামে গৃহস্থ ও চিকিৎসকের মধ্যে দেনা পাওনার অবস্থা পাঠক মহাশয়েরা জানেন কি? বিশেষ সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক ভিন্ন আর কেহই দীর্ঘস্থায়ী রোগ চিকিৎসা করিতে গিয়া সকল ভিজিটের টাকা আদায় করিতে পারেন না। অনেক স্থলেই দর্শনীর টাকা নগদ মিলে না, খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। পরে যখন কালসহকারে

* ইংরাজ ডাক্তরকে পরামর্শ করিবার জন্য ডাকার সুখ এই যে, ইংরাজ আসিয়া তোমার সর্ব্বনাশ তো করিবেই না বরং গৃহস্থের নিকট তোমার প্রশংসা করিয়া তোমার যদি সত্য কোন দোষ পায় তাহা গোপনে কেবল তোমাকেই বলিবে।

পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়, তখন গৃহস্থ মহাশয় পঞ্চাশ টাকার দেনায় ত্রিশ টাকার অধিক আর দিবেন না ইহাই মিষ্টভাষায় বিনীতভাবে বুঝাইয়া দেন—ডাক্তর মহাশয়ও ম্লানবদনে আগত্যা তাহাই গ্রহণ করেন, হয়তঃ মনে মনে বাল্যকালের পঠিত শ্লোকের এক অংশ আবৃত্তি করেন—"অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"। ঔষধের মূল্য পাওয়া আরও কঠিন ব্যাপার। গৃহস্থেরা চিকিৎসা সম্বন্ধে আর কিছু জানুন বা নাই জানুন কিন্তু তাঁহাদের এটী বেশ জানা আছে যে, ঔষধের প্রকৃত দাম খুব কম, সুতরাং পঞ্চাশ টাকার 'বিল' লইয়া গেলে অনেকে বিল্সরকারকে পাঁচবার ফিরাইয়া দিয়া শেষে নগদ আট টাকা দেন, এবং পুনরায় তিনমাস পরে কিছু দিবেন এমন ভরসা দিয়া পাঠান। এই ব্যাপারে অধিক দোষ কাহার? অবশ্য, লোকের দরিদ্রতাই ইহার প্রধান কারণ।

এইরূপে ডাক্তার দিগের মনোবাঞ্ছা যথেষ্ট রূপ পূর্ণ হয় না বলিয়া অনেক ডাক্তরই যেন ক্ষুণ্ণ মনে থাকেন। এইরূপ অসন্তুষ্ট ব্যক্তি যে নিজের অধিক উন্নতি করিবে, তাহা বড় আশা করা যায় না। আমি অনেক ডাক্তরকে "পড়া শুনা কেমন করেন?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছেন "যাহা কলেজে পড়িয়াছি, তাহারই দাম পাই নাই, আবার নূতন কি পড়িব"।

পক্ষান্তরে যদি রোগীর আত্মীয় স্বজন ডাক্তারের ভ্রম বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে চিকিৎসকও একটু সতর্ক থাকিতেন এবং ভয়ে ভয়ে একটু পড়া শুনা করিতেন। কিন্তু হায় চিকিৎসকের ভুলধরা দূরে থাকুক দেশের লোকে চিকিৎসার কিছুই বুঝে না। সাধারণ লোকের নিকট ডাক্তার দুই রকমের। প্রথম বড় ডাক্তার অর্থাৎ যাহারা গাড়ি পাল্কি চড়িয়া বেড়ায়, আর ছোট ডাক্তার—যাহারা হাঁটিয়া চিকিৎসা করে। পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না, তাঁহারা লেখাপড়া জানেন, অনেক কথা বুঝেন কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেশের অধিকাংশ নরনারী মূর্খ, সুতরাং তাহাদের নিকট ডাক্তারের এইরূপ বিভেদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দুঃখের কথা বলিব কি, যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াছেন বি, এ, এম, এ, পাস করিয়াছেন, তাঁহারাও ডাক্তারে একটা নিতান্ত ভুল কথা বলিলে বা খারাপ চিকিৎসা করিলেও বুঝিতে পারেন না। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহারাও কেবল পসারওয়ালা ডাক্তারের প্রতি প্রাগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ও যাহার পসার হয় নাই, তাহার প্রতিসন্দিগ্ধ থাকেন। না হইবেই বা কেন? অজ্ঞতা নিজের পথ চিনে না, অন্ধকারের মধ্যে কেবল যেদিকে লোকের কোলাহল শুনে, তাহারই প্রতি আশাপন্ন হইয়া ছুটিতে থাকে, যেদিকে কোলাহল নাই সেদিকে উত্তম পথ থাকিলেও যাইতে সন্দেহ করে।

চিকিৎসকদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির পঞ্চম প্রতিবন্ধক ভারতীয় জাতির স্থিতিশীলতা ও ইউরোপীয়ের উন্নতিশীলতা। যে ভারতবর্ষে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র

বৎসর পূর্ব্বের লিখিত আয়ুর্ব্বেদই বিলুপ্তপ্রায়, যেখানে প্রাচীন জ্ঞান সংগ্রহ করাই লোকের পক্ষে কঠিন, করিতে পারিলে প্রশংসনীয়, সেখানে আবার নূতন আবিষ্কারের বিষয় কে চিন্তা করিবে? আয়ুর্ব্বেদ এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় আছে, তাহা সম্যক্ রূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহার দোষ সংশোধন করিতে ও আয়ুর্ব্বেদীয় নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিতে কয়জন কবিরাজ ইচ্ছুক আছেন। আয়ুর্ব্বেদে যে সকল মত ভ্রমাত্মক আছে, যে সকল মত মিথ্যা বলিয়া এক্ষণকার লোকে বুঝিতে পারিতেছে, সে গুলিকে বেদ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া ঐ শাস্ত্র যাহাতে ইদানীন্তন চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহের তুল্য যুক্তি ও সহজ বুদ্ধির উপর দাঁড়াইতে পারে, এরূপ করিবার জন্য কয় জন কবিরাজ ব্যস্ত হইয়াছেন? আর ডাক্তর সমূহের মধ্যেও এমন লোক কয়জন আছেন, যাঁহারা হউরোপ ও মার্কিনের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া তাহার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক আছেন? ইউরোপ ও মার্কিণের উন্নতির গতি মেল্ ট্রেণের ন্যায়, আমাদের গতি কচ্ছপের ন্যায়, কিরূপে আমরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমান বেগে চলিব?

এই সকল কারণে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণের উন্নতি হইতেছে না। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে চিকিৎসকগণ জ্ঞানের উন্নতি করিতে পারেন তাহা চিন্তা করা সকল চিকিৎসকেরই উচিত। আমরা একে একে সেই সকল উপায় বর্ণনা করিব।

১। সর্ব্বপ্রথম উপায় একটী চিকিৎসক সভা স্থাপন। এইরূপ সভা থাকিলে চিকিৎসকগণ নিজ নিজ ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা ঐ সভায় প্রকাশ করিতে পারিবেন, এবং সমব্যবসায়ীগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এইরূপে পরস্পরের সংঘর্ষণ ও পরামর্শে সমুদায় চিকিৎসক সমাজের যথেষ্ট জ্ঞানোন্নতি হইতে পারিবে। কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে সকল শ্রেণীরই চিকিৎসক ঐ সভার সভ্য হইতে পারিবেন এবং যে সকল জ্ঞানোৎসাহী ব্যক্তি চিকিৎসক নহেন তাঁহারাও সভ্য হইবেন।

আদি বা কেন্দ্রসভা কলিকাতায় স্থাপিত হইবে, মফঃস্বলে শাখা সভা স্থাপন করিতে হইবে। যখন চিকিৎসকেরা নিজের মঙ্গল চিন্তা করিতে শিখিবেন, তখন মফঃস্বল সহরে ঐরূপ সভার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু কি কলিকাতা কি মফঃস্বল সর্ব্বত্রই সভার উদ্দেশ্য অতি উদারভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে। কেবল মাত্র চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি করিলে চলিবে না। কিসে দেশ হইতে বড় বড় রোগ দূর হয়, কি করিলে মফঃস্বলের জলকষ্ট যায়, কি উপায় অবলম্বন করিলে বিসূচিকা বা তদ্রূপ অন্য কোন রোগাক্রান্ত গ্রাম, নগর বা জনপদকে রক্ষা করিতে পারা যায়, কোন্ স্থানে মিউনিসিপালিটি বা স্থানীয় কিম্বা জেলা বোর্ডের কার্য্য কিরূপ চলিলে

তত্রত্য লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়—এই সকল ঐসভার অবশ্যবিবেচ্য বিষয় হইবে। তজ্জন্য মফঃস্বল হইতে বহু সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইবে। বাস্তবিক ভারত সভা যেমন এতদ্দেশীয় প্রজাসাধারণের রাজ নৈতিক মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের প্রস্তাবিত চিকিৎসক সভাও সেইরূপ সর্ব্বথা যাহাতে এই অধঃপতিত জাতির শারীরিক মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। সাত শত বৎসরের পরাধীন জাতির শারীরিক উন্নতির জন্য যদি উক্ত সভা একটীও সৎপরামর্শ দিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রকার সভার সম্মিলিত কার্য্য অপেক্ষা উহা দ্বারা যে, অধিক কার্য্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এইরূপে একই সভা দ্বারা চিকিৎসকগণের জ্ঞানোন্নতি ও সর্ব্বসাধারণের সাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা যাইতে পারিবে। ভরসা করি, এইরূপ সভা স্থাপিত হইলে চিকিৎসকগণের মধ্যে যে সৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে বঙ্গীয় চিকিৎসক সমাজে অমৃতময় ফল ফলিবে।

২। দ্বিতীয় উপায় চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশ। উল্লিখিত সভার তত্ত্বাবধারণে বা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে অন্ততঃ একখানি উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। অনেকে বলেন ইংলণ্ডে ল্যান্সেট্ নামক যে সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক কাগজ বাহির হয়, এদেশে তাহার ন্যায় কাগজ বাহির হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, এদেশের গ্রাহকগণ কাগজের মূল্য দিতে বড়ই অনিচ্ছুক, বিশেষতঃ চিকিৎসা বিষয়ক পত্রের যে অল্প সংখ্যক গ্রাহক হইবে তাহাতে যদি অনেকেই মূল্য না দেন তবে কয় দিন উহা চলিবে? কিন্তু যদি কোন ধনী ব্যক্তি উহার উদ্‌যোগী হয়েন তবে কেন না চলিবে? আর যদি সেই রূপ করিয়া কিছুদিন ভাল লেখা বাহির হয় তবে কেনইবা গ্রাহকগণ ফাঁকি দিবেন?

ঐরূপ পত্র সাপ্তাহিক অন্ততঃ পাক্ষিক হওয়া উচিত। দেশের সমুদায় চিন্তাশীল ও সুলেখক ব্যক্তিগণকে উহাতে লিখিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহাদিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত অর্থ দিতে হইবে নতুবা কখনই ভাল প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, তাঁহারাও সংবাদ দাতা প্রভৃতি নানাপ্রকারের লেখক হইবেন। উক্ত পত্রে সর্ব্ব দেশীয় ও সর্ব্বশ্রেণীর চিকিৎসাবিষয়ের সার সংগৃহীত হইবে, উহাতে ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানের জল বায়ু, স্বাস্থ্য ও পীড়া প্রভৃতির সংবাদ লিখিত হইবে এবং উহাকে বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতা প্রকটন ও মত আন্দোলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র করিতে হইবে।

৩। তৃতীয় উপায় যাহাতে এতদ্দেশীয় এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তারদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর একটু কৃপাদৃষ্টি করেন এবং যাহাতে

মেডিকেল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই গৃহীত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাস্তবিক জ্ঞানোন্নতি করিতে হইলে প্রথমে অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। এক্ষণে ডাক্তারেরা যেরূপ ভাবে দিনপাত করি-করিতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাতে জ্ঞানোন্নতি করিবার প্রবৃত্তি হয় না, এই জন্য যাহাতে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হয় তাহা করা প্রয়োজন। অন্যান্য বিভাগে বেতনের হার যেরূপ আছে এ বিভাগেও যাহাতে নেটিব ডাক্তার ও এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ ইহা অপেক্ষা ভাল থাকিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

শিক্ষিত চিকিৎসকদের অবস্থা ভাল করিতে হইলে হাতুড়ের সংখ্যা যাহাতে উদ্দাম ও অনির্দ্দিষ্টরূপে না বাড়িতে পায়, তাহা করা প্রয়োজন। এই জন্য বাচ্ সাহেবের প্রস্তাবিত মতটীই ভাল বোধ হয়। কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথদের গুণপনা নির্দ্ধারণের জন্যও গবর্ণমেণ্টের একটা নিয়ম করা উচিত।

এমন দিন আসিয়াছে যে, মেডিকেল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা এ দেশে গৃহীত হয়। আর কতকাল গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতিতা দেখাইয়া অপদার্থ শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারগণকে মোটা বেতনে শ্রেষ্ঠ কাজগুলি দিবেন? তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে অপদার্থ, তাহা অনেক ইংরাজ এক্ষণে বুঝিয়াছেন, আর যদি তাঁহারা অপদার্থই না হন তবে কেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয়-গণের সঙ্গে একত্রে পরীক্ষা করুন না? ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই একই সময়ে একই প্রশ্ন দ্বারা কেন পরীক্ষা গৃহীত হউক না? তাঁহারা যদি শ্রেষ্ঠ হন তাহা হইলে এখন যেমন চিকিৎসা বিভাগের সকল ভাল কাজ গুলিই তাঁহারা পাইতেছেন, তখনও সেই রূপই পাইবেন। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের জাতীয় কংগ্রেস্ সভা এবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাহাতে কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া পরীক্ষা দিলেই লোকে এই প্রার্থনীয় পদ পায়, তাহা ঘুচাইয়া ভারতীয় চিকিৎসা শিক্ষার্থীগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন।—

৪। শেষ উপায়, উদার ভাবে সত্যানুসন্ধান। মহাত্মা ঈশাকে যেদিন নিষ্ঠুর য়িহুদিগণ হত্যা করিল, সেই দিন নির্ব্বোধ পাইলেট্ সেই মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "সত্য কাহাকে বলে?" সত্যের প্রতি তাহার এতই অনাদর যে, সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিল না। আহা, হতভাগা যদি উত্তরের প্রতীক্ষা করিত, তাহা হইলে য়িহুদিরা সেই সত্যের আধারকে ধ্বংশ করিত না। চিকিৎসক বন্ধুগণ! আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান করা। রোগের মূল নিদান, ঔষধের যথার্থপ্রকৃতি, পীড়ার সহিত ঔষধের সত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ—এই সকলই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু আমরা কি অবিকৃত মনে সত্যানুসন্ধান করিতে পারি? তাহা যদি পারিতাম তবে

এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির এত বিবাদ কেন? কবিরাজগণকে ডাক্তারেরা উপহাস করেন কেন? আমরাও পাইলেটের ন্যায় পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করি "সত্য কাহাকে বলে?" কিন্তু উত্তর জানিবার জন্য ব্যগ্র হই না। কুসংস্কার ও পোষিত মত, কুশিক্ষা ও কুপ্রবৃত্তি আমাদিগের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়ায়, তাহারা যাহাকে সত্য বলায় আমরা তাহাকেই সত্য বলি, প্রকৃত সত্যের নিকট গিয়াও চিনিতে পারি না। তাই রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগও ঔষধের সত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না এবং কুশিক্ষা যাহাকে প্রকৃত ঔষধ বলে, তাহাই খাইতে দিয়া য়িহুদিরা যেমন একদিন ঈশাকে হত্যা করিয়াছিল আমরাও সেইরূপ শত সহস্র সত্যের আধার জীবিত মনুষ্যকে হত্যা করিয়া যেদিন রোগ ও ঔষধের সত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে, কেহ কি বিবেচনা কর, তাহার পর আর রোগ আরোগ্য করা কঠিন থাকিবে?

সত্য কোন ঋভবিশেষের ভৃত্য নহে। যদি ডাক্তারি বা কবিরাজিতে সত্য পিঞ্জরাবদ্ধ হইত, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিতে এত বিসূচিকার রোগী ভাল হইত না। আমার বোধ হয়, সত্য সকলমতের ভিতরই কিছু কিছু আছে, কোনটীতেই সম্পূর্ণ নাই।

ঐ যে মধ্যাহ্ন সূর্য্য আকাশ হইতে জগতের উপর কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, উহার আলোক আমি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি আমারই চক্ষে পড়িয়াছে? তাই বলিয়া কি দূর দেশস্থ লোকে সূর্য্যে দেখিয়াছে বলিলে বিশ্বাস করিব না? সূর্য্য রশ্মি যেমন দর্শক মাত্রেরই চক্ষে কিছু কিছু পড়ে, কাহারো চক্ষে সমস্ত পড়ে না, চিকিৎসার সত্যও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার মতেরই ভিতর কিছু কিছু আছে কোনটিতেই সম্পূর্ণ নাই।

সত্য ও অসত্য মিশ্রিত যে সকল চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, যে সকল মত গ্রথিত হইয়াছে, ভবিষ্যতের চিকিৎসকগণ তৎ সমুদায় হইতে সত্য ঝাড়িয়া বাহির করিবেন। যে অনুসন্ধানের ঝড় তাঁহারা বহাইয়া দিবেন, তাহাতে অসত্যের রাশি রাশি ধূলা উড়িয়া যাইবে, কোটি কোটি পুস্তক ও শত শত মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইবে এবং জগতের সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্রের সার সত্যরত্ন একত্রিত হইয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াও মনুষ্যকে ধন্য করিয়া তুলিবে।

জগতের ইতিহাসে এমন দিন আসিবেই আসিবে কিন্তু কে এই শুভ কার্য্য আরম্ভ করিবে? ভাই বঙ্গবাসি চিকিৎসক সম্প্রদায় তোমরা কি একার্য্য পার না? এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করা যাহারই ভাগ্যে থাকুক, তোমরা কি ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ নহে? যে দেশে অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ তনয় অশেষ বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই দেশের সমগ্র চিকি-

ৎসক মণ্ডলী একত্রিত হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্কার করিতে সমর্থ হইবেন ইহা আশা করা কি অযৌক্তিক ?

আমার বোধ হইতেছে কোন অদূরবর্ত্তি দিনে এই দেশের চিকিৎসক কুল আপন আপন মতবৈষম্য বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের সাহার্য্য লইয়া উদারভাবে ভৈষজ্য শাস্ত্রের সত্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যখন সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে তখন প্রত্যেক চিকিৎসক স্বমত নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র হইতে কেবল যেঔষধে যেরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, তাহাই লইবেন এবং এইরূপে নূতন শাস্ত্র সংগঠিত হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসকগণ বন্ধুভাবে হাত ধরাধরি করিয়া চিকিৎসার দুর্গম পথে অগ্রসর হইবেন, তখন বাঙ্গলার চিকিৎসক সমাজ অন্যান্য সভ্য জাতির নিকট সুপরিচিত হইবেন।

শ্যামনগর
উত্তর বারাকপুর } শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি,
১৮৮৯

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সুযোগ্য লেখক মহাশয়, বাঙ্গলার চিকিৎসকসমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত অভাব মোচনের জন্য আজ গভীর দুঃখের সহিত উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, চিকিৎসা-সম্মিলনী সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের অন্তঃকণও ঠিক্ এই শ্রেণীর অভাব দ্বারা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই আমরা মৃত মহাত্মা ডাক্তার খাস্তগীর প্রভৃতি বড় বড় বিচক্ষণ ডাক্তার কবিরাজ মহোদয়ের সাহায্যে এই সম্মিলনী ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। ভাবিয়া ছিলাম-এব্রত উদ্যাপনের জন্য আমরা দেশস্থ সর্ব্বশ্রেণীর চিকিৎসক-মণ্ডলীর নিকট হইতে সহানুভুতি ত পাইবই, অপরন্তু দেশীয় সুশিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়গণও আমাদের এ সাধু প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া তদ্রুপ যত্নাদি লইবেন। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় এই যে, আজ কয়বৎসর পর্য্যন্ত আমরা এই সম্মিলনী ব্রতে বতী থাকিয়া সাধারণের নিকট হইতে আমাদের প্রার্থিত সহানুভুতির যে পরিমাণে আভাস প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমাদের অনেকটা চৈতন্য হইয়াছে। তবে নাকি অন্তঃকরণ বোঝেনা, তাই এখনও এসমস্ত বিষয় লইয়া হৈ চৈ করিতে ছাড়িতেছিনা। সে যাহা হউক, যদুবাবুর উপস্থিত প্রস্তাবে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। এবং আশা করি যে, তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের নির্ব্বাণপ্রায় উদ্যম ও কল্পনাকে উদ্দীপিত রাখিবেন। চি, স,ক,স,

জ্বর-চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথি মতে)

এগারিকস্।

ব্যবহার লক্ষণঃ—পাতলা কেশ ও বর্ণ বিশিষ্ট লোকদিগের উপযোগী; শিথিল মাংশ পেশী ও চর্ম্মবিশিষ্ট : শ্লথ রক্ত সঞ্চালন বিশিষ্ট প্রাচীনপণ। নীহার স্ফোটের (chilblain) ন্যায় শরীরের বিভিন্নাংশে জ্বলন কণ্ডুয়ন ও আরক্ততা, কর্ণ, নাসিকা, আস্য, মণ্ডন, হস্ত ও চরণের। বোধঃ-যেন বরফ স্পৃষ্ট, অথবা বরফ সূচিকা বিদ্ধ, (উষ্ণ জ্বলন্ত সূচিকাবেধ, আর্সে)। প্রলাপ, উপযুক্ত শব্দের পরিবর্ত্তে ভ্রান্ত শব্দের ব্যবহার ; রাত্রিতে নিদ্রা শূন্যতা ; কল্পনার উত্তেজনা;—গানকরা, কথাকহা কিম্বা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া ; প্রলাপ; শর্য্যাত্যাগ চেষ্টা প্রলাপ কালীন শক্তি চলনা। তাণ্ডব রোগ ; সকল প্রকার সামান্য অনৈচ্ছিক সঞ্চলন ও এক একটি মাংস পেশীর স্পন্দন হইতে সর্ব্ব শরীরের নৃত্য বৎ সঞ্চলন। জাগরণে অনৈচ্ছিক সঞ্চলন ; নিদ্রায় তাহার বিলোপ। মেরুদণ্ডে স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রাতে বৃদ্ধি যুক্ত ; বিদ্যুৎঝটিকার পূর্ব্বে ; প্রতি সঞ্চলনে, শরীরের প্রতি পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ; মেরু মজ্জার গভীরাংশে দাহকর ও চিড়িক মারা বেদনাবোধ।

কম্পঃ—সাধারণতঃ সর্ব্ব শরীরে ; অনাবৃত বায়ুতে ; উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে (ভিরে) ; সামান্য সঞ্চলনে বা বস্ত্রোত্তলনে কম্প বোধ ; পৃষ্ঠে যেন জল নিম্নে গড়াইতেছে এইরূপ বোধ।

উত্তাপঃ—সামান্য বা অবর্ত্তমান ; প্রায়ই শরীরের উর্দ্ধাংশে।

ঘর্ম্মঃ—অপর্য্যাপ্ত ; বসাবৎ, নিদ্রিতাবস্থায় ও সমস্ত রাত্রি স্থায়ী, কিন্তু দুর্গন্ধী নহে ; সামান্য উদ্যমে উদ্রিক্ত ; প্রায়ই শরীরের সম্মুখাংশে ; রাত্রিতে বিশেষতঃ পদদ্বয়ে ; আস্য মণ্ডলে, গ্রীবায় বক্ষে শীতল ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্ম, অপর্য্যাপ্ত সত্বেও দুর্ব্বলকর নহে।

এনাকার্ডিয়ম্ ওরিয়েণ্টেলি।

ব্যবহার লক্ষণঃ—খিট্ খিটে, স্নায়বীয় ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্বভাব ; পীড়ায় মানসিক লক্ষণের প্রাবল্য। হঠাৎ স্মৃতি লোপ ; সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ হওয়া ;

বিস্মরণশিলতায় রোগীর কষ্ট বোধ হওয়া। অবসাদ বায়ুগ্রস্ততা (hypochondriasis)। হিংসাপ্রবলতা, পরানিষ্টচেষ্টা; অভিসম্পাৎ ও দিব্য করণের অনিবার্য্য ইচ্ছা। সকলকেই সন্দেহ; চলিবার সময় বোধ হয় যেন কেহ তাহার পশ্চাতে ধাবন করিতেছে; আপনাতে ও অন্যতে বিশ্বাসের অভাব; ইন্দ্রিয় সমূহের দৌর্ব্বল্য। আশ্চর্য্য স্বভাব; গুরুতর বিষয়ে বিদ্রুপ; কিন্তু সামান্য বিষয়ে গম্ভীর ভাবধারণ; নিজকে প্রেত বলিয়া ভ্রম; দিব্যকরণ। আক্রান্ত অংশে রজ্জু বেষ্টন বোধ।

প্রকারঃ—দৈনিক; এক দিনান্তর, দুই দিনান্তর।

সময়ঃ—অপরাহ্ণ ৪টা; অপরাহ্ণ। প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টায় কম্প-বিহীন জ্বর (লাইকো)।

কম্পঃ—বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে, সূর্য্যোত্তাপে তাহার উপশম (কোণা, সিকে)। পৃষ্ঠে ও সর্ব্ব শরীরে জল প্রক্ষেপের ন্যায় শিহরণ, (রস্, অণ্টি-টা, আর্ণি,) ইহার সহ আস্য মণ্ডলের উত্তাপ। বারংবার তুষারবৎ শীতল শিহরণ; অঙ্গ, হস্ত ও চরণে কম্প বোধ; উষ্ণ গৃহেতেও আভ্যন্তরিক কম্প; অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি। খিট্‌খিটে ভাব ও অস্থিরতা-সহ শিহরণকর কম্প। কপালে শীতলতা ও গণ্ডদ্বয়ে আরক্ততা। আভ্যন্তরিক কম্প সহ বাহ্যিক উত্তাপ। শীতল ঘর্ম্মসহ আভ্যন্তরিক উত্তাপ। কেবল মাত্র বাম পার্শ্বের উত্তাপ (বাম পার্শ্বের উত্তাপ ও দক্ষিণ পার্শ্বের শীতলতা, রস্)।

উত্তাপঃ—অপরাহ্ণে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আহারে তাহার প্রাত্যহিক উপশম; শরীরের উর্দ্ধাংশে উত্তাপ; আভ্যন্তরিক কম্পসহ শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণতা ও চরণের শীতলতা; বাহ্যিক উত্তাপ, বিশেষতঃ আস্য-মণ্ডলের ও হস্ত তলের; উদর ও জানুর দুর্ব্বলতা; সর্ব্ব শরীরের উত্তাপ সত্বেও শীতলতা বোধ। তৃষ্ণা থাকিলে, তাহা উত্তাপ ও ঘর্ম্মের অন্তর কালে (কম্প ও উত্তাপের অন্তরে, স্যাবা)।

ঘর্ম্মঃ—রাত্রি কালীন ঘর্ম্ম; সাধারণ ঘর্ম্ম হেতু মধ্যে মধ্যে জাগরণ। রাত্রিতে বক্ষ ও উদরে ঘর্ম্ম হওয়া। হস্ততলে, বিশেষতঃ বামের, আটা আটা ঘর্ম্ম। আহারে ঘর্ম্মের উপশম। উপবেশনে ঘর্ম্ম হওয়া। শ্বাস কষ্ট শুষ্ক ষ্টকর শ্বাসহ্রাস (কম্প কালীন-এপিস্)।

জিহ্বাঃ—শ্বেত ও খরস্পর্শ, ধূমপানান্তে তিক্তাস্বাদ। পান্‌সে ও দুর্গন্ধীস্বাদ। ভোজন বা পানে গলা রোধ হওয়ার উদ্যম।

মন্তব্যঃ—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের জ্বরে, যাহার প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টার সময় উদ্রেক, এনাকার্ডিয়ম্, লাইকোপোডিয়মের সদৃশ; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রাবল্য ততোধিক নয়, সবল অবস্থারই কিঞ্চিৎ সমতা। শিশু অত্যন্ত খিট-খিটে, সামান্য ত্রুটি বা প্রতিবাদে তাহার অত্যন্ত ক্রোধ (ব্রাই ক্যাম)।

অ্যাঙ্গেষ্টুরা

ব্যবহার লক্ষণঃ—অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, বিশেষতঃ জঙ্ঘাদ্বয়ে। অস্থির গলন বা তাহাতে বেদনা যুক্ত ক্ষত; অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, সামান্য বিদ্রূপও সহ্য হয় না। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কার (হাইপারি)।

বৃদ্ধিঃ—আক্রান্ত অংশস্পর্শে; অপরাহ্ণে ৩টায়।

প্রকারঃ—নিয়মিত সাময়িকতা (Periodicity) লক্ষিত নহে।

সময়ঃ—অপরাহ্ণ ৩টা (এপিস্, আর্শে, চিনি-স)।

কারণঃ—উষ্ণপ্রধান দেশের জ্বর, তদ্দেশে জলা ভূমিতে বিচরণ হেতু (সিড্র)।

কম্পঃ—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩টায় প্রবল কম্প। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া অঙ্গে কাঁটা দিয়া শিহরণ, কিন্তু তৃষ্ণা না থাকা। পৃষ্ঠে প্রবল শীতলতা বোধ; হস্ত অঙ্গুলি ও চরণে শীতলতা বোধ; কনুই জানু ও চরণাঙ্গুলিতে আকর্ষণীবেদনা (গুল্‌ফ ও মনিবন্ধে বেদনা, পড)। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল স্থায়ী কম্প। স্পৃষ্ঠে শুড়শুড়ানি সহ, অভ্যন্তর-অংশ ব্যাপী। অস্থিরতা, তজ্জন্য তৃষ্ণা না থাকিলেও উষ্ণতাযুক্ত ওষ্ঠের স্পন্দন হওয়া। শীতবোধ, পরে সেই দিনেই উত্তাপ; কখন সন্ধ্যা, পরে দ্বিপ্রহরে, পরে প্রাতে উহার উদ্রেক; উদ্রেকের প্রারম্ভে তৃষ্ণা ও পিত্ত রমন।

উত্তাপঃ—সর্ব্ব শরীরে, মস্তক ব্যতীত, সন্ধ্যাভিমুখে, তজ্জন্য রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রা না হওয়া (রাত্রি ৩টা ও দিবা ৩টায় বৃদ্ধি, থুজা)। গণ্ডে শীতলতা।

উত্তাপ উর্দ্ধগামী (সিপিয়া)। উৎকণ্ঠাসহ উত্তাপের ঝলক বোধ।

ঘর্ম্মঃ—রাত্রিতে শায়িত অবস্থায় ঘর্ম্ম ; প্রাতে ঘর্ম্ম ; কপালে।

য়্যারেনিয়া ডায়েডিনিয়া।

ব্যবহার লক্ষণঃ—শিরঃপীড়া ও মস্তকে বিশৃঙ্খলা বোধ, ধূমপানে উপশম, অনাবৃত বায়ুতে সম্পূর্ণ বিলোপ, রাত্রিতে শয়নান্তে উর্দ্ধ ও নিম্ন দন্ত শ্রেণীতে হঠাৎ বেদনা।

বৃদ্ধিঃ—শীত ও বর্ষাকালে ; সেঁতে সেঁতে বাস ভূমিতে ; শীতল জলে স্নানে।

উপশম ঃ—ধূমপানে ; অনাবৃত বায়ুতে।

প্রকারঃ—দৈনিক। এক দিনান্তর। সকল প্রকারেরই নিয়মিত এক সময়ে উদ্রেক।

সময় ঃ—প্রত্যহ বা একদিনান্তর নিয়মিত এক সময়ে (সিড্র, স্যাব্যা)। সমুদয় আক্রমণের নিয়মিত সাময়িকতা।

কারণ ঃ—সিক্ত হওয়া, বৃষ্টিতে কাজ করা ; জলে দাঁড়িয়া কাজকরায় (ক্যালকে, লিড, রস্) ঠাণ্ডা লাগা।

কম্প ঃ—অধিক কাল স্থায়ী, প্রায়ই চব্বিশ ঘণ্টা ; কম্পের প্রাধান্য। নিয়ত কম্প বোধ, বর্ষায় ও শীতে বৃদ্ধি, শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি, আর্দ্র বাস ভূমিতে বৃদ্ধি। গ্রীষ্মকালেও দিবারাত্র সকল সময়ে শীত বোধ। মাসাবধি অস্থিতে বেদনা ; জ্বরেতে কেবল মাত্র শীত বোধ। উত্তাপ, ঘর্ম্ম বা তৃষ্ণা বিহীন কম্প। শিরঃপীড়া, অনাবৃত বায়ুতে তাহার বিলোপ। অত্যন্ত অবসন্নতা ; ক্লান্তিভাব। প্রত্যহ একই সময়ে নিম্ন কর্ত্তক দন্তে (Incisor) বেদনা যুক্ত শীতলতা বোধ।

উত্তাপ ঃ—সামান্য, কম্পের পরবর্ত্তী। সন্ধ্যাকালীন উত্তাপে, পাকস্থলীতে প্রস্তর অবস্থানের ন্যায় পূর্ণতা ও ভার বোধ ; পাকস্থলী প্রদেশে বিবমিষা ; জঙ্ঘায় ভার বোধ হেতু কষ্টে চলন। অগ্র বাহু ও হস্তে এত ভার বোধ যে, যেন তিনি হয়তো হস্ত উত্তোলন করিতে পারিবেন না। এ অবস্থার প্রায়ই অভাব।

ঘর্ম্ম ঃ—অভাব।

জিহ্বা ঃ—সামান্য লেপাবৃত, বিবমিষা, তিক্তাস্বাদ, ধূমপানে উপশম।

জ্বর বিরামঃ—সম্পূর্ণ। প্লীহার বিবৃদ্ধি। রজস্রাব অষ্ট দিন অগ্রগামী ও অধিক পরিমিত।

মন্তব্য ঃ—এই ঔষধের আক্রমণে উত্তাপ বা ঘর্ম্মের অভাব কিন্তু কেবল মাত্র শীতলতা বর্ত্তমান, যাহা নিয়ত স্থায়ী ও প্রবল এবং কিছুতেই উপশমিত নহে। ইহার প্রায়ই কোন অবস্থাতে তৃষ্ণা থাকেনা ; যদি থাকে তাহা উত্তাপ কালে।

ব্যবহার লক্ষণঃ—রক্তাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের স্থানীয় রক্তাধিক্য (এক)।

রক্তস্রাবঃ—নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, সরলান্ত্র ও মূত্রস্থলী হইতে।

শিরঃপীড়াঃ—শীর্ষে গুরুভারজনিতের ন্যায় চাপযুক্ত ; রজোবন্ধকালীন বয়সে।

শিরঃপীড়া ও স্নায়ুশূল ঃ—রক্তাধিক্যযুক্ত, সাময়িক, নিয়মিত দক্ষিণ পার্শ্বীয়, প্রবল ও দপদপানি বেদনা। বোধ হয় যেন শরীর রজ্জুবেষ্টন দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে।

সঙ্কোচন ঃ—গলমধ্য, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, মূত্রস্থলী, সরলান্ত্র, জরায়ু ও যোনিদেশের ; সামান্য স্পর্শে উদ্ভূত বা উদ্রিক্ত। সর্ব্বত্র বেদনা ; চিড়িকমারা ও বিদ্যুৎগতিবিশিষ্ট এবং শেষে জাঁত দেওয়ার ন্যায় চাপিয়া ধরা বোধ এবং পরে ঐ প্রকার বেদনার পুনরুদ্রেক। শয়নান্তে রজঃস্রাব বন্ধ (কষ্টিকম্)।

বৃদ্ধি ঃ—গতি ; স্পর্শ।

উপশম ঃ—অনাবৃত বায়ুতে।

প্রকার ঃ—দৈনিক। নিয়মিতসাময়িকতা বিশেষ লক্ষিত। প্রত্যহ একই সময়ে পুনরুদ্রেক ; জঙ্ঘা বহিয়া নিম্নাভিমুখে বেদনা, কম্প, জ্বর, এবং জরায়ু ও ডিম্বকোষে বেদনা।

সময় ঃ—দিবসে ১১টা, বা রাত্রিতে ১১টা। প্রত্যহ একই সময়ে পুনরুদ্রেক (য্যারে, সিড্র, জেলসি, স্যাবা)।

কারণ ঃ—সূর্য্যোত্তাপ লাগান।

কম্প ঃ—তৃষ্ণাবিহীন। পৃষ্ঠে শীতলতা এবং হস্তের বরফের ন্যায় তুষারবৎ শীতলতা। ৩ ঘণ্টাকাল স্থায়ী কম্প। দাঁতে দাঁতে লাগা এবং শুইয়া কম্বল চাপা দিলে তাহার বিলোপ, গায়ে বস্ত্র দিলে বা উত্তাপ লাগাইলে তাহার বিলোপ না হওয়া (য্যারে)।

উত্তাপ ঃ—তিন ঘণ্টা কম্পের পর ২৪ ঘণ্টা কাল স্থায়ী দাহকর উত্তাপ, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসহ্রাস এবং চাপিয়া ধরা বোধ হেতু শয্যায় স্থির হইতে না পারা। মস্তকে উত্তাপ এবং আস্যমণ্ডলে উত্তাপের ঝলক বোধ হেতু উৎকণ্ঠা। উদরে অসহ্য উত্তাপ; হৃৎপিণ্ডে বেদনা, প্রস্রাবরোধ, মূত্রস্থলীতে বেদনা, জরায়ু প্রদেশে দপ্‌দপানি বেদনা, বমন, শিরঃপীড়া, মোহ, অচৈতন্য, এবং সর্ব্বশেষে সামান্য ঘর্ম্মে তাহার পরিণতি। উত্তাপের শেষে কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা।

ঘর্ম্ম ঃ—প্রবল তৃষ্ণা (সিংক, আর্সে)। জ্বরের পর, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম ও শীতল জলের জন্য প্রবল তৃষ্ণা (আর্সে, সিংক)। ঘর্ম্ম না হইলে প্রবল বমন।

জিহ্বা ঃ—পরিষ্কৃত; সাবানের ন্যায় আস্বাদ; পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা।

জ্বরবিরাম ঃ—রাত্রি ১১টা হইতে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিরাম। পীড়ার উদ্রেক ও সকল প্রকার অবস্থা আশ্চর্য্য প্রকার নিয়মিত সময়ে। তাপকালীন মস্তিষ্ক ও বক্ষে রক্তাধিক্যলক্ষণের প্রাবল্য (বেলা, সিংকো, নে. মিউ)। ব্যবহার স্বল্প, কিন্তু আবশ্যক স্থলে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে।

তুলনীয় ঃ—(য়্যারে, সিড্র, সিংক)। দৈনিক সবিরাম জ্বর; মস্তকে রক্তাধিক্য; আস্যে উত্তাপের ঝলক; প্রস্রাব রোধ; হৃৎপিণ্ডে খোঁচা মারা বোধ; মূত্রস্থলীতে বেদনা; প্রবল বমন; রৌদ্র লাগা হেতু হইলে ঘর্ম্ম দেখা দেয় না।

ক্যান্থারিস।

কম্প ঃ—সন্ধ্যাকালীন উত্তাপ, বাহ্যিক উত্তাপে অনুপশমিত। কম্পের পর উত্তাপ না হইয়া তৃষ্ণা। পৃষ্ঠ বহিয়া কম্পের উর্দ্ধে ধাবন।

শীর্ষাঙ্গের শীতলতা। মেরুদণ্ড বহিয়া নিম্নাভিমুখে কম্প বোধ; মেরুদণ্ডের শীতলতা বোধ (চাপিলে মেরুদণ্ডে বেদনা—কুইনাইন); শয্যায় নড়িতে চড়িতে কম্প বোধ।

উত্তাপ ঃ—রাত্রিতে দাহকর উত্তাপ, কিন্তু রোগীর তাহা বোধ না হওয়া (অসহ্য উত্তাপ, অত্যন্ত অস্থিরতা—আর্সে)। হস্ত ও পদতলের জ্বলন, উদরে উত্তাপ।

ঘর্ম্ম ঃ—অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম, নড়িতে চড়িতে ঘর্ম্ম (ব্রাই, ক্যাম্ফ)। শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত ও চরণে; জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম। প্রস্রাবগন্ধ ঘর্ম্ম। সবিরাম জ্বর, প্রত্যেক অবস্থায় ক্যান্থারিসের প্রস্রাবলক্ষণ বর্ত্তমানযুক্ত।

জ্বর বিরাম ঃ—মূত্রযন্ত্রের উপদাহ, বারম্বার কষ্টে ও বেদনাসহ প্রস্রাব ত্যাগ। প্রথমতঃ অতি কষ্টে অতি অল্প কাল প্রস্রাব নির্গমন; ও পরে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি, অত্যন্ত তৃষ্ণা ও মাংস ভোজনে স্পৃহা—(মাংসে বিরতি-আর্ণি)। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু সকল প্রকার পানীয়ে বিরতি। চরণে ভার বোধ, অঙ্গের পাক্ষপাতিক নিশ্চলতা; শুইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া।

চেলিডোনিয়ম মেজস্।

বৃদ্ধি—প্রাতে (ব্রাই, ন, ভমি)।

উপশম—সন্ধ্যা (বৃদ্ধি, পল্‌সে)।

প্রকার—পরিবর্ত্তনশীল।

সময়—অনিরূপিত। আপরাহ্ণিক ও সান্ধ্য আক্রমণ।

কম্প ঃ—হস্ত ও চরণে আরম্ভ (জেল্‌সি), তৃষ্ণাবিহীন। আভ্যন্তরিক কম্প। সন্ধ্যায় শয়নান্তে প্রবল কম্পনসহ; অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে; গৃহাভ্যন্তরে বিলুপ্ত। সর্ব্বশরীরের কম্পন ও শীতলতা; হস্ত ও চরণে তাহার প্রাবল্য, তথাকার শিরার বিবৃদ্ধিসহ (তাপকালে হস্ত ও পদের শিরার বিবৃদ্ধি

—চিনি, স)। দক্ষিণ চরণের ও পদের তুষারবৎ শীতলতা (দক্ষিণ অঙ্গের, স্যাবা)। শিহরণ, বাহ্যিক শীতলতা বিহীন; পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নাভিমুখে শিহরণের ধাবন (মেনি, পেট্, ভিরে)।

তাপ ঃ—সন্ধ্যায় শয়নান্তে তৃষ্ণা বিহীন আভ্যন্তরিক উত্তাপ। হস্তের দাহকর উত্তাপ, পরে সর্ব্বশরীরে তাহার বিস্তার। উত্তাপ, মস্তক ও আস্যের; স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের; দাপনা সন্ধিতে।

ঘর্ম্ম ঃ—মধ্য রাত্রির পর এবং প্রাতরভিমুখে নিদ্রাকালীন ঘর্ম্ম; জাগরণান্তে উপশম। বেদনা বিলুপ্ত হইলে ঘর্ম্ম (অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মে বেদনার বিলোপ—আর্ণি, নে-মিউ, ইউপে, পা)।

জিহ্বা ঃ—পুরু, সাদা বা হল্‌দে লেপ। তিক্ত বা পান্‌সে আস্বাদ। মুখে তিক্ত লালা সঞ্চয়।

নাড়ী ঃ—কম্পকালীন ক্ষুদ্র ও দ্রুত, আক্রমনান্তে মন্দগতি।

জ্বর বিরাম ঃ—স্পষ্ট নহে, প্রায়ই অবিরাম জ্বরে পরিণতি। যকৃত প্রদেশে সূচি বেধের ন্যায় বেদনা এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তাহার চিড়িক মারা, চাপিলে বাম কক্ষেতে বেদনা। ইহার পর আর্সেনিকম উত্তম ব্যবহার্য্য এবং তাহাতে রোগের অবশিষ্টের আরোগ্য সাধিত হয়।

মন্তব্য ঃ—যকৃতের কার্য্য বৈলক্ষণ্য এই ঔষধ প্রয়োগের জ্ঞাপক লক্ষণ।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। কার্ত্তিক। } শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি। হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টীসনর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার বিপিন বাবু, কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন সুপরিচিত ও গণ্যমান্য চিকিৎসক বলিয়া অনেক দিন হইতেই তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সম্মিলনীতে বাহির হওয়া প্রার্থনীয় ছিল; কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটে নাই। সংপ্রতি বিপিন বাবু সম্মিলনীতে নিয়মিত লিখিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে এত দিনে আমাদের সে আশা পূর্ণ হইতে চলিল। অতএব আশা করি, বিপিন বাবুর লিখিত প্রবন্ধ পাঠে অনেকেই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

চি, স, ক, স।

কাশরোগে বায়ুপরিবর্ত্তনের উপযোগিতা ও উপকারিতা।

(ডাক্তার অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্ লিখিত।)

"পুরাতন পীড়া আরোগ্য বা উপশমের নিমিত্ত যতপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, স্থান বা বায়ুপরিবর্ত্তনই তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আরও ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার কাশরোগে বিশেষতঃ ক্ষয়কাশে এই উপায় বিশেষ উপকারক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিবিধপ্রকার পুরাতন শ্বাননালী প্রদাহ, হাঁপকাশি, এম্ফাইজিমা, পুরাতন ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ এবং রক্তকাশ (যখন উহা বারম্বার ঘটিতে থাকে). এই সর্ব্বপ্রকার পীড়ারনিমিত্ত যদি উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশিত হয়, তাহা হইলে উহার হয় এককালে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, অথবা উহাদিগের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে। ক্ষয়কাশ পীড়ার আরোগ্যার্থে অদ্য পর্য্যন্ত কোন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত যদি কোন উপায় থাকে, বায়ুপরিবর্ত্তনই একমাত্র উপায়। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনেও কখন কখন কোন উপকার উপলব্ধি হয় না; এমন স্থলে হয় যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উহা এই পীড়ার পক্ষে কোনক্রমেই উপযোগী নহে, অথবা এমন সময়ে ঐ পরিবর্ত্তন আদিষ্ট হইয়াছে. যখন ঐ পীড়া নিতান্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন রোগী এককালে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পীড়া প্রথম প্রকাশমান হইলেই এবং দেহ তাদৃশ ভগ্ন না হইতে হইতে, নূতন স্থান অবলম্বন করিলে উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, পীড়া যতদূর বিবৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত বা অগ্রসর হউক না এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার যতদূর হীনাবস্থা হউক না, স্থান পরিবর্ত্তনে অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্তও উপকার উপলব্ধি হইবে; এবং আরও ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপে স্থানপরিবর্ত্তনে যদিও স্থানিক পীড়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু রোগীর দেহ পুষ্ট ও বলবান হইয়া উঠে এবং অনেক স্থলে ফুস্‌ফুসের একদিক বিগলন প্রাপ্ত ও তথায় কন্দর অবস্থাপিত হইলেও অপর ফুস্‌ফুসে আরোগ্যের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

নূতনস্থানে বাসপরিবর্ত্তন করিলে তথায় আমরা যেরূপ বায়বীয় ও পার্থিব অবস্থায় নীত হই, উহা আমাদিগের পুরাতন আবাসস্থল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বায়বীয় অবস্থায় অর্থাৎ বায়ুর উত্তাপের বা শৈত্যের কতদূর আতিশয্য; দিবা ও রাত্রি মধ্যে ইহাদিগের কিরূপ তারতম্য হয়; দিন দিন, মাসে মাসে, বা উহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে; সাধারণতঃ কিরূপ আর্দ্রতা ইহাতে বর্ত্তমান থাকে; শিশিরের পরিমাণ বা কিরূপ; বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ; বৈদ্যুতিক অবস্থা; ওজোনের ন্যূনাধিক্য; প্রবলবায়ু মধ্যে মধ্যে বা সর্ব্বদা বাহিত হয়; সাধারণতঃ যে বায়ু গৃহীত হয়, উহাতে ধূম প্রভৃতি উগ্র পদার্থ কণায় কিরূপ প্রাধান্য বা হানিজনক গ্যাসের কিরূপ অবস্থিতি; যথা—সল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কার্ব্বলিক্ এসিড্, কার্ব্বুরেটেড্ হাইড্রোজেন ইত্যাদি; উদ্ভিজ্জ বা জান্তব পদার্থ-গলন-সম্ভূত বিষাক্ত পরমাণুর বর্ত্তমান; রবিরশ্মির প্রখর তেজের এবং সুধাংশুর স্নিগ্ধ কিরণের রাসায়নিক কার্য্য ও অপর গ্রহগণের আমাদিগের দেহের উপর কিরূপ কার্য্য; ভূমির পার্থিব ও ধাতব অবস্থা—উহা কিরূপ ছিদ্রময় এবং কি পরিমাণে বৃষ্টিশোষণ করিতে সক্ষম; পানীয় জলের গুণ; পুষ্করিণী, জলাশয় বা বৃক্ষাদির কিরূপ অবস্থিতি; সেই স্থানের সন্নিকট সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বর্ত্তমান, সমুদ্র হইতে স্থান কত উচ্চ এবং ঐ স্থানের ভৌতিক নির্ম্মাণ কিরূপ; উপরিলিখিত এই সমস্ত গুলি এরূপ অচিন্তনীয়রূপে বিবিধপ্রকারে ও পরিমাণে একত্রীভূত হইয়া থাকে যে, পীড়ার প্রকারভেদে এবং উহার প্রকৃত অবস্থার উপযোগী হইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক স্থান নিরূপণ করা সুকঠিন, তথাপি নিম্নলিখিত কতকগুলি সাধারণ বিষয় অনুধাবন করিলে উহার একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করা যায়।

১। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তি যদি একই স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে বিভিন্নপ্রকার ফলোপলব্ধি হইতে দৃষ্ট হয়, যথা—ক্ষয়কাশ রোগাক্রান্ত ইংরেজের পক্ষে কনষ্টান্‌টি নোপলে বাস অতি হিতকারী হইয়া থাকে, কিন্তু মিশরদেশীয় ব্যক্তির পক্ষে ঐ স্থান নিতান্ত সাংঘাতিক হয়।

২। যদি কোনও স্থান তত্রত্য লোক বা বাসীদিগের এই পীড়ার পক্ষে অহিতকারী হয়, তাহা হইলে ঐ স্থান যে অন্যান্য দেশবাসীদিগের পক্ষে ঐরূপ, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। নিউবিয়ানেরা প্রায়ই ক্ষয়কাশ

রোগ জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে; কিন্তু এবম্প্রকার পীড়াক্রান্ত ইংরেজের পক্ষে নিউবিয়ার ন্যায় হিতকারী স্থান পৃথিবীতে অতি বিরল।

৩। উত্তাপের এককালে বৈপরীত্য—অর্থাৎ, উহার নিতান্ত আতিশয্য বা উহার নিতান্ত হ্রাসতা; এই পীড়ার পক্ষে হানিকর এবং প্রধান স্থানের অসহনীয় উত্তাপ বিশেষ অশুভকর হয়।

৪। শুদ্ধস্থান পরিবর্ত্তন করিলে, যদি নূতন স্থানের বায়বীয় অবস্থা কোন বিশেষরূপ দূষিত না হয়, তাহা হইলেও উহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়। এবং এই কারণে কোন স্থলে বাস পরিবর্ত্তিত হইলে, তথাকার জল, বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইলেও বহুদিবসাধি তথায় বাস না করিয়া মধ্যে মধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করিলে পীড়ার পক্ষে আরও মঙ্গলকর হইয়া থাকে।

৫। যে স্থানে উত্তাপ সমভাবে থাকে, উহার পরিবর্ত্তন না হয়, এবং যদি রাত্রে তাপমানযন্ত্রে উহার সামান্য লাঘব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে এই পীড়ার পক্ষে বিশেষ উপকারক হয়। কিন্তু এ বিষয়টী কার্য্য পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয় না। অষ্ট্রেলিয়া ও মিসরদেশ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এখানে আইসিস্ পীড়ার গতি এককালে রোধ হয়, কিন্তু উপরোক্ত নিয়মটীর অসদ্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৬। কোন স্থানের বায়বীয় ও অন্যান্য অবস্থা মানসিক বৃত্তিসমূহের উপর ক্রিয়া প্রদর্শাইয়া দেহের উপর কার্য্য করে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবাসী ইংরাজ ঐ সকল স্থানের তেজঃপুঞ্জ মার্ত্তণ্ডের প্রখর আলোক হইতে লণ্ডনের নিষ্প্রভ জ্যোতিতে আনীত হইলে অতি প্রফুল্লান্তঃকরণ হয়।

৭। উত্তাপের পরই বায়ুর আর্দ্রতা ও শৈথিল্য এবং শুষ্কতা ও কাঠিন্য গুণকে স্থাপন করা যায়। বায়ুর এই সকল অবস্থা অনুধাবন করিলে পীড়ার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত উহার প্রত্যেকটীর উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, সুতরাং স্থানও নির্দ্দেশিত হইতে পারে এবং রোগীরও পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রিয় ও কোন্‌টী অপ্রিয় তদ্বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াও উহা স্থিরীকৃত হইতে পারে।

৮। যে সকল স্থানে বায়ু সর্ব্বদা প্রবলবেগে বহে—নিউজিল্যাণ্ড অথবা

যথায় উহা সময়ে সময়ে ঝঞ্ঝ্যাবাতরূপে প্রকাশিত হয় এরূপ স্থানে কাস-রোগ ব্যক্তির বাস অননুমোদনীয় এবং যদিও ঐ সকল স্থানে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের যে সময় উহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত, সেই সময়ে ঐ সকল স্থানে স্থান পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

৯। যে সকল স্থানে বায়ুর সঞ্চাপ সমভাবে না থাকে, অর্থাৎ উহা পর্য্যায়ক্রমে গুরু বা লঘু হয়, তাদৃশ স্থল কাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অহিতকারী হইয়া থাকে। এবিষয়ে বিশেষ মতান্তর দেখা যায়। কেহ কেহ অত্যধিক উচ্চস্থানের বায়বীয় অবস্থা যে ক্ষয়কাশ পীড়ায়, বিশেষতঃ টিউ-বার্কেল সঞ্চয়ের পক্ষে, সুবিধাজনক নহে, অর্থাৎ উহা ইহার বিপক্ষাচরণ করে, এরূপ নির্দ্দেশ করেন এবং আর কেহ কেহ বলেন যে, নিতান্ত নিম্ন-ভূমি, এমন কি সমতল ভূমি, যাহা সমুদ্রের সমতল হইতে আদৌ উচ্চ নহে, এমন স্থলে এই পীড়া কখনই উৎপন্ন হয় না। অনেকে বলেন যে, মেলে-রিয়া অথবা এরূপ পদার্থ যাহা মেলেরিয়া উৎপাদনে সক্ষম, উহাই কেবল এই পীড়ার বিষের বিষঘ্ন।

১০। যে স্থানে বাসপরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তথায় রোগীর আহা-রোপযোগী যাবতীয় সামগ্রীর সদ্ভাব থাকা উচিত। এবিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইলে, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইলেও এই অভাব অতি কষ্টকর ও অসহনীয় হইয়া উঠে। চিকিৎসা-দর্শন।)

ঔষধ-প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

পর্পটী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পর্পটী কল্পনার আদিম ক্রম রসপর্পটী। মাত্র পারদ এবং গন্ধক ইহার উপাদান। আদৌ এই উভয় পদার্থ একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে রাসায়-নিক সংমিশ্রণে কজ্জলীভূত হইয়া কজ্জলী নামক প্রসিদ্ধ পদার্থে পরিণত হয়। তারপর অগ্নি সন্তাপে কজ্জলী দ্রবীভূত হইয়া পারদ গন্ধকের রাসায়নিক সংযোগে অপিচ প্রক্রিয়া বিশেষে পর্পটীরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কজ্জলীর সহিত ধাতু, উপধাতু এবং রত্ন বিশেষ মিশ্রিত করিয়া পর্পটীর আরও কয়েকটী ক্রমান্তর পরিকল্পিত হইয়াছে। পর্পটী কল্পনা পঞ্চবিধ,—রসপর্পটী,

স্বর্ণপর্পটী, লৌহপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী এবং বিজয়পর্পটী। এই পর্পটী পঞ্চকে কেবলমাত্র রাসায়নিক সংযোগে সংমিশ্রিত করিতে হয়; ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যা-ন্তর পর্পটীর সহিত সংযোগ সম্বন্ধে অবস্থিতি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বীয় স্বীয় গুণ প্রকাশ করে। পারদ গন্ধক রাসায়নিক সংযোগে সংমিশ্রিত হয় বলিয়া, তত্তৎদ্রব্যনিষ্ঠ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম পর্পটীতে বিদ্যমান থাকে না। পারদ বিরেচক পদার্থ, গন্ধক ও মৃদু বিরেচক; কিন্তু উভয়েসংঘটিত পর্পটী প্রসিদ্ধ ধারক ঔষধ। পারদ সেবনে লালা নিঃসরণ হয়, পর্পটী সেবনে লালা নিঃসরণ ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। ইত্যাদি উভয় দ্রব্যনিষ্ঠ গুণাগুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া রস গন্ধকের রাসায়নিক সংযোগে পর্পটী নামক অপূর্ব্ব পদার্থ উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়া ও প্রয়োগপ্রণালী।

পর্পটী—ওজোবর্দ্ধক; বাতদৌর্ব্বল্যে হিতকর; পরিপাক যন্ত্র সমূ-হের শ্লেষ্ম-ধরা-কলাজালের বলবর্দ্ধক; পিত্তনিঃসারক; আগ্নেয়, আন্ত্রিক-ক্ষতশোধক; আমপাচক; ধারক; পরিবর্ত্তক এবং সঞ্চিত বিকৃত অপ্-ধাতুর শোষক।

পাণ্ডুশোথ, ঔদরিকশোথ, দকোদর, গ্রহণী, দীর্ঘাতীসার, নিরাম প্রবা-হিকা এবং জ্বর ও উদরাময়যুক্ত শোথ রোগে পর্পটি সচরাচর ব্যবহার করা গিয়া থাকে। এবং এই সকল পীড়ায় পর্পটী প্রয়োগের ফলও প্রায়ঃই সুনিশ্চিত। এতদ্ভিন্ন কুষ্ঠপ্রমেহ প্রভৃতি অনেক গুলি পীড়াতে পর্পটী ব্যব-হারের উপদেশ আছে। কিন্তু অধুনাতন তত্তৎরোগে পর্পটী ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। করিলেও কোন সুফল ফলে কিনা অবগত নহি।

উপরোক্ত পীড়া সমূহে রসপর্পটী প্রয়োগে প্রায়ঃই সুফল পাওয়া যায়; তবে স্থলবিশেষে পর্পটীর কল্পনান্তরেও বিশেষ আবশ্যক হয়। পর্পটী-সাধ্য রোগে রোগীর রক্তের শোণিকার ভাগ খুব কমিয়া গেলে লৌহপর্পটী প্রয়োগ করা বিধেয়। স্নায়বীয় অবসাদ বিশেষতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের অবসন্নতা দেখা দিলে স্বর্ণ-পর্পটী বিশেষ হিতকর। পাণ্ডুশোথে, ঔদরিকশোথে এবং দকো-দরে পঞ্চামৃত পর্পটীই প্রশস্ত; রোগীর দেহের ওজস্বিতা হ্রাস হইলে, বিজয়-পর্পটী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ স্বর্ণাদির গুণ ও প্রভাব বিবেচনা

করিয়া পর্পটীসাধ্য পীড়ায় তত্তৎ পদার্থ প্রয়োগের উপযোগিতা বোধ হইলে স্বর্ণ-পর্পটী প্রভৃতি পর্পটীর কল্পনান্তর প্রয়োগ করিবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা
বারুইপাড়া। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি।

জ্বরে ঘৃতপ্রয়োগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মহামতি বাগ্‌ভট্টাচার্য্য সুস্পষ্টরূপে তদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—আমাবস্থা পরিপাক হইলে নিরামে বাত-পিত্তাধিক জীর্ণ উদরে ঘৃতপ্রদান করিবে। পক্কদোষে অর্থাৎ নিরামাবস্থায় ঘৃতপ্রয়োগ করিলে অমৃততুল্য মহাগুণশালী হয়। অন্যথা পুনঃ দশাহপর অপক্কদোষে কফাধিকে ঘৃত প্রদান করিলে বিষের ন্যায় মহোপকার সাধন করে, অপিচ জ্বরের উপদ্রবাদির বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (৫) উপদ্রবান্বিত জ্বর যে সহজেই সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে তাহার আর কথা কি? এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও হরণ করিতে পারে। এজন্য আমাবস্থায় ঘৃতপান করা সম্পূর্ণরূপেই অযুক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব দশাহ অতীত হইলেও যদি কফাধিক পরিলক্ষিত হয় এবং নিয়মিতরূপে যথোপযুক্ত লঙ্ঘণ করান না হইয়া থাকে; তাহা হইলে যেপর্য্যন্ত কফের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় সাধন না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত ঘৃতপান না করাইয়া, সেস্থলে দোষের লাঘব পর্য্যন্ত দোষ প্রশমন কারক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এবং মাংস রসের (যূষের) সহিত আহার বিধান করিবে। (৬) মাংস রস প্রদান পক্ষে লাব (লাবুইপাখী)

(৫) পক্কেষু দোষেষ্বমৃতং তদ্বিধোপমমন্যথা।
দশাহে স্যাদতীতেঽপি জ্বরোপদ্রববৃদ্ধিকৃৎ॥
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

(৬) নির্দ্দশহামপিজ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ।
যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু॥
চক্রপাণিঃ।

কপিঞ্জল (গৌরবর্ণ তিস্তিড়পাখী) এণ (কৃষ্ণবর্ণ হরিণ বিশেষ) পৃষ্ঠ (বিন্দু দ্বারা চিত্রিত হরিণ বিশেষ) শরভ (উষ্ট্র প্রমাণ মহাশৃঙ্গযুক্ত হরিণ বিশেষ) শশ, কালপুচ্ছকুরঙ্গ, (যাহার বর্ণ এণ এবং তাম্রবর্ণ হরিণ হইতে বিভিন্ন) মৃগমাতৃকা (স্ত্রীজাতিয় কুরঙ্গ) প্রভৃতির মাংসরস জ্বরিতের পক্ষে হিতকারক। (৭) যদি বল,—কিরূপেই বা প্রবলপ্রকার কফবিরুদ্ধ আহার কফ প্রবলাবস্থায় প্রদান করা সুসঙ্গত বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে এই বলিলে যথেষ্ট যে, উল্লিখিত লাবাদিকৃত মাংসরস লঘু এবং বলকারক। এজন্য লঘুতা বশতঃ কফের প্রকোপ না হইয়া বরং হ্রাসই হইয়া থাকে এবং মাংসরস বলজনক হেতু,—মাংসরস সেবনে শারীরিক বল বৃদ্ধি হইলে দুষ্টবাতাদি দোষত্রয় স্বয়ংই নিগৃহীত হইয়া থাকে। (৮) অপিচ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থলবিশেষে দোষাদির প্রতি বিবেচনা করিয়া মাংসরসের সহিত "মৃতসঞ্জিবনী সুরা" প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে আশু অতি চমৎকার ফললাভ হইয়া থাকে। মৃতসঞ্জিবনী সুরাযুক্ত মাংসরস সেবনে যেমন সত্বর দোষাদি প্রশমিত হয়, তদ্রূপ রোগীর দুর্ব্বলতা বিদূরীত হইয়া বলবর্ণাদির অভ্যুদয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মরিচ চিত্রকাদি সংস্কারক দ্রব্যগুণে কফপ্রশমন হয়। অতএব জ্বর-জনিত অপক্ক কফে সুসংস্কৃত ঘৃতপান নিষিদ্ধ হইল কেন? সহজেই এবিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। সংস্কারক দ্রব্যগুণে কফোপশম না হইয়া, কেন যে কফের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার কারণ বলা যাইতেছে। দেহিদিগের প্রকৃতস্থ শ্লেষ্মাই বল এবং সেই শ্লেষ্মা আবার বিকৃত প্রাপ্ত হইলে মল নামে অভিহিত হয়। অপিচ ঐ শ্লেষ্মা ওজধাতু নামে কথিত হইয়া থাকে। (৯) আচার্য্য প্রবরমহর্ষি সুশ্রুত, আমাশয়কেই

(৭) লাবান্ কপিঞ্জলানেণাম্ পৃষতান্ শরভান্ শশান্।
কালপুচ্ছান্ কুরঙ্গাঞ্চ তথৈব মৃগমাতৃকম্।
মাংসার্থে * * জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥
সুশ্রুতসংহিতা।

(৮) বলং হলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চতৎ॥
শিবদাসঃ।

(৯) প্রকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বৈকৃতোমল উচ্যতে।
সচৈবোজঃ স্মৃতঃ * * * ॥
চরক-সংহিতা।

কফের প্রধানতমস্থান বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১০) জ্বরে আমাশয়ের সর্ব্বাংশেই বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা পুনরায় শরীরস্থ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মার হ্রাস বৃদ্ধি, বিকৃতি ও অবিকৃতির মূলস্বরূপ। আমাশয়িক শ্লেষ্মার বিকৃত এবং অবিকৃত অনুসারে দৈহিক অন্যান্য সর্ব্ববিধ শ্লেষ্মা বিকৃত কিম্বা অবিকৃত হইয়া থাকে। (১১) অতএব আমাশয় কফের স্বস্থানবশতঃ আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা সমধিক বলবান্ হইবে তাহার আর কথা কি? (১২) এখন দেখা যাউক; ঘৃতের স্বগুণ সহ কি সংস্কারক দ্রব্যগুণ যুগপৎ প্রকাশ পায়, কি প্রথমেই সংস্কারক দ্রব্যগুণ প্রকাশ পায়? না কফহর দ্রব্য দ্বারা পরিপাচিত ঘৃতপান করিলে, ঘৃতের স্বগুণের সহিত যেরূপে অবিরুদ্ধভাবে কফঘ্ন দ্রব্যগুণে কফ প্রশমিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে মহামনা শিবদাস সেন প্রকৃষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন। যথা—সুসংস্কৃত ঘৃতপান করিলে ঘৃতের স্বগুণের পশ্চাৎ সংস্কারক দ্রব্যগুণ প্রকাশ পায়। (১৩) ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইতেছে যে, প্রথমেই ঘৃতের স্বগুণ অর্থাৎ স্নেহশৈত্যাদি দ্বারা বাতপিত্ত প্রশমন হইয়া থাকে এবং শীত গুণ বিশিষ্ট ঘৃতের তুল্য গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই আমাশয়স্থ শ্লেষ্মারও সমধিক বৃদ্ধি হয়। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার বৃদ্ধিতে দৈহিক সর্ব্ববিধ শ্লেষ্মাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাতে যে জ্বরের উপদ্রবাদি আনয়ন করিয়া, সহজেই সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে, তাহার আর কথা কি? এজন্য কফাধিক জ্বরে ঘৃতপান না করাইয়া, প্রথমে কফের প্রশমন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব বমন, লঙ্ঘণ, কষায়; লঘুভোজন প্রভৃতির দ্বারা কফ সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় সাধিত হইলে, যৎকালে বায়ু অতি বলবান্

(১০) আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ। সুশ্রুত-সংহিতা॥

(১১) স তত্রস্থ এব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং।
শরীরস্যতোদককর্ম্মণানুগ্রহং করোতি॥
সুশ্রুত-সংহিতা।

(১২) আমাশয়স্য কফস্থানত্বাৎ স্থানিত্বেন চ কফএববলী।
শিবদাসঃ॥

(১৩) স্বগুণস্য পশ্চাৎ সংস্কারকগুণবর্ত্তণম্।
শিবদাসঃ।

হইয়া পিত্তের সহিত বিচরণ করে অর্থাৎ বাতপিত্তাধিক পরিলক্ষিত হয়, তৎকালে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত গৃহে জলসেচন করিলে আশু অগ্নি নির্ব্বাণ করে, তদ্রূপ ঘৃতপানও উৎকৃষ্ট সংশমন ঔষধ; ইহাই ঘৃতপ্রয়োগের উপযুক্ত সময়, ইহাতে বাতপিত্তাধিক জ্বর আশু নিবৃত্ত হয় (১৪)। ফলতঃ সংক্ষেপে বলিতে গেলে বাতপিত্তাধিক জীর্ণজ্বর শান্তি হইয়া জঠরাগ্নির প্রদীপ্তি এবং শারীরিক বলাধানার্থ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঘৃতপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। (১৫)

ক্রমশঃ—

চৌরিয়া পাবনা। } শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(৫ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যার ৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

তৈলপাকসম্বন্ধে যে সকল সাধারণ নিয়ম জানা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ইতিপূর্ব্বে ক্রমশঃ সংক্ষেপে সমস্তই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কেমন করিয়া তৈলের কটা, মূর্চ্ছা, কল্ক ও ক্বাথাদি পাক করিতে হয়, তাহা সমস্তই বলিয়াছি, কেবল বলি নাই গন্ধপাক ও শেষপাকের কথা। কিন্তু সে কথা প্রত্যেক তৈলপাকের সঙ্গে সঙ্গে বলিব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। অতঃপর জ্বরাদি সর্ব্বপ্রকার রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ তৈল ব্যবহার্য্য ও বিশেষ ফলপ্রদ এবং সেই সমস্ত তৈলের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালীই বা কিরূপ? তাহাই ক্রমশঃ বলিয়া পাঠবর্গের তৃপ্তিসম্পাদন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

(১৪) বমন-স্বেদ-কালাম্বু-কষায়-লঘুভোজনৈঃ।
ষঃ স্যাদতিবলোধাতুঃ সহচরী সদাগতিঃ॥
তস্য সংশমনং সর্পির্দীপ্তস্যেবাম্বু-বেশ্মনঃ।
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

(১৫) স্নেহমেব পরং দদ্যাৎ দুর্ব্বলানলদীপনম্।
অরুণদত্ত।
জীর্ণজ্বরস্য শান্ত্যর্থং দেহবলাধানার্থঞ্চ সর্পিঃ পানং॥
হিতম্। অরুণদত্ত।

জ্বরে তৈলপ্রয়োগ।

জ্বররোগে সাধারণতঃ অঙ্গারক, বৃহদঙ্গারক, জ্বরভৈরব, লাক্ষাদি, বৃহল্লাক্ষাদি, মহাকিরাতাদি ও মহাদশমূল প্রভৃতি তৈলগুলির প্রয়োগের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কবিরাজ মহাশয়েরাও প্রায় জ্বররোগে ইহাদের মধ্যে একটী না একটীর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কট্বরাদি ও পিপ্পল্যাদি প্রভৃতি তৈলের প্রয়োগের বিষয়ও জ্বররোগে উপদেশ আছে, কিন্তু আমি প্রথমোক্ত তৈলকয়েকটী ভিন্ন শেষোক্ত তৈল জ্বররোগে প্রয়োগ করিতে কাহাকেও দেখি নাই বা শুনি নাই। আর আমার ইহাও দৃঢ়-বিশ্বাস যে, শেষোক্ত কট্বরাদি বা পিপ্পল্যাদি তৈল কেহই ব্যবহার করেন না। অতএব যে সমস্ত তৈল কবিরাজ-সম্প্রদায় সর্ব্বদা জ্বরশান্তির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাই ক্রমশঃ বলিব।

কিন্তু জ্বররোগে তৈলমর্দ্দন বা প্রয়োগসম্বন্ধে উপরোক্ত তৈলসমূহের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী বলিবার পূর্ব্বে এসম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ কিছু মীমাংস্য বা বক্তব্য আছে, এমন কি, সে সমস্ত কথা আমার মতে এতদূর প্রয়োজনীয় যে, জ্বররোগে জ্বরভৈরব বা কিরাতাদি তৈলসমূহের প্রস্তুত বা প্রয়োগপ্রণালী শিক্ষার বা জানিবার পূর্ব্বে অগ্রে যেন আমার অন্তরের প্রস্তাবিত কথাগুলির মীমাংসা হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অতএব সে সমস্ত কথাগুলি কি, তাহাই আগামীবারে বলিব।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা,
আশ্বিন। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক মহাশয়ের প্রস্তাব সাধু। এজন্য তাঁহার অন্তরের কথা জানিবার জন্য আমরা ব্যগ্র থাকিলাম।

চি, স, ক, স।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

(এলোপ্যাথি মতে)

(Apomorphine)

এপমর্‌ফাইন্।—এপমর্‌ফাইন্ একটী বমনকারক ঔষধ। ডাক্তার জন ব্রাউন্ কহেন যে, বমনকারক ঔষধের মধ্যে এপমর্‌ফাইন্ তুল্য আর ঔষধ নাই। ইহা যেমন সত্বর ও নিরাপদে বমন উপস্থিত করে এমন অন্য কোন ঔষধ করে না, ইহা কখনও ব্যর্থ হয় না। ডাক্তার ব্রাউন্ নিম্নলিখিত রূপে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন।

এপমর্‌ফাইন্ হাইড্রোক্লোরেট্ (Apomorphine hydrocloret)	...	...	১ গ্রেণ
স্পীরিট ভাইনম্ রেকিট	...	...	২০ বিন্দু
জল	...	...	১০০ মিনিম্

এই মিশ্রণের প্রতি ১০ মিনিমে $\frac{1}{10}$ গ্রেণ মাত্রায় এপমর্‌ফাইন্ থাকে। অতএব ১০ মিনিম মাত্রায় অধঃত্বাচরূপে (hypodermic injection) প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এইরূপ প্রয়োগে ১০ মিনিট পরেই বমন উপস্থিত হয়। সচরাচর দুইবার কি তিনবার বমন হয়। রোগী তাহাতে তাদৃশ দুর্ব্বল হয় না। ডাক্তার ব্রাউন বলেন এই ঔষধ প্রয়োগে কোন বিপদ ঘটিতে দেখেন নাই। ডাক্তার ব্রাউন যে সকল রোগীতে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন পূর্ণবয়স্ক, আর সকলেই নিতান্ত শিশু। তিনি কহেন বালকদিগের পক্ষে এমন নিরাপদ, নিশ্চিত এবং সত্বর কার্য্যকারী বমনকারক ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। ব্রিটিস্ মেডিকেল্ জর্‌নাল, ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৯ পা ৫২৫।

নিরক্তাবস্থায় পারাঘটিত ঔষধ।—নিরক্তাবস্থায় (এনিমিয়া) রোগে পারাঘটিত ঔষধ এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার ডাক্তার কার্টলেজ্ বলেন যে, অধিকাংশ এনিমিয়া রোগে পারাঘটিত ঔষধ বিশেষতঃ পারক্লোরাইড্ অব্ মার্ক্যুরি অত্যন্ত উপকারক। তিনি আরও বলেন যে সকল রোগীর কখনও উপদংশ পীড়া হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই ইহা বিশেষরূপে কার্য্যকারী। অতি সামান্য মাত্রায়

মার্কুর্য্যরি প্রয়োগে শরীরের নানাস্থানের লিমফেটিক্ এন্লার্জ্জমেণ্টের ধ্বংশ করিয়া ইহা উপকারক হয়। যকৃত প্লীহা কিড্নি প্রভৃতি গ্লাণ্ড সকলের বিবৃদ্ধি দমন করিয়া ইহা কার্য্যকারী হয়। অধিকাংশ এনিমিয়া (রক্তহীনতা রোগে) এই সকল যন্ত্রের রক্তাধিক্যতা বর্ত্তমান থাকে। পারাঘটিত ঔষধে তাহা দমন করে। অতি অল্প মাত্রায় বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুর্য্যরি হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে বলকারক হইয়া উপকারক হয়। ডাক্তার কার্টলেজ্ ১/৬ গ্রেণ মাত্রায় পূর্ণোদরে (আহারের পর) প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। জরায়ুপীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের রক্তহীনতা রোগে ইহার তুল্য ঔষধি আর নাই। ওভেরির কন্‌জেস্‌সেন বা বিবৃদ্ধি থাকিলে ইহা মহোপকার সাধন করে। স্ক্রোফুলা পীড়াগ্রস্থ রোগীদিগের রক্তহীনতায় ইহা উপকারী। ক্লোরোসিস্ পীড়াতেও ইহা উপকারক। যে সকল স্থলে কেবলমাত্র লৌহঘটিত ঔষধ উপকার না করে, সে সকল স্থলে লৌহ এবং বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুর্য্যরি একত্র মিশাইয়া দিলে উপকারক হয়।

বাল্‌সাম্ অব্ পেরু (Balsam of peru) ডাক্তার রক্‌ওয়েল কহেন যে, কোন স্থান কাটিয়া গেলে বা ছড়িয়া গেলে বা ছ্যাঁচা লাগিলে বাল্‌সাম্ অব্ পেরু দিয়া ড্রেস করিলে ঐ স্থান না পাকিয়া অতি সত্বর আরাম হইয়া যায়। যদি কোন স্থান অত্যন্ত ছেঁচিয়া যায়, তবে বাল্‌সাম্ অব্ পেরু দিয়া ঐ স্থান বাঁধিয়া দিলে তাহা কঠিন হইয়া যায়। পাকেও না, ফুলেও না। পেরু বাল্‌সাম্ রক্তরোধকও বটে। ইহাতে কাটা ঘা তৎক্ষণাৎ জোড়া লাগিয়া যায়। ইহা পুনঃ পুনঃ বদলাইবার দরকার নাই। নিউইয়র্কমেডিকেল-রেকর্ড ১৮৮৮ সাল ১৪ নং। *

জল—জল নানারোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। তা ছাড়া জল শিশুদিগের ক্রন্দন থামাইবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। শিশু কিয়ৎকাল অনাহারে থাকিলেই কাঁদিতে থাকে, কিন্তু একটু দুধ খাওয়াইলেই স্থির হয়। এই কারণবশতঃ প্রসূতিগণ শিশুদিগের পুনঃ পুনঃ দুধ খাওয়াইয়া উহাদিগের পীড়া উৎপন্ন করেন। পুনঃ পুনঃ দুধ না দিয়া যদি এক এক ঝিনুক জল

* ভরসা করি সম্মিলনীর পাঠকবর্গ কাটা ঘা, ছাঁচা ঘা প্রভৃতিতে বাল্‌সাম্ অব্ পেরুর গুণ পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল জ্ঞাত করেন। চি, স, ডা, স।

খাইতে দেওয়া যায়, তবে তাহাতে উপকার বই অপকার নাই। এইরূপ শিশু ক্রন্দন করিলেই দুধ না দিয়া এক ঝিনুক কি দুই ঝিনুক জল খাওয়াইলে শিশু আর ক্রন্দন করে না। এইরূপে জল দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া দুধ খাওয়ানের সময় উপস্থিত হইলে তখন দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য জল দুগ্ধের কায করে না বা দুগ্ধের স্থানীয় হইতে পারে না। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে শিশুর অত্যন্ত পিপাসা পায়। এই সময়ে মাঝে মাঝে অল্প অল্প জল খাইতে দিলে সমূহ উপকার হয়। চারিমাস বয়সের পর হইতে শিশুদিগকে প্রত্যহ শীতলজলে স্নান করাইতে পারা যায়, তাহাতে শিশুদিগের শরীরে বলাধান হয়। ক্রূপরোগে আক্রমণ সময়ে চক্ষে মুখে জলের ছাট দিলে অথবা হট্‌বাথ দিলে উপকার হয়। শিশুদিগের তড়কারোগে জলের তুল্য ঔষধ আর নাই। দন্তউদ্গম সময়ে তড়কা হইলে হট্‌বাথ দেওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত জ্বর হইয়া তড়কা হইলে হট্‌বাথ দেওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত জ্বর হইয়া তড়াকা হইলে শীতলজলে স্নান করান বিধেয়। সায়েটিকারোগে গরমজলে বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডিয়ম্ মিশ্রিত করিয়া এনিমা দিলে নিবারণ হয়। ডাক্তার ডিসম্ (Dessam) বলেন বেদনা স্থানে জলের হাইপডার্মিক্ ইন্‌জেক্‌সনে (অধঃ ত্বাচ প্রয়োগ) অতি শীঘ্র বেদনার হ্রাস হয়। কিন্তু সকল বেদনায় জল উপকার করে না। সায়েটিকালম্বেগো, নিউর‍্যাল্‌জিয়া (স্নায়ুশূল) বেদনায় জল হাইপডার্মিক্ প্রয়োগে উপকারক হয়। (নিউইয়র্কমেডিকেলরেকর্ড, মার্চ্চ ৯ই ১৮৮৯।)

ফিনাসেটীন্ (Phenacetin)—ইহা একটী জ্বরঘ্ন ঔষধ। এই ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার ফ্রেডারিক মূলার প্রণীত প্রবন্ধই সমধিক প্রশংসার যোগ্য। তিনি অনেক গুলি বিবিধপ্রকার রোগে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্ণবয়স্ককে ৭ হইতে ১১ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিতে দেওয়ায় অতি সত্বরে উত্তাপের হ্রাস হয় এবং কদাচিৎ ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এক হইতে চারিঘণ্টার মধ্যে এই উত্তাপের হ্রাস হয় এবং অধিকাংশস্থলেই ঘর্ম্ম, নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে কোন অসুস্থতার লক্ষণ উপস্থিত হয় না। তিন হইতে পাঁচঘণ্টা পর্য্যন্ত যে জ্বরবেগ নিতান্ত কম থাকে, সে সময়ে রোগী

সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করে। ক্ষুধা অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হয় এবং অধিকক্ষণ সুনিদ্রা জন্মে। পুনরায় উত্তাপের বৃদ্ধির সহিত কম্প উপস্থিত বা শীত বোধ হয় না। রোগীর সুবিধার জন্য উত্তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির নিবারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত, তাহা না করিয়া যদি ক্রমাগত ঔষধ সেবন চলে, তাহাহইলে উত্তাপও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং কিয়দ্দিবস পরে ঔষধ শরীরের অভ্যস্থ হইয়া পড়ে সুতরাং অত্যধিকমাত্রায় আবশ্যক হয়; কিন্তু অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। দৈনিক ৯০ হইতে ১২০ গ্রেণ মাত্রা সেবনে তিনি সায়ানসিস্ (Cynosis) জন্মিতে দেখিয়াছেন। এণ্টিপাইরিন্ প্রভৃতি জরঘ্ন ঔষধ অপেক্ষা ফিনাসটিনের ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে। তবে অন্যান্য ঔষধ গুলিতে যে সকল অপ্রীতিকর উপসর্গ জন্মে, ইহাতে সে আশঙ্কা নাই। ইহা আস্বাদহীন, কদাচিৎ বমন বা উদরাময় আনয়ন করে, কর্ণে কোনরূপ শব্দ অনুভূত, চর্ম্মোপরি কণ্ডু বহির্গত বা মূত্রপিণ্ডের কোনরূপ উপসর্গ জন্মিতে দেখা যায় নাই। কোন কোন স্থলে ইহাদ্বারা উদরাময় বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য ঔষধগুলির ন্যায় ফিনাসেটিনের বেদনাহারক গুণ আছে। মস্তিষ্কের নির্ম্মাণ বিকৃতি বা ইউরিমিয়া কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণোদ্ভূত শিরঃপীড়ায় ইহার ব্যবহারে বেদনার শান্তি হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যসাধনার্থ দৈনিক ৪৫ হইতে ৭৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। কোন কোন স্নায়ুশূলরোগে ফিনাসেটিনদ্বারা বেদনার হ্রাস হয় এবং এই বেদনাহারক গুণ কোন অংশে এণ্টিপাইরিন্ বা এণ্টিফেব্রিণ অপেক্ষা ন্যূন নহে। সন্ধিস্থলের তরুণ বেদনার ২৪টী রোগীর মধ্যে ১৫ টীর জ্বর, সন্ধিস্থলের বেদনা ও স্ফীতির আশু উপকার করিয়াছিল এবং দুই হইতে নয়দিবস মধ্যে সকল উপসর্গ তিরোহিত হইয়াছিল। চারিটীর কোন উপকার হয় নাই, ছয়টীর কোন অবস্থান্তর ঘটে নাই। এই শেষোল্লিখিত ছয়টীর মধ্যে দুইটীর রোগ মেহবশতঃ জন্মে ও দুইটীর রোগ পুরাতন বাতব্যাধিসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। জরঘ্নগুণে ইহাকে এণ্টিফেব্রিণ ও এণ্টিপাইরিণের সমশ্রেণীতে গণ্য এবং বাত ও স্নায়ুশূলরোগে সমান উপযোগী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে (আঃ মেঃ জঃ)।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

পরীক্ষিতমুষ্টিযোগ ঔষধ।

(গত প্রকাশিতের পর)।

(১) সুখবিরেচক ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধভাব উপস্থিত হইয়া ২।১ দিন মলনির্গত না হইলে মুক্তঝুরির পাতা উত্তমরূপে বাটিয়া মলদ্বারের চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহ্যে যাইবার চেষ্টা হইয়া উত্তম কোষ্ঠপরিষ্কার হইবেক, মলের নিতান্ত কঠিনভাব থাকা বোধ হইলে কথিত ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে পুরাতন ঘৃত, কিম্বা তৈলের দ্বারা মলদ্বার কোমল করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ঐ দ্বিতীয়প্রকার।

বকুলের বিচির মধ্যের শাঁস উত্তমরূপে বাটিয়া পুরাতন ঘৃতের সহিত একত্র করতঃ ঐ প্রকারে প্রলেপ দিলে উত্তম কোষ্ঠপরিষ্কার হয়। এই ঔষধ বালকশরীরে অধিক কার্য্যকারী হয়।

(২) সর্পদংশনের ঔষধ।

জয়পালের বিচি সর্পদংশনের মহৌষধ। উহা ঘসিয়া দংশনস্থানে লাগাইয়া দিবে, যদি রোগী ঢলিয়া পড়ে তবে যাহাতে চক্ষুর তারায় না লাগে, এইরূপ সতর্ক হইয়া পায়রার পালকে করিয়া কজ্জলের ন্যায় চক্ষুতে লাগাইয়া দিবে।

ঐ ২য়।

কোদালে, কুড়ুলে নামক দুইটী লতাজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ। এ উদ্ভিদদ্বয় পরিষ্কার শিলাখণ্ডে অল্প জল দিয়া বাটিতে হয়। উহার এক এক ছটাক পরিমাণ বালকের পক্ষে এবং উহার দ্বিগুণ পরিমাণ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সেবন ব্যবস্থা।

ঐ ৩য়।

দ্রোণপুষ্পবৃক্ষের পাতার রস অর্দ্ধছটাক, থানকুনির পাতার রস অর্দ্ধছটাক, একত্র করিয়া একবার পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

ঐ ৪র্থ।

ঈশ্বরবাণীর পাতায় সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

ঐ ৫ম।

শ্বেতকাচগাছের শিকড় একতোলা উঠাইয়া জলে বাটিয়া খাওয়াইবে ও ঘা মুখে দিবে।

ঐ ৬ষ্ঠ।

শ্বেতচিতাগাছের মূল ১ একতোলা, আদখানি পেঁপুলের সহিত জলে বাটিয়া খাওয়াইবে ও ঘা মুখে দিবে।

ঐ ৭ম।

বাঁজা মুথাঘাসের শিকড় দুইতোলা উঠাইয়া একটী পিপুলের সহিত জলে বাটিয়া খাওয়াইবে ও ঘামুখে দিবে। ইহাতে বোলতা, ভিমরুল ও বিছা প্রভৃতি অন্যান্য বিষও নষ্ট হয়।

ঐ ৮ম।

দোকৃতাতামাকের গাছের শিকড় ১ একতোলা ও পলতা ১ একতোলা একত্রে হুঁকার জলে বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইবে ও ক্ষতমুখে দিবে।

ঐ ৯ম।

নিম্বকাষ্ঠের ছাতুর গুঁড়া একশিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ নস্য করিতে দিবে ও বক্রী কিঞ্চিৎ ধানি লঙ্কাগাছের শিকড় ১ একতোলার সহিত জলে বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইবে।

ঐ ১০ম।

কেলেবিষহরি গাছের পাতার রস অর্দ্ধপোয়া রোগীকে খাওয়াইবে ও ক্ষতস্থানে দিবে।

ঐ ১১শ।

কালিকাঝাপ গাছের শিকড় দুই তোলা জলে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে ও ক্ষতস্থানে দিবে।

ঐ ১২শ।

দুর্গাঝাপ গাছের শিকড় দুইতোলা জলে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে ও ক্ষতমুখে দিবে।

ঐ ১৩শ।

ছুঁইমুঁই অথবা ছুঁইমারি গাছের শিকড় আন্দাজ দেড় তোলা লইয়া জলে বাটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে ও ক্ষতস্থানে দিবে।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

"বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ্‌যেন তদ্দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধং।"

এই বচনানুসারে রোগঘ্ন-পথ্য সকলও যে ঔষধ-পদবাচ্য, তাহার সন্দেহ নাই—সুতরাং যুক্তিযুক্ত সুপরীক্ষিত পথ্য সকলও এই মুষ্টিযোগের শ্রেণী-নিবিষ্ট করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম—

রামরস ভোগ প্রস্তুত প্রণালী।

বিটপালন, ফুলকোপি, ওলকোপি, শালগম, জালিমূলা, পটোল, বা গোল আলু, ইহার মধ্যে একতম লইয়া কুচিকুচি করিয়া প্রয়োজনানুসারে অর্থাৎ বিটপালম, ফুলকোপি, মূলা প্রভৃতি হইলে পূর্ব্বে একটু সিদ্ধ করিয়া এবং পটোল আলু প্রভৃতি হইলে অল্প ঘৃতে একটু গাতানি দিয়া রাখিতে হইবে। পরে একটী পরিষ্কৃত ধাতুপাত্রে পরিমাণমত ঘৃত ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে উপযুক্তমত সুজি দিয়া ভাজিবে। যোগ্যমত ভাজা হইবামাত্র ঐ সুজি সিদ্ধ হইবার উপযোগী জলে উহাতে ঢালিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে উহাতে পূর্ব্ব প্রস্তুতীকৃত তরকারি খণ্ড ও পরিমাণ মত সৈন্ধব বা লবণ দিয়া নাড়িতে হইবে। এইরূপে জল শুষ্ক হইয়া গেলেই পাককার্য্য সমাধা হইল। রোগীর অগ্নির বলাবল বিবেচনায় ঘৃতের পরিমাণ ন্যূনাতিরেক করা আবশ্যক। অধিক ঘৃত সংযুক্ত এই রামরস ভোগ একটী উপাদেয় পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু রোগীর সম্বন্ধে তাহা পথ্য নহে।

গুণ—অরুচিনাশক, বলকারক, লঘুপাকী। আজ্ কালকার প্রথানুসারে যে ক্ষেত্রে দুদসুজি, অথবা কেবল সুজি ব্যবস্থা হয়, তৎসমস্তক্ষেত্রেই ইহা প্রয়োজ্য।

পটোলাবলেহ

অথবা

পটোল ছেঁচ্‌কি।

অনেকেই অনেক প্রকার প্রণালীক্রমে পাক করিয়া পটোল আহার করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু আমার অদ্যকার লিখিত এই পটোলাবলেহ অথবা পটোল ছেঁচ্‌কি পাকের প্রণালী যে, সকলে জ্ঞাত আছেন, তাহা আমি বোধ করি না—এনিমিত্ত বিস্তৃতরূপে তাহা লিখিতেছি।

এক একটী আস্ত পটোলের উপরের কুঁড়মত ছালভাগ বটি প্রভৃতি অস্ত্র-

দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলিয়া পটোল বিবেচনায় এক একটীকে চারি বা ছয়-ভাগে লম্বা ফালি করিয়া পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবেক। পরে একখানি পরিস্কৃত কড়ায় পটোলগুলি অনায়াসে ভাজা হইতে পারে, এইরূপ ঘৃত চড়াইয়া দিয়া তাহাতে পাঁচফোড়ন বা ভাল হিঙ্গুসম্ভরা দিয়া পটোল নিঃক্ষেপ করিতে হইবেক। পটোলগুলি সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তাহাতে পরিমাণ মত দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া, দুদ তুম তুম হইয়া পটোলের গায়ে লাগিলে পাকশেষ জ্ঞানে তাহাকে নামাইবে। ইহার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে উহাতে লবণাদি দিতে হইবেক, পাঁচফোড়ন ও হিঙ্গু সম্ভারিত উভয় প্রকারই তুল্য উপাদেয়। তবে হিঙ্গুসম্ভরা ব্যক্তিবিশেষের অনুমোদিত নহে।

গুণ—অরুচিনাশক, বলকারী, সারক, লঘুপাকী, রক্তপরিস্কারক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারী, পিত্তনাশক।

ডিম্ববটক।

প্রথমতঃ কিছু গোল আলু অথবা ভাল ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে ৫।৬ টী হংসডিম্ব ভাঙ্গিয়া লইয়া ফেটিয়া ঐ ডিম্বের অর্দ্ধেক পরিমাণ কথিত আলু বা ওল সিদ্ধ উহার সহিত একত্রে মাখিয়া লইয়া উহাতে হরিদ্রার গুঁড়া, লবণ, অল্প ত্রিজাতকচূর্ণ ও অতি সামান্য পরিমাণ ময়দার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া স্থাপনানন্তর, একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া দিয়া ঐ ডিম্ব বটকাকারে ভাজিতে হইবেক এবং ঐ কড়ার নিকটেই অপর একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত স্থাপন করিতে হইবেক। ঘৃত এমত পরিমাণ হওয়া আবশ্যক যাহাতে বটকগুলি সমস্ত অথবা অধিকাংশ ডুবিয়া যায়। পরে ঐ বটকগুলি উপযুক্ত মত ভাজা হইলে ঐ ঘৃতে ফেলিতে হইবেক।

গুণ—অরুচিনাশক, লঘুপাকী, বলকারক, ওলসংযুক্ত হইলে অর্শনাশক, পুষ্টিকারী, মেধ্য, ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য।

অমৃতান্ন।

গুলঞ্চের ডাঁটা যে পরিমাণ, তাহার বত্রিসগুণ জলে ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া, ডাঁটার ক্বাথ উত্তমরূপে বাহির করিয়া লইয়া অর্দ্ধাবশেষ জল রাখিয়া ডাঁটা গুলি ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া পৃথক্ পাত্রে মুখবন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে অর্থাৎ ক্বাথ যেন শীতল না হয়।

তৎপরে রোগীর প্রথম ভোজনে আবশ্যকীয় এক ছটাক কি অর্দ্ধছটাক পুরাতন সিদ্ধ চাউল পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া তাহাতে লবণ ও হলদি মিশ্রিত করিয়া একটী বগুনায় অল্প ঘৃত চড়াইতে হইবে ও তাহাতেই লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত তণ্ডুলগুলি ভাজিয়া পূর্ব্বরক্ষিত গুলঞ্চের ক্বাথে সিদ্ধ করিতে হইবেক। অন্ন সুসিদ্ধ ও পাক নিষ্পন্ন হইলে ক্বাথ এই পরিমাণ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে শেষে ফ্যান্ ঝাড়িতে না হয়, রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি হইতে লাগিলে ঘৃতের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়।

গুণ—হাত পা জ্বালা নিবারক, কামলানাশক, মেহঘটিত পুরাতন জ্বর নিবারক, অরুচিনাশক, বলকারক, আগ্নেয়, লঘুপাকী, ত্রিদোষনাশক, সামান্যতঃ সকলপ্রকার পিত্তদোষশান্তিকারক, চুলকনা ও পাচড়ার পক্ষে অতিশয় হিতকারী।

ক্রমশঃ—

সাতক্ষীরা কার্ত্তিক। } শ্রীরামনিরঞ্জন রায় চৌধুরী জমীদার।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

লেখক মহাশয়ের ঔষধ বা পথ্যগুলি যাঁহাদ্বারা আবিষ্কৃত, সেই স্বর্গীয় মহাত্মা দেবনাথ বাবুর অসাধারণশক্তির কথা মনে করিয়া আমরা সাধারণকে এই সমস্ত ঔষধ বা পথ্যের ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু অনেক দ্রব্যের নাম যাহাতে সাধারণে সহজে বুঝিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের দৃষ্টি প্রার্থনীয়। চি, স, ক, স।

টোট্‌কা ঔষধ।

(উদ্ধৃত)

অজীর্ণ—অধিক মাংস খাইয়া অজীর্ণ বা পেট গরম হইলে ২ তোলা পরিমাণে শুকনা কাশীর চিনি মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। মাছি খাইলে কাশীর চিনি মুখে রাখিলে কোন প্রকারে বমি হয় না।

অর্শ—মটর কড়াইয়ের মত ছোট ছোট বুনো ওল ময়দার ঠুসির ভিতর পুরিয়া প্রাতে একবার করিয়া ৩। ৪ দিন খাইলে অর্শ রোগ আরাম হয়। এক তোলা আতপ চাউল, আধ তোলা অতি চারা নিমের শিকড় একত্রে বাটিয়া ৩। ৪ দিন খাইলে অর্শ আরোগ্য হয়। উচ্ছে পাতার রসও ইহার পক্ষে বড় উপকারী।

কাটা ঘা—যদ্যপি কোন প্রকার ঔষধি নিকটে না থাকে, তবে নিম্ন লিখিত কড়ারটি অতি চমৎকার। একোগুড় ও খয়ের সমভাগে সর্ষের তৈলে মিলাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া কাপড় জড়াইয়া দিবে। সাবধান থাকিবে জল না লাগে; যত বড় আঘাত হউক না কেন অবশ্য তিন দিনে আরোগ্য হইবেক। প্রথম দিবস ভিন্ন আর ঔষধ লাগাইতে হইবেক না। কিন্তু জল লাগিলে অতি বিপরীত হইবে। কাটার স্থানে দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

কানপাকা—পাণীসাড়ার গাছ কাটিলে যে জলবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা ২।১ বার কানের ভিতর দিলে কানপাকা আরোগ্য হয়।

ক্রিমি—ভাঁট পাতার রস বা আনারস পাতা চুণের জলে ছেঁচিয়া সেই রস বা জাম খাইলে আরোগ্য হয়।

গরল—শিরিষের শিকড় মনসার আটার সহিত বাটিয়া লাগাইলে সকল প্রকার গরল আরোগ্য হয়।

ঘা—কয়েৎবেলের কাষ্ঠহুকার জলে চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া, তাহার উপর হুকার জলে নেকড়া ভিজাইয়া পটি বাঁধিয়া ১ দিন অথবা ২ দিন রাখিলে, পারা সংযুক্ত অথবা যত দিনের যে প্রকারের ঘা হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ব্রণ হইলে পাকাগাব খাইবে।

ছুলি—হলুদের ফুলের ভিতর যে এক প্রকার জল থাকে, ঐ জলে চন্দন ঘসিয়া গাত্রে লেপন করিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

টাক—পুরাতন সজিনা গাছের ছালের রস টাকের উপর ঘসিয়া দিলে ২।৪ দিনের মধ্যে টাকের উপর চুল উঠে। সজিনার বিচীর তৈল মাথায় ব্যবহার করিলে অথবা একটা পেঁয়াজ দুই খানা করিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ছড়াইয়া টাকের উপর প্রত্যহ ঘসিলে চুল উঠিবে।

দাদ—শোঁদালের কচি পাতা লেবুর রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ এক দিনেই সারে।

দাঁত—চিকিস্থপারির ভস্ম ১ তোলা, বাঁশের কয়লা ১ তোলা, দগ্ধ করা তুঁতে সিকি তোলা একত্রে মাড়িয়া মাজন প্রস্তুত করিলে ঐ মাজনে দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি আরাম হয়।

নালী ঘা—গাওয়া ঘি, ১ পোয়া, ভাল মোম ৪ তোলা, তেপাতি গাছের রস ১ ছটাক। প্রথমতঃ ঘি আগুণে চড়াইয়া খুব গরম হইলে মোম দিয়া আবার জ্বাল দিবে, তাহার পর নামাইয়া ঐ তেপাতি পাতার রস দিয়া পুনরায় আগুণে চড়াইয়া জ্বাল দিবে যে পর্য্যন্ত না সেই রস উত্তমরূপে মিলিয়া যায়; পরে নামাইয়া উহাতে ১ সের শীতল জল ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে শীতল হইলে ঐ ঘৃত কাচের বা পাথরের পাত্রে রাখিবে। ঘা নীম পাতার জলে ধুইয়া ঐ ঘি পুরাতন তুলার উপর দিয়া পটি করিয়া বাঁধিবে। ইহাতে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন ঘা অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবেক। হাফরমালির আঠা নালিঘার পক্ষে বড় উপকারক।

পাঁচড়া—পুরাতন বেগুণ গাছের পাতার এক তোলা ভস্ম, আধ ছটাক সর্ষপ তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। হলকসা ফুলের পাতা হুকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক দিনে আরোগ্য হয়।

পালাজ্বর—এক দিন অন্তর হইলে জ্বরের দিবস প্রাতঃকালে নিমুকালতা হাতে তাগা বাঁধিলে এক দিনেই জ্বর আরোগ্য হয়। সাদা বকফুলের পাতার রস নেকড়ার পুঁটলি করিয়া ঘ্রাণ লইলে এক দিন অন্তর কিম্বা ২ দিন অন্তর জ্বর এক দিনেই আরোগ্য হয়। উক্ত টোটকা বাসী হাতে বাসী মুখে করিবে।

বিছা ইত্যাদি কামড়ানর ঔষধ—আঁবের কশা এক পোয়া, এক পোয়া জলে ১০।১২ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সেই জল বোতলে পুরিয়া রাখিবে; বিছা, বোলতা, ভিমরুল, প্রভৃতি কামড়াইলে ঐ জল দষ্ট স্থানে ২।৪ ফোটা দিলে অচিরাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। বোলতা বা মৌমাছি কামড়াইলে সরিষা বা কেরসিন তৈল লাগাইবে। মাকড়সা কামড়াইলে ঘি আর লবণ মিশাইয়া লাগাইবে। সুঁয়াপোকার কাঁটা লাগিলে চুণ লাগাইবে। হাতে চুষিপোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইবে।

রক্তপাত—গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া আঘাত কিম্বা কাটার জন্য রক্তপাত হইলে ঐস্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হয় ও বেদনা নিবারণ করে। ফট্‌কিরি ও বাবলার আটার গুঁড়া দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। দুর্ব্বা, আয়াপান, কুকসিম বা ডুমুরের রস বা শীতল জল বা বরফ দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

রাতকানা—দেশি পানের রস এক ফোটা করিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে দিলে রাতকানা দশ মিনিটের মধ্যে আরোগ্য হয়।” শিল্পকৃষিপত্রিকা।

সম্পাদকীয়মন্তব্য।

প্রবন্ধটী অনেক দিনের পুরাতন হইলেও ইহাদের ফল অনেকেই পাইতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চি, স, ক, স।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

প্রমেহ বা ধাতের পীড়া।

৫ম খণ্ডে প্রকাশিত ২৫৬ পৃষ্ঠার পর।

প্রমেহরোগের তরুণাবস্থায় জ্বালা যন্ত্রণা বা টন্‌টনানি কিম্বা দপ্‌দপানি প্রভৃতি অত্যন্ত কষ্টদায়ক উপসর্গ সকলের আশু নিবৃত্তির জন্য যে সকল ক্রিয়া প্রশস্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে ক্রমশঃ বলিয়াছি। পরন্তু প্রথমাবস্থায় যে সকল ঔষধ দ্বারা সপূয় ধাতুনিস্রাবের শান্তি হইতে পারে, তাহাও বলিতে ত্রুটী করি নাই। অতঃপর দাস্তের সময় বেগ দিলে কিংবা পুং অঙ্গ টিপিলে যে এক আধ ফোটা ধাতু নির্গত হয়, তাহার শান্তির বিষয় বলিব বলিয়া ইতি-পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু কেবল মুষ্টিযোগ ঔষধ প্রয়োগদ্বারা এই সকল অবস্থায় নির্দ্দোষ শান্তি সকল সময় যে হইতে পারে, সে বিশ্বাস আমার নাই। আসল কথা প্রমেহরোগ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে তখন আর মুষ্টিযোগ ঔষধপ্রয়োগে তাহার নির্দ্দোষ শান্তির চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং সে অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমেহচিন্তামণি, বৃহদ্‌বঙ্গেশ্বর, বঙ্গাষ্টক, স্বর্ণবঙ্গ, সোমনাথরস ও বসন্তকুসুমকাররস প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে রোগীর প্রকৃতি অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া তবে প্রয়োগ করিতে হইবেক। এস্থলে রোগীর প্রকৃতি উল্লেখের বিশেষতাৎপর্য্য এই যে, এমন অনেক প্রমেহরোগী আছেন, যাঁহাদের অর্দ্ধবড়ী সোমনাথ বা বসন্তকুসুমাকররস সেবনেই ভয়ানক গরম অথবা অনিদ্রাদি অন্য কোনরূপ অসুখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধেরই প্রয়োগকর, কিন্তু রোগীর বাতশ্লেষ্মাদি প্রকৃতির উপর যেন বেশ দৃষ্টি থাকে। কেবল তাহা নহে, ঔষধপ্রয়োগের ন্যায় এস্থলে ঔষধের অনুপানদ্রব্যের (শিমুলমূল, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি) প্রতিও সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবেক। কেননা স্থলবিশেষে এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঔষধের অনুপানে যজ্ঞডুমুরের রস বা যজ্ঞডুমুরের বীচীরচূর্ণ অনুপান দিয়া সপ্তাহমধ্যে কোন উপকার দর্শে নাই, সেই ঔষধই চারাশিমুলমূলের রসের সহিত সেবনে ৩।৪ দিন মধ্যে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। যাহাহউক, প্রমেহরোগের ঔষধ অনুপান বা পথ্যসম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে সকল কথা এখানে বলিতে গেলে ইহা প্রমেহরোগ চিকিৎ-সার একটী দস্তরমত বিস্তৃত প্রবন্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু গোড়ায় আমরা প্রমেহ-রোগের চিকিৎসা বলিব বলিয়া স্থির করি নাই, আমাদের বক্তব্য কেবল প্রমেহরোগের মুষ্টিযোগ লইয়া, সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তৎসমস্তই সাধ্যমত বলিয়াছি। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগের চিকিৎসার বিষয় ইহার পর প্রমেহাধিকারে অবশ্যই বলিব। অতঃপর অন্যান্য রোগের আশু-প্রতীকারার্থ যে সমস্ত মুষ্টিযোগ বিশেষে ফলপ্রদ বলিয়া জানি, তাহা আগামীবার হইতে ক্রমশঃ বলিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

কবিরাজ সম্পাদক।

৬ষ্ঠ খণ্ড। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯৬ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌,এ,বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্‌, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত। প্রাণ-গোবিন্দ রায় কবিরাজ। শ্রী—এবং সম্পাদকদ্বয়।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্‌ ৫নং, জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯০।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনার হিসাবে এই দুই সংখ্যার একত্র নগদ মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (মানবশত্রু—স্ত্রী)	২৩৩
স্ত্রী ও পুরুষ (ডাক্তারীমতে লিখিত)	২৩৬
খাদ্য ঐ	২৩৯
আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রীবিদ্যা	২৪১
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী (পর্পটী)	২৪৫
ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি (জ্বরে ঘৃতপ্রয়োগ)	২৪৭
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী (জ্বরে তৈলপ্রয়োগ)	২৫১
সংশয় অপনয়ন (এলোপ্যাথি)	২৫৪
ধাতুব্যাখ্যা (কবিরাজী)	২৬৫
ইংরেজরাজ্যে কুষ্ঠরোগের বৃদ্ধি (এলোপ্যাথিমতে)	২৬৮
কুষ্ঠরোগ ও লেডিডফরীন্ ফণ্ডদ্বারা স্ত্রীরোগ-	
চিকিৎসা-সম্বন্ধে কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য (কুষ্ঠরোগ)	২৭৪
পরীক্ষাতত্ত্ব (কবিরাজী)	২৮১
নাসিকা (এলোপ্যাথিমতে)	২৮৬
সূতিকা তরুণজ্বর বা পচাজ্বর (এলোপ্যাথিমতে)	২৮৮
অবলাবান্ধব (কবিরাজী)	২৯০
কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ (এলোপ্যাথিমতে)	২৯৩
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগে কোষ্ঠবদ্ধরোগে পাকাবেল (সম্পাদকীয়)	২৯৯
পুস্তক সমালোচনা ঐ	৩০৩
পুষ্পমেলা ঐ	৩০৩
সংবাদপত্র ঐ	৩০৪

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

মানবশত্রু—স্ত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্ত্রীজাতির সহিত সংঘর্ষে সংসারক্ষেত্রে মানবের যে অহিতাচরণ হইতেছে, আমরা কয়েকবার ধরিয়া সে কথার আলোচনা করিতেছি। স্ত্রীজাতিকে আমরা যে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছি, পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মাতাপ্রভৃতি গুরু-স্থানীয়া স্ত্রীলোকদিগকে আমি প্রথমশ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছি এবং এই শ্রেণীর অযথাচরণে বর্ত্তমান সমাজে কিরূপ অনিষ্টের আবির্ভাব হইতেছে এবং তজ্জন্য মানবজাতির শারীরিক ও মানসিক কিরূপ অহিতসাধন হইতেছে, এইবারে তাহারই আলোচনা করিব বলিয়া আভাস দিয়াছি। এখন সেই কথাই বুঝিয়া দেখা যাক্। প্রথমতঃ মায়ের কথাই বলা যাক্।

কথাটা বড় গুরুতর। আমি পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। "জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ইহা প্রাচীন ঋষির প্রাচীন কথা। কিন্তু প্রাচীনে আর নবীনে কত প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে একবার ভাবিয়া দেখুন। যিনি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তিনিই এখন রাক্ষসী নামে অভিহিতা হইতে চলি-লেন। প্রাচীন পাঠ সকলই পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। যে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া সন্তান দেবতাকে প্রণাম করিয়াছি বলিয়া মনে করিত, আজ সেই মাতা সেই সন্তানের কাছে মাইডিয়ার মাদারমাত্রে পরিণত। পুরাকালে কথা ছিল যে, যার ঘরে মা নাই, আবার তাহার উপর যাহার পত্নী মুখরা, বনে যাওয়াই তাহার ভাল। অরণ্য আর গৃহ, তাহার পক্ষে সমান।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥

কিন্তু এখন প্রথা দাঁড়াইয়াছে যে, মাতা যে গৃহে আছেন, পুত্র সেই গৃহকে অরণ্যবোধ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে পৃথক্ বাস

COLOUR PAPER

করেন। প্রাচীনে আর নবীনে, মাতাপুত্রের সম্বন্ধ এম্‌নি আকাশ পাতাল ভেদ হইয়া গিয়াছে।

এ ভেদ কেন হয়, কাহার দোষে হয়! সে বিচার আর মাথামুণ্ড কি করিব? দোষ কারও নয়! দোষ আমাদের পোড়াকপালের! সকল কাজেই দেখিবেন, এক হাতে কখনও তালি বাজে না। দোষ দুই পক্ষেই থাকে। সুতরাং মাতা পুত্রের বিবাদে যে উভয়পক্ষই অপরাধী, সে কথা কিছু বিচিত্র নয়। পুরাকালের পক্ষে কথাটা বিচিত্র ছিল বটে। পুরাকাল অর্থে আমি অধিক দিনের কথাও বলিতেছি না। সংস্কৃত যখন আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল, তখনকার কথাও বলি না। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই প্রবাদ আছে—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিতে বরং ভুল হইতে পারে, কিন্তু স্নেহের ব্যভিচার হয় না। এখনকার কালে এ কথাটা কিন্তু আর খাটে না। স্নেহের ব্যভিচার এখন সমাজের বহুস্থলে লক্ষিত হইতেছে। একদিন যাহা অসম্ভব ছিল, আজ তাহা সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন যাহা স্বপ্নের অগোচর বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, আজ তাহা লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠিতেছে। জননীর সন্তানস্নেহে তাচ্ছল্য হইয়াছে। এই পুণ্যভূমে, এই কৌশল্যা দেবকীর দেশে, জননী বাৎসল্যহীনা হইয়াছেন শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সহস্র কুপুত্রের চিত্র দেখিলে আমরা বরং সহ্য করিতে পারি, কিন্তু একটি মাত্র কুমাতার দৃষ্টান্তে আমাদের প্রাণের অন্তস্তল কাঁপিয়া উঠে, চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারি না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্নেহহীনা মাতৃমূর্ত্তির দৃষ্টান্ত আজিকার এ সমাজে নিতান্ত বিরল নহে। বুকের রক্ত দিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রাণের পুত্তলীকে যে জননী প্রতিপালন করিতেন, সে জননীমূর্ত্তি—সে দেবতামূর্ত্তি, ক্রমেই দেশ হইতে যেন তিরোহিত হইতেছে। এখন সন্তান পালন, সন্তান রক্ষণের ভার দাস দাসীর হাতে। পাছে আপনার বিলাসে বাধা পড়ে, পাছে আপনার সুখসচ্ছন্দতার ত্রুটি হয়, এই ভয়ে রমণী এখন সন্তান কামনা করেন না, সন্তান না হইলেই বরং আপনাকে সুখিনী বলিয়া মনে করেন। সন্তানের জন্য আর সে পূজা মানসিক, আর সে তীর্থসেবা গুরুসেবা, আর সে ব্রত নিয়ম নাই। "হতা রূপবতী বন্ধ্যা,"

এ কথার গৌরব এখন লুপ্ত হইয়াছে, এখন অপুত্রকাই রূপবতী বলিয়া সমাজে গণনীয়া।

পুত্রপালনের ভার পরহস্তে ন্যস্ত করিয়া, নব্যকামিনী পুত্র প্রসবের ভারটা এখনও স্বহস্তে রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু সেও নিতান্ত অনিচ্ছায়। গর্ভধারণকালে, ঋতুকালে, বা গর্ভাধানকালে যে সকল নিয়ম পালন করিলে সন্তান সবল সুস্থ ও সুন্দরকায় হইবে, সে সকল নিয়মের প্রতি এখনকার গৃহিণীরা আর দৃক্‌পাত করেন না। তাই দেশে আজ মানুষ না জন্মিয়া পশু-জন্মের এত বাহুল্য হইয়াছে। আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহিত এ সকল কথার অতিশয় গুরুতর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। না থাকিলে আমি অনর্থক এ প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সন্তানের শুভাশুভে যাঁহাদের তিলমাত্র দৃষ্টি নাই, তাঁহাদিগকে "কুমাতা" বলিয়া কি স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারা যায় না?

অনেকে বলিবেন যে মাতার আলস্যে বা অজ্ঞানতায় যে সকল অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধের দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। মাতা পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া, আদালতের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, পতিযোগ্য বিষয়ের ভাগ গ্রহণ করিতেছেন, এ দৃষ্টান্ত আপনারা কত দেখিতে চাহেন? আরও দেখা গিয়াছে যে, মাতা বিষয়ভাগিনী হইয়া স্বচ্ছন্দে ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছেন, আর পুত্র অর্থহীন নিঃসম্বল হইয়া উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছে। শেষ কথা, জননী স্বহস্তে পুত্রহত্যা করিয়া দ্বীপান্তরিতা হইয়াছেন, এরূপ দুই একটা ঘটনাও আমার জানা আছে। আর ভ্রূণহত্যার কথাটা পিশাচীর পাপকীর্ত্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয় ত দাও; কিন্তু সন্তান জারজ হইলেও তাহার গর্ভজাত বলিয়া ত অবশ্য ধরিতে হইবে। জারসেবায় যাহার অনুরাগ, সন্তানে তাহার এত বিরাগ কেন? তবেই দেখুন, কামুকতা স্নেহবৃত্তিকে পরাজিত করিয়াছে। এ পাপচিত্র স্মরণ হইলেও পাতক স্পর্শ হয়। আমার দুর্ভাগ্য যে এ ভয়ানক চিত্র আমার লেখনীমুখে আজ বিনির্গত হইল।

আমি আবার বলিতেছি যে, বুকের রক্ত দিয়া, আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার আত্মসুখ একবারে বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণের পুত্তলীকে

যে জননী প্রতিপালন করিতেন, সেই প্রাণাধিক, সেই সংসারের একমাত্র পুত্ররত্নের প্রতি জননী আজ্ এত বিরূপ কেন? কারণ আর কিছুই নহে, আমি বেশ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আত্ম-জ্ঞানহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। কেননা আধুনিক হিন্দুসমাজে আত্মজ্ঞান নাই বলিয়াই পিতৃমাতৃ ও পুত্রজ্ঞানের লোপ পাইয়াছে, আমরা আত্মহারা হইয়াছি বলিয়াই কি পিতামাতা, কি পুত্রকন্যা, কি দেবদেবী, কি ঈশ্বর জগদীশ্বর সকলকেই হারাইয়া বসিয়াছি এবং সেই জন্যই মূর্ত্তিমন্ত পশুভাব সকল আমাদিগকে একবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। নচেৎ যদি আমাদের কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান থাকিত—যদি আমরা আমরা কি, কেন সংসারে আসিয়াছি, কি করিয়াছি বা করিতেছি এবং করণীয়ই বা কি আছে, ইত্যাদি আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ দেবভাবের সেবক থাকিতাম, তবে কি আজ্ আমাদের অদৃষ্টে ভগবান্ এত গুরুতর দুঃখভার সকল অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেন? নিশ্চয় বলিতেছি যে, কখনই নহে। ফলতঃ আত্মজ্ঞান ভারত হইতে একবারে লোপ হইয়াছে,—কৃতজ্ঞতা ইহ সংসার হইতে একবারে পলায়ন করিয়াছে,—ভারতের মানুষ মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া পূর্ণমাত্রায় পশুত্বে পৌঁছিইয়াছে, তাই আমাদের আজ্ এত কষ্ট, তাই মাতা পুত্রে আজ্ এত বিবাদবিসম্বাদ, তাই আজ্ সোণার ভারত একবারে ছারেখারে———পাঠক! সত্য বলিতেছি দুঃখ ও ক্ষোভে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; ধর্ম্মতঃ বলিতেছি অবসন্ন অঙ্গুলী আজ্ আর লেখনী চালাইতে কোনমতেই সমর্থ নয়, সুতরাং আজ্ এই পর্য্যন্ত। ক্রমশঃ—

শ্রী—

স্ত্রী ও পুরুষ।

ডাক্তারীমতে লিখিত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর তাঁহার আয়ুর্ব্বর্দ্ধন নামক পুস্তকে বলেন যে, আমাদিগের জননেন্দ্রিয়-যন্ত্র শরীর ধারণের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদনই উহার উদ্দেশ্য। এই খণ্ডের সমর্থনে তিনি বলেন যে আমাদিগের যাবতীয় শরীর রক্ষার যন্ত্র সকল (যেমন

হৃদয়, ফুস্ফুস প্রভৃতি) শরীরের অভ্যন্তরে অতি যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু জননেন্দ্রিয় বহির্ভাগে রহিয়াছে। যদি জননেন্দ্রিয় শরীর-রক্ষার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইত তবে উহারাও হৃদয় ফুস্ফুস প্রভৃতির ন্যায় দেহমধ্যে লুক্কায়িত ও রক্ষিত হইত। এজন্য তিনি বলেন যে জননেন্দ্রিয় উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেও শরীরের পক্ষে বিশেষ হানি হয় না প্রত্যুত শরীর অত্যন্ত বলবান হয়। এইরূপ যে বলবান হয় তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি খোজাদিগের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন খোজাগণ পালোয়ান বলিয়া বিখ্যাত।

কিন্তু জননেন্দ্রিয় যদিও প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু ইহা শরীরের পক্ষে নিতান্তই হিতকারী তাহা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমাদিগের পক্ষে হৃদয় ফুস্ফুস যেমন প্রয়োজনীয়, জননেন্দ্রিয় সেরূপ নহে। হৃদয় ফুস্ফুসে অল্প আঘাত লাগিলেই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জননেন্দ্রিয়ে আঘাত লাগিলে সেরূপ প্রাণের বিনাশ না হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা জীবকার্য্য নির্ব্বাহে কম প্রয়োজনীয় নহে। জননেন্দ্রিয় শরীরের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণের ন্যায় একটী অঙ্গস্বরূপ। যেমন হাত পা কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে বা চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলে প্রাণ বিনষ্ট না হইলেও মানুষটী খঞ্জ বা অন্ধ হইয়া মনুষ্যত্বের এবং কাযের বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ জননেন্দ্রিয় চ্ছেদন করিলেও সে মনুষ্যত্বের বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহার জীবনের কার্য্যকলাপ বিপরীত ভাবধারণ করে। জননেন্দ্রিয় উৎপাটন করিলে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট এবং বৃহৎকার হয় একথা প্রকৃত। কিন্তু এইরূপ হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতেও তাদৃশ উপকার নাই। জীবদেহের নিয়ম এই যে এক অঙ্গের কার্য্য স্থগিত হইলে আর এক অঙ্গের বলবৃদ্ধি হয়, যথা অন্ধের স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হয়। কিন্তু শ্রবণশক্তি এবং স্পর্শশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও সে ব্যক্তি দর্শনশক্তির সমুদায় সুবিধায় বঞ্চিত হয়। কোন জীবের হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া দিলে তাহার শরীর বৃক্ষের গুঁড়ির ন্যায় মোটা হইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বে তাহার শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ (রক্ত) যাহার কতকাংশ হস্তপদের পোষণকার্য্য ব্যয়িত হইতেছিল, তাহার সমস্ত অংশ এক্ষণে শরীরের পোষণকার্য্যে নিয়োজিত হইতে লাগিল। জননেন্দ্রিয় উৎপাটন করিলে যে জীবগণ স্থূল হয়

তাহার কারণও এইরূপ। অর্থাৎ শরীরের যে অংশদ্বারা শুক্ররস উৎপন্ন হইতেছিল তাহা সমুদয় শরীরের পোষণকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং শরীর ক্রমেই স্থূল হইয়া উঠে।

কিন্তু জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার একবারেই লোপ হইলে জীবগণ স্থূল হইলেও তাহাদের স্বভাব প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া একরূপ অদ্ভূত নূতন জীব হইয়া উঠে। খোজাগণ যদিও বৃহৎকায় ও বলবান্ হয় তথাচ তাহাদিগের আকার পুরুষের ন্যায় না হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় হয় এবং সাহস প্রভৃতি একবারেই কমিয়া যায়। মনুষ্যের যৌবনের আরম্ভে জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে যে কেবলমাত্র কাম নামক একটী মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয় তাহা নহে। উহার সহিত মানবের নানাবিধ মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং কতকগুলি নূতন মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হয়। যে সকল মানসিক গুণগ্রামদ্বারা মনুষ্য মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারে তৎসমুদয় এই কামরিপুর সহিত দৃষ্ট হয়। সামাজিক নৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়ের উন্নতি এই দুরন্ত রিপুর সহিত সংদৃষ্ট। যদিও কামরিপু পাশববৃত্তিবিশেষ নামে অভিহিত, তথাচ এই পাশববৃত্তিই অত্যন্ত স্বার্থপর মনুষ্যকে পরের হিতকামনা এবং মঙ্গলচিন্তায় নিয়োজিত করে। স্বজাতিপ্রেম, অপরের প্রতি ভালবাসা, স্নেহমমতা, পরোপকারিতা, সামাজিকতা, পরদুঃখকারতা, আসঙ্গলিপ্সা, বাৎসল্য প্রভৃতি মনের ভূষণরূপ গুণগ্রাম সকল এইরূপে সঙ্গে সঙ্গে স্ফূরিত হয়। অতএব যে ব্যক্তির জননেন্দ্রিয় নাই, তাহার শারীরিক মানসিক গুণসমষ্টিও নাই। ডাক্তার হেন্‌রি বড্‌স্‌লে বলেন খোজারা নৈতিক গুণগ্রামে একবারেই বঞ্চিত। তাহারা ভীরুস্বভাব, পরশ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী, এবং প্রতারক হয়। সামাজিকগুণগ্রামে তাহারা বঞ্চিত। অতএব জননেন্দ্রিয় আমাদিগের শরীরে ও মনে যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহা শরীরের এবং মনের পক্ষে নিতান্তই হিতকারী।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের মনের সহিত বড় একটা প্রভেদ নাই। অতএব বালিকাকে বালকের ন্যায় লালন পালন করিলে এবং সেইরূপভাবে শিক্ষিত করিলে বালিকা বালকের সদৃশ

হইবে এবং তাহার চিন্তাশক্তি, পছন্দ, মনোবৃত্তি, ক্ষমতা প্রভৃতি সমুদয় পুরুষের ন্যায় হইবে। কিন্তু এরূপ মনে করা গুরুতর ভ্রম। হরিণের শৃঙ্গ, কুক্কুটের ঝুঁট, ষাঁড়ের ঝুঁট, হস্তির দন্ত, সিংহের কেশর এবং পুরুষের দাড়ি ও গোঁফ এ সমুদয় শিক্ষার গুণে জন্মাইতে পারে না এবং বালিকাকে বালকের ন্যায় শিক্ষিত করিলে তাহার জননেন্দ্রিয় কখনও পুরুষের ন্যায় হইবে না। স্ত্রী ও পুরুরের শারীরিক মানসিক প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অতি শৈশব হইতেই অল্প অল্প বুঝিতে পারা যায় এবং যৌবন বয়সে এই বিভিন্নতা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়। এই বিভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে। বাল্যাবস্থায় পুরুষজাতির অণ্ডচ্ছেদন করিলে উহাদিগের আকৃতি এবং মন কতকপরিমাণে স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া যায় এবং স্ত্রীলোকের ওভেরিদ্বয় (ডিম্বকোষ) ছেদন করিলে উহাদিগের আকৃতি এবং মানসিকভাব অনেক পরিমাণে পুরুষের ন্যায় হইয়া উঠে। সংসারে কতগুলি ব্যক্তি আছে উহারা হিজরা নামে অভিহিত। ইহারা উভয়লিঙ্গ (কতক স্ত্রী, কতক পুরুষ) ইহাদিগের আকার ও প্রকৃতি স্ত্রী ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী হয়।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

খাদ্য।

ডাক্তারীমতে লিখিত।

যাহা আমরা প্রতিদিন আহার করি, যদ্ব্যতীত আমাদিগের প্রাণধারণ হয় না, তাহাই আমাদিগের খাদ্য। মনুষ্যের জীবন অগ্নির ন্যায়। যেমন অগ্নির সম্বন্ধে কাষ্ঠ সেইরূপ মনুষ্যের সম্বন্ধে খাদ্য। কাষ্ঠ বা দাহ্যপদার্থ ব্যতীত অগ্নি জ্বলে না, সেইরূপ আহার ব্যতীত মনুষ্য প্রাণধারণ করিতে পারে না। মানুষের প্রাণ ও অগ্নিতে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। অগ্নির যেমন উত্তাপ আছে, মনুষ্যের শরীরেও সেইরূপ উত্তাপ আছে। যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতি পুড়িয়া অগ্নির তাপ জন্মাইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের শরীরের ভিতরে খাদ্য দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই উত্তাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মানুষ জীবিত থাকে; উত্তাপ জুড়াইয়া গেলেই মানুষ মরিয়া যায়।

মানুষের শরীর প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া ক্ষয় হইয়া থাকে। আমরা পরিশ্রম করি বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকি প্রতিনিয়ত আমাদিগের শরীরের পরমাণু সকল ধ্বংস হইতেছে। তবে পরিশ্রম করিলে বেশী ধ্বংস হয় এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কম ধ্বংস হয় এই মাত্র বিভেদ। মনুষ্য বাষ্পীয় কলের ন্যায়। বাষ্পীয় কলে জল ও অগ্নি সংযোগে নিয়ত বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, সেই বাষ্পের জোরেই কল চলিতেছে। মনুষ্য স্থির হইয়া থাকিলেও কল চলা বন্ধ থাকে না। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনও আমাদিগের শরীর রূপ কল চলিতে থাকে। এ কলের আর বিশ্রাম নাই। সুতরাং প্রতিনিয়ত কল চালাইবার মাল মসলা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং খাদ্য গ্রহণ দ্বারা সেই মাল মসলার পূরণ করিতে হইতেছে। যেমন রেলওয়ে এঞ্জিন কল প্রতিনিয়ত জল ও কয়লা গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ আমরাও প্রতিনিয়ত জল ও কয়লা গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি। একজন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের ওজন যদি ৭৫ সের ধরা যায় তবে এই ব্যক্তির প্রতিদিন দেড়সের দুইসের করিয়া ভার কমিয়া যাইতেছে। অতএব এই মানুষটীর ওজন ঠিক রাখিতে গেলে ইহাকে প্রত্যহ দেড়সের বা দুইসের খাদ্য দ্রব্য আহার করা চাই। তারপর দেখ, মানুষের শরীরে সর্ব্বদাই উত্তাপ রহিয়াছে। আমরা যদি থারমমীটার নামক তাপমান যন্ত্রদ্বারা উত্তাপ পরীক্ষা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের শারীরিক উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রি। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, মানুষের উত্তাপ সেই ৯৮ ডিগ্রি। কি অত্যন্ত শীতপ্রধান কুমেরু ও সুমেরুদেশে, কি হিমালয় গরিশিখরে, কি নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপ মহাদেশে, কি আফ্রিকার বালুকাময় উত্তপ্ত মরুভূমিতে, মানুষ যেখানেই গিয়া বাস করুক্ তাহার শারীরিক উত্তাপ সেই ৯৮° ডিগ্রি। এই সমান দৈহিক উত্তাপ বজায় রাখিবার জন্য খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজন।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

যে আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না—কে শত্রু, কে মিত্র, তাহাও কখনো জানে না—সুস্থ থাকিলে হাসি এবং রোগ হইলে ক্রন্দন ভিন্ন যার আর কোনও সম্বল নাই, সেই স্নেহের পাত্র সকলের আশ্রিত সরলতাময় বালকের আরও কতিপয় রোগের কথা কহিতেছি।

মহাপদ্ম।

ইহা ত্রিদোষোদ্ভব প্রাণনাশক একপ্রকার পীড়কা। রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় দেখা যায় বলিয়া মহাপদ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পীড়া প্রথমতঃ মস্তকে প্রকাশিত হইয়া শঙ্খ দেশ দিয়া হৃদয় এবং তথা হইতে গুহ্যদ্বারে বিসর্পিত হয়। আবার ইহার বিপরীত ভাবেও প্রকাশ পাইতে পারে (অর্থাৎ প্রথমে গুহ্যদেশ হইতে উল্লিখিত স্থান প্রভৃতিতে।) কেহ কেহ ইহাকে বালবিসর্পও কহিয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—মহাপদ্ম রোগে দোষশান্তির জন্য পল্‌তা, নিম, দারুহরিদ্রা, কটকী, যষ্টিমধু এবং বলালতা ইহাদিগের কাথ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিস্‌মিস্, ক্ষেৎপাঁপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ এবং দুরালভা এই সমুদায় কুট্টিত করিয়া এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন প্রাতঃকালে তাহা ছাকিয়া পান করাইবে। ঘৃত ও মধুর সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র উপকার হয়। এক প্রলেপের উপর আবার প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব প্রলেপ পরিষ্কার করিয়া আবার দিতে হইবে। যদি পীড়িত স্থান পাকিয়া ক্ষত হয়, তাহা হইলে দূর্ব্বার স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা পটী দিবে।

তালুকণ্টক।

বিকৃত কফ সঞ্চিত হইলে শিশুদিগের তালুমাংসে এই পীড়ার উৎপত্তি

হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক বসিয়া যায়। শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না, বহুকষ্টে পান করিলেও তাহা বমন হইয়া পড়িয়া যায়। তরলভেদ, তৃষ্ণা এবং কণ্ঠ, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—হরীতকী, বচ ও কুড় এই সমুদায় একত্রে বাঁটিয়া মধু ও স্তনদুগ্ধের সহিত পান করাইলে শিশুর তালুপাত নিবারণ হয়। আমেরকুই, জারিত লৌহ, গেরিমাটি, মধু ও রসোত একত্রিত করিয়া সেবন করাইবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র একত্রে বাঁটিয়া মধুর সহিত তালুতে প্রলেপ দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

কুকূণক।

ইহা এক প্রকার চক্ষু রোগ। বিকৃত স্তন্যপান করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষে বেদনা, কণ্ডু ও উহা হইতে অবিরত স্রাব নির্গত হয়। শিশু সর্ব্বদা কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে এবং সূর্য্যকিরণ দর্শন বা চক্ষের পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

চিকিৎসা।—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লোধ, পুনর্নবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল জলে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে কুকূণক রোগের শান্তি হয়। দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরীমাটি, ছাগ-দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। মনছাল, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষের পীড়া উপশমিত হয়।

অজগল্লী।

ইহা মুগের ন্যায় স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গ্রথিত ও বেদনাশূন্য এক প্রকার পীড়কা। বয়োধিকাবস্থায় কখনো এই পীড়া হয় না।

চিকিৎসা।—এই রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহা বিদীর্ণ করিবে। বাসক মূল ও রাখালশশার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

অহিপূতন।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া বা সর্ব্বদা মলমূত্র লাগিয়া শিশুদিগের মলদ্বার নিরন্তর অপরিষ্কৃত থাকিলে উহাতে রক্ত কফোদ্ভব এক প্রকার কণ্ডু জন্মে। সেই কণ্ডু চুলকাইয়া দিলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষত সমূহ একত্রে মিলিত হইয়া যায়। এই পীড়াকে অহিপূতন কহে।

চিকিৎসা।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও খদিরের কাথদ্বারা বারম্বার ক্ষত ধৌত করিলে শীঘ্র পীড়ার শান্তি হয়। করঞ্জবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তিক্তদ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিবে।

ক্ষীরছর্দ্দি।

স্তন্যপান করিবামাত্রেই যদি বমি হইয়া তাহা পড়িয়া যায় তবে, তাহাকে ক্ষীরছর্দ্দি কহে। আবার গব্যদুগ্ধ পান করিলেও এরূপ হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে দুধতোলা কহে। এই পীড়ায় অনিষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস পান করাইলে দুগ্ধবমন নিবারিত হয় অথবা পঞ্চকোলের অবলেহ দ্বারাও পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া ৪।৫ বিন্দু মাত্রায় চূণের জল সেবন করাইলে দুধ তোলা নিবারণ হয়। আমেরকুই, খই এবং সৈন্ধবলবণ, এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে। উদরের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। পিপুল ও মরিচ চূর্ণ, চিনি মধু ও ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

জ্বর।

বালকদিগের যে কোন পীড়াই কেন না হউক, তাহার সঙ্গে কিছু না কিছু জ্বর সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। আবার সেই জ্বর অন্য কোন পীড়ার উপসর্গ না হইয়া যদি স্বতন্ত্ররূপে আক্রমণ করে, তবে তাহা প্রায়ই গুরুতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। দুগ্ধজীবী শিশুদিগের অন্যান্য দোষ অপেক্ষা বাতশ্লেষ্মা স্বভাবতঃই একটু প্রবল, আবার তাহাতে ক্রিমিদোষও কাহারো

কাহারো বিদ্যমান থাকে, তাহাতেই এরূপ হয়। শিশুদিগের জ্বর হইলে সাধারণতঃ শ্বাস, কাস, শরীরের উত্তাপ ও বমিপ্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। জ্বরের বেগ যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তবে সেই জ্বর পরিত্যাগ হইবার সময় কোন কোন শিশুর মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণায়মান বা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, অঙ্গসমূহ নিস্পন্দ হইয়া দুর্ব্বলের ন্যায় ঢলিয়া পড়ে বা অঙ্গ বিশেষের খেঁচুণী আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া আইসে এবং মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য (নীলবর্ণত্ব) ঘটিয়া উঠে। সামান্য ভাষায় ইহাকে জ্বরচোমক কহে।*

চিকিৎসা।—দুগ্ধজীবী শিশুরপক্ষে লঙ্ঘনাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সমস্তই নিষেধ করা যাইতে পারে কিন্তু কখনও স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না। স্তন্যদায়িনীকেই অনেকস্থলে উপবাসাদি নিয়মের অধীন হইয়া ঔষধ সেবন করিতে হয়। স্তন্য দূষিত হইলে প্রথমে তাহাই সংশোধন করিয়া লইবে। স্তন্যশোধক ঔষধাদির বিষয় স্তনরোগাধিকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মুথা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, এই সমুদায়ের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শিশুকে পান করাইবে। শিশু ঔষধসেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলে ঔষধীর কল্ক স্তন্যদায়িনীর স্তনে লেপন করিয়া দিবে। সেই স্তন্য পান করিলেও বালকের উপকার হইতে পারে।

মৌরী, পিপুল, রসোত, খৈচূর্ণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বমি, কাস ও জ্বর নিবারণ হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা, আতইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া অথবা কেবল আতইচ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

নাটার বীজ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎপরিমিত মরিচ চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। কিঞ্চিৎ মধু বা স্তন্যদুগ্ধের সহিত ইহার অর্দ্ধরতি করিয়া দিনের মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করাইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে দীর্ঘকালোত্থিত শ্বাস কাসও উপদ্রব সহিত প্রবল জ্বর উপশমিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে রসাদিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বালরোগান্তকরস ও রামেশ্বররস শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের বলা-

* ডাক্তার গণ ইহাকে Convulsion of the Infant কহেন।

বল বিবেচনা করিয়া দিনের মধ্যে ২।৩ বা ৪টী বটী চারি বারে সেবন করান যাইতে পারে।০ অনুপান পিপুল বা মরিচ চূর্ণের সহিত মধু অথবা শুদ্ধ মধু বা স্তনদুগ্ধ।

বালরোগান্তকরস।—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, প্রত্যেকে ॥০ তোলা, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা, একত্রে উত্তমরূপ কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কৈশরাজ, ভীমরাজ এবং নিসিন্দার স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপাকার বটী প্রস্তুত করিবে। শ্বাসকাসাদি উপদ্রব না থাকিলে ইহা প্রশস্ত।

রামেশ্বররস।—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে এক তোলা পূর্ব্ববৎ কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিশিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়া, সালিঞ্চা, থানকুলি (থুলকুড়ি) ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া মরিচ ॥০ তোলা এবং শ্বেত অপরাজিতা ফুলের মূল ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং সর্ষপের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইবে। শ্বাস কাস ও হিক্কাসংযুক্ত প্রবল জ্বরে বালকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এতদ্ভিন্ন সাধারণ জ্বরাধিকারে যে সকল ঔষধের কথা উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যেও বিবেচনা করিয়া কোন কোন মৃদুবীর্য্য ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ—

উমারপুর
পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

পর্পটী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পর্পটী প্রয়োগে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। প্রথমতঃ—পর্পটী সুধাতুল্য ঔষধ হইলেও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহা অতিশয় গুরুপাক ঔষধ। সুতরাং পর্পটীপ্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর পাকযন্ত্রের বলাবল পরীক্ষা করিয়া লইবে। পর্পটী জীর্ণ হইলে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে;

জীর্ণ না হইলে উদরের গুরুতা এবং আধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করাইয়া বিশেষ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। পর্পটী-সাধ্যপ্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে যদি অম্লপিত্তের যোগ থাকে, তাহা হইলে পর্পটী ব্যবহারে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা করা বৃথা। তাদৃশস্থানে অম্লপিত্তের শান্তি না করিয়া পর্পটী ব্যবস্থা করিবে না, করিলেও ঔষধ জীর্ণ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—রোগবিশেষে রোগীদেহে কখন কখন এরূপ একপ্রকার বিষ অন্তরুৎসিক্ত হইয়া উঠে, যৎপ্রভাবে প্রকুপিত পিত্ত ভূয়োপি সংদূষিত হইয়া শরীরে পচনক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করে; সূতিকারোগবিশেষে প্রসূতিদেহে এরূপ বিষের সঞ্চার অনুমিত হয়। কুষ্ঠবিশেষ, মধুমেহ, দুষ্টব্রণ এবং কয়েকটী কদর্য্য রোগে রোগীর শরীরে এই পচনপ্রবর্ত্তকবিষ বিদ্যমান থাকে। সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি পর্পটীসাধ্য পীড়ায় দেহে পচনপ্রবর্ত্তকবিষ বিদ্যমান থাকা অনুমিত হইলে পর্পটী ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হইবে। নিঃসৃত মলের সহিত উক্ত বিষের কিছু কিছু অংশ বিসৃষ্ট হওয়াতে পচন প্রবণতা কিয়ৎপরিমাণে সংযত থাকে। এরূপ অবস্থায় পর্পটী প্রয়োগে সহসা মলনিঃসরণের অল্পতা ঘটাইয়া দিলে দেহে উক্ত বিষ অবরুদ্ধ হইয়া অনর্থপাত করিতে পারে। এবম্ভূত স্থলে অগ্রে পচনপ্রবর্ত্তকবিষের সংশোধন করিয়া পর্পটী প্রয়োগ করিবে।

আর একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের দৈহিকদূষিতপদার্থ অপানপথে প্রশ্বাসযোগে এবং রোমকূপদ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। যদি সুদীর্ঘকাল শরীরে গ্রহণ্যাদি পীড়া ভোগ করে, তাহা হইলে কখন কখন ত্বকের এবং ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার লাঘবতা ঘটে সুতরাং রোমকূপদ্বারা এবং প্রশ্বাস যোগে দূষিতপদার্থ যথোচিতভাবে নিঃসৃত হয় না। তত্তৎস্থলে অপানপথেই দূষিতপদার্থ অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। যেস্থলে এরূপ ঘটে, সে স্থানে ত্বকের ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ না করিয়া এবং ফুস্‌ফুসের বলাধান না জন্মাইয়া পর্পটী প্রয়োগ করিবে না। পর্পটীপ্রয়োগফলে মলনিঃসরণ সংযমিত হইবে; পুনঃ পুনঃ মলনিঃসরণের সঙ্গে দৈহিক দূষিতপদার্থ যাহা নিঃসৃত হইত, তাহা হইবে না, এদিকে রোমকূপ ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াও অপ্রকৃতিস্থ সুতরাং দুষ্টপদার্থ দেহে সঞ্চিত হইয়া শিরোধিকার, অক্ষিপীড়া প্রভৃতি নানা বিকার উৎপাদন করিতে পারে।

দিবসের প্রথমভাগে প্রহরার্দ্ধাভ্যন্তরে পর্পটী সেবন করা বিহিত। পর্পটীর মাত্রা—প্রথম দিবসে ২ রতি, পরে প্রতিদিন এক এক রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। নবম দিবসে দশগুঞ্জাপরিমিত পর্পটী সেবন করা হইলে, আর মাত্রা বৃদ্ধি করিবে না। যে পীড়া প্রতিকারের জন্য পর্পটী সেবন করা হইতেছে, যদি এই নয় দিনে তাহার আরোগ্যদর্শন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দশম দিন হইতে প্রতিদিন এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সপ্তদশ দিবসে দুইরতি মাত্রায় নামাইয়া ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। মহামতি চক্রপাণিদত্ত দ্বাদশগুঞ্জনপরিমাণপর্য্যন্ত রসপর্পটী সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তদনুসারে বৃদ্ধিহ্রাস ক্রমপর্য্যায়ে পর্পটী সেবনের নিয়মিতকাল একবিংশতি দিবস। কিন্তু যদি নবম কি একাদশ দিবসে পীড়ার আরোগ্য দর্শন না হয়, তাহা হইলে আরোগ্যদর্শন যাবৎ দশ কি দ্বাদশ রক্তিক মাত্রায় প্রত্যহ পর্পটী সেবন করিতে হইবে। আরোগ্য দেখা দিলে দিন দিন এক এক রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিয়া আনিবে। ক্রমশঃ—

মাগুরা বারুইপাড়া, } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগবিধি।

জ্বরে ঘৃতপ্রয়োগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ঘৃত সেবন কালীন কিরূপ পথ্যাপথ্য কর্ত্তব্য, এখন তাহা বলা যাইতেছে। আচার্য্য বাগভট বলেন, ঘৃত সেবনকালীন মাংসরসাশন ভোজন কর্ত্তব্য। ইহা দোষনাশক এবং অতিশয় বলকারক। (১৬) মহাত্মা বিশ্বনাথ বলেন,—এণ, কুরঙ্গ, হরিণ (তাম্রবর্ণ হরিণ) ময়ূর, লাব (লাবুইপাখি) শশ (খরগস্) তিত্তিরি (তিতুইপাখি) কুক্কুট (কুঁকড়া) ক্রৌঞ্চ (বকপাখি বিশেষ) কুলিঙ্গ (কিঙ্গাপাখি) পৃষত, চকোর, কপিঞ্জল, বর্ত্তক (ভারুইপাখি) কালপুচ্ছ প্রভৃতির মাংসরস জীর্ণ জ্বরিতের পক্ষে হিত

(১৬) জীর্ণে ঘৃতে চ ভুঞ্জীত মৃদু মাংস রসৌদনম্।
বলং হলং দোষহরং পরং তচ্চ বলপ্রদম্॥
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

কারক (১৭)। খরনাদ বলেন, তিত্তিরি, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, বর্ত্তক এবং কুক্কুট,—এই সমস্ত পার্থীর মাংস স্বভাবতই গুরু ও উষ্ণ গুণবিশিষ্ট, এজন্য জ্বরে প্রয়োগ করিলে জ্বরের উপদ্রবাদির বৃদ্ধি হইতে পারে। অতএব বর্জ্জনীয়। (১৮)। সংস্কারবশতঃ গুরু দ্রব্যও লঘু এবং লঘু দ্রব্যও গুরু হইয়া থাকে। এজন্য মহামতি চক্রপাণি দত্ত বলেন, কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, ক্রৌঞ্চ, ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বরে আহারার্থ ব্যবস্থা প্রদান করেন না কিন্তু লঙ্ঘনপ্রযুক্ত যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যথোচিত মাত্রায় সংস্কার পূর্ব্বক ঐ সমুদয় মাংসও যথাকালে প্রদান করিবে। (১৯) এরূপ সংস্কার আবশ্যক, যাহাতে গুরুলঘু; উষ্ণ, শীত গুণবিশিষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা মাংস আহার না করেন, তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণমৎস্য মধ্যে কবজি (কই), শৃঙ্গী, মৎগুর, শকুল, বর্ম্মি (বাইন) ও ক্ষুদ্র রোহিত (রোহিত শাবক) চিঙ্গড়ী প্রভৃতি মৎস্য হিতকারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র মৎস্য প্রদান করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন।

পুরাণজ্বরীর পথ্যাপথ্য সমুদয় ঘৃতসেবন কালীন প্রতিপালনীয়, এজন্য বিস্তৃত উক্ত হইল না। ঘৃত সেবনকালীন আনুষঙ্গিক চিকিৎসা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পুরাণজ্বরে শরীরের গুরুত্ব, মস্তকবেদনা এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ববিষয়গ্রহণে

(১৭) এণঃ কুরঙ্গো হরিণৌ ময়ূরঃ লাবঃ শশস্তিত্তিরি কুক্কুটৌ চ।
ক্রৌঞ্চ কুলিঙ্গঃ পৃষতশ্চকোর কপিঞ্জলো বর্ত্তকা কালপুচ্ছৌ॥
* * * পুরাণজ্বরিণা হিতায়।
পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়ঃ॥

(১৮) জ্বরিতৈস্তিত্তিরি ক্রৌঞ্চ শিখিবর্ত্তককুক্কুটাঃ।
গুরুষ্ণত্বাৎ বিবর্য্যোঃ স্যুরত্রসোপদ্রবে জ্বরে॥
খরনাদঃ।

(১৯) কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরং ক্রৌঞ্চ বর্ত্তকান্।
গুরূষ্ণত্বান্নশংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ॥
লঙ্ঘণেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্ মাত্রা বিকলাজ্ঞো দদ্যাত্তানপি কালবিৎ॥
চক্রপাণিঃ।

অসমর্থ হইলে তৃপ্তিকর শিরোবিরেচন (নস্য) প্রদান করিবে। (২০) মলবদ্ধ-জনিত উদরের গুরুত্ব, সশব্দে গর্জ্জন বিবদ্ধ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে জ্বরনাশক রেচক ঔষধদ্বারা বিরেচন করাইবে। মলবদ্ধ থাকিলে শতসহস্র ঔষধে ফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এজন্য পুরাণজ্বরে বিরেচনের উপযুক্ত ব্যক্তিকে কখনই সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিরেচন প্রদান করিতে উপেক্ষা করেন না। পরন্তু জ্বরদ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে বমন বিরেচন হিতকারক নয়; এমতাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধপান করাইয়া অর্থাৎ এমতভাবে দুগ্ধপান করাইবে, যাহাতে কোনপ্রকার বিকার না জন্মাইয়া মল পরিষ্কার হইয়া যায়। অথবা নিরূহণ অর্থাৎ কষায়াদিদ্বারা পিচকারী প্রদান করিয়া মলনিঃসারণ করাইবে। (২১) দোষ পক্বাশয়গত হইলে চরকসংহিতার সিদ্ধিস্থানোক্ত জ্বরঘ্ননিরূহণ (কষায়াদিদ্বারা পিচকারী) এবং অনুবাসন (স্নেহদ্রব্যদ্বারা পিচকারী) প্রদান করিবে। (২২) ইহাতে সত্বর জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের।

দ্রবদ্রব্য যথা,—জল ১৬ ষোলসের।

কল্কদ্রব্য যথা,—পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা বেণারমূল, কটুকী, ইন্দ্রযব, ভূম্যামলকী, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, (কিস্‌মিস্) আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর, কণ্টকারি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা

(২০) গৌরবে শিরশঃ শূলে বিবদ্ধেষ্বিন্দ্রিয়েষু চ।
জীর্ণ জ্বরে রুচিকরং দদ্যাৎ শীর্ষ বিরেচনম্॥
চক্রপাণিঃ।

(২১) জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনম্।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্ব্বা হরেন্মলান্॥
চরকসংহিতা।

(২২) প্রয়োজ্যয়েজ্জ্বরহরান্ নিরূহান্ সানুবাসনান্।
পক্বাশয়গতদোষে বক্ষ্যন্তে যে চ সিদ্ধিষু॥
চক্রপাণিঃ।

গ্রহণ করিয়া ; পাষাণপাত্রে পেষণ করিয়া লইবে। তাহা হইলেই কল্কদ্রব্য প্রস্তুত হইল।

প্রথমতঃ উক্ত ৪ চারিসের ঘৃত, পাকপাত্র সহ চুল্লিতে উঠাইয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে জ্বাল দিবে ; যখন দেখিবে ঘৃত নিষ্ফেণ হইয়াছে, তখন চুল্লি হইতে পাকপাত্র নামাইয়া রাখিবে। যখন দেখিবে ঘৃত শীতল হইয়াছে, তখন উল্লিখিত পেষিত কল্কদ্রব্য গুলি এবং দ্রবদ্রব্য পাকপাত্রে প্রদান করিয়া যথাবিধানে পাককার্য্য সম্পূর্ণ করিবে। কিরূপে পাক করিতে হইবে এবং কিরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলে পাক সিদ্ধ হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। এজন্য পুনর্ব্বার উক্ত হইল না।

পরন্তু মহামতি চক্রপাণিদত্ত বলেন,—এই পিপ্পলাদ্য ঘৃত কোন কোন তন্ত্রে দুগ্ধের সহিত পাক করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। একারণ বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন চিকিৎসক চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ ষোলসের দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া থাকেন। অতএব কল্কদ্রব্যগুলি ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া, পরে উক্ত পক্ক ঘৃতের সহিত ১৬ সের দুগ্ধ পুনরায় পাক করিবে। দুগ্ধ উত্তমরূপে ক্ষীর করিয়া ছাকিয়া লইবে। তাহা হইলেই দ্বিতীয় মতের ঘৃত পাক হইল। এস্থলে উভয় মতই লিখিত হইল, যাঁহার বিবেচনায় যেমত উৎকৃষ্ট বোধহয়, তিনি সেই মতেই পাক করিয়া লইতে পারেন। *

ইহার গুণ,—জীর্ণজ্বর, কাস, পার্শ্বশূল, হলীমক, বিষমাগ্নি প্রভৃতি নিবারক এবং অগ্নি-সন্দীপক ও বলবর্ণকারক।

ইহার মাত্রা,—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সবল, দুর্ব্বল প্রভৃতি পাত্র বিভেদে এবং অগ্নি ও ধাতুভেদে মাত্রার নিয়তই ন্যূনাধিক হয়। মাত্রার বিষয় অতি বিস্তৃত, সুতরাং প্রবন্ধান্তর ভিন্ন এপ্রবন্ধে মাত্রার বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে না। ফলতঃ অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বতোভাবে, কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় চিরনির্দ্ধারিত মাত্রা, স্থিরীকৃত হওয়া অসম্ভব। অতএব ঔষধের

* সুশ্রুত এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ে এই পিপ্পলাদ্য ঘৃত উক্ত হইয়াছে, তাহাতে দুগ্ধের কোন উল্লেখ নাই এবং টীকাকারও উল্লেখ করেন নাই। অপিচ সুশ্রুতে কল্কদ্রব্য মধ্যে শুঁঠ ও চিত্রক এই দুই দ্রব্য অতিরিক্ত পচিত হওয়ায় কোন কোন সংগ্রন্থকার বৃহৎ পিপ্পলাদ্য ঘৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মাত্রা সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। এই পিপ্পলাদ্য ঘৃত, রোগীর দোষ, অগ্নিবলাদি অনুসারে ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুই তোলা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রমশঃ—

চৌরিয়া. কুমরুলপোষ্ট, পাবনা। } শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

জ্বরে তৈলপ্রয়োগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর)।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্বররোগে জ্বরভৈরব বা কিরাতাদি তৈলসমূহের প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী বলিবার পূর্ব্বে আমার নিজের কতকগুলি অন্তরের কথা বলিবার আছে। আবার গতবারে আমার প্রবন্ধশেষে দেখিলাম যে, সম্মিলনী-সম্পাদক মহাশয়ও আমার অন্তরের কথা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা জানাইয়াছেন, সুতরাং সেই কথাই আগে বলি—চরক, চক্রদত্ত বা রসেন্দ্রসারসংগ্রহাদি নূতন পুরাতন যে কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই জ্বরচিকিৎসার জন্য তৈল, ঘৃত, পাচন ও বটীকা প্রভৃতি সমধিক উপকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেবল গ্রন্থেই যে উক্ত আছে, তাহা নহে, এমন অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ রোগীর মুখে শুনিতে পাই যে, যখন তাঁহারা নানাবিধ ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধ যথারীতি দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়াও কোনমতেই জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তখনই মৃত মহাত্মা রমানাথ কবিরাজের ব্যবস্থিত তৈলপ্রয়োগে ২।৪ দিনের মধ্যেই জ্বরের সম্যক্‌শান্তি এবং শরীর গ্লানিরহিত ও বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। আবার এমনও শুনিতে পাই এবং তাহাতে বিশ্বাসও করি যে, ঘোরতর জ্বরবিকারের সময় রোগীর যখন শরীর একবারে ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখন কোনরূপ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াও খাঁটী সর্ষপতৈল মর্দ্দন ও তদুপরি স্বেদ প্রয়োগদ্বারা অচিরাৎই রোগীর দেহের শৈত্য দূর হইয়া উষ্ণতার ও জীবনীশক্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই বলিতেছি যে, নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জরশান্তির জন্যই যখন তৈলপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে এবং কার্য্যতঃও শুভফল ঘটে, তখন জ্বরশান্তির জন্য তৈল

রূপ মহৌষধ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক কবিরাজ মহোদয়গণ কিজন্য কি উদ্দেশ্যে জ্বরে কেবল পাচন বা বটীকাপ্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াই নিশ্চিত থাকেন? যথার্থই বলিতেছি যে, এই টুকুই আমার অন্তরের কথা, আর এই কথাটুকুর মীমাংসা অগ্রে করিয়া পরে উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিব বলিয়াই আমার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া বেশ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে যাইয়া এখন বুঝিলাম—আমার ইহা আকাঙ্ক্ষা নহে, তবে অবশ্য ভয়ানক দুরাকাঙ্ক্ষা। কেন যে দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহা বলি।—যে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঋষি-প্রণীত ও জীবনের প্রকৃতবন্ধু আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রকৃত গুণগরিমাকে পদদলিত করিয়া পদে পদে কথায় কথায় ভিন্ন দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর প্রসাদ ভিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন—যে দেশের যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী গুণিগুণ স্বজন ও স্বদেশীয় কর্ত্তৃক গুণগ্রহণের অভাবে অন্ন-বস্ত্র হীন হইয়া কায়ক্লেশে চক্ষু-জল ফেলিতে ফেলিতে দিনযাপন করিতেছেন—অধিক কি, যে দেশে বিদেশীয় ও বিধর্ম্মীর অনুকরণই জীবনের সারধর্ম্ম; আর সামান্য পরিধেয় বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন রক্ষক অন্ন বা ঔষধাদি স্বদেশীয় ও স্বজনের যাহা কিছু, তৎসমুদায়ের প্রতি ঘৃণা করাই মোক্ষধর্ম্ম; সেই হতভাগ্য ভারতবর্ষে যে ভগবানের কৃপায় এখনও বৈদ্য-চিকিৎসার কিঞ্চিৎমাত্রও অস্তিত্ব বজায় আছে, ইহাই যথেষ্ট সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। ইহার উপর আবার কবিরাজগণ জ্বরশান্তির জন্য তৈলপ্রয়োগ করেন কি না, অথবা জ্বরে তৈলপ্রয়োগে উপকারের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ত অতিতুচ্ছ কথা! কেমন এরূপ দেশে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল সমাজে লেডীডফরিন্ ফণ্ড প্রভৃতি অতি গুরুতর অভাবের কথা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় নিরেট-কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত বদ্দি মহাশয় জ্বররোগে একটু তৈল ব্যবহার করেন কিনা, এই অতি তুচ্ছানুতুচ্ছ কথাটার খবর লইতে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত কি? বোধ হয় এক জনও সঙ্গত বলিতে সাহস করিবেন না। সঙ্গত নয় দেখিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া প্রাণের অতি মহান্ আকাঙ্ক্ষাকে দুরাকাঙ্ক্ষার মধ্যে গণ্য করিয়াছি। সুতরাং এ তুচ্ছ কথার সম্বন্ধে আর কিছু না বলাই ভাল।

কিন্তু এ পোড়া প্রাণ যে কোন মতেই বোঝে না, তাই প্রাণের সুগভীর ক্রন্দনে আবার বলিতেছি যে,—যে সমস্ত রুক্ষধাতুর লোক বহুকাল হইতে

জীর্ণজ্বর ভোগ করিয়া ক্রমাগত পর পর শত সহস্র এলোপ্যাথ বা হোমিও-প্যাথ ডাক্তার কিংবা কবিরাজকে উদরসাৎ করিয়াও জ্বরের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই,—আমার বিশ্বাস যে, সেই সেই স্থানে হয়ত সপ্তাহকাল পূর্ব্বোক্ত তৈল মর্দ্দনেই তদপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, যে বাতপিত্তাধিক জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে যে কোন শাস্ত্রের সেবনীয় যে কোন ঔষধই গলাধঃকরণ করিলে গরম হইয়া উপকারের পরিবর্ত্তে হয়ত গা বমি বমি প্রভৃতি অশেষবিধ অপকার দর্শিয়া থাকে, বৈদ্যশাস্ত্রীয় জ্বরাধিকারোক্ত তৈল মর্দ্দনে তাহা যে ২।১ দিনেই নিবৃত্তি পাইতে পারে, একথায় কি কাহারও বিশ্বাসস্থাপন করিতে ভরসা হয়? অথবা আর অনর্থক অরণ্যে রোদন করিয়া কি করিব? কেননা এখনই সম্মিলনীর গ্রাহকের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন যে, ঘরের পয়সা দিয়া বাপু এসব্ ফাজিল কথা শুনিতে চাহি না। তা না শোনেন,—ভাল না লাগে, তবে চুপ্ করিলাম এবং আসল কথাই বলি,—কিন্তু বার বার বলিয়া রাখিলাম যে, যে জীর্ণ জ্বরের সহিত কফের বা রসধাতুর বিশেষ সংস্রব না থাকে, সেই সেই স্থলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল সকল নিশ্চয়ই ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কাজ করিবেই করিবে। কেননা এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাইয়াই সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, এই উষ্ণপ্রধান ভারতবাসীর জীর্ণজ্বরশান্তির জন্য বলিয়া গিয়াছেন—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শিতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরে।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে॥

অর্থাৎ কবিরাজগণ জীর্ণ (পুরাতন) জ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদিমর্দ্দন), প্রদেহ (রক্তচন্দনাদি দ্বারা প্রলেপ) স্নেহপান (ঘৃত বা তৈলপান) ও স্নানাদি, স্থান বিশেষে শীতল ও স্থান বিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। যেহেতু এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য পথ্যস্থিত জ্বর শীঘ্র শীঘ্র উপশমিত হইয়া শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাসা এই যে, জ্বররোগে তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নানাদি ক্রিয়া যদি

যথার্থ এতই উপকারী বলিয়া বোধ হয়, তবে কবিরাজ মহাশয়গণ জীর্ণজ্বরে এক পাচন বা বড়ী ঔষধের প্রতিই সম্যক্ নির্ভর করিয়া গরিব রোগীকে রোগযন্ত্রণাভোগ করান কেন? অথবা একথা আজ্ এই পর্য্যন্ত। অগামীবারে তৈলপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী বলিতে ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ—

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লেখক নিজে প্রশ্ন তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের অন্তরের কথা ঠিক্ই বলিয়াছেন। সুতরাং আমাদের এসম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই।

চি, স, ক, স,

সংশয়-অপনয়ন।

বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের চিকিৎসা-সম্মিলনীতে আমাদিগের সম্মিলনীর সুযোগ্য লেখক কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মৈত্রেয় মহাশয় ডাক্তারিমতে তাপমানযন্ত্র (Thermometer) দ্বারা কিপ্রকারে জ্বর পরীক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্মিলনীর সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোনও পাঠক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না দেখিয়া আমরাই তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিতে অগ্রসর হইলাম।

কবিরাজ মহাশয়ের প্রশ্ন এই যে, থার্মমিটার দ্বারা কিরূপে জ্বর পরীক্ষিত হয় এবং উহা দ্বারা জ্বরের সাধ্যাসাধ্য নির্ণীত হইতে পারে, না কেবল শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষার জন্যই উক্ত যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে?

একথার উত্তরে প্রথম বলা আবশ্যক যে, জ্বর পরীক্ষায় ডাক্তার ও কবিরাজদিগের সমান অধিকার নাই। এস্থলে কবিরাজ মহাশয়েরা এমন বিবেচনা না করেন যে, জ্বর পরীক্ষায় তাঁহারা ডাক্তারদিগের ন্যায় পারদর্শী নহেন। এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ডাক্তারি ও কবিরাজী চিকিৎসায় অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও রোগ নিদান ও ঔষধপ্রয়োগ প্রণালীতে অনেক বিভিন্নতা আছে। এবং এই বিভিন্নতা থাকার জন্যই কবিরাজী ও ডাক্তারি দুইটী স্বতন্ত্র চিকিৎসা-প্রণালী হইয়াছে; নচেৎ সকল বিষয়ে দুই চিকিৎসা প্রণালী মিলিয়া গেলে ডাক্তারি চিকিৎসা ও কবিরাজীমতে

চিকিৎসা বলিয়া একটা পার্থক্য থাকিত না এবং ডাক্তার কবিরাজ সকলেই সমান হইতেন।

কবিরাজী ও ডাক্তারি চিকিৎসায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কবিরাজ মহাশরেরা বায়ু পিত্ত কফকেই সকল রোগের নিদান বলিয়া ঐ বায়ু পিত্ত কফনাশক ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন। জ্বর চিকিৎসাতেও তাঁহারা পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মাজ্বর প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া জ্বর বিশেষে পিত্তনাশক, শ্লেষ্মানাশক প্রভৃতি পাঁচন ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ডাক্তারগণ যদিও বায়ু, পিত্ত, কফের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাদিগকে তাঁহারা জ্বরের নিদান না বলিয়া তাঁহারা জ্বারোৎপত্তির অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। এস্থলে কারণ বলিতে শরীরের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইবেক। জ্বরের বাহ্যিক কারণ সম্বন্ধে কবিরাজী ও ডাক্তারি দুই মতেই মিল আছে। যথা বিরুদ্ধ ভোজন, শীতাতপ ভোগ, অত্যন্ত পরিশ্রম প্রভৃতি জ্বরের বাহ্যিক কারণ কবিরাজ ও ডাক্তার উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। কবিরাজ বলেন এই সকল বাহ্যিক কারণ পরম্পরা আভ্যন্তরিক বায়ু, পিত্ত, কফকে বিকৃত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, আর ডাক্তার বলেন ঐ সকল কারণে শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক সংযোগ বিযোগ হইয়া দৈহিক উত্তাপ বা জ্বর উৎপন্ন করে। কিন্তু যিনি যেরূপ ব্যাখ্যাই করুন; ফল সেই একই দাঁড়ায়। যেমন যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পরিণামে সেই ঈশ্বরকেই পাওয়া যায়, সেইরূপ যে কোন শাস্ত্রীয় ও যুক্তি-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। পরন্তু অতি সূক্ষ্ম চক্ষে দেখিতে গেলে কবিরাজী বা ডাক্তারিমতে কোনই পার্থক্য নাই। কারণ পার্থক্য থাকিলে ফল সেই একই হইবে কেন? বিজ্ঞান কখনও ভিন্ন হইতে পারে না। তবে এ প্রস্তাবের সে সকল জটিল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবে না। মোটামুটী এই বলা যাইতে পারে যে, কবিরাজী ও ডাক্তারি দুইটী ভিন্ন মতের চিকিৎসা এবং কোনও কোনও বিষয়ে দুই মতের মিল থাকিলেও সকল বিষয়ে মিল নাই।

কবিরাজী ও ডাক্তারীমতে কোন কোন বিষয়ে মিল আছে বা না আছে, তাহা মাঝে মাঝে আলোচনা করাও চিকিৎসা-সম্মিলনীর একটী উদ্দেশ্য। চিকিৎসা-সম্মীলনীর একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কবিরাজগণ ডাক্তারী

চিকিৎসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে কোন কোন মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন এবং শারীরতত্ত্ব বিষয়ে কোন ত্রুটী থাকিলে প্রত্যহ বর্দ্ধনশীল ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে সে ভ্রমের অপনয়ন করেন। এবং ডাক্তারগণও কবিরাজী শাস্ত্র হইতে দেশীয় ঔষধ সকলের গুণ জ্ঞাত হইয়া ঐ সকল ঔষধ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়া এই দরিদ্র ভারতবাসীকে দুর্ম্মূল্য ইংরেজী চিকিৎসার দায় হইতে অব্যাহতি দেন। এই মহৎকার্য্য সাধন জন্য চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক ও লেখকদিগকে একবারেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব ও গোড়ামী-শূন্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মৈত্রেয় কবিরাজ মহাশয় সম্মিলনীর এক জন লেখক এবং আমাদিগের অনেক দিনের পরিচিত। তিনি গোঁড়ামী শূন্য হইয়া নিরপেক্ষভাবে সকল কথার বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

যেমন কবিরাজগণ পিত্তনাশক, বায়ুনাশক প্রভৃতি ঔষধ লইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, সেইরূপ ডাক্তারগণ ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্বর চিকিৎসায় ডাক্তারগণ এইরূপ ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক বিরেচক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বর বা উত্তাপের লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক প্রভৃতি ঔষধের নানা সংমিশ্রণে ডাক্তারদিগের জ্বর মিশ্র বা ফিবারমিক্‌চার প্রস্তুত হয়। ডাক্তারেরা শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিকেই জ্বর বলেন এবং এই উত্তাপ হ্রাস করাই তাঁহাদের চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্বে যখন থার্‌মমিটারের প্রচলন ছিল না, তখন ডাক্তারগণও কেবলমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এবং গাত্র স্পর্শ করিয়া শরীরের উত্তাপ জ্ঞাত হইতেন। কিন্তু তাহাতে সূক্ষ্মরূপে শরীরের উত্তাপ নির্ণীত হইত না। এজন্য ডাক্তারগণ অনেক ভাল ভাল প্রবল জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবহারে সংকুচিত হইতেন। কেবলমাত্র গা ও নাড়ী দেখিয়া জ্বর বুঝা গেলেও সকল সময়ে শরীরের উত্তাপ সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সেকালে মুনি ঋষিরা পারিতেন কিনা সে কথার বিচারে প্রয়োজন নাই। তবে এখনকার তপোবল-পরিশূন্য যোগসাধন-বিহীন ডাক্তার কবিরাজগণ মহা বহুদর্শী হইলেও সকল সময়ে জ্বরবেগ নির্ণয়ার্থে কেবলমাত্র নাড়ী ও গাত্রস্পর্শ দ্বারা নির্ভুল মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন

নাই ইহা স্থিরনিশ্চয়। গাত্রের উত্তাপ নির্ণয় করিতে হইলে হস্তই প্রধান-সাধন। কিন্তু হস্তের উত্তাপ ও শীতলতা অনুসারে আমাদিগের উত্তাপ-বোধ বিভিন্ন হইয়া থাকে। যথাঃ—যদি আমাদিগের হাতের তেলো বাহিরের শীতল বাতাসে অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়, তবে বস্ত্রাবৃত একজনের শরীর স্পর্শ করিলে স্বাভাবিক অপেক্ষা উষ্ণতর বলিয়া বোধ হইবে। আবার আমাদের হাত যদি বেশী গরম থাকে, তবে অপরের উষ্ণগাত্রে হস্তার্পণ করিলেও তত উষ্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। গরম জলে হাত ডুবাইয়া ঐ হাত শীতল জলে ডুবাইলে ঐ জল অত্যন্ত শীতল বলিয়া বোধ হইবে। গ্রীষ্মকালে খুব গরমদুগ্ধপান করিয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলপান করিলে দাঁত কন্ কন্ করিতে থাকে। এই গুলি সকলেই অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আবার নাড়ী পরীক্ষাদ্বারা জ্বরবেগ নির্ণয় করিতে হইলে নাড়ী, হস্তাঙ্গুলিতে উষ্ণ, পুষ্ট এবং চঞ্চল বোধহয় কিনা তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে নাড়ীর উষ্ণতা কেবলমাত্র হস্তাঙ্গুলিদ্বারা পরীক্ষা করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। কারণ সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণের জন্য চিকিৎসকদিগের স্পর্শজ্ঞান সুচারুরূপে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দৈহিক নানাবিধ কারণে এবং বাহ্যিক শীতোষ্ণাদি কারণে স্পর্শজ্ঞানের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। আবার উত্তাপ বাদ দিয়া কেবলমাত্র নাড়ীর চঞ্চলতা ও পুষ্টতার দ্বারা জ্বরপরীক্ষা করিতে গেলেও সময় সময় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। জ্বরব্যতীতও নানা কারণে নাড়ী চঞ্চল-গতিবিশিষ্ট বা পুষ্ট হইতে পারে। যথা, শরীর দুর্ব্বল হইলে নাড়ী অপেক্ষাকৃত চঞ্চল হয়। অজীর্ণ দোষ হইলে নাড়ী পুষ্ট বোধ-হয় ইত্যাদি। অতএব যদি উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই জ্বর বলা যায়, তবে সেই জ্বর কেবলমাত্র নাড়ী ও হস্তস্পর্শদ্বারা সকল সময়ে সূক্ষ্মরূপে জানিতে পারা যায় না। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে অনেক সময়েই সকল ডাক্তার কবিরাজকেই জ্বরপরীক্ষায় ঠকিতে হয় এবং লাঙ্গল মুষ্টিধরার দণ্ডবিধান সকলের উপরই সময় সময় খাটিয়া থাকে। কারণ আমাদের এই নশ্বর নরদেহ সর্ব্বদাই বাহ্যিক শীতোষ্ণাদির বশীভূত। সুতরাং কেবলমাত্র হস্তার্পণদ্বারা অধিক জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে পারিলেও সূক্ষ্মরূপে সকল জ্বর বুঝিতে পারা একবারেই অসম্ভব। এই থার্‌মমিটারের সৃষ্টি হইয়া অবধি সূক্ষ্মরূপে জ্বর জানিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব থার্‌মমিটারকে চিকিৎসা-

শাস্ত্রের একটী উন্নতি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এমন অনেক স্থূলকায় (শ্লেষ্মার ধাতুবিশিষ্ট) রোগী আছেন, যাঁহাদের জ্বরকালে গাত্রে বা নাড়ীতে হাত দিলে কিছুমাত্র উষ্ণতা বুঝিতে পারা যায় না, অথচ সে ব্যক্তি জ্বরের ন্যায় অসুস্থানুভব করিতেছে। এইস্থলে থার্মমিটারদ্বারা পরীক্ষা করিলেই জ্বর কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা গেল। যদি বগলে থার্মমিটার দিয়াও না বুঝা যায়, তবে মুখের অভ্যন্তরে থার্মমিটার দিলেই জ্বর থাকিলে অবশ্যই তাপমানযন্ত্রের পারা উঠিবে। উত্তাপদ্বারা যে নলের পারা ফাঁপিয়া উঠে, সে বিষয়ে বোধকরি কবিরাজ মহাশয় কোন সন্দেহ করিবেন না। এত উত্তাপে পারা এতদূর উঠে, এইটী জানা থাকিলে কেন সূক্ষ্মরূপে জ্বর জানা যাইবে না? পারা ধাতুর একটা মহৎ গুণ এই যে, উহা উত্তাপপ্রয়োগে বিস্তৃত হয় এবং শীতপ্রভাবে সংকুচিত হয়। সকল ভৌতিকপদার্থই শীতপ্রভাবে সংকুচিত এবং উষ্ণতার প্রভাবে বিস্তৃত হয়। কিন্তু পারা যেমন প্রত্যক্ষরূপে অল্পশীতোষ্ণপ্রভাবে সংকুচিত ও বিস্তৃত হয়, এমন অন্য কোন ধাতু হয় না। এজন্য কোন কৌশলে পারাকে কাঁচের নলে পুরিতে পারিলে ঐ নল সামান্য উত্তাপে ধরিলেই উহার পারা উঠিবে। এবং কতদূর পর্য্যন্ত পারা উঠিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইলেই উত্তাপের একটা স্থিরনিশ্চয় হইবে। এমন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ বিষয়কে কাল্পনিক বলা নিতান্তই ভুল। কবিরাজ মহাশয় বলেন "কেননা এমন অনেক রোগী নয়নগোচর হইয়া থাকে যে, তাহার শরীরে তাপমানযন্ত্র সংলগ্ন করিলে তন্নিহিত পারদ ১০৫। ৬ ডিগ্রী পর্য্যন্তও উৎক্ষিপ্ত হয়, অথচ সেও সেই দুরন্ত জ্বরের হস্ত হইতে ক্রমে আরোগ্যলাভ করে। আবার যাহার শরীরে কিছুমাত্র তাপ নাই, সুতরাং তাপমানযন্ত্রের পারদও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহাকেও কোনমতে বাঁচাইতে পারা যায় না।" একথার তাৎপর্য্য কি, ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যে ব্যক্তির জ্বর নাই সে কি মরে না? হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া ঘর্ম্ম হইয়া যাহার ধাত ছাড়িয়া গেল, তাহারও শরীরে কিছুমাত্র উত্তাপ নাই এবং সে রোগী কি মরিবে না? এবং দুরন্ত জ্বর (১০৬ ডিগ্রী) হইলে কি তাহাকে কঠিন জ্বর বলিব না এবং সেই উত্তাপের লাঘব করিবার চেষ্টা করিব না? পরন্তু বেশী জ্বর বুঝিবার জন্যই যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে এমন নহে। তাপমান যন্ত্রদ্বারা স্বাভাবিক উত্তাপের

অভাবও বুঝিতে পারা যায়। ইহা উত্তাপের মানদণ্ডমাত্র। যেমন উত্তাপ বৃদ্ধিও দোষের বলিয়া গণ্য, সেইরূপ স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব হইলেও রোগীকে সংশয়াপন্ন পীড়িত বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। কবিরাজ মহাশয় কি দেখেন নাই যে, একবারে ঘাম হইয়া ধাত বসিয়া গেলে ডাক্তারগণ নানাবিধ উত্তেজক এবং উষ্ণতাবৃদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর ধাত আনয়ন করেন? তবে এ সকল স্থলে কি তাপমানযন্ত্র বিশেষরূপে উপযোগী নহে? যেমন এত ডিগ্রির উপর উত্তাপ হইলে রোগ কঠিন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, সেইরূপ এত ডিগ্রির নীচে উত্তাপ নামিলেও রোগ কঠিন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কবিরাজী চিকিৎসা প্রণালীতে কতটুকু জ্বরজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কবিরাজ মহাশয়েরা নাড়ী ও গাত্রপরীক্ষাতেই প্রায় জানিতে পারেন। তাঁহাদের অত সূক্ষ্মরূপে জানিবার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু প্রত্যহ পরিবর্ত্তনশীল ডাক্তারি চিকিৎসার নূতন নূতন জ্বরঘ্ন ঔষধের প্রয়োগকালে সূক্ষ্মরূপে রোগীর শারিরীক উত্তাপ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে পদে পদে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। এই ঔষধগুলির মধ্যে এণ্টিফেব্রিন্ (Antifebrin) প্রভৃতি প্রবলঘর্ম্মকারক ঔষধ। থার্মমিটারের সাহায্য ব্যতীত এই ঔষধগুলির যথাযথ প্রয়োগ আদৌ সম্ভবে না। ডাক্তারি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে এত ডিগ্রিপর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে অমুক ঔষধ এত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে এবং এত ডিগ্রি উত্তাপ নামিলে আর প্রয়োগ করিবে না। এই নিয়মের ব্যভিচার হইলে রোগী একবারেই শীতল হইয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা। অতএব জ্বর কতটুকুপর্য্যন্ত কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে, ঔষধ প্রয়োগে কি ফল হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিতে হইলে থারমোমিটার যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন। অবিচ্ছেদী জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগের জন্যও তাপমান যন্ত্রের আবশ্যক, কারণ অনেক স্থলে চুল পরিমাণ জ্বর কমিলেও ঔষধ দেওয়ার বিধি আছে। ১০৬ ডিগ্রি কি ১০৫ ডিগ্রি জ্বর এই দুইয়ের ইতরবিশেষ সুধু গাত্র স্পর্শ করিয়া বা হাত দেখিয়া কোন কবিরাজ যে ঠিক করিয়া বলিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। কবিরাজ মহাশয় রোগীর গাত্র ও হস্ত দেখিয়া বলিবেন আন্দাজ ১০৪ বা ১০৩ ডিগ্রি। ঠিক্ কখনই বলিতে পারিবেন না। অতএব এটীর কোন্‌টীকে কাল্পনিক বলিব? কিন্তু এই সামান্য

ইতরবিশেষ জ্ঞান এখনকার আধুনিক ডাক্তারি চিকিৎসা-পদ্ধতির একটা প্রধান উপকরণ। তবে আজ্‌কাল যে ডাক্তারগণ কথায় কথায় তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নিষ্প্রয়োজন। এখনকার কালের অনেক ডাক্তার প্রতিদিন জ্বররোগীর ৮ বার ১০ বার উত্তাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অনেক রোগীর অভিভাবকও শয্যাপার্শ্বে একটী থারমমিটার নিয়ত জন্য রাখিয়া দেন এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তাপ গ্রহণ করেন্। এইরূপ প্রথা নিতান্তই বিরক্তিকর। ইহাতে রোগীরও নিজের বিরক্তি উৎপাদন ভিন্ন আর কেন বিশেষ ফল নাই। অনেক ডাক্তার ধাত ও গাত্র পরীক্ষা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র এক থার্‌মমিটারের উপরই নির্ভর করেন। এরূপ প্রথাও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। কম্পজ্বর হইয়া ঘামদিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল, তাহা বুঝিতে আবার তাপমান যন্ত্র বগলে দেওয়া কেন? সোজাসুজি স্বল্প-বিরাম জ্বরে (Remitent fever) প্রত্যহ প্রাতে উত্তাপ কমিতেছে এবং দুই প্রহরের পর উত্তাপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা এক দিন জানিলাম, দুই দিন জানিলাম, তবে প্রত্যহ দুই বেলা কেন একটা যন্ত্র বগলে ধরা? দুই তিন দিন বাদ দিয়া একদিন দেখিলেই সব বুঝা গেল। অনেক ডাক্তার কেবল মাত্র ভড়ং করিবার জন্য এবং রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন জন্য নিষ্প্রয়োজন হইলেও থার্‌মমিটার ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ গুলি ডাক্তারদিগের যে নিতান্ত বাড়াবাড়ী, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। পরন্তু বহুদর্শী হইলে সোজাসুজি জ্বরজারি বুঝিতে হইলে ক্রমে ক্রমে তাপমানযন্ত্রের ব্যবহার কমিয়া আইসে, ইহা স্থির নিশ্চয়। আমরা মেডিকেল কলেজ হইতে পাস হইয়া বাহির হইয়া প্রথম প্রথম যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করিতাম, এখন আর তত করি না। পরন্তু অঙ্গুলি ও হস্তকে কিঞ্চিৎ ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে সামান্য জ্বর বুঝিতে তাপমান যন্ত্রের প্রায় প্রয়োজন হয় না। রোগীর জিহ্বা মুখশ্রী প্রভৃতি পরীক্ষাতেও সময় সময় জ্বর বুঝিতে পারা যায়। তাপমান যন্ত্র জ্বর বুঝিবার জন্যই কেবল নহে, উহা জ্বরের পরিমাণ নির্দ্ধারণ জন্য। অতএব সর্ব্বদা জ্বর হইলেই যে, ইহা ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অতিরিক্ত থার্‌মমিটার ব্যবহারে ডাক্তারদিগের অর্থনাশও উপস্থিত হয়। আমাদিগের পরিচিত একজন ডাক্তার এক ম্যালেরিয়ার মর্‌শুমে ১৮টী

তাপমান যন্ত্র ভাঙ্গিয়াছিলেন। প্রত্যেকে তাপমান যন্ত্রের মূল্য ৫৲। ৬৲ টাকা। তারপর রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় জন্য এবং এক রোগ হইতে অন্য রোগ পৃথক করিবার জন্য তাপমান যন্ত্র কতদূর কার্য্যকারী তাহা দেখুন। এখানে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহারসম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিতে গেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে, অতএব দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তাহাতেই কবিরাজ মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। কবিরাজ মহাশয় অবগত আছেন যে, অনেক কলেরা রোগী একবারে হিম হইয়া গিয়াও আরাম হয়। তবেই হইল কলেরা রোগীর গাত্র এবং হাত পা শীতল হইলেও অসাধ্য হয় না। কিন্তু এইরূপ শীতল হইলেও যদি ঐ রোগীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তবে ঐ রোগী কখনই বাঁচিবে না। এই আভ্যন্তরিক উত্তাপ কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? রোগীর গাত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। বগলে তাপমান যন্ত্র রাখিলাম, উত্তাপ ৯৭ বা ৯৬ ডিগ্রি অর্থাৎ স্বাভাবিক অপেক্ষাও ১ ডিগ্রি কম। এক্ষণে রোগীর গুহ্যদ্বারে তাপমান দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—আভ্যন্তরিক উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রি। এস্থলে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রোগী কখনই বাঁচিবে না। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার গেয়ার সাহেব কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত হইয়াছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, তাঁহার নাকি এইরূপ আভ্যন্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার আন্ত্রিক জ্বরে (টাইফয়েড ফিবার) যদি কোন সময়ে হঠাৎ উত্তাপ কমিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার অন্ত্রমধ্যে রক্তস্রাব হইয়াছে এবং রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন। এই সকল অবস্থাজ্ঞাপন কাল্পনিক নহে। কারণ আন্ত্রিক জ্বরে যে রোগীতেই হঠাৎ উত্তাপ কমিয়াছে, সেই রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদকালে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবদ্বারা উক্ত রোগী মারা পড়িয়াছে, ইহা সর্ব্বদা দেখা গিয়াছে। আবার সাধারণ জ্বরবিকাররোগীর প্রাতঃকালে উত্তাপ ও প্রলাপ কম থাকে, রাত্রে উত্তাপ ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রাতে যদি উত্তাপ ও প্রলাপের বৃদ্ধি দেখা যায়, তবে সে রোগী প্রায়ই মারা পড়ে। আবার নিউমোনিয়া (ফুষ্‌ফুষ প্রদাহ) রোগে যে পার্শ্বের ফুষ্‌ফুষের প্রদাহ হয় সেই পার্শ্বের বগলের উত্তাপ সুস্থ পার্শ্বের উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী। ছোট ছোট ছেলেদের নিউমোনিয়া রোগ হইলে যদি ছয়, সাত দিনেও উত্তাপ কম না পড়ে, প্রত্যুত অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয় এবং

নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, তবে সে রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। তরুণ বাতরোগে (একুট্ রিউমাটিজম্) রোগের একটী ধরণ এই যে. উহাতে হঠাৎ উত্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া রোগী মারা পড়িতে পারে। এই সকল সাংঘাতিক পীড়াতে ১১০ ডিগ্রিপর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং এইরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে আর রোগীকে বাঁচান যায় না। অতএব অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধির পূর্ব্বহইতেই ডাক্তারকে সাবধান থাকিতে হইবে, কিন্তু উত্তাপ ১০৪ কি ১০৭° ডিগ্রি তাহা রোগীর গা ও নাড়ী দেখিয়া কখনও বুঝা যায় না। আবার আরও দেখুন। সূতিকাক্ষেত্রে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের ঠিক্ কম্পজ্বরের অনুরূপ একপ্রকার সাংঘাতিক জ্বর হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সূতিকাক্ষেত্রে নানাপ্রকারে প্রসূতির জ্বর হইতে পারে, যথা স্তনে দুগ্ধ জন্মিলে অল্প জ্বর হয়, এই দুগ্ধের জ্বর ৫।৭ দিনও থাকিতে পারে। আবার পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত সাংঘাতিক জ্বরও প্রথম প্রথম সামান্য জ্বর বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাপমানযন্ত্র থাকিলে সে ভ্রম অতি সত্বরই দূরীভূত হয়, কারণ ঐ সাংঘাতিকজ্বরে ১০৫ বা ১০৬ ডিক্রি বা ততোধিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সামান্য জ্বরে ওরূপ হয় না। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আমি আমার পূর্ব্বলিখিত ধাতুনামক প্রবন্ধে কোন স্থলে বলিয়াছিলাম যে "ডাক্তারদিগের দৌড় আরও বেশী"। এস্থলে কবিরাজ মহাশয় অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। এখানে দৌড় বেশী বলাতে ডাক্তারি চিকিৎসাকে ঠাট্টা করা গিয়াছে মাত্র। পরন্তু আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ডাক্তারি অনিশ্চিত, কবিরাজীমতেও সকলরোগের নিদান বুঝিয়া উঠা যায় না। বাতের ন্যায় ব্যথা হইয়া হাত পা কামড়াইলে যে ল্যাক্‌টিক এসিড্ নামক একরূপ অম্লরসের সৃজন হয়, তাহা কাল্পনিক নহে। উহা ডাক্তারদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। তরুণ-বাতরোগে রোগীর রক্ত অল্প অম্লাক্ত হয় এবং উহাতে Lactic এসিড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহজ রক্তে পাওয়া যায় না। অজীর্ণদোষ (Dyspehsia) হইলে পাকস্থলীতে Lactic acid জন্মায় এবং উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হাতপা কামড়ায়। কিন্তু অম্লের ব্যাম হইলে বা অজীর্ণ হইলে কোন রোগীর পিঠ না কামড়াইয়া কেন হাতপা কামড়ায়, এইটীই বিবেচ্য বিষয়। কবিরাজ মহাশয় যে কারণ দিয়াছেন,

তাহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত এমন আমাদিগের বিবেচনা হয় না। শারীরিক উষ্মাবৃদ্ধি হইলে কেনই বা সর্ব্বাঙ্গের শ্লেষ্মা তরল না হইয়া পদের গোছের শ্লেষ্মাই বা কেন তরল হইবে? যদি বলেন ঐ পায়ের উষ্মাই বৃদ্ধি হইয়াছে, তবে অজীর্ণ ব্যামহইলে শরীরের এত অঙ্গ থাকিতে কেন কেবল মাত্র রোগীর বাহু কামড়াইতে লাগিল? ইহার কারণ কি কবিরাজ মহাশয় বলিতে পারেন? যদি না পারেন তবে স্বীকার করা উচিত যে, কি কবিরাজী, কি ডাক্তারি সকল চিকিৎসাশাস্ত্রই অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ এবং কালে সকল বিষয়ই বিষদ ও মানব বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। কালের বিচিত্রগতি অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, কালে এই সকলের মীমাংসা না হইতে পারে। জগৎ ক্রমোন্নতিশীল এবং সতত পরিবর্ত্তনশীল, অতএব কোন বিষয়ের চরম উন্নতি কতদূর তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

কবিরাজী, ডাক্তারি শারীরবিদ্যা বিষয়ে যে মিলন হওয়া একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়াছি তাহা সমুদয় অংশের মিলসম্বন্ধে বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ প্রমাণদ্বারা অনায়াসেই জানা যায় এবং যাহাতে দুই মত হওয়া সম্ভবপর নহে সেই সকল বিষয়েই মিল হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এবং তাহা হওয়াও উচিত। কারণ এক শরীরে দুই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের মন্তব্য।

সহযোগী পুলিনবাবুর লিখিত "সংশয়-অপনয়ন" প্রবন্ধটী বেশ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দুইটী কথায় বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। তন্মধ্যে ১ম কথা—প্রবন্ধটীর আগাগোড়া বেশ সরলভাবে অথচ সত্যের অপলাপ না করিয়া যে ধরণে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। আর ২য় কথা—চিকিৎসা-সম্মিলনীর গোড়ায় সৃষ্টিও ঠিক্ এই শ্রেণীরই প্রবন্ধ লইয়া। সুতরাং যাহাতে গভীর জ্ঞানের কথা আছে, যাহা সম্মিলনী নামের প্রকৃতই উপযোগী,

সে প্রবন্ধকে ভাল না বলিয়া আর ভাল বলিবার আছে কি? তথাপি কিন্তু একটু কথা আছে। সে কথাটুকু আর বেশী কিছু নয়, কেবল বৈদ্যশাস্ত্রে ভালরূপ জ্ঞানের অভাব জন্যই পুলিনবাবুর লিখিত প্রবন্ধে স্থানে স্থানে ২।১টি কথা যেন কাণে একটু লাগে, কিন্তু এ আঘাতের পরিমাণ যথার্থ বড়ই সামান্য। এমন কি, লেখকের বিনয়পূর্ণ সরল ভাব, সে টুকু উড়াইয়া দিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রবন্ধটীও যে একবারে সাঁচ্চাপূর্ণ, তাহাও কিন্তু বলিতেছি না, এবং ভিন্ন দেশীয় শাস্ত্রে ভাল জ্ঞানের অভাবজন্যই যে তাঁহারও কিঞ্চিৎ ত্রুটী ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবেই যথার্থ কথা এই যে, উভয় লেখকের লিখিত প্রবন্ধেই যেন একটু আধটু "কোলটানা" ছয়ের আভাস প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই ত বলিলাম যে, তাহা একে অন্যের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞজন্য। যাহাহউক, সে আভাস টুকু কি, তাহা এই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু সে শক্তি টুকু আপাততঃ ত আমার নাই, কেননা আমিও ত আর ডাক্তারী আদি সর্ব্বশাস্ত্রে দিগ্‌গজ নহি। সুতরাং খুব্ ইচ্ছা রহিল-একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তারের সহিত এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া আগামী বারে এসম্বন্ধে কিছু বলিব।

কবিরাজ সম্পাদক।

ধাতু—ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাড়ীতত্ত্ব সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে বায়ু, পিত্ত, কফ, সম্বন্ধে আরও গুটিকয়েক কথা বলা যাইতেছে। দেহমধ্যে যে সমস্ত ধমনী দৃষ্টীভূত হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বদাই বায়ু অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া রসরক্তাদি সঞ্চালিত করিতেছে। দেহস্থ বায়ু যদি সাম্যভাবেই অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ধমনী গুলিও নাতিস্থূল নাতি সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। কিন্তু কোনপ্রকারে তাহার আধিক্য হইলে অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হওয়ায় ধমনী গুলিও (পরীক্ষণীয় নাড়ী) অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া পড়ে এবং বায়ুর স্বাভাবিক বক্র গতিদ্বারা ধমনীও বক্রভাবে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হয়। আবার এইরূপ অবস্থায় নাড়ী পূর্ব্বের ন্যায় কোমল না থাকিয়া অনেকটা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। পিত্ত—তেজীয়ান্, উষ্ণতাই তাহার প্রধান গুণ। উষ্ণতার তারতম্যানুসারে বায়ুর গতিও যে ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, বোধ হয় বিজ্ঞান-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নব্য শিক্ষায় হাজার সভ্য হইলেও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পিত্তাধিক্যে ধমনী সন্তাপিত হইলে তন্মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই জন্যই নাড়ী বাতাক্রান্তের ন্যায় স্থূল না হইয়া পরিপূর্ণ, সরল এবং দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে নাড়ী থেকে থেকে স্পন্দিত হয়। শ্লেষ্মা কখনও নাড়ীর মধ্যভাগে প্রবেশ করিতে পারে না, বহির্ভাগই ইহার অবস্থিতির স্থান। শ্লেষ্মা কুপিত বা প্রবল হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে নাড়ীকে একবারে চাপিয়া ধরে, এই জন্যই শ্লেষ্মার দোষ জন্মিলে নাড়ী সূক্ষ্ম তন্তুবৎ হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন দুই বা দোষত্রয়ের সমবায়ে এতৎ সমুদায়ের মিশ্রিত ভাব লক্ষিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, যোগশাস্ত্রে নাড়ীতত্ত্বের কথা যেরূপ বিবৃত আছে, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতেছি, অহিন্দুর কাছে হিন্দুদিগের গুহ্য বিষয়-যোগতত্ত্বের কথা সমালোচনা করিলে, মরুভূমে জল সিঞ্চনের ন্যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইবে।

সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাই উল্লেখ করিতেছি। যোগশাস্ত্রে প্রধান প্রধান নাড়ী গুলির কার্য্যানুযায়ী একটী একটী পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। এস্থলে তাহাও উল্লেখ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

জীবদেহে সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে তিন কোটী নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী স্থূল। তদ্দ্বারা শ্রবণদর্শনাদি কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পাদিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে আবার চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী অপেক্ষাকৃত আরও স্থূল। ইহারা সকলেই নাভিকন্দের অব্যবহিত নিম্ন হইতে সমুত্থিত হইয়া দেহমধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছে। যে স্থান হইতে এই কয়েকটী নাড়ী উত্থিত হইয়াছে, তাহার আকৃতি ঠিক্ একটী কচ্ছপের ন্যায়। মহাত্মা দত্তাত্রেয় ইহাকে কূর্ম্ম বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই কূর্ম্ম বামদিকে মস্তক এবং দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে নাভিনিম্নে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার মুখ হইতে দুইটী এবং পুচ্ছ হইতে দুইটী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। ঊর্দ্ধস্থিত একটী হস্ত ও একটী পদ হইতে পাঁচটী করিয়া দশটী এবং অধোস্থিত একটী হস্ত ও পদ হইতে তদ্রূপ আরও দশটী নাড়ী চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতিটী নাড়ীই প্রধান, অন্যান্য নাড়ী গুলি ইহাদিগেরই শাখা প্রশাখা। ইহার মধ্যে যে নাড়ীটী হস্ত হইতে পদ পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। শরীরের অন্যান্য স্থানে উহা যেরূপ মাংসভেদ করিয়া রহিয়াছে, হস্তস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অব্যবহিত নিম্নে তদ্রূপ নয়। এই জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দুই অঙ্গুলী দূরে নাড়ী পরীক্ষা করিবার রীতি আছে। ইতিপূর্ব্বে যে কূর্ম্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কূর্ম্ম পুরুষদিগের শরীরে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে, স্ত্রীদিগের দেহাভ্যন্তরে কখনো সেইভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। তাহা হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থিতি ও কার্য্যের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন, পুরুষদিগের কূর্ম্ম অধোমুখে এবং স্ত্রীলোকদিগের কূর্ম্ম ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাতে ঐ উভয় জাতির নাড়ী স্পন্দনের বিলক্ষণ তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ পুরুষজাতির দক্ষিণ হস্তস্থিত নাড়ী যেমন সুস্পষ্ট অবস্থা-জ্ঞাপক, স্ত্রীদিগের বাম হস্তস্থিত

নাড়ী তেমনি যথার্থ রোগ-বিনিশ্চায়ক।" স্ত্রীলোকদিগের দক্ষিণ হস্তস্থিত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে রোগের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, তজ্জন্যই তাহাদিগের বাম হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিয়ম হইয়াছে। দুই হস্তদ্বারা একই সময় রোগীর দুই হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলে যদিও সহসা কোন প্রকার পার্থক্য অনুমীত না হয়, কিন্তু একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই তাহাতে কিছু না কিছু প্রভেদ উপলব্ধি হইবে। যিনি সেই প্রভেদ বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে নাড়ীপরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিতে চেষ্টা করা এবং তাহার উপরই নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা বড়ই অন্যায়।

ক্রমশঃ—

সাং উমারপুর পোঃ নাকালীয়া, পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সুযোগ্য লেখকমহাশয় প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া অগ্রেই ক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ "অহিন্দুর কাছে হিন্দুদিগের গুহ্য যোগতত্ত্বের কথা" ইত্যাদি বাক্যরূপ—বীজ, তিনি মরুভূমিতে রোপণ করিতে ইচ্ছুক নন্। কথাটী অতি সত্য, বাস্তবিকও ভয়ানক অসত্যের নিকট সত্যের কণামাত্রও প্রবেশ করিতে অসমর্থ—যথার্থ অহিন্দুর নিকট প্রকৃত হিন্দুয়ানীর কথা বিষবৎই লাগে বটে, কিন্তু এসম্বন্ধে একটী কথা আছে, তাঁহার লিখিত বাক্য পাঠ করিয়া কোটী কোটী অহিন্দু তাঁহাকে ঘৃণা করুক,—সহস্র সহস্র অহিন্দুর নিকট তিনি উপহাসাস্পদ হউন, কিন্তু যদি একজনও প্রকৃত হিন্দু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া কণামাত্রও আনন্দ পায়, তবেই তাঁহার আর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ থাকা উচিত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য যে, আমরা তাঁহার এশ্রেণীস্থ প্রবন্ধ পাঠে অতি আনন্দিত বই কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কেন না নীরোগ অবস্থায় শরীর কৃশ থাকাও ভাল, তথা পি কিন্তু শোথরোগ হইতে উৎপন্ন স্থূলতা কোনমতেই প্রার্থনীয় নহে। কেমন আর কিছু বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে হইবে কি? অতএব আশা করি যে, ভবিষ্যতে হিন্দুর মর্ম্মকথাসম্বন্ধে তাঁহার যাহা

কিছু লিখিবার, যাহা কিছু বলিবার, তাহা তিনি যেন অবশ্যই প্রাণ খুলিয়া লিখেন, তাহা হইলেই লেখক বুঝিবেন যে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সোণার ভারত সত্যহীন হইয়াই আজ্ "ভারতছাড়া" "লক্ষ্মীছাড়া" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেছে এবং ভারতবাসীও অসত্যরূপী রাক্ষসীর হাতে পড়িয়া একে একে কবলিত হইতেছে। তবে যদি কোন মহাত্মা যেরূপেই হউক, এই দুরন্ত রাক্ষসীকে বধ করিতে পারেন, অথবা কিঞ্চিৎমাত্রও শাসন করিতে সমর্থ হন, তবেই লেখক তাঁহার নিজ জীবনেই দেখিতে পান যে, যে সোণার ভারত, আবার অচিরাৎই সেই সোণার ভারত হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যশীল ও মহাপাপীদিগের পক্ষে সেরূপ মহাত্মা মিলিবে কি ?

চি, স, ক, স।

ইংরেজ রাজ্যে কুষ্ঠরোগের বৃদ্ধি।

এলোপ্যাথিমতে।

আজি কালি কুষ্ঠরোগ লইয়া ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে, কুষ্ঠরোগ নিবারণোদ্দেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতেছেন। স্থানে স্থানে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের কথা উঠিতেছে। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক কি না তদ্বিষয়েও নানারূপ বিচার হইতেছে। পরন্তু সুধু ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, ইংরেজাধিকৃত প্রায় সমস্ত দেশে কুষ্ঠরোগ ধাঁ ধাঁ করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক স্থানে কুষ্ঠরোগীদিগকে আলাহিদা রাখিবার জন্য আইন পাশ হইয়াছে। এ রোগ যে পূর্ব্বাপেক্ষা সম্প্রতি কেন এত বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার মীমাংসা হওয়া দুরূহ। সম্প্রতি লণ্ডননগরে "এপিডেমিওলজিকাল সোসাইটীতে" ডাক্তার পি, এস এব্রাহোম কুষ্ঠরোগসম্বন্ধে একটী বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজাধিকৃত কোন্ দেশে কিরূপ কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠরোগের এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, উত্তমাশা অন্তরীপে (কেপ্ অব্ গুড্ হোপ্) ১৮৮৪ সালে কুষ্ঠ আইন জারি হইয়াছে। তথাকার ডাক্তারসমূহ এক বাক্যে বলিতেছেন যে, তথায় কুষ্ঠরোগের বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন ডাক্তার বলেন যে, কুষ্ঠরোগ এখানে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি

হইয়াছে এবং তন্নিবারণার্থ শীঘ্রই কোন উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। উত্তমাশা অন্তরীপে যে চিকিৎসা-বিষয়ক সমিতি বা কমিটী আছেন, সে কমিটী বলেন যে, কুষ্ঠরোগ যে সংক্রামক এ সংস্কার ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে। এবং এই ঘৃণিত ব্যাধি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার, ডব্লারের মতে উত্তমাশা অন্তরীপে পূর্ব্বে নাকি কুষ্ঠব্যাধি ছিল না। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দিতে ওলন্দাজেরা উত্তমাশা অন্তরীপে কতকগুলি মালয় দেশের অধিবাসী লইয়া যান। ঐ মালয়দিগের মধ্যে অনেকে কুষ্ঠগ্রস্ত ছিল। তাহাদিগের দ্বারাই উত্তমাশা অন্তরীপে কুষ্ঠরোগের সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ দেশীলোক এই উভয়ের মধ্যেই এক্ষণে কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ব্রণ্ট বলেন যে, ট্রান্সভাল উপনিবেশে সম্প্রতি কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অনেক হইয়াছে। যদিও দেশীয় লোকের মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী কিন্তু অনেক ইউরোপবাসীও ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইত গেল আফ্রিকার কথা। তারপর আমেরিকা। আমেরিকার জামেকাদ্বীপে ১৮৮১ অব্দের সেন্সসে পাঁচ লক্ষ আশী হাজার আটশত চারিজন লোক অবধারিত হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৭০০ কি ৮০০ শত লোক কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থ ছিল। জামেকাদ্বীপে একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। তথায় রোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে পারে। আইনদ্বারা বাধ্যকরা হয় না। ব্রীটিস্ গায়েনাতে ডাক্তার হিলিসের মতে ১৮৮১ সালে ৫০০ শত লোকের মধ্যে একজন করিয়া কুষ্ঠরোগী ছিল। তিনি আরও বলেন যে, ১৮৫৮ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৬০ জন করিয়া কুষ্ঠরোগীর বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু লোক সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন বই হয় নাই। তথাকার আর একজন ডাক্তার বলেন যে, গায়েনার কুলিদিগের মধ্যেই কুষ্ঠরোগীর বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এস্থলে জানা উচিত যে, ব্রীটিস গায়েনার কুলিদিগের অধিকাংশই ভারতবর্ষবাসী। মাহেকার (Mahaica) কুষ্ঠাশ্রমের সুপারিণ্টেডেণ্ট ডাক্তার কাষ্টর ১৮৮৭ সালে লেখেন যে "আমি চারিদিক হইতেই শুনিতে পাইতেছি যে, সুধু গায়েনা বলিয়া নহে পৃথিবীর সমস্ত অংশেই কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৬০ সালে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, কুষ্ঠরোগ ক্রমেই তথায় বৃদ্ধি হইতেছে। যথাঃ—

ক্যানারি দ্বীপ সমূহে

১৭৮৮ সালে	১৯৫	জন কুষ্ঠরোগী ছিল।
১৮৩১ „	৩৪৬	„ „ „
১৮৫৭ „	৫০০	„ „ „
১৮৬০ „	৬০০	„ „ „

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সেনিগ্যাম্বিয়া হইতে লোপেজ অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব।

লোয়াঙ্গো উপকূলে কুষ্ঠরোগী নাই।

কেপ্‌অব্ গুড্‌হোপে অপনা আপনি কুষ্ঠরোগ জন্মাইয়া থাকে।

আফ্রিকা ছাড়া এসিয়া এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহ কুষ্ঠরোগের আকর স্থান। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বাংশে এবং ভারতবর্ষেই অধিক কুষ্ঠরোগ দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আরবদেশের অভ্যন্তর ভাগে এবং পারস্য, সিরিয়া, সাইপ্রস্ প্রভৃতি দেশের পার্ব্বত্য বিভাগে কুষ্ঠরোগ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগী অনুমান দশ হাজারের মধ্যে ৬ জন পাওয়া যায়।

সিলোন বা লঙ্কাদ্বীপ, ভারত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জ, যাবাদ্বীপ, এণ্ডামান পুঞ্জ, সুমাত্রা এবং বর্ণিও দ্বীপে কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

চীন সাম্রাজ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে কুষ্ঠরোগ বিদ্যমান আছে। চীনের উত্তর ভাগেই অধিক। ক্যান্‌টন্ প্রদেশে সম্প্রতি ১০,০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী আছে। ক্যান্‌টন্ নগরের নিকটে দুইটী কুষ্ঠরোগীর গ্রাম আছে, উহার একটীতে ৭০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী বাস করে। আর একটীতে ১,০০০ জন বাস করে।

জেপান দ্বীপে জেডো এবং ইয়োকোহামার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানে কুষ্ঠরোগী আছে। জেপান দ্বীপের একটী বৃহৎ পল্লিগ্রামের সমুদয় অধিবাসী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে বড় একটা কুষ্ঠরোগ দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় তাহাও তত্রস্থ চীন অধিবাসীদিগের মধ্যে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া এবং ট্যাস্‌মেনিয়া প্রদেশে আদৌ কুষ্ঠরোগ নাই।

নিউজিলাণ্ডে পূর্ব্বে খুব্ কুষ্ঠরোগ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অনেক কমিয়া গিয়াছে। ওসেনিয়া দ্বীপসমূহে সমস্ত স্থানে কুষ্ঠরোগী দেখা যায়। তন্মধ্যে হাওয়েআন্‌দ্বীপেই বেশী। হনোলুলুদ্বীপে ১৮৪০ সালে চীন দেশীয় লোকদিগের দ্বারা কুষ্ঠরোগ প্রবেশ লাভ করে। তার পর কুষ্ঠরোগী সংখ্যায় এত বাড়িয়া যায় যে, ১৮৬৫ সালে হাজার করা ৩½ জন কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

ইউরোপ মহাদেশের সেপন, পর্টুগাল, ইটালি, সিসিলি, হঙ্গেরি, সুইডেন্, নরওয়ে এবং আইস্‌লণ্ড এই কয় দেশে কুষ্ঠরোগ জন্মাইতেছে। কিন্তু এই সকল দেশেও ক্রমে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

যথাঃ—নরওয়ে দেশে—

১৮৫৬ সালে	২৮৪৭	জন ছিল।
১৮৬৩ „	২৬৬০	„ „
১৮৭৪ „	১৮৩২	„ „

সেট্‌লেণ্ড, ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ড হইতে কুষ্ঠরোগ একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। স্কট্‌লণ্ডে পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এডিন্‌বরার নিকট ইগারটন্ নামক ক্ষুদ্র নগরীতে পূর্ব্বে অনেক কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

উত্তর আমেরিকায় কুষ্ঠরোগী প্রায় নাই। তবে মেক্সিকো ও কালিফর্ণিয়া দেশে আছে। মেক্সিকো দেশে আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যেই কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্য আমেরিকার স্থানে স্থানে কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কিউবা এবং জ্যামেকায় অনেক কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

ডাক্তার সম্পাদক।

ট্রিনিডাড উপনিবেশেও তথাকার কুষ্ঠাশ্রমে দিন দিন কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তথায় ডাক্তার বিভানরেকের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ডাক্তার আর, এইচ ন্যাগস্ বলেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দির আরম্ভ হইতে ট্রিনিদাদে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে।

বার্‌বেডোস্ দ্বীপে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তথায় লোকসংখ্যা শতকরা ৬ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কুষ্ঠরোগীর শতকরা ২৫ জন করিয়া বাড়িয়াছে। ব্রীটিস উত্তর আমেরিকার নিউব্রন্স উইক্ প্রদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু ব্রীটিস্ কলম্বিয়াতে কুষ্ঠরোগীর বৃদ্ধি হইয়াছে। তারপর ভারতসাম্রাজ্য। ভারতবর্ষে ডাক্তার কার্‌টার, লুইস্ এবং কনিংহাম ইহারাই কুষ্ঠরোগসম্বন্ধে রোগী আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৮১ সালের সেন্‌সসে ১৩১৬১৮ জন কুষ্ঠরোগী ছিল বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এখানকার ডাক্তারদিগের মতে ঠিক কতজন ছিল, তাহা সম্যকরূপে নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষের একজন সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার সম্প্রতি বলেন যে "ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কি হ্রাস হইতেছে, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের নানা-স্থান হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে দিন দিন কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। বোম্বাই সহরের করোনার বলেন যে, বোম্বাই সহরে কুষ্ঠরোগ খুব্ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বোম্বাই সহরে এমন একটী কূপ নাই, যাহাতে কোন না কোন কুষ্ঠরোগী ডুবিয়া না মরিয়াছে। সম্প্রতি অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে অনুমান আড়াই লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগ বৃদ্ধি হইতেছে কি না, তাহা জানিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট বিশেষ সচেষ্ট হইয়া-ছেন। এই কারণে ভারতগবর্ণমেণ্ট ১৮৮৮ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্ঠরোগসম্বন্ধে মন্তব্য জারি করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই ;—কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা এবং বৃদ্ধিনিবারণসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তার্পণ করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিবেচনা করিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষের কুষ্ঠাশ্রমসমূহে কত কুষ্ঠরোগী ভর্ত্তি হয়, তাহাদের লিঙ্গ নির্ণয় এবং তাহারা কিরূপে চিকিৎসিত হয়, ইত্যাদি জানিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণ-

মেণ্টসকলের মতামত লওয়া হইয়াছিল। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল জানিতে পারিয়াছেন যে, কুষ্ঠরোগ একবারে দূরীভূত করিতে হইলে সমস্ত কুষ্ঠরোগীদিগকে যাবজ্জীবন পৃথকস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং তাহাদের আর বংশ বৃদ্ধি না হয়, এজন্য স্ত্রী ও পুরুষ পৃথকস্থানে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ বিধান করিতে গেলে সম্প্রতি সাধারণের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষে এরূপ নিয়মমতে কার্য্য করাও অসম্ভব হইবে। অতএব আপাততঃ স্থানে স্থানে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিবেন এবং তথায় যে সকল কুষ্ঠরোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইবে তাহাদিগকেই লওয়া হইবে। এই সকল কুষ্ঠাশ্রমে স্ত্রী পুরুষদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত সমস্ত কুষ্ঠাশ্রমে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং সাধারণের চাঁদায় স্থাপিত কুষ্ঠাশ্রম-সকলেও যাহাতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে।" সম্প্রতি ভারতবর্ষে খাস গবর্ণমেণ্টের নয়টী এবং গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত পাঁচটী কুষ্ঠাশ্রম আছে।

তারপর লঙ্কদ্বীপেও কুষ্ঠরোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। তথাকার ডাক্তার কিন্‌সি বলেন ১৮৬২ সাল হইতে কুষ্ঠরোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সালে তথাকার কুষ্ঠাশ্রমে ৬৩ জনমাত্র কুষ্ঠরোগী ছিল কিন্তু এক্ষণে ১৫১ জন হইয়াছে।

ইংরেজদিগের অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশেও কুষ্ঠরোগ লইয়া ঘোর আন্দো-লন হইতেছে। সিড্‌নিতে কুষ্ঠের জন্য কুয়ারানটাইন বিধি প্রচলিত হই-য়াছে। তথায় চীনদেশীয় কুষ্ঠরোগীদিগকে আটকান যাইতেছে।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কুষ্ঠরোগ আছে?

আফ্রিকার মিশর দেশে কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। তথায় আপনা হইতে কুষ্ঠরোগ জন্মায়। নাইল নদীর উভয় পার্শ্বে এবং ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের উপকূল ভাগে কুষ্ঠরোগী অনেক আছে।

আবিসিনিয়া দেশে সমুদ্র উপকূল ভাগে সমতল ক্ষেত্রে এবং পার্ব্বত্য স্থানেও কুষ্ঠরোগ আছে।

জান্‌জিবর, মোজাম্বিক্, মাডাগস্কোর এসকল স্থানে।

সেণ্টহেলেনা, মরিসস্ দ্বীপে।

ক্যানারিদ্বীপ সমূহে। এই সকল দ্বীপে ১৭৮৮। ১৮৩১, ১৮৫৭, এবং

১৮৬০ সালে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, কুষ্ঠরোগ ক্রমেই তথায় বৃদ্ধি হইতেছে। যথাঃ—

ক্যানারি দ্বীপ সমূহে

১৭৮৮ সালে	১৯৫	জন কুষ্ঠরোগী ছিল।
১৮৩১ ,,	৩৪৬	,, ,, ,,
১৮৫৭ ,,	৫০০	,, ,, ,,
১৮৬০ ,,	৬০০	,, ,, ,,

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সেনিগ্যাম্বিয়া হইতে লোপেজ অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব।

লোয়াঙ্গো উপকূলে কুষ্ঠরোগী নাই।

কেপ্‌অব্ গুড্‌হোপে অপনা আপনি কুষ্ঠরোগ জন্মাইয়া থাকে।

আফ্রিকা ছাড়া এসিয়া এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহ কুষ্ঠরোগের আকর স্থান। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বাংশে এবং ভারতবর্ষেই অধিক কুষ্ঠরোগ দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আরবদেশের অভ্যন্তর ভাগে এবং পারস্য, সিরিয়া, সাইপ্রস্ প্রভৃতি দেশের পার্ব্বত্য বিভাগে কুষ্ঠরোগ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগী অনুমান দশ হাজারের মধ্যে ৬ জন পাওয়া যায়।

সিলোন বা লঙ্কাদ্বীপ, ভারত মহাসাগর দ্বীপপুঞ্জ, যাবাদ্বীপ, এণ্ডামান পুঞ্জ, সুমাত্রা এবং বর্ণিও দ্বীপে কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

চীন সাম্রাজ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে কুষ্ঠরোগ বিদ্যমান আছে। চীনের উত্তর ভাগেই অধিক। ক্যান্‌টন্ প্রদেশে সম্প্রতি ১০,০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী আছে। ক্যান্‌টন্ নগরের নিকটে দুইটী কুষ্ঠরোগীর গ্রাম আছে, উহার একটীতে ৭০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী বাস করে। আর একটীতে ১,০০০ জন বাস করে।

জেপান দ্বীপে জেডো এবং ইয়োকোহামার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানে কুষ্ঠরোগী আছে। জেপান দ্বীপের একটী বৃহৎ পল্লিগ্রামের সমুদয় অধিবাসী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে বড় একটা কুষ্ঠরোগ দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় তাহাও তত্রস্থ চীন অধিবাসীদিগের মধ্যে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া এবং ট্যাস্‌মেনিয়া প্রদেশে আদৌ কুষ্ঠরোগ নাই।

নিউজিলাণ্ডে পূর্ব্বে খুব্ কুষ্ঠরোগ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অনেক কমিয়া গিয়াছে। ওস্তেনিয়া দ্বীপসমূহে সমস্ত স্থানে কুষ্ঠরোগী দেখা যায়। তন্মধ্যে হাওয়েআন্‌দ্বীপেই বেশী। হনোলুলুদ্বীপে ১৮৪০ সালে চীন দেশীয় লোকদিগের দ্বারা কুষ্ঠরোগ প্রবেশ লাভ করে। তার পর কুষ্ঠরোগী সংখ্যায় এত বাড়িয়া যায় যে, ১৮৬৫ সালে হাজার করা ৩½ জন কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

ইউরোপ মহাদেশের সেপন, পর্টুগাল, ইটালি, সিসিলি, হঙ্গেরি, সুইডেন্, নরওয়ে এবং আইস্‌লণ্ড এই কয় দেশে কুষ্ঠরোগ জন্মাইতেছে। কিন্তু এই সকল দেশেও ক্রমে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

যথাঃ—নরওয়ে দেশে—

১৮৫৬ সালে	২৮৪৭	জন ছিল।
১৮৬৩ ,,	২৬৬০	,, ,,
১৮৭৪ ,,	১৮৩২	,, ,,

সেট্‌লেণ্ড, ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ড হইতে কুষ্ঠরোগ একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। স্কট্‌লণ্ডে পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এডিন্‌বরার নিকট ইগারটন্ নামক ক্ষুদ্র নগরীতে পূর্ব্বে অনেক কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায়।

উত্তর আমেরিকায় কুষ্ঠরোগী প্রায় নাই। তবে মেক্সিকো ও কালিফর্ণিয়া দেশে আছে। মেক্সিকো দেশে আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যেই কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্য আমেরিকার স্থানে স্থানে কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কিউবা এবং জ্যামেকায় অনেক কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

ডাক্তার সম্পাদক।

কুষ্ঠরোগ ও লেডি ডফরিন্ ফণ্ডদ্বারা স্ত্রীরোগ চিকিৎসা-সম্বন্ধে কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য।

কুষ্ঠরোগ।

"কু—কদর্য্য বিষয়ে তিষ্ঠতীতি কুষ্ঠঃ।"

অনেক দিন হইতে আমরা কুষ্ঠরোগসম্বন্ধে একটা বিষম হৈ চৈ ব্যাপার শুনিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ সুযোগ্য সহযোগীকে সেই আন্দোলনে যোগ দিতে দেখিয়া আমাদের অন্তঃকরণে যথার্থই গলিত-কুষ্ঠের ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণের মূলপ্রদেশে আগুণ জ্বলিবার কারণ অনেকগুলিই আছে। তন্মধ্যে একটী বিশিষ্ট কথা এই যে, আমাদের ইংরাজরাজ এতবড় একটা মহাপ্রতাপশালী ও ত্রিভুবনবিজয়ী সম্রাট্ ("কথায় বলে ইংরাজরাজত্বে বাঘবকরী এক ঘাটে পানি খায়") যাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকৌশলে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রতিমুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এহেন ব্রিটিশ-পুঙ্গব-দিগের যথার্থ সাত্ত্বিকী সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব দেখিয়া অধিকাংশ সময় আমা-দিগকে যথার্থই অযথাগর্ব্বে গর্ব্বিত পক্ষান্তরে মহান্ দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। খুব্ সূক্ষ্মবুদ্ধিতে একান্তমনে আমরা যখনই চিন্তাদেবীর শরণাগত হই, তখনই প্রাণ যেন স্বতঃই বলিয়া দেয় যে, যথার্থ সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা মনুষ্য জীবনের প্রকৃতপক্ষে ঐহিক বা পারত্রিক চরমসুখসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজ হৃদয়ে সেই উভয়লোকসাধনী প্রকৃত সদ্‌বুদ্ধির কণামাত্রও আজ পর্য্যন্ত যেন প্রতিভাষিত হয় নাই! নচেৎ কার্য্যকারণসম্বন্ধ-জ্ঞান বা কার্য্যকারণের প্রকৃত অভেদ-জ্ঞান প্রচুর থাকিলে আজ্ কি ইংরাজরাজ কুষ্ঠরোগের কারণ বা সংক্রামতা অথবা লেডি ডফরীন্ ফণ্ডদ্বারা স্ত্রীরোগ নিবারণের আবশ্যকতার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইতে পারিতেন? বোধ হয় কখনই নহে। আহা! একটী দুগ্ধপোষ্য বালকের বালবুদ্ধিতে যে কার্য্যকারণ জ্ঞান সহজেই আসিয়া

পড়িতে পারে, কিন্তু গভীর দুঃখ ও অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এই যে, এহেন মহাপ্রতাপশালী বিষয়-চতুর ইংরাজরাজ এতকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করি-য়াও সেই বাল-সুলভ কার্য্যকারণ-জ্ঞানের অধিকারী আজ্‌ও হইতে পারেন নাই! কোন্ শিশুর শিশুবুদ্ধিতে এরূপ জ্ঞানের অভাব হয় যে, গৃহস্থিত অগ্নিদগ্ধ শুষ্ক গোময় বা তৃণপুঞ্জ হইতে উত্থিত ধূম কেবল ফুৎকার বা তাল-বৃন্ত ব্যজন দ্বারাই নিরাকরণ হইতে পারে? অপিচ যতক্ষণ গৃহস্থিত সেই শুষ্ক গোময় বা তৃণপুঞ্জ অপসারিত করিয়া দেওয়া না হয়, ততক্ষণ কোটী কোটী ফুৎকার, লক্ষ্য লক্ষ্য লোকের ব্যজনক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা কোনমতেই সেই গৃহস্থিত ধূমরাশি বিদূরিত হইবার নহে। কেমন, এরূপ অবস্থায় এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা ধূমরাশি দূর হইতে পারে কি? কিন্তু যদি কোন শিশু যে কোন উপায়ে হউক, সেই গৃহ হইতে প্রজ্জ্বলিত অথবা অর্দ্ধ-দগ্ধীভূত শুষ্ক গোময় বা তৃণগুলি বাহিরে নিঃক্ষেপ করিতে পারে, তাহা হইলে কি আর সেই গৃহ, ধূমরাশিদ্বারা পরিপূর্ণ এবং তদ্দ্বারা গৃহীর কষ্ট-দায়ক চক্ষুজ্বালা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতে পারে? বোধহয় কখনই নহে। সুত রাং এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, ধূমোৎপত্তির কারণসম্বন্ধে প্রজ্জ্বলিত শুষ্ক গোময় বা তৃণরাশি, সুতরাং সেই গুলি গৃহ হইতে দূর করিয়া ফেলাইয়া দিলেই সকল কষ্ট চুকিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই ধূমনিবারণের আরও ২।১টী উপায় আছে। তন্মধ্যে ১ম উপায়—উহার উপর প্রচুর জলবর্ষণ, আর ২য় উপায়—শুষ্ক গোময় বা তৃণগুলিকে একবারে জ্বালাইয়া দেওন। তবেই এই হইল যে, গৃহস্থিত ধূমরাশিকে সম্যক্ দূর করিতে হইলে হয় সেই প্রজ্জ্ব-লিত তৃণগুলিকে বাহিরে ফেল, নচেৎ তাহার উপর প্রচুর বারিবর্ষণের ব্যবস্থা কর, অথবা তাহাদিগকে একবারে ভস্ম হইতে দাও। অন্যথা নিশ্চি-তই তোমাকে ঘরে বসিয়া চক্ষে ধোয়া লাগাইতেই হইবে এবং হয়ত তজ্জন্য তোমার চক্ষু লাল হইয়া অবশেষে তুমি অন্ধদশায় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পার।

এখন সুচতুর জ্ঞানবান্ পাঠক বুঝুন যে, বর্ত্তমান ইংরাজরাজত্বে আমাদের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান এবং স্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও পরপ্রসাদ-প্রিয় অধি-বাসীগণের মধ্যে কুষ্ঠরোগের দমন অথবা লেডীডফরীন্ ফণ্ডদ্বারা স্ত্রীরোগ নিবারণ করিতে যাওয়া ঠিক্ এই গৃহস্থিত তৃণরাশি হইতে উত্থিত ধূমের দূর

করার ন্যায় কি না? যদি বল যে, এত বড় একজন মহাপ্রতাপশালী রাজা, যাঁহার বুদ্ধিকৌশলে এমন একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ করতলস্থিত হইয়া নিঃশব্দে সুশাসিত হইতেছে, দেশের বড় বড় আমীর ওমরাহ ও মহারাজগণ যে রাজার সেই সুশাসনকার্য্যের প্রাণপণে সহায়তা করিতেছেন, মোট কথা যে দেশের মনুষ্যপদবাচ্য ব্যক্তিমাত্রেই যে কুণ্ঠ আইন বা লেডী ডফ্‌রীন্ ফণ্ডের সম্যক্ পক্ষপাতী, সেই দেশেজাত তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ লেখকের এ সর্ব্ব বাক্য প্রলাপবাক্য ভিন্ন কি আর কিছুই নহে? নচেৎ এত বড় বড় লোক থাকিতে কাহারও হৃদয়ে যাহা অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, অপিচ যাহা একটী উৎকৃষ্ট সৎকার্য্য বলিয়াই সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস, সে স্থলে তোমার ন্যায় একজন অদূরদর্শী কবিরাজের পক্ষে দেশ শুদ্ধ প্রধান প্রধান লোকের স্থিরীকৃত সৎকার্য্যকে অসঙ্গত কার্য্য বলিতে যাওয়া বড়ই অন্যায়। হাঁ অবশ্য স্বীকার করি যে, দেশের গণ্যমান্য লোক যে পথের নিয়ত পথিক, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণী সেই পথকে অন্যায় পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ভয়ানক ভুল, যথার্থই অসঙ্গত; কিন্তু ইহার মধ্যে একটী অতি সূক্ষ্ম কথা আছে, সে কথাটী যথার্থ এতই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম যে, স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যদি আমাদের ন্যায় মহাপাপীর সম্মুখে সেই কথা উপস্থিত করেন, তথাপি আমরা নানাকারণে এরূপ অন্ধ হইয়া বসিয়াছি যে, তাহা কোন মতেই দেখিতে পাইব না, এমন বধিরতায় উপস্থিত হইয়াছি যে, কোন মতেই তাহা শুনিতে সক্ষম হইব না। যদি বল যে কথাটা এতই কি সূক্ষ্ম, যাহা ভগবান্ আসিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও আমরা তাহা দেখিতে বা বুঝিতে অসমর্থ হইব? অথবা না, তাহা প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম কথা নহে, তাহা গুরুমন্ত্রের এক আধটী কথার ন্যায় হ্রীং হ্রাংও নহে। তবে তাহা কি? তাহা বেদ, বেদান্ত, মহাভারত, রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি হিন্দুজাতির সহস্র সহস্র বৎসরের সুগভীর চিন্তাপ্রসূত অনন্ত সাগর প্রবাহের ন্যায় পর্ব্বতাকার শাস্ত্র সকল। যে শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বে হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ ভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতি অদ্যাপিও পৌঁছিতে পারেন নাই। তবেই দেখ হিন্দুর বেদাদি শাস্ত্রসকল পর্ব্বতাকার এবং হিন্দুর সুগভীর উপদেশ সকল বজ্রনিনাদের ন্যায় সুগম্ভীর হইলেও আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যশীল ও মহাপাপীগণের চক্ষু এতই অন্ধ হইয়াছে, কর্ণ এতই বধির হইয়াছে যে,

সে সকল পর্ব্বতাকার জ্ঞানপূর্ণ শাস্ত্রসকল সেই ঘোর বজ্রনিনাদের ন্যায় গম্ভীর উপদেশসমূহ আমরা আজ্ দেখিতে বা শুনিতে একবারেই অসমর্থ হইয়াছি।

যদি প্রকৃতপক্ষেই আমরা তাহা না হইব, তবে কি আজ আমরা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, আদর্শজীবনের গৌরবস্থানীয় ও দয়াধর্ম্মের অবতারস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈটকখানারূপ মহাসাগরস্থিত অষ্টাদশাধিক আলমারীরূপ ভাণ্ডারে লণ্ডন, জর্ম্মাণ, রোম, আমেরিকা, আফ্রিকা ও রুস্ প্রুস্ প্রভৃতি বিভিন্নদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রত্নরূপ গ্রন্থসকলদ্বারা পূর্ণ বিরাজমান দেখিতে পাইতাম? আহা! আমাদের একজন বিচক্ষণ বন্ধু সে দিন এই সাগরাদির সমালোচনা উপলক্ষে ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"ভারতবর্ষে এমন একজন লোক দেখিতে পাই না, যিনি আত্মহারা হইয়া হাওয়ায় না চলেন"। কথাটী শুনিতে অতি তুচ্ছ বটে, কিন্তু চিন্তা করিলে জ্ঞানবানের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। কেননা ভারতবাসী আত্মজ্ঞানহারা এবং হাওয়ায় চলিয়াই যে আজ সর্ব্বনাশের শেষসীমায় পৌঁছিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। আর ইহাও অত্যন্ত জ্বলন্ত সত্যকথা যে, বর্ত্তমান ভারতের কি সাগর মহাসাগর, কি নদ নদী, কি দীঘী পুষ্করিণী বা কি ডোবা কূপ, সমস্তই এই হাওয়াতে অহরহ সঞ্চালিত হইতেছে এবং ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, ভগবান্ যদি একবার কৃপাপূর্ব্বক কোনমতে এই হাওয়ায় চলা রোগটা দূর করিয়া দিয়া ভারতবাসীকে আবার আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেন, তবেই দেখ, যে সোণারভারত, অচিরাৎই আবার সেই সোণার ভারতে পরিণত হয় কি না। কিন্তু এ সকল অতি দুরাশার কথা। সুতরাং ইহার আলোচনা ছাড়িয়া আবার সাগরমন্থনে নিযুক্ত হই। অথবা কেবল বিদ্যাসাগর বলিয়া কেন, একটু গভীর চিন্তাতে আমরা জ্ঞানসাগর, রত্নসাগর, ক্ষীরসাগর বা লবণসাগর, ভালমন্দ যে কোন সাগরকেই যখনই মন্থন করিতে যাই, দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে দেশীয় মণিমুক্তাপূর্ণ এমন একটী সাগরও দেখিতে পাই না, যাহাতে স্নান করিয়া যাহার গণ্ডূষমাত্র বারি পান করিয়া শরীর শীতল ও এ দুরন্ত পিপাসার নিবারণ করি!!! তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা যথার্থই অন্ধ, যথার্থই বধির হইয়াছি। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ও ভগবন্! এ কালমাহাত্ম্যে এখন দেখি-

তেছি যে, মহাজন যে পথে গিয়াছিলেন এখন সেই সকল পথই পূর্ণমাত্রায় অপস্থা। কেবল অপথ নহে, তাহাতে কাঁটা বোঝাই; সুতরাং তাহাতে পদ-ক্ষেপপর্য্যন্ত করিবার যোটী নাই। অথবা আর অনর্থক অরণ্যে রোদন করিয়া কি ফল আছে? মরুভূমিতে বীজবপন করিয়া তাহা হইতে কি কেহ শস্যোৎপত্তির আশা করিতে পারেন? তবে অবশ্য ফল আছে, অবশ্য আশা করিতে পারেন, যদি রোদনের পূর্ব্বে অরণ্যকে গৃহ এবং বীজবপনের পূর্ব্বে মরুভূমিকে জলাভূমি করিয়া লইতে সমর্থ হন্। কিন্তু সে অমানুষিক শক্তি বা সে ঐশ্বরিকবলসম্পন্ন করিয়া আর কি ভারতে কোন ব্যক্তিকে ভগবান্ পাঠাইবেন? বোধ ত হয় না, বুদ্ধিতে ত কোনমতেই আসে না, অথবা ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সুতরাং এ সমস্ত ভবিষ্যৎ আলোচনা আমাদের ন্যায় অতি ক্ষুদ্রপ্রাণীর পক্ষে কোনমতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু কি করিব? আর যে চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যথার্থই বলিতেছি যে, প্রাণে আর কোনমতেই সহ্য হয় না। অথবা প্রাণেরই বা অপরাধ কি? যখন স্পষ্টতঃ অহরহ চখের উপর দেখিতেছি যে, যে হিন্দু বা মুসলমান নামধারী ব্যক্তি কেবল কথায় নিজকে হিন্দু বা মুসলমান প্রতিপন্ন করিয়া যথার্থপক্ষে প্রকৃত হিন্দুয়ানী বা মুসলধর্ম্মের দিকে ভ্রমেও লক্ষ্য করে না, সেই অখাদ্যভোজী, সেই কদাচারী, সেই বেশ্যাসংসর্গী, সেই অযথা পরদারসেবনকারী, সেই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত পশুবৎ ব্যক্তিরই রক্তদোষ জন্মিয়া ভয়ঙ্কর মহাব্যাধি বা কুষ্ঠরোগ জন্মে এবং অবশেষে চৌদ্দপুরুষপর্য্যন্ত নরকগামী করে। নচেৎ যথার্থ বল দেখি, কোন্ হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ সাত্ত্বিক ব্যক্তি বা প্রকৃত মুসলমানধর্ম্মী কোন্ মুসলমান ব্যক্তি কুষ্ঠরোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে? আমার বোধ হয় যে, প্রকৃত স্বধর্ম্মে থাকিলে যাহার যে ধর্ম্ম তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিলে কোনমতেই এ সমস্ত মহাব্যাধি মানবদেহ অধিকার করিতে পারে না। অধিক কি, কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি হওয়া দূরে থাকুক্, স্বধর্ম্মে চলিলে যদি কোনরূপ দৈব ব্যাঘাত না ঘটে, তবে কোনপ্রকারের রোগই মানবদেহ স্পর্শমাত্রও করিতে সমর্থ হয় না। একথা যে আজ্ আমিই বলিতেছি না, তাহা নহে, হিন্দুর পরম সুহৃৎ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহুকাল পূর্ব্বেই এই সকল কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষ্যকারীবিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী ভবত্যরোগঃ॥
অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃতপ্রযত্নং কৃতাদরং নিত্যমুপায়বৎসু।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তিরোগাস্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তিদৈবং॥"

অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন হিতজনক আহার বিহার করেন। যিনি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করেন, বিষয়ে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি দাতা, সমদর্শী, সত্যপর, ক্ষমাবান্ এবং যিনি আপ্ত * ব্যক্তির সেবা করেন, রোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, যিনি অলভ্য অর্থাৎ লাভের অযোগ্য অর্থের জন্য যত্ন করেন না, অথচ লাভের যোগ্য অর্থের প্রতি যিনি হতাদর না করেন, সে সমস্ত ব্যক্তিও রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন্ না। কিন্তু যদি সে সময় কোন প্রকার দৈব ব্যাঘাত না ঘটে। তবেই জ্ঞানবান্ পাঠক বুঝুন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর উপদেশ কি? কোন্ পথে প্রকৃতপক্ষে চলিলে তবে শারীরিক বা মানসিক রোগ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তুমি সকাল নাই সন্ধ্যা নাই গৃহস্থিত প্রাণাধিকা স্ত্রীর প্রাণে দারুণ আঘাত প্রদান করিয়া উপদংশ-গ্রস্তা বারাঙ্গনার সহিত স্বীয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অর্থবলে আপ-নাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিবে, তুমি এ নিদারুণ গ্রীষ্মপ্রধানদেশে পদে পদে শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া ঘৃতদুগ্ধ বা আলু পটোলাদি এমন সমস্ত স্বর্গীয় অমৃত খাদ্য থাকিতেও পচা মুরগী বা গোমাংস নিতান্ত না হয় পচা ইলিশ মৎস্য দ্বারা অহরহ উদর পূর্ণ করিবে, সুতরাং বাপু তোমার রক্তদোষ না হইয়া তোমার কুষ্ঠরোগ না জন্মিয়া তবে কি ভট্টপল্লীর ভট্ট মহাশয়দিগের এ রোগ জন্মিবে? না নবদ্বীপের ন্যায় বা শিরোরত্ন মহাশয়দিগের এ সমস্ত রোগ জন্মিতে পারে? অথবা অত অধিক কথার দরকার কি? কুষ্ঠ-রোগের কার্য্যকারণ বিচার ত বহু জ্ঞান বা বহু দূরের কথা। একবার

---

* এ সমস্ত শ্লোকের সর্ব্বসাধারণ-বোধ্য বঙ্গানুবাদ করিতে হইলে এই দুই শ্লোক-দ্বারাই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এখানে তাহা সম্ভবে না, সুতরাং স্থানান্তরের আমরা সাধারণের যে বাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকিলাম।

শব্দটী লইয়াই বিচার করা যাউক না কেন। কিন্তু সে বিচার ত সর্ব্বাগ্রেই করিয়াছি। তথাপি আবার বলিতেছি যে, যে মহাত্মা যে গভীর জ্ঞানশালী ঋষি এই কদর্য্য রোগকে "কুষ্ঠ" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমরা সেই পরম পূজনীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় ঋষিচরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করি। কেন না তিনি ধ্যানবলে তিনি যোগবলে অথবা যেরূপেই হউক, নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা কু-কদর্য্যে বিষয়ে ত্তিষ্ঠতি অর্থাৎ থাকে, তাহাই কুষ্ঠ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কু-কদর্য্য আহারবিহারী হয়, তাহারই কুষ্ঠরোগ জন্মে, সুতরাং এই কুশব্দ আহার, বিহার বা পানীয় প্রভৃতির যাহাতে সংযোগ করিবে, অধিক কি, যাহারই মূল কু হইবে, তাহাই কুষ্ঠরোগের কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। বলা বাহুল্য যে, হিন্দু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সমস্ত কারণকে কুষ্ঠরোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তই এই কু অর্থাৎ কদর্য্যমূলক এবং সেই জন্যই মূল-রোগ ব্যাখ্যার পূর্ব্বে "কুষ্ঠ" এই আখ্যা প্রদান করিয়া পরে কারণ ও কার্য্যতত্ত্বাদির খবর লইয়াছেন। অতএব দেখা যাউক্, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কুষ্ঠোৎপত্তির কারণ কি? আয়ুর্ব্বেদ বলেন——

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাং॥
ব্যয়ামমতিসন্তাপমতিভুক্ত্বা নিষেবেণাং।
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাং॥
অজীর্ণাধ্যশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাং।
নবান্নদধিমৎস্যাতি লবণাম্লনিষেবিণাং॥
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীর গুড়াশিনাং।
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা॥
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টা স্ত্বগ্রক্তমাংসমম্বু চ॥
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্তচৈকাদশৈব চ॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলির কেবল অক্ষরানুবাদ করিয়া দিলে, চিকিৎসান-ভিজ্ঞ এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি, উহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিবেন না। অত-এব বিশদব্যাখ্যার জন্য স্থলে স্থলে একটু বিস্তৃতভাবে তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশের প্রয়োজন। প্রথম দুই শ্লোকের অক্ষরানুবাদ এইরূপ—

"যাহারা বিরোধী অন্নপান সেবন করে, যাহারা দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন করে, যাহারা বমনবেগ এবং অন্যান্য (অর্থাৎ মলমূত্রাদির) বেগ রোধ করে, যাহারা অতিরিক্ত ব্যায়াম করে, অতিরিক্ত ভোজন করে, যাহারা (বহ্নি রৌদ্রাদির) অতিসন্তাপ সহ্য করে এবং ঘর্ম্ম শ্রম ও ভয়ার্ত্ত হইয়া যাহারা অবিলম্বে শীতলজল পান বা তাহাতে অবগাহন করে।"

এখন বিরোধী অন্নপান সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথমতঃ অন্নপান শব্দের অর্থ বুঝা আবশ্যক। অন্ন শব্দে এস্থলে কেবল ভাত নহে। ভাত ডাল, রুটী লুচি, ব্যঞ্জন উপকরণ, ফল মূল, মৎস্য মাংস প্রভৃতি শরী-রের পুষ্টিকর যাবদীয় কঠিন আহারীয় পদার্থকে বুঝিতে হইবে। পান বলিতে দুগ্ধ জল, ঘৃত মদ্য প্রভৃতি যাবদীয় তরল পদার্থ যাহা পান করা যায়, তৎসমস্তকে বুঝিতে হইবে। তারপর, বিরোধী অন্নপান কাহাকে বলে দেখা যাক্। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চারিপ্রকার বিরোধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সংযোগবিরোধ, দেশবিরোধ, কালবিরোধ ও মাত্রাবিরোধ। যে সকল খাদ্য একত্র আহার করিলে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণোৎপাদন করিয়া বিষতুল্য কার্য্য করে, তাহাদিগকে বিরোধী অন্ন কহে, এবং ঐরূপ দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র ভোজনের নাম বিরোধী অন্নাহার। এই বিরোধী অন্নের বহুল দৃষ্টান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিলেই চলিবে। চরকে উক্ত হইয়াছে—'ন মৎস্যান্ পয়সা সহাভ্যবহরেৎ।' 'দুগ্ধের সহিত একত্র মৎস্য ভোজন করিবে না।' অত এব এই দুগ্ধ ও মৎস্য একত্র ভোজন করার নামই বিরোধীভোজন। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ফলোৎপাদক অন্নপানাদি ভোজন কুষ্ঠরোগের একটি কারণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরূপ বিরোধের নাম সংযোগবিরোধ। দেশভেদে কোন কোন অন্নপানীয় বিরুদ্ধ গুণাবলম্বন করে, তাহার নাম দেশবিরোধ। কালভেদে অর্থাৎ ঋতুবিশেষে যে বিরোধ হয়, তাহার নাম কালবিরোধ। আর মাত্রাভেদে যে বিরোধ, তাহার নাম মাত্রাবিরোধ। ইহা ছাড়া, কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতই শরীরের পক্ষে বিরোধী আছে। সে সকল অন্নপান বিরোধী বলিয়া গণ্য। দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্যের অর্থ সহজ হইলেও

বলা আবশ্যক যে, দ্রব অর্থে জলবৎ তরলপদার্থ, স্নিগ্ধ অর্থে স্নেহ বা তৈলময় পদার্থ, আর গুরু অর্থে গুরুপাক, অর্থাৎ পিষ্টকাদি খাদ্য বুঝিতে হইবে।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের অর্থ—

"অজীর্ণ (অর্থাৎ অপক্ক অন্নাদি) যাহারা ভোজন করে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে যাহারা পুনর্ভোজন করে; পঞ্চ কর্ম্ম (অর্থাৎ বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরুহন ও নস্যক্রিয়া) এই সকলের অপচার (অর্থাৎ অবিহিতানুষ্ঠান) যাহারা করে; নবান্ন, দধি, মৎস্য, লবণ ও অম্লদ্রব্য যাহারা অতিশয় ভোজন করে; মাষকলাই, মূলক, পিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড় যাহারা অধিক পরিমাণে ভোজন করে; ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হইতেই যাহারা স্ত্রীসহবাস করে; দিবাভাগে যাহারা অধিক নিদ্রা যায়।"

উপরের দুই শ্লোকে "পঞ্চ কর্ম্মের অপচার" কাহাকে বলে বুঝা উচিত। পঞ্চ কর্ম্ম কি, উপরে তাহা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চ কর্ম্মের অপচার অর্থাৎ অবিহিতাচার করায় অনিষ্ট আছে। বমন করা আবশ্যক হইয়াছে, বমনকারক ঔষধ খাওয়ান হইল, কিন্তু সম্পূর্ণমাত্রায় খাওয়া হয় নাই। তাহাতে ফল এই যে, কেবল বমনেচ্ছায় শরীর বিকৃত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইল, কিন্তু বমন হইল না এবং তজ্জনিত ফলও পাওয়া গেল না। অথবা কতক বমন হইল; যে পরিমাণে বমন হইলে উপকার হইত, তাহা না হইতে হইতেই বমননিবারক ঔষধে বমন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহারই নাম বমনসম্বন্ধে অপচার বা অবিহিতানুষ্ঠান। বিরেচনসম্বন্ধেও এইরূপ নানাপ্রকার অপচার হইতে পারে। অনুবাসন অর্থে তৈলঘৃতাদির দ্বারা বিরেচনার্থ পিচ্‌কারী প্রয়োগ, নিরুহন অর্থে ক্বাথসংযোগে পিচ্‌কারী প্রয়োগ। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই; ঐ পঞ্চ কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রবিরোধী যে কিছু আচরণ, তাহাকেই পঞ্চ কর্ম্মাপচার বলা যায়। এই পঞ্চকর্ম্মাপচারে কুষ্ঠরোগের সূত্রপাত হইতে পারে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ—

"গুরু ব্রাহ্মণের অপমান যাহারা করে, পাপকর্ম্ম (মহাপাতকাদি) যাহারা করে; তাহাদের বাত, কফ, পিত্ত এই ধাতুত্রয় দূষিত হইয়া (শরীরস্থ) ত্বক্, রক্ত, মাংস ও অম্বু অর্থাৎ লসীকধাতু দূষিত করে। এই সপ্তক (অর্থাৎ বাতপিত্ত কফদোষত্রয় এবং ত্বক, রক্ত, মাংস ও অম্বু এই দূষ্যচতুষ্টয়) কুষ্ঠরোগের সংক্ষেপ কারণ। এবং ইহা হইতেই সপ্ত ও একাদশপ্রকার (অর্থাৎ অষ্টাদশপ্রকার) কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে।"

ক্রমশঃ—

কবিরাজ সম্পাদক।

পরীক্ষা-তত্ত্ব।

কবিরাজীমতে।

কোথায় বা চিকিৎসক অসাধ্য ব্যাধি * সাধ্য জ্ঞান করিয়া "আমি নিশ্চয় এ রোগীকে রোগ মুক্ত করিব, তাহাতে কোন সংশয় নাই।" এবম্বিধ বহু আড়ম্বরপূর্ণ অসম্ভববচনাবলী বিন্যস্ত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কোথায় রোগীর রোগমুক্ত, রোগীর জীবনমুক্ত করিয়া চিকিৎসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার কোথায় বা চিকিৎসক সাধ্যব্যাধি অসাধ্য বিবেচনা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। আবার অনেক স্থলে চিকিৎসককর্ত্তৃক যথার্থরূপে রোগ নিরূপিত এবং তদুপশমনার্থ বিহীত-ভেষজ প্রদত্ত হইলেও যথাযোগ্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সমুদয়েরকারণ কি? অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চিকিৎসক কেবল অন্তর্দৃষ্টি বিরহিত হইয়াই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন অথবা আরোগ্যার্থে আকুল হইয়া ফললাভের আশায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রোগীর বিশেষ কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। রোগীর যথারূপে প্রকৃতি, সত্ব, অগ্নি, শরীর, বল, সার, সাত্ম্য, আহার, বয়, কুল, জাতি, আয়ু এবং দেশ, কাল, ভেষজ প্রভৃতি নিরূপিত না হইলে চিকিৎসক যে প্রতিপদে পশ্চাদ্গামী হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এজন্য আচার্য্যগণ, ব্যাধির নিদান, সংপ্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংখ্যা, বিধি, বিকল্প প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রকৃতি, সত্ব, প্রভৃতি অবশ্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

---

* অসাধ্য ব্যাধি দ্বিবিধ। এক যাপ্য অসাধ্য, দ্বিতীয় প্রত্যাখ্যেয় অসাধ্য। যে ব্যাধিতে সাধ্য লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ উপস্থিত এবং সত্ব ও আয়ু অক্ষীণ হইলে; হিত আহার বিহারদ্বারা যাহার যাপ্য করা যাইতে পারে, তাহাকে যাপ্য অসাধ্য ব্যাধি কহে। আর যে ব্যাধি সাধ্য ও যাপ্য ব্যাধির লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ উদিত হয়। অপিচ ঔৎসুক্য ও ইন্দ্রিয় নাশ হয়, মোহ, অরতি এবং অরিষ্টচিহ্ন অর্থাৎ মরণনিশ্চয়াত্মক চিহ্নগুলি উপস্থিত হইলে, তাহাকে প্রত্যাখ্যেয় অসাধ্য ব্যাধি বলা যায়। এরূপ স্থলে প্রত্যাখ্যেয়রূপ অসাধ্য রোগ বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসকের অভিনিবেশ পূর্ব্বক যথার্থরূপে প্রকৃত্যাদি পরীক্ষা করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্য অর্থাৎ এরোগ সুখসাধ্য কি কষ্টসাধ্য, অসাধ্য ব্যাধি যাপ্য কি প্রত্যাখ্যেয়; অপিচ দোষ ও দূষ্যানুসারে রোগের গতি, বল, পরিণাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নির্ণয় করতঃ চিকিৎসায় প্রবেশ বা নিবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। চিকিৎসক অমনোযোগিতাবশতই হউক অথবা অজ্ঞতাপ্রযুক্তই হউক, যিনি প্রকৃত্যাদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না হইবেন, তিনি কখনই রোগোপশম করিতে পারেন না এবং লোকসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। (১)

পাঠকগণ;—সর্ব্ববিধ চিকিৎসকই কি প্রকৃত্যাদি পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসারম্ভ করিয়া থাকেন? যদি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণই পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন; তাহা হইলে হাতুড়ে চিকিৎসক অজ্ঞতাপ্রযুক্ত পরীক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও হাতুড়ের চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যাইতেছে? সুতরাং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সুচিকিৎসক ও হাতুড়ের চিকিৎসায় প্রভেদ এবং প্রকৃত্যাদি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনই বা কি? এরূপ অবশ্যই বলিতে পারেন, তদুত্তরে বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রজ্ঞানকুশল ও হাতুড়ে চিকিৎসকের কি পরীক্ষাদি কার্য্য, কি চিকিৎসা কার্য্য লইয়া, কোন বিষয় বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যদিও কখন কখন ব্যাধিতের প্রকৃত্যাদি অপরীক্ষক অজ্ঞচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিৎ রোগীর রোগমুক্ত হইতে দৃষ্ট হয়; তাহার মধ্যে বিশেষ তারতম্য আছে। এই তারতম্যের বিষয় দৃষ্টান্তদ্বারা বলা যাইতেছে। মনে করুন যেমন ধনুর্ব্বিদ্যায় অশিক্ষিত এক ব্যক্তি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া, ফল পল্লবে-বিভূষিত উচ্চ শাখসমন্বিত বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট বিহঙ্গমকে উদ্দেশ করিয়া শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলে যেমন দৈবাৎ এক বাণদ্বারা বিহঙ্গম শরীর বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। সেইরূপ মুর্খ চিকিৎসক দৈবাৎ কোন

(১) অগ্রে পরীক্ষ্যং ততোঽনন্তরং কার্য্যার্থী প্রবৃত্তিরিষ্টা তস্মাদ্ভিষক্‌কার্য্যং। চিকীর্ষুঃ প্রকার্য্যসমারম্ভাৎ পরীক্ষায়াঃ কেবলং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্যার্থং কর্ম্মসমারম্ভেৎ কর্ত্তুঃ॥

চরক-সংহিতা।

আধ্যান ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিয়া অতি মানোন্মত্তে শত শত নিয়তায়ুষ্ক ব্যক্তিকে নিহত করিয়া থাকে। (২)

এইরূপে সংক্ষেপে অজ্ঞচিকিৎসকদিগের চিকিৎসার কথা বলা হইল। এই হাতুড়েদিগের চিকিৎসা দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদের অসারতা প্রতিপাদনেচ্ছুক হইয়া হটাৎ একটা বলিয়া ফেলা অনুচিত। আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ এই হাতুড়েদিগকে প্রাণহন্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাযেই হাতুড়ে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ এমন কি চিকিৎসক নামে বাচ্য হইতে পারে না। এই প্রাণহন্তা হাতুড়ের সদৃশ বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসককে কল্পনা করাও অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলিব?

ইহা বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, কবিরাজদিগের মধ্যে যেমন কবিরাজ নামধারী হাতুড়ে আছে, তেমনি ডাক্তারদিগের মধ্যেও হাতুড়ে ডাক্তার বাবু আছেন। ডাক্তার আবার প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এক এলোপ্যাথি ২য় হোমিওপ্যাথি। হাতুড়ে ডাক্তার বাবু এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথি সম্প্রদায়ে অধিক দেখা যায়। হোমিওপ্যাথি সম্প্রদায়ে হাতুড়ের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের এমন কোন শক্তি নাই যে, রোগের লক্ষণানুসারে উচিত ঔষধ প্রয়োগ না হইলেই বা মাত্রার তারতম্যে ঔষধের ক্রিয়ায় রোগীর অন্যবিধ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু রোগের উচিত ঔষধ প্রয়োগ হইলে ব্যাধির উপশম হয়। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দিগের মনে দৃঢ়বিশ্বাস ঔষধ যথার্থরূপে নির্ব্বাচিত হইলে, নিশ্চয় ব্যায়রামের শান্তি হইবে এবং অনুপযুক্ত প্রয়োগ হইলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে না অথবা হইতেও পারে বটে—যে ঔষধ অনুরণুরূপ অতি সূক্ষ্মত্বহেতু যিনি কেবল মদ্যবিশেষ (Alcohol) মধ্যে বিরাজমান; ঔষধের বর্ণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, এজন্য অরূপ, রস রসনেন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধি এজন্য অরস, ঘ্রাণ গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরাজয় এজন্য অগন্ধ, এবম্বিধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের 'অতীত পদার্থ' এক হোমিওপ্যাথি ঔষধকে বলা যাইতে পারে। রূপাদি যাহা কিছু উপলব্ধি হয়, তাহা

(২) যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুষং।
ভিষগ্জ্ঞানী নিহন্ত্যাশু শতান্যনিয়তায়ুষাম্॥

চরক-সংহিতা।

ঔষধের আধার পদার্থ এল্‌কোহল নামক মদ্য। ফলতঃ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হোমিওপ্যাথি ঔষধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অগ্রাহ্য ও অভিনব পদার্থ বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষতায় প্রসূত হইয়াছে। কিন্তু এলোপ্যাথি ঔষধ রোগানুসারে যথার্থরূপে নির্ব্বাচন ও মাত্রা নিরূপিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, নচেৎ ইষ্ট হইতে অনিষ্ট হইয়া পড়ে। অসাবধান হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ যাওয়া দূরের কথা, প্রাণান্ত হইতে পারে, এজন্য এলোপ্যাথি ডাক্তারদিগের যথাজ্ঞানে রোগী ও রোগপরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; তাই এলোপ্যাথি সম্প্রদায়ে হাতুড়ে ডাক্তার বাবু হোমিওপ্যাথি সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প। কবিরাজ বা ডাক্তার, এই উভয়বিধ চিকিৎসকের মধ্যে হাতুড়ে আছে; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং হাতুড়ে কবিরাজ বা হাতুড়ে ডাক্তার বাবুদিগের রোগনির্ণয় বা চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া সম্প্রদায় বিশেষকে হাতুড়ে বলিয়া নির্দ্দেশ করা অদূর দর্শিতার ফল ভিন্ন আর কি বলিব? পরন্তু হাতুড়েদিগের চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়া কেবল অনর্থক সময় নষ্ট এবং বাতুলের প্রলাপ মাত্র বলা যাইতে পারে। কেন না অযথা অসার বাক্যে, সত্যের অবমাননা ভিন্ন, সত্যের সম্মান রক্ষা হইতে পারে কি? আমি সামান্য একজন হাতুড়ে কবিরাজ বা ডাক্তারের চিকিৎসা দেখিয়া বলিলাম "কবিরাজেরা বা ডাক্তারেরা চিকিৎসাবিষয়ে কিছুই জানে না" পাঠকগণ বলুন দেখি, আমি সামান্য একজন হাতুড়ের চিকিৎসা দেখিয়া বলিলাম ডাক্তারেরা বা কবিরাজেরা কিছুই জানে না; কেবল আমি নিজের অনভিজ্ঞ দোষে সত্যের অবমাননাকরি অথবা আমার হৃদয়নিলয় কেবল অসূয়া-পরিপূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম হটাৎ এক কথা বলিয়া ফেলা অনুচিত। কবিরাজ ও ডাক্তার উভয় সম্প্রদায়ে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। উভয়বিধ চিকিৎসকেই যথাজ্ঞানপূর্ব্বক চিকিৎসাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এইক্ষণ হাতুড়ে ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসার প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

কথাগুলি অতি বিস্তৃত হইলেও নিদানতত্ত্বের ও চিকিৎসাতত্ত্বের কথা গুলি বলিবার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; এজন্য অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। যেমন ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অভ্যাসশীল ধানুষ্ক ধনুগ্রহণপূর্ব্বক বাণ যোজনা করিয়া অতি সমীপস্থ বৃহৎ শরীর অনায়াসে বিদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য

হইয়া থাকেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন ক্রিয়াভিজ্ঞ চিকিৎসক, রোগের প্রকৃতি (বাতাদিদোষ) দোষভেদে রোগের সংখ্যা, দোষের বৃদ্ধি ক্ষয়জনিত অংশাংশ বিকল্প, রোগের নিদান বিভেদ অর্থাৎ এই রোগ প্রকৃতি কোন হেতুবিশেষ দ্বারা প্রকুপিত হইয়াছে. যেমন রুক্ষ, লঘু, শীতাদিক্রিয়া বাতপ্রকোপের হেতু। রোগের লক্ষণবিশেষে অর্থাৎ এই রোগের এই গুলি স্বলক্ষণ এবং এই গুলি উপসর্গিক লক্ষণ। এমন অনেক রোগ আছে পূর্ব্বরূপ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলে, অনেক স্থলে মৃত্যুরোগ বলিয়াই অনুমান করা যায়, একারণ পূর্ব্বরূপ এবং রোগটী কোন দূষ্য আশ্রয় করিয়া কোন দেশে ও কোন কালে উৎপত্তি হইয়াছে ইত্যাদি নিদানতত্ত্বের পরীক্ষা বিষয়ক সম্যক্‌তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা রোগনির্ব্বাচন, রোগের দোষ দূষ্য প্রভৃতি অবগত হইয়া রোগীর প্রকৃতি. সত্ব. অগ্নি, শরীর, বলপ্রভৃতি কিরূপ, এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ অতি সূক্ষ্ম অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া. রোগের বলাবল, গতি, সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া থাকেন; অপিচ এবম্বিধ ব্যাধিতের ব্যাধিতে এই ঔষধ এই মাত্রায় এইরূপ যোগযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় যথাযোগ্য ক্রিয়াবান্ এবং ব্যাধির শান্তিবিধানে সমর্থ হইবে ইত্যাদি বিনিশ্চয় করিয়া যথাকালে চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হইলে নিশ্চয় রোগীর রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। কখন তাঁহার স্খলিতগতি হইতে হয় না। (৩)

পাঠকগণ.—বিজ্ঞ চিকিৎসকের ও হাতুড়ের চিকিৎসকের কতদূর প্রভেদ—তাহা দেখুন। একারণ আচার্য্যগণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন "বরমাত্মাহতোঽজ্ঞেন ন চিকিৎসা প্রবর্ত্তিতা॥" * এজন্য প্রকৃতি প্রভৃতি অত্যাবশ্য-

(৩) দূষ্যং দেশং বলং কালমনলং প্রকৃতিং বয়ঃ।
সত্ত্বং সাত্ম্যং তথাহারমবস্থাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
সূক্ষ্মসূক্ষ্মাঃ সমীক্ষ্যৈষাং দোষৌষধনিরূপণে।
যো বর্ত্ততে চিকিৎসায়াং ন স স্খলতি জাতুচিৎ॥
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।
প্রকৃত্যাদিভেদেন যোগস্য প্রায়ো ভেদোভবতি॥
আয়ুর্ব্বেদদীপিকাঃ।

*এই কথা গুলির বিস্তৃত বিবরণ অত্র প্রবন্ধে সম্ভবে না; এজন্য বিরত হইলাম। বারান্তরে এসম্বন্ধে "চিকিৎসক" নামক প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কীয় পরীক্ষণীয় তত্ত্বগুলির পরীক্ষা করিবার কারণ এই "পরীক্ষাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের অবতরণা করিলাম। এবং ক্রমশঃ এসম্বন্ধে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

কয়রা,
পাবনা। } শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ।

কবিরাজ সম্পাদকের মন্তব্য।

ভাষাবিৎ পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে হয়ত তাদৃশ সুখী হইতে পারিবেন না। না হওয়ার কারণ এই যে, প্রবন্ধটীতে পদে পদেই ভাষার শ্রুতিকটু ইত্যাদি দোষ ঘটিয়াছে, কিন্তু ভাষা ভাল না হইলেও আলোচ্য বিষয়টী বড়ই উপযোগী। সুতরাং কেবল সেই উপযুক্ততার প্রতি সম্যক্ নির্ভর করিয়াই আমরা এরূপ ভাষাযুক্ত প্রবন্ধ সম্মিলনীতে স্থানদান করিলাম। অতএব আশা করি যে, ভাষাবিৎ পাঠক, এজন্য বিরক্ত না হন্। আর লেখক-মহাশয়ও ভবিষ্যতে ভাষার লালিত্য ও সহজবোধ্য বিষয়ে একটু যত্নবান্ হইয়া প্রবন্ধ লিখিলে আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইব। চি, স, ক, স,

---

নাসিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহাকে লোকে সচরাচর "নাসারব্যাম" বলে, তাহাকেই নাসারোগ বলিয়া অভিহিত করিলাম। ইহার নিদানসম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা লিখিত হইল। কবিরাজীমতে নাসারোগ কি, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞসহযোগী কি বিবেচনা করেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

সুইডেনের একজন ডাক্তার দেখাইয়াছেন যে, নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে স্মরণশক্তি কম পড়ে। একটী বালকের নাসিকার ভিতর টিউমর (অর্ব্বুদ) হইয়াছিল, তাহাতে সেই বালক তাহার পড়াশুনা মনে করিয়া রাখিতে পারিত না, অপিচ ক্রমে ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কম হইতে লাগিল।

তারপর ঐ অর্ব্বুদ উৎপাটন করিবার পর তাহার স্মরণশক্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ হইল। অতএব নাসিকদ্বার দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার উপকার অসীম।

ঘ্রাণ ও আস্বাদনের হ্রাস হওয়া নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ হওয়ার একটী লক্ষণ। আমাদিগের সর্দ্দি লাগিলে আমরা কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ বা আস্বাদ টের পাই না।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে মানুষ তোতলা হইতে পারে অথবা তাহার গলার স্বর বিকৃত হইতে পারে।

নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ হইলে অথবা নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ (পনিপস্) জন্মাইলে, হাঁপ ও শ্বাস কাশের পীড়া জন্মাইতে পারে। ১৮৭১ অব্দে ভল্-টোলিনি নামক একজন ডাক্তার প্রকাশ করেন যে, নাসিকার পনিপস্ হইলে হাঁপ জন্মাইতে পারে। নাসিকার পনিপস্ উৎপাটন করার পর অনেকের হাঁপরোগ একবারেই সারিয়া গিয়াছে।

নাসিকার মধ্যে যে সকল অর্ব্বুদ হয়, উহাদিগকে নাসিকার পনিপস্ কহে। এই সকল অর্ব্বুদ মধ্যম টর্বিনেটেড্ বডি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে কর্ত্তন করিতে হইলে পনিপস্ ফর্সেপ দিয়া কার্য্য সমাধা করার প্রথাই প্রচলিত আছে। কিন্তু তদপেক্ষা ভাল উপায় এই যে, প্রথমে কোকেন দ্রবদ্বারা ঐ স্থানের বোধশক্তি হরণ করিয়া পরে ওয়ারস্নেয়ার (Wirc ancre) দ্বারা অর্ব্বুদ কাটিয়া দেওয়া উচিত।

নাসিকা পথে এডিনয়ড্ ভেজিটেসন্ (অর্ব্বুদবিশেষ) জন্মাইলে বধিরতা রোগ জন্মাইতে পারে।

ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য।

বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, সহযোগী মহাশয়ের অনুরোধে এই সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যমতে "নাসা" বা নাসিকারোগের বিষয় যথাশক্তি কিছু বলিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবারে তাহা কোন মতেই পারিয়া উঠিলাম না। কেননা একেই ত সময়াভাব, তাতে আবার সহযোগী আমাকে যে কুণ্ঠ-

কীয় পরীক্ষণীয় তত্ত্বগুলির পরীক্ষা করিবার কারণ এই "পরীক্ষাতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের অবতরণা করিলাম। এবং ক্রমশঃ এসম্বন্ধে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

কয়রা, পাবনা। } শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ।

কবিরাজ সম্পাদকের মন্তব্য।

ভাষাবিৎ পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে হয়ত তাদৃশ সুখী হইতে পারিবেন না। না হওয়ার কারণ এই যে, প্রবন্ধটীতে পদে পদেই ভাষার শ্রুতিকটু ইত্যাদি দোষ ঘটিয়াছে, কিন্তু ভাষা ভাল না হইলেও আলোচ্য বিষয়টী বড়ই উপযোগী। সুতরাং কেবল সেই উপযুক্ততার প্রতি সম্যক্ নির্ভর করিয়াই আমরা এরূপ ভাষাযুক্ত প্রবন্ধ সম্মিলনীতে স্থানদান করিলাম। অতএব আশা করি যে, ভাষাবিৎ পাঠক, এজন্য বিরক্ত না হন্। আর লেখক-মহাশয়ও ভবিষ্যতে ভাষার লালিত্য ও সহজবোধ্য বিষয়ে একটু যত্নবান্ হইয়া প্রবন্ধ লিখিলে আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইব। চি, স, ক, স,

---

নাসিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহাকে লোকে সচরাচর "নাসারব্যাম" বলে, তাহাকেই নাসারোগ বলিয়া অভিহিত করিলাম। ইহার নিদানসম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা লিখিত হইল। কবিরাজীমতে নাসারোগ কি, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞসহযোগী কি বিবেচনা করেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

সুইডেনের একজন ডাক্তার দেখাইয়াছেন যে, নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে স্মরণশক্তি কম পড়ে। একটী বালকের নাসিকার ভিতর টিউমর (অর্ব্বুদ) হইয়াছিল, তাহাতে সেই বালক তাহার পড়াশুনা মনে করিয়া রাখিতে পারিত না, অপিচ ক্রমে ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কম হইতে লাগিল।

তারপর ঐ অর্ব্বুদ উৎপাটন করিবার পর তাহার স্মরণশক্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ হইল। অতএব নাসিকদ্বার দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার উপকার অসীম।

ঘ্রাণ ও আস্বাদনের হ্রাস হওয়া নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ হওয়ার একটী লক্ষণ। আমাদিগের সর্দ্দি লাগিলে আমরা কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ বা আস্বাদ টের পাই না।

নাসিকা অবরুদ্ধ হইলে মানুষ তোতলা হইতে পারে অথবা তাহার গলার স্বর বিকৃত হইতে পারে।

নাসিকাদ্বার অবরুদ্ধ হইলে অথবা নাসিকার ভিতর অর্ব্বুদ (পনিপস্) জন্মাইলে, হাঁপ ও শ্বাস কাশের পীড়া জন্মাইতে পারে। ১৮৭১ অব্দে ভল্-টোলিনি নামক একজন ডাক্তার প্রকাশ করেন যে, নাসিকার পনিপস্ হইলে হাঁপ জন্মাইতে পারে। নাসিকার পনিপস্ উৎপাটন করার পর অনেকের হাঁপরোগ একবারেই সারিয়া গিয়াছে।

নাসিকার মধ্যে যে সকল অর্ব্বুদ হয়, উহাদিগকে নাসিকার পনিপস্ কহে। এই সকল অর্ব্বুদ মধ্যম টর্বিনেটেড্ বডি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে কর্ত্তন করিতে হইলে পনিপস্ ফর্সেপ দিয়া কার্য্য সমাধা করার প্রথাই প্রচলিত আছে। কিন্তু তদপেক্ষা ভাল উপায় এই যে, প্রথমে কোকেন দ্রবদ্বারা ঐ স্থানের বোধশক্তি হরণ করিয়া পরে ওয়ারস্নেয়ার (Wire ancre) দ্বারা অর্ব্বুদ কাটিয়া দেওয়া উচিত।

নাসিকা পথে এডিনয়ড্ ভেজিটেসন্ (অর্ব্বুদবিশেষ) জন্মাইলে বধিরতা রোগ জন্মাইতে পারে।

ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য।

বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, সহযোগী মহাশয়ের অনুরোধে এই সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যমতে "নাসা" বা নাসিকারোগের বিষয় যথাশক্তি কিছু বলিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবারে তাহা কোন মতেই পারিয়া উঠিলাম না। কেননা একেই ত সময়াভাব, তাতে আবার সহযোগী আমাকে যে কুণ্ঠ-

হাঙ্গামায় ফেলিয়াছেন, তাহাতেই প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা-হউক, তথাপি যেরূপে হউক, আগামীবারে সহযোগীর অনুরোধ রক্ষা করিতে সাধ্যমত যত্ন করিব। চি, স, ক, স।

সূতিকা তরুজ্বর বা পচাজ্বর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

উত্তাপ ও নাড়ী সমতা করিবার জন্য টীং ভেরট্রেম্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। টীং ভেরট্রেম্ প্রয়োগ করিতে হইলে অল্পমাত্র সুরাসার (এল্-কোহল) এবং মর্‌ফিয়ার সহিত প্রয়োগ করা উচিত। তাহা হইলে আর বমন প্রভৃতি উপসর্গ জন্মাইতে পারে না। ইহা ১০ হইতে ১৫ মিনিম্ মাত্রায় প্রতি দুই ঘণ্টান্তর দিতে পারা যায়। কিন্তু নাড়ীর বেগ কমিলেই বন্ধ করা উচিত, আমরা খুব্ অল্পমাত্রায় যেমন ৩ মিনিম্ মাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি নাড়ীর স্পন্দন ১৩০ থাকে, তবে ৯০ হইবামাত্র উক্ত ঔষধ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি রোগীর অত্যন্ত বমনোদ্বেগ থাকে এবং অতিশয় দুর্ব্বল হয় বা তাহার হাতপা শীতল থাকে কি অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয়, তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা নিষেধ। ব্রাণ্ডি সরাপ ও উত্তাপনিবারক, অনেক রোগীতে ইহা প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ দুর্ব্বলাবস্থায় ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। রোগী দুর্ব্বল হইয়া যখন নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত হয়, তখন ভেরেট্রম্ না দিয়া ব্রাণ্ডি দেওয়াই উচিত, কিন্তু যখন নাড়ী কঠিন, দ্রুত থাকে এবং রোগী সবল থাকে, তখনই কেবল ভেরাট্রম্ প্রয়োগ করা যায়।

রোগীর শরীরে শীতল জল বা বরফ জল প্রয়োগ উত্তাপ নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। শীতল বরফজলে মোটা বস্ত্র ভিজাইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উহাদ্বারা আবৃত করিয়া তাহার উপর কম্বল দিয়া জড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাকে ওয়েট্‌প্যাকিং (Yetpacking) বলে। এই অবস্থায় মস্তকেও শীতল বরফজলের পটী দিতে হইবে এবং পদদ্বয়ে মষ্টার্ডবাথ্ দিতে হইবে। গরমজলে মষ্টার্ড গুলিয়া তাহাতে পদদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে। তারপর রোগীর উত্তাপ সাধনে রোগীর প্যাক্ খুলিয়া দিয়া গরমজলে তোয়ালে বা

স্পঞ্জ ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া রোগীর গা মোছাইয়া দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে। ১৫ কি ২০ মিনিটের বেশী রোগীকে ওয়েট্‌প্যাকে রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে বিশেষ ধরাধরি করিয়া চিকিৎসা করায় আজ কাল দুই একটী সুতিকাতরুণজ্বর ভাল হইতেছে।

রোগীর বল রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক রোগীর এরূপ বমনোদ্বেগ বা বমীর বেগ থাকে, যে যাহা খাইতে দেওয়া যায়, তাহাই তুলিয়া ফেলে, এরূপস্থলে গুহ্যদ্বার দিয়া রোগীকে আহার দেওয়া উচিত।

এইরূপ গুহ্যদ্বার দিয়া খাওয়ানকে নিউট্রিয়েণ্ট এনিমেটা দেওয়া কহে। রেক্‌টম্ বা মলনাড়ীর কোন কোন দ্রব্য পরিপাক করার ক্ষমতা আছে। এজন্য যেখানে রোগীর পেটে আহার তলায় না, বা রোগীর আহার্য্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না, সে সকল স্থলে আহার্য্যদ্রব্য পীচকারীদ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। এই আহার দেওয়ার পূর্ব্বে অগ্রে সাবান ও উষ্ণ জলের পীচকারী দিয়া মলদ্বার ধৌত করিতে হইবে, তাহাতে মলপ্রভৃতি নির্গত হইয়া গেলে তার পর পীচকারী-দ্বারা তরল আহার্য্যদ্রব্য গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা ডিম্বের ঘেলু, দুগ্ধ অথবা মাংসের যূষ, ব্রাণ্ডি বা এল্‌কোহলের সঙ্গে মিশাইয়া পীচকারী দিবে। অনেক সময়ে তরলদ্রব্য পীচকারী করিয়া দিবামাত্র নির্গত হইয়া পড়ে। এই সকল স্থলে রিচার্ডসনের বিক্‌সপেজিটরী মলদ্বারে দেওয়া যাইতে পারে। বড় বড় ইংরেজ ঔষধালয়ে ইহা পাওয়া যাইতে পারে। (Richerdsons Pehtomied Beefsappositoris) সপোজিটরী একরূপ বড়ীর ন্যায় ঔষধ, উহা গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে গলিয়া যায় এবং উহার কতকাংশ মলনাড়ীরদ্বারা শরীরে শোষিত হইয়া কার্য্য করে।

বোমী বা বমনোদ্বেগ থামাইবার জন্য যে সকল প্রচলিত উপায় আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে।

কিছুতেই বোমীর বেগ নিবারণ না হইলে পাকস্থলীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। অতি অল্পমাত্রায় খুব গরমজল খাইতে দিলে বমন আশ্চর্য্যরূপে নিবারণ হয়। জল এমন গরম হওয়া চাই যে, ওষ্ঠে ও জিহ্বায়

উত্তাপ লাগে। রোগীর অত্যন্ত জলপিপাসা হইলে এইরূপ গরমজল অল্প-পরিমাণে খাইবে, মাঝে মাঝে খাইতে দিলে অচিরে পিপাসা নিবারণ হয়। যেখানে রোগীর পিপাসা কিছুতেই নিবারণ হয় না, সেখানে পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা জল বা বরফজল না দিয়া খুব গরমজল একটু একটু খাইতে দিলে পিপাসা কমিয়া যায়।

তার পর পেটের পীড়া একটী উপসর্গ; এরূপ হইলে বিস্‌মথ, অহিফেন, পল্‌ভকাইনো কম্পাউণ্ড প্রভৃতি ঔষধ দিবে।

তার পর উদরস্ফীতি একটী কঠিন উপসর্গ। ২০ মিনিম মাত্রায় টার্পিন প্রয়োগ করিলে এক মাত্রাতেই নিবারণ হইতে পারে।

জরায়ু ধৌত করিয়া দেওয়া খুব কর্ত্তব্য, তাহা সকল চিকিৎসকেই অবগত আছেন।

একবার রোগী আরোগ্যোন্মুখ হইয়া পুনশ্চ উত্তাপবৃদ্ধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ জ্বর ফিরিলে আয়রন্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া, ক্লোরেট্ অব পোটাসিয়ম্, নক্‌সভমিকা প্রভৃতি প্রয়োগদ্বারা ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য।

এরোগ বা ইহার চিকিৎসা-সম্বন্ধে এলোপ্যাথিমতে যাহা বক্তব্য, বোধ-হয় সুবিজ্ঞ সহযোগী মহাশয়ের তাহা বলা শেষ হইল। আমাদেরও এসম্বন্ধে যে কিছুই বলিবার নাই এমত নহে, কিন্তু সে বক্তব্যের মাত্রা এত অধিক যে, আপাততঃ আমরা তাহা বলিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আশাকরি, সুধীর পাঠক একটু অপেক্ষা করিবেন। চি, স, ক, স।

অবলা-বান্ধব।

উপক্রমণিকা।

ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং সহিষ্ণুতা যদি আজও ধরাধামে বিদ্যমান থাকে, সুশীলতা, সতীত্ব এবং লজ্জাশীলতার বিষয় যদি এপর্য্যন্তও বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন

না হইয়া থাকে; তবে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, এই সকল মহদ্‌গুণরাশি একমাত্র ভারতবাসিনী সৎকুলসম্ভূতা হিন্দুমহিলাদিগেরই পবিত্র হৃদয়ে মুক্তাফলকের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবল-স্রোতে অবিরত যত্ন করিলেও ইহা ভাসাইয়া লইতে পারিতেছে না অথবা ভাসাইয়া লইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এখনও ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তিই রক্ষা করিতে পারেন। হতভাগ্য বাবুগণ তাহা করিবেন কি? যথাসময়ে গৃহকার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিয়া অতিথি অভ্যাগতের যথোচিত সেবাসুশ্রূষাদি নির্ব্বাহ করিতে, মাতৃমুখ প্রত্যাশী দুগ্ধজীবী শিশুদিগকে নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া পরিবারস্থ দশ-জনের মন যোগাইয়া চলিতে, হিন্দু-মহিলা ভিন্ন জগতে আর কোন্ দেশীয় কোন্ জাতীয় রমণী শিক্ষা করিয়াছে? এতাদৃশ স্বর্গীয় পবিত্রভাব আর কোন্ দেশীয় রমণীর অন্তঃকরণে বিরাজ করিতে পারে? ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি যতগুলি সুসভ্য অসভ্য দেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকল দেশীয় রমণীই কেবল নামে মাত্র রমণী। কিন্তু রমণী শব্দের যে অর্থ কি, তাহাও তাঁহারা জানেন না। কেবল আপন আপন সুখসৌভাগ্যের জন্যই সকলে লালায়িত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বামীর সৌভাগ্য—স্বামীর সুখের প্রতিও কেহ দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, এই সকলের ছিটা ফোটা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া পবিত্র ভারতরাজ্যে আসিয়া বিষম চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইয়া দিতেছে। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন, হিন্দু-শাস্ত্রেও কিছু কিছু বর্ণিত আছে। কিন্তু রাহু-রূপী বাবুগণ আর তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আপাততঃ এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া কোন ফল নাই। নব্যশিক্ষিত বাবুগণ সভ্যতার অনুরোধে যাহাই কেন না বলেন, যদি তাঁহারা একবার ধীরভাবে স্থির-বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে, ধর্ম্মই হউক, কর্ম্মই হউক, আর পাতিব্রত্যই হউক, যাহা কিছু সংসারের আশ্রয়—রমণীকুলের অঙ্গভূষণ, একমাত্র হিন্দু-মহিলা ভিন্ন তৎসমুদায়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী ভূমণ্ডলে আর কেহই হইতে পারে না। একে ত নানাবিধ গৃহকার্য্যের জন্যই বঙ্গমহিলাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার উপর আবার সময় সময় দুই একটী ব্যাধির যন্ত্রনাতেও তাঁহা-

দিগকে জ্বালাতন করিতে ত্রুটি করে না। অন্যান্য দেশীয় উগ্রচণ্ডা ভৈরবী-দিগের অপেক্ষা বঙ্গমহিলাগণ স্বভাবতঃ নম্রমুখী এবং লজ্জাশীলা। তাঁহারা স্বামী ভিন্ন এবং ছোট ছোট আত্মীয়স্বজন ভিন্ন বয়োধিক্যা অন্য স্ত্রীলোকের সহিতও বাক্যালাপ করেন না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের এমন একএকটী পীড়া আছে, যে তাহার প্রকৃত অবস্থা অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। সুতরাং চিকিৎসকের দ্বারা সেই সমুদায় পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎ-সাও কখনো সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যখন হিন্দুরদেশে হিন্দুর আধিপত্য অটল ছিল, যখন হিন্দুরাজা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পাপের দণ্ড পুণ্যের পুর-স্কার প্রদান করিতেন, যখন সমাজ সুদ্ধ সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য-পালনে ক্ষণকালের জন্যও বিমুখ হইত না, তখন এই লজ্জাশীলতাই সুবর্ণ হীরকখচিতের ন্যায় হিন্দুমহিলাদিগকে অপূর্ব্বসাজে সাজাইয়া তুলিত। প্রাচীনকালে রমণীদিগের কোনও পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য আর তাঁহাদিগকে অন্য কাহারো নিকট যাইতে হইত না। গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা করিবার সময়েই স্ত্রীরোগসমূহের প্রতীকারের বিষয়ও শিখিয়া রাখি-তেন। স্ত্রীলোকদিগের যে বয়সে যে যে পীড়া এবং তাহার যে যে অবস্থায় যে সকল ঔষধ প্রশস্ত, তাহা পূর্ব্বতন মহিলাগণ একবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং পীড়া হইলে আর তদ্বিষয়ে পুরুষেরা কিছুই জানিতে পারিত না। আজকাল আমাদের দেশের এমনি দুরবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে যে, সকলেই বিলাতী বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া দিবারাত্রী কেবল বিজ্ঞানচর্চ্চায় সময়াতিপাত করিতেই খুব ভালবাসেন, কিন্তু জীবন-ধারণের প্রধান উপযোগী—নিত্য প্রয়োজনীয় ধান্যগোমাদি শস্য যে কি প্রকার গাছ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার কিছুই বলিতে পারেন না। আবার তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীদিগের কথাই বা কি বলিব! তাঁহারাও বিজ্ঞান আলোচনায় কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না! উত্তপ্ত জলের মধ্যে দাইল নিঃক্ষেপ করিলে যখন তাহা উতলাইয়া উঠে, তখন কি উপায় অবলম্বন করিলে যে সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, তাহাও বাবুপত্নীগণ দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছেন। তবে আর শরীর রক্ষার জন্য ঔষধাদির কথাই বা মনে করিয়া রাখিবেন কিপ্রকারে? সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলকেই চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণও লজ্জাবশতঃ অনেক

কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং ব্যাধিপীড়িতা রমণীও বাক্যদ্বারা প্রকৃত কথা বলিতে বা নিজ শরীরের যথার্থ অবস্থা দেখাইতে পারেন না। এই সমুদায় কারণবশতঃ অনেক স্থলে চিকিৎসকের সাতিশয় বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং যথার্থ রোগনির্ণয় না হওয়ায় সময় সময় অনেক পরিবারের বিষম অত্যাহিত হইতেও বাঁকি থাকে না। যাহাতে রমণীগণ নিজের অবস্থা নিজেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যে সকল ঔষধ নিতান্ত উপযোগী, তাহা সুন্দররূপ বুঝিতে পারেন, আমি তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ গ্রন্থ এবং নানাপ্রকার তন্ত্র হইতে সারসঙ্ক-লন করিয়া এই অবলা-বান্ধব অবনীমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিতেছি। অশীতি পর বৃদ্ধা গৃহিণীর নিকট হইতেও যে সকল দৃষ্টফল ঔষধের বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহাও এতন্মধ্যে সন্নিবেশিত করা যাইবে। এইক্ষণ আমরা প্রার্থনা এই যে, বিঘ্নবিনাশন গণপতি যেন ইহার নামের স্বার্থকতা সম্পাদনে কোনপ্রকার বিঘ্নপ্রদান না করেন। ক্রমশঃ—

নাকালিয়া পাবনা, } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অবলা-বান্ধবের উপক্রমণিকা পড়িয়া সুখী হইলাম। "যাহাতে রমণী-গণ নিজের অবস্থা নিজে বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা দ্বারা শীঘ্র আরাম হইতে পারেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অবলম্বন ও বৃদ্ধা গৃহিণীর নিকট হইতে তাহা জানিয়া সমস্তই ক্রমশঃ লিখিব" লেখক মহাশয়ের একথা গুলি বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। ভাল লাগার বিশেষ কারণ এই যে, তাঁহার লিখিত "ধাত্রী-বিদ্যায়" সে ক্ষমতার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এপ্রব-ন্ধের দ্বারাও যে সাধারণে সুখী হইবেন, সে আশা বিলক্ষণ করিতে পারি। কিন্তু দেখিবেন—যেন প্রতিভঙ্গ না হয় এবং আমাদের এই চাটুবাক্যে আসল কার্য্যে ব্যাঘাত না ঘটে। চি, স, ক, স।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ।

এণ্টিপাইরিন—এণ্টিপাইরিন একটী উত্তাপনিবারক ঔষধ। প্রায় ৬ বৎসর হইল ইহা প্রচলিত হইয়াছে। এই ৬ বৎসর মধ্যে ইহা একটী

অতি উৎকৃষ্ট উত্তাপনিবারক ঔষধ বলিয়া ডাক্তারসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এই ঔষধটী নানাদেশের হাসপাতালে এবং নানা ডাক্তারদিগের হাতে পরীক্ষিত হইয়াছে। অথচ প্রায় কোন স্থানেই ইহাতে কুফল প্রসব করে নাই। যতপ্রকার উত্তাপনিবারক ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে এণ্টিপাইরিণের তুল্য একটীও নাই। এখন যে এণ্টিফেব্রিন এবং ফিনামেটিন (যাহা এক্ষণে কেবলমাত্র পরীক্ষিত হইতেছে) তাহাও এণ্টিপাইরিণের তুল্য নহে। ঔষধের মাত্রায় অর্থাৎ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইহা খাইতে তাদৃশ কষ্ট নাই। ইহার কার্য্য নিশ্চিত, ক্বচিত বিফল হয়। শীঘ্র শীঘ্র উত্তাপ লাঘব করে। যত দিন না অন্য কোন ভাল ঔষধ আবিষ্কৃত না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত এণ্টিপাইরিনকেই উত্তাপনিবারক ঔষধ মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অতি কষ্টদায়ক স্নায়ুরোগে (যেমন নিউর‍্যাল্‌জিয়া, শিরঃপীড়া প্রভৃতি) এণ্টিপাইরিণের তুল্য ঔষধ আর নাই।

সেরিব্রো স্পাইনাল মেনিন্‌জাইটিস্ নামক ভয়ানক জ্বরবিকার যাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা আক্রান্ত হয়, তাহাতে এণ্টিপাইরিন উত্তাপ নিবারণ করিয়া এবং মস্তকের যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া উপকার করে। ডাক্তার এন্‌ষ্টীফেন বলেন যে, সেরিব্রো স্পাইনাল মেনিন্ জাইটিস্ রোগে যে ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া প্রভৃতি যন্ত্রণা হয়, তাহা বিদূরিত করিতে এণ্টিপাইরিণের অসীম ক্ষমতা। অহিফেন, বেলাডোনা, ব্রোমাইড্ এবং একনাইটের যেমন যন্ত্রণানিবারক ক্ষমতা আছে, ইহারও সেইরূপ আছে। ডাক্তার ষ্টীফেন্ বলেন যে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় তিন বার করিয়া প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

কিন্তু এণ্টিপাইরিণ অবসাদক ঔষধ শ্রেণিমধ্যে পরিগণিত। এজন্য কোন্ কোন্ স্থানে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) হৃদয়ের দুর্ব্বলতা থাকিলে এণ্টিপাইরিণ দিবে না।

(২) ডিপ্‌থিরিয়া এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ উপসর্গ যাহাতে হৃদয়ের পীড়া থাকে।

(৩) অতিরিক্ত রক্তস্রাবে নিষিদ্ধ।

(৪) স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন এবং বাধকের বা কষ্টরজের ব্যামতে এণ্টিপাইরিণ দিতে নাই।

নিউমোনিয়া রোগে এণ্টিপাইরিণ দিতে নাই। বিশেষতঃ ক্যাটারান নিউমোনিয়া। লোবার নিউমোনিয়াতে দিলে তত হানি নাই, কিন্তু তাহার সহিত ফুস্‌ফুস্‌শোথ (ইভিমা অব্ লঙ্গ) বর্ত্তমান থাকিলে কদাচ দিবে না।

(৬) আইথিস্ রোগের শেষাবস্থায়।

(৭) কোন দুর্ব্বল অবস্থায় ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অনেক জ্বরভোগ করিয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এণ্টিপাইরিণ দিবে না।

ডাক্তার গেজ বলেন যে, প্রত্যেক নূতন রোগীতে এণ্টিপাইরিণ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় দিবে। তার পর তাহার ফল দেখিয়া হয় ঔষধ বেশীমাত্রায় দিবে বা বন্ধ করিবে।

বরণনগরের ডাক্তার ডেম্ বলেন "গুরুতর ডিপ্‌থিরিয়া পীড়াতে এণ্টিপাইরিণ প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু উহাতে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা উপস্থিত করিয়া বিপদ আনয়ন করে। বিশেষতঃ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে সচরাচর হৃদয়ের পীড়া (সাওকার্‌ভাইটিস্) থাকে। যে সকল রোগী স্বাভাবিকই দুর্ব্বল এবং যাহাদিগের হৃদয়যন্ত্র দুর্ব্বল বা পীড়াগ্রস্থ, সেখানে এণ্টিপাইরিণ দিবে না।

প্যারিনগরের ডাক্তার লিয়ন আর্‌ডুইন বলেন "যে সকল ব্যক্তির হৃদয় দুর্ব্বল তাহাদিগের সম্বন্ধে এণ্টিপাইরিণের কথা মনেও করিতে নাই। যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল তাহাদিগকে প্রথমতঃ খুব অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। সেইরূপ যক্ষ্মাকাসের রোগীকেও খুব অল্পমাত্রায় দিবে। সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে গেলে প্রত্যেক নূতন রোগীতে খুব অল্পমাত্রায় এণ্টিপাইরিণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, সে এণ্টিপাইরিণ সহ্য করিতে পারে কি না।"

ডাক্তার হুচার্ড একটী কষ্টরজপীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোককে ১৬ গ্রেণ এণ্টিপাইরিণ দিয়াছিলেন, তাহাতে কষ্টরজ ভাল হইল বটে কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কম্পদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সকল উপসর্গ অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে নিবারণ হইল। তিনি আরও দুইটী কষ্টরজপীড়াগ্রস্থ স্ত্রীলোককে এণ্টিপাইরিণ দিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ পীড়াতে এণ্টিপাইরিণ সহ্য হয় না।

এণ্টিফেব্রিন (Antifberin)—এণ্টিপাইরিণের পর এণ্টিফেব্রিন জ্বরঘ্ন ও উত্তাপনিবারক ঔষধ বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। এণ্টিপাইরিণ অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু। ইহার ক্রিয়া প্রায়ই এণ্টিপাইরিণের ন্যায়। অনেক স্নায়ু রোগবশতঃ যন্ত্রণাদায়ক পীড়াতেও ইহা উপকারক। সম্মিলনী পত্রিকায় একবার ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এণ্টিফেব্রিন্ জলে দ্রব হয় না, এজন্য ইহা প্রয়োগ ভারি অসুবিধা, বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে ইহা এলকোহলে দ্রব হয়। আর দ্রব হয় নাইট্রিক্ইথরে। স্পীরিট্ অব্নাইট্রস্ইথর সঙ্গে এণ্টিফ্রেব্রিন্ মিশ্রিত করিলে পরিষ্কার স্বচ্ছ জলবৎ ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ফিনাসেটিন্—(Phenacetin) প্রায় বৎসরাবধি প্রচলিত হইয়াছে। ইহাও এণ্টিপাইরিন্ এবং এণ্টিফেব্রিণের ন্যায় জ্বরঘ্ন এবং উত্তাপনিবারক। ইহার গুণ সম্যক্রূপে এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। (Chenmiceally) ফিনাসিটিন দ্রব্যটী এণ্টিফ্রেব্রিণের ন্যায়ই একটী দ্রব্য। ইহা গরম এবং শীতলজলে অল্প দ্রবণীয়।

পাকস্থলীর পাচকরসে অথবা প্যান্ক্রিয়াস্ নামক যন্ত্রের রসেও ইহা তাদৃশ দ্রবণীয় নহে। অথচ ইহা সেবন করিলে কিপ্রকারে যে এরূপ অসাধারণ শারীরিক কার্য্য উৎপন্ন করে তাহা অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই। ইহা যে কোনপ্রকারে হউক, শরীরস্থ হইয়া উত্তাপ লাঘব করে এবং নিউর্য়াল্জিয়া নামক পীড়ার যন্ত্রণাও নিবারণ করে। ভায়েনা নগরের ডাক্তার কব্লার প্রথমে ইহার উত্তাপনিবারক গুণ দর্শন করেন। ডাক্তার কব্লার ৫০টী জ্বররোগীতে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া ইহার নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

(ক) ইহার জ্বররোগের ভোগকালের উপর কোন ক্ষমতা নাই—অর্থাৎ জ্বরের ভোগকাল কম করে না।

(খ) কোন রোগীতেই বা কোন খারাপ উপসর্গ আনয়ন করে নাই।

(গ) অতি শীঘ্র শীঘ্র উত্তাপ লাঘব করে এবং উত্তাপ লাঘবকাল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। অল্প অল্প করিয়া বারে বারে প্রয়োগ করা অপেক্ষা ইহা বেশীমাত্রায় একবারে প্রয়োগ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

(ঘ) একবারে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগী দুর্ব্বল হয় না। ১০টী

চিকিৎসা-সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র।*

নিউমোনিয়া রোগীতে পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে হৃদয়ের ক্রিয়া দুর্ব্বল করে না।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের বক্তব্য।

প্রিয়তম পুলিনবাবু,

দয়া করিয়া ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনি আপনার এণ্টিপাইরীন্ নামক ঔষধের যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য গুণের বিষয় লিখিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, তৎসমস্তই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু দাদা! এই বীরশ্রেষ্ঠ ঔষধের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই আমার কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। কেননা মৃত এম্ ডি ডাক্তার ভগবান্ বাবুও একবার এই ঔষধের গুণের কথা শতমুখে বলিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে,ছোট বড় এমন এলোপ্যাথ্ডাক্তার কম আছেন, এণ্টিপাইরীনের নামে যাঁহার জিহ্বা দিয়া জল না পড়ে। অবশ্য প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া গুণের পক্ষপাতী হওয়া অন্যায় কথা নহে। কিন্তু আমাদের এই কবিরাজী চক্ষে কিছুদিন হইতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ যেন আর ওকথায় একটুও ভিজিতে চায় না। কেন না ইহার গুণ অসংখ্য থাকিলেও দুই একটী দোষের মাত্রা এত গুরুতর—এমনই ভয়ঙ্কর যে, তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সে দোষ আর কিছুই নহে, কেবল ইহার উত্তাপহারক ক্ষমতা লইয়া। অবশ্য স্বীকার করি যে, অত্যুত্তাপ বা ডিগ্রীপ্রাপ্ত রোগীকে সময় ও মাত্রা বুঝিয়া এণ্টিপাইরীন্ দিলে এমন কি ৫ বা ১০ মিনিটের মধ্যেই তাহার সেই ভয়ঙ্কর উত্তাপ বা ডিগ্রী দূর হইয়া শরীরের উত্তাপের অবস্থা স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, যদি ভাগ্যক্রমে তাহা না হইয়া অর্থাৎ উত্তাপের মাত্রা স্বাভাবিক না হইয়া অস্বাভাবিক অর্থাৎ কম হইয়া পড়ে, আর যদি বিধির বিপাকে আর

---

* চিকিৎসা-সম্মিলনীর এই দুই সংখ্যায় নিয়মিত আট ফর্ম্মা ছাড়া, এবার অতিরিক্ত দেড় ফর্ম্মা দেওয়া গেল। এই অতিরিক্তের ভিতর যাহা আছে, তাহা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া কাহারও বোধ হইলে সুতরাং মার্জ্জনীয়।

উপরে না উঠে, তখন উপায়? বলা অধিকন্তু যে, তখন প্রায়শঃ কাশীমিত্র বা নিমতলার ঘাট ভিন্ন আর কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি নিজে আর এসম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিতে চাহি না, কেন না আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। তথাপি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, এই ২।১০ লাইন টিপ্পনী লিখিতে লিখিতে যে ২।৪ জন বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধবের সহিত এই ঔষধের কথা তুলিলাম, দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে, "এই ঔষধপ্রয়োগে অমুক অমুককে মরিতে দেখিয়াছি। অমুক অমুককে মৃতপ্রায় হইতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। আর লেখক আমি নিজে এই ঔষধের সম্বন্ধে যাহা ২।৪ টী ভয়ঙ্কর ও অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি এবং তাহার ফলাফল চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহা আর বুদ্ধিমান্ পাঠককে বলিতে চাহি না। ফলতঃ ডাক্তারীতে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলেও আমি সাহসপূর্ব্বক এ কথা বলিতে পারি যে, আমাদের এই শাকভাতখেগো ও নিদারুণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অস্থিচর্ম্মসার লোকের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহারের ভীষণত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্টই জন্মিয়াছে; সুতরাং আমার এই জ্ঞানগ্রহণ সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ পাঠকই বিচার করিবেন। আমি আবার বলিতেছি যে, দুই বেলায় আহারের সময় নিতান্ত পক্ষে যে মহাত্মাদিগের উদরে প্রত্যহ ২।৪ টা মুর্গী কিম্বা বাছুর বা শূকরের মস্তক প্রবেশ করে, সেই মাংসাশী বীরপুরুষদিগের পক্ষে হয় ত এণ্টিপাইরীন্ ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু প্রতিগ্রাসে যাঁহাদের উদর ঘুষাচিঙ্ড়ীর মস্তক কিংবা নিতান্ত না হয় ২।১ খানা দাগামাছের অধিক প্রাপ্ত হয় না, প্রতি চর্ব্বণে যাঁহাদের দন্ত, পুঁই বা লাউ শাকের উপর উঠে না, সেই তালপাতার শিপাহী বাবুগণের পক্ষে এণ্টিপাইরীন্! তুমি প্রায়শঃ যথার্থই যমের সহোদরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাক বলিয়াই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। সুতরাং এই জন্যই তোমার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা বা প্রেম করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-প্রাণীর বিবেচনায় অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ করি। চি, স, ক, স।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

সম্পাদকীয়

কোষ্ঠবদ্ধরোগে পাকা বেল।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগটা ইংরাজরাজত্বে বিশেষতঃ সহরবাসীর মধ্যে যাঁহারা মানসিক পরিশ্রমে বড় মজবুদ, তাঁহাদের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন ধনী কম দেখি যিনি প্রাতঃকালে দান্তপরিষ্কাররূপ স্বর্গসুখের অধিকারী আছেন; এমন পণ্ডিতও বিরল, যিনি অর্থাভাবজন্য নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াও সকালসন্ধ্যা দান্তপরিষ্কাররূপ সহজলভ্য সুখের অধিকারী আছেন। আর ছোট বড় সাধারণ গৃহস্থের বাবুগণের মধ্যেও এমন একজন বাবু দেখি না, যাঁহাকে প্রাতের নিদ্রাভঙ্গের পর দান্তপরিষ্কারের জন্য অন্ততঃপক্ষে ২।১ ঘণ্টাকাল চা ও কাপিরূপ দেবগণের পূজা করিতে না হয়। কেন এমন হয়? কিজন্য যে এমন হয়, তাহার সূক্ষ্মতত্ত্বটুকু আজই বলিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় ও স্থানাভাবে তাহা পারিলাম না। তথাপি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, যে কারণেই হউক, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধরূপ কার্য্যের ধ্বংসের জন্য এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে প্রাণভরিয়া ইক্ষু-চিনি ও দুগ্ধ দিয়া সুপক্ক বেলের সরবৎ পান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কথাগুলি কতদূর সত্য। ৪।৫ দিনেই ফলভোগ করিবেন। পাকাবেলের সময় কিন্তু এই— ক্রমশঃ—

কবিরাজ সম্পাদক।

সমালোচনা।

চিকিৎসক।—চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্র, ডাক্তার বিনোদবিহারী রায় কর্ত্তৃক জেলা রাজসাহীর তালন্দগ্রাম হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য মাশুলসহ ১৷৷০ টাকা মাত্র। এই নব প্রকাশিত মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা

প্রাপ্ত হইয়া আমরা আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আহ্লাদের কারণ এই যে, চিকিৎসক ১ম সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রবন্ধ লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, প্রায় তৎসমস্ত গুলিতেই সত্য ও সাহসের কিছু কিছু পরিচয় আছে। আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সম্পাদক, ডাক্তার হইয়া পত্রিকাতে কিন্তু প্রায় আগাগোড়াই বদ্দিগিরির পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং নিজে ডাক্তার হইয়া তাঁহার কবিরাজীর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া আমরা যথার্থই চমৎকৃত হইয়াছি। তদ্ভিন্ন তাঁহার লিখিত সত্য ও সাহসপূর্ণ অবতরণিকা পাঠেও আমাদিগকে সুখী হইতে হইয়াছে। নিম্নে একটু নমুনা দিলাম;—

"আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় এখন কেবল একখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আরও পত্রিকা প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সেই খানেই পত্রিকাপ্রচারসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি হইতেছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকে দেখুন—কত অসংখ্য পত্রিকা তাহার উন্নতির জন্য প্রচারিত—কত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আর আমরা কি করিতেছি? কয়টা সভা স্থাপন করিয়াছি? কয়খানা পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে? কিছুদিন পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী নামক একখানি পত্রিকা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। বোধ হয় আহারাভাবেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক চিকিৎসা-সম্মিলনী আজ্ পর্য্যন্তও জীবিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহাকেও নিয়ম মত দেখা যায় না। তবুও দুই চারি মাস অন্তর তাহাকে যে দেখিতে পাওয়া যায়, টাকীর সুবিখ্যাত জমিদার পরম দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুগ্রহদৃষ্টিই তাহার একমাত্র কারণ। এই সমস্ত দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। যাহা হউক দেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, এরূপ নহে। লোকের মন চিরদিন সমান থাকে না, অবশ্যই একদিন না একদিন পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে।"

কথাগুলি একবারে বাজে কথা নয়। অতএব সত্যপরায়ণ পাঠক, এই টুকুর সত্যতা উপলব্ধি করিলেই সুখী হইব।

যুবতী বা স্ত্রী জীবনের আদর্শ এবং অপঘাত মৃত্যুনিবারণ।

সুপ্রসিদ্ধ পাক-প্রণালী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখ্যোপাধ্যায় প্রণীত "যুবতী বা স্ত্রীজীবনের আদর্শ" ও "অপঘাত-মৃত্যু নিবারণ" নামক দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক দুইখানিই গৃহস্থমাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয়; ভাষা প্রাঞ্জল, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যৌবনাবস্থায় কি নিয়মে চলিলে নারীজাতি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সুসন্তান লাভ করিতে পারিবেন এবং ধনী পরিবারগণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম দ্বারা সন্তান লাভে বঞ্চিতা হইয়া থাকেন, এই দুইটী গুরুতর বিষয় "যুবতী বা স্ত্রীজীবনের আদর্শে," অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের জীবন ও স্বাস্থ্য কেবলমাত্র তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে; ইহাতে স্বামী ও অপরাপর পরিবারবর্গের অংশ আছে; অতএব শরীর পালনে তাঁহাকে অবশ্যই যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য।" আলোচ্য গ্রন্থখানিতে নারীজাতির স্বাস্থ্য, ঋতুবিষয়ে অভিজ্ঞতা, গর্ভসম্বন্ধে জ্ঞান, গর্ভস্রাব নিবারণ, কৃত্রিম প্রসববেদনা, গর্ভধারণ সময় বা কাল, গর্ভসঞ্চারকাল ও প্রসবসময় নিরূপণ, গর্ভে পুত্র কন্যা গণনা, ধাত্রী বা শিশু বালিকা, প্রসবতত্ত্ব, প্রসবের আয়োজন, প্রসবের পরে বিশ্রাম, স্তন্যদান, স্তনদ্বয়, দুগ্ধজ্বর বা থুন্‌কোজ্বর, স্তনদানের সময় নির্দ্দেশ, স্তনদানকালে আহারের ব্যবস্থা, স্তনদানকালে প্রসূতির অবস্থান ও মানসিকভাব, সন্তান পোষণাবস্থায় প্রসূতির ঋতু এবং শিশুকে স্তনত্যাগ করাইবার উপায় ইত্যাদি অতি আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ লিখিত হইয়াছে।

"অপঘাতমৃত্যু-নিবারণ" গ্রন্থে লিখিত বিষয়গুলি যথা;—অগ্নিদাহ, জলমগ্ন, অহিফেণ সেবনে কিম্বা বিষপানে অপমৃত্যু, উচ্চ হইতে পতন, রেলওয়ে ট্রামওয়ে ও নৌকাদি যানসম্বন্ধীয় বিপদ, সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরাদির দংশন, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, গলায় দড়ী এবং বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিপদ নিবারণের অতি সহজ উপায় শিক্ষা। আমাদিগের বিবেচনায় গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এরূপ পুস্তকের আদর পাওয়া উচিত। যুবতী বা স্ত্রীজীবনের আদর্শ মূল্য ৸০ বার আনা। অপঘাতমৃত্যু নিবারণ মূল্য ॥০ আট আনা। এক সঙ্গে ক্রয় করিলে উভয় পুস্তকের মূল্য ১৲ এক টাকা

মাত্র। ডাকমাশুল /০ এক আনা। ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বি, বানর্জি গুপ্ত এবং কোং, কলিকাতা।

সংস্কৃতঃ একাক্ষর-কোষঃ।—শ্রীমৎপুরুষোত্তম দেব-বিরচিতঃ। কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিট্‌সরকারেণ সংশোধিতো ব্যুৎপত্ত্যা সহানুবাদিতশ্চ। কলিকাতা ৩৫ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্তদ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন। আমি কবিরাজ, কিন্তু কোষাদি বিদ্যায় পণ্ডিত নহি। এই গ্রন্থের সমালোচনে সুতরাং অক্ষম।

পাচন-চিকিৎসা।—বঙ্গানুবাদসহ। ইহাও উক্ত কোষানুবাদক বিট্‌-সরকার মহাশয়ের দ্বারা সংকলিত। মূল্য ১৲ টাকামাত্র। সহস্রাধিক পাচনের ব্যবস্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। পাচন অমৃত তুল্য বটে, কিন্তু এ হলা-হল-প্রবাহে অমৃতের ধারা কে মিশাইতে পারে?

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পরিচয়।—ঢাকা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীচিকিৎসা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব উপদেশক ডাক্তার শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা মাত্র। ডাক্তার মহাশয় গ্রন্থ-রচনাকার্য্যে নূতন ব্রতী, অতএব ভুলচুক হওয়া সম্ভব, এপরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন। বেশ কথা! কিন্তু তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন। সে ধন্যবাদের পাত্র হইতে আমরা সাহসী নহি। টাইটেল পেজে ১০।১২ ছত্র ইংরেজীর মধ্যে একটা বানানভুল, সূচীপত্রে বানানভুল, এগুলি না হয় ছাপাকরের উপর দিয়া গেল। কিন্তু গ্রহারম্ভের ১ম পত্রেই যে "বিশ্বাসী দোকান" হইতে ঔষধ কিনিবার ব্যবস্থা, সেটা ত গরীব ছাপা-করের উপর চাপাইলে চলিবে না। আর ২৮৮ পাতার গ্রন্থমধ্যে এরূপ ভুল ধরিয়া দিবার ব্যবস্থাটাও কি ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার নয়? তবু চিকিৎ-সার ভুল এখনও ধরি নাই।

জ্বরচিকিৎসা।—শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি, প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। মৈত্র মহাশয় যোগ্য লোক। গ্রন্থখানিও সাবধানে ও সযত্নে লেখা হইয়াছে বটে। কিন্তু যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

হোমিওপ্যাথিকমতে ওলাউঠারোগের সরল চিকিৎসা। শ্রীরুক্মিণীকান্ত দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। করটিয়া। মূল্য /০ এক আনা। ওলা-উঠা একটা উৎকটরোগ। কিন্তু উহার চিকিৎসাটা সরল বলিয়াই হয়ত, গ্রন্থকর্ত্তার বিশ্বাস আছে। নহিলে এক আনা মূল্যের অষ্টপত্র পরিমিত এক-খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি উহার প্রতিকারপ্রণালী লিখিয়া ছাপাইবেন কেন? এই আটপাতা পড়িয়া ওলাউঠা ব্যাধির চিকিৎসা বিষয়ে কাহারও অভিজ্ঞতা জন্মিবে কিনা, সে বিষয়ে মতপ্রদান করিতে আমরা সক্ষম নহি।

পুষ্পমেলা।—কলিকাতা সাতপুকুরের বাগানে ফুলের মেলা দেখিতে আমরা গিয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ ছিল না, তবু সাধ করিয়াই গিয়াছিলাম; এবং পত্রাভাবে অতিসন্তর্পণে দ্বারস্থিত সাহেব-প্রহরীর হাত এড়াইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলাম। বাবু বিবির বিহারে, ফুলের বাহার মিশিয়া বাগা-নের উৎসবশোভা বেশ খুলিয়াছিল বটে। কিন্তু এ উৎসবের ভিতর বিষাদ আসিল কেন? আমরা দেশীয় চিকিৎসক বা কবিরাজ। ফুল বল, লতা বল, ঔষধি বল গুল্ম বল, এ সকল দেখিতে শুনিতে আমাদের স্বার্থ আছে, আনন্দও আছে। কিন্তু আনন্দের ভিতরেও নিরানন্দ কেন? ঔষধের গাছগাছড়া এ ফুলমেলার ভিতর কৈ ত কিছু দেখিলাম না। দুই একটা যাহা ছিল, কোথায় কোন্ কোণে যেন ম্রিয়মাণা বর্ষীয়সী বিধবার মত সে ফুল্লমুখী কুসুমসুন্দরীগণের মধ্যে অনাদরে পড়িয়া আছে। সেই বিষাদ-দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে সে সময় আরও একটা ঘোরতর বিষাদের কথা মনে আসিল। ভাবিলাম, এই যে পুষ্পপ্রদর্শনী, ইহাতে কি প্রদর্শিত হইতেছে? প্রদর্শিত হইতেছে যে, দেশের ধান, চাল, দেশের ঔষধ পথ্য, উড়িয়া পুড়িয়া

চলিয়া যাক্! আমরা পেটে না খাইয়া, ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, ফুলময়ীকে ফুলহারে সাজাইয়া, ফুলশরের ফুলবাণে মত্ত হইয়া দেশোদ্ধার করিয়া বেড়াইব। দেশের বাবু বিবি, চোগা চাপকান, সাল দোশালা, গাউন চেনে ভূষিত হইয়া সেদিনকার সেই ফুলমেলায় লিপ্ত হইয়া এই চিত্রই বুঝি ফুটাইতে গিয়াছিলেন। দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, কুসুমমেলা প্রাণ ভরিয়া দেখা হইল না।

সংবাদপত্র সমালোচনা।—দেশীয় সংবাদপত্রে আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি আছে। সেই ভক্তির আধিক্যবশতঃই ভক্তির পাত্রে কোন দোষের লক্ষণ দেখিলে যেমন প্রাণে বাজে, কোন বিশিষ্ট গুণলক্ষণ দেখিলে হৃদয় তেমনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়। দোষের কথা ধরিয়া সকল সময় আমরা আলোচনা করি না বটে, কিন্তু গুণের কথা ব্যক্ত করিতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়। অন্ততঃ আজ একটা আনন্দের কথা ব্যক্ত করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বিগত ১৭ই ফাল্গুনের এডুকেশন গেজেটে প্রাপ্তপত্র স্তম্ভে "আচার প্রবন্ধ" নাম দিয়া যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ আমার চক্ষে এরূপ প্রবন্ধ কখনও পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ প্রবন্ধের অশেষ গুণ। উহা যেমন সারগর্ভ তেম্‌নি মধুরতাময়, যেমন ভাবপূর্ণ তেম্‌নি গাম্ভীর্য্যময়, যেমন পণ্ডিত্যসূচক তেম্‌নি নিরহঙ্কার, যেমন নিঃস্বার্থ তেম্‌নি তেজোময়, যেমন ধর্ম্মাত্মক তেম্‌নি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক যেরূপ শান্ত ও সুচতুরভাবে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে হিন্দুধর্ম্মের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যে সহৃদয়মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য ও জ্ঞানগম্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমবারে তাঁহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকা ভাগমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, লেখক তাঁহার বক্তব্য সকল এই ভাবে নিয়ত প্রকাশ করিয়া উৎকণ্ঠিত পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন।

কবিরাজ সম্পাদক।

৬ষ্ঠ খণ্ড। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। ১০, ১১ ও ১২শ সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯৬ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,

ও

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শিখরকুমার বসু এল্, এম, এস্। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। প্রাণগোবিন্দ রায় কবিরাজ। শ্রী—এবং সম্পাদকদ্বয়।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্ ৫নং, জ্যোতিঃপ্রকাশযন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯০।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনার হিসাবে এই তিন সংখ্যার একত্র নগদ মূল্য ১৵০ টাকা মাত্র।

সাধারণের দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর গত ৫ পাঁচ বর্ষের ৫ খণ্ড উত্তমরূপে বাঁধান ও উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত কেবল আমার নিকটেই পাওয়া যায়। খণ্ডগুলি পৃথক্ পৃথক্ বাঁধান। সুতরাং যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি একত্রে পাঁচখণ্ড অথবা পৃথক্ কোনও খণ্ড লইতে পারেন। মূল্যাদির বিষয় জানিতে হইলে আমাকে পত্র লিখিবেন।

বেঙ্গলমেডিক্যাল লাইব্রারী,
নং ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ঔষধবিনা রোগশান্তি।

শ্রদ্ধাস্পদ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়!

আমি গত ৫।৬ বৎসর চিকিৎসা-সম্মিলনীর গ্রাহক হইয়া ঐ পত্রিকা পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং এরূপ পত্রিকার দ্বারা আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের যে সমূহ উপকার হইতেছে ও হইবে তাহাতেও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

আপনারা চিকিৎসা-সম্মিলনীতে অনেক রোগেরই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া বহু প্রকার ঔষধাদি সেবন করিয়াও কোন বিশেষ ফল না পাইয়া ডাক্তারদিগের পরামর্শমতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলাম; এবং তথায় ডাক্তারদিগের মতানুসারে ঔষধাদি সেবন করিয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি কোনও উপকার না পাইয়া তথায় কোন এক বন্ধুলোকের পরামর্শে ঔষধের মাত্রা কমাইয়া কেবলমাত্র সুপথ্যের ও ব্যায়ামাদির দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে আমার আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল; এবং তদবধি আমার মনোমধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে অনেক সময়েই চিকিৎসকেরা প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর সমূহ অপকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি প্রায় গত ১২।১৩ বৎসর ব্যারামকালে প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে ঔষধ সেবন করিতাম, পরে তাহারও অপকারিত্ব বুঝিয়া সম্পূর্ণরূপে ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া আমার পরিবারস্থ পুত্রগণের উৎকট উৎকট ব্যারামসকল বিনা ঔষধে কেবলমাত্র সুপথ্যের ও শুশ্রূষার ব্যবস্থার দ্বারা শীঘ্র ও নিরাপদরূপে আরোগ্য লাভ হইতেছে দেখিয়া আসিতেছি।

প্রায় চারি বৎসর গত হইল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগাক্রান্ত হইলে ডাক্তারগণ

ঔষধ না দেওয়ার জন্য, তাঁহার বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়া, আমাকে অনেক নিন্দাবাদ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপায় নিরাপদে আরোগ্য লাভ হইল দেখিয়া ঐ ডাক্তারগণ আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইয়াছেন। গতবৎসর আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া বিনা ঔষধে শুদ্ধ ঘোর তৃষ্ণার সময় প্রভূত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল ও অল্প মাত্রায় দুগ্ধদ্বারা উত্তমরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। উপরোক্ত দুইটী ও অন্যান্য বহুপ্রকার রোগ এইরূপে আরোগ্যলাভ হওয়ায় আমার পরিবারস্থ ব্যক্তির এবং এমন কি দুই এক জন গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরও ঔষধের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এক্ষণে আমি বিষাক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ জল সুপথ্য ও শুশ্রূষা এবং ডাক্তারের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ভগবানকেই ডাক্তর স্থির করিয়াছি। "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্।" এইরূপে পরীক্ষার দ্বারা যতই ফল পাইতে লাগিলাম, ততই আমার ঔষধের শক্তির উপর সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির উপর দিন দিন আস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন কি যত গুলি ঐরূপ পরীক্ষা করিয়াছি ভগবানের কৃপায় একটীতেও এপর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হই নাই।

কেবলমাত্র সুপথ্য ও শুশ্রূষার দ্বারায় যে রোগ আরোগ্য হয় আমাদের দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র চরক সংহিতায় এবং ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

ইতি চরক।

কেংসিংটন নিবাসী ডাক্তার টি, এল, নিকলস, (T. L. Nichols) লিখিয়াছেন—The character and perfection of life depend upon the nature and perfection of the diet. Health rests very largely on dietetic condition, and the restoration of health depends upon the same principles as its preservation." "From the days of Hippocrates all wise physicians, all careful observers, have had but one opinion on the importance of diet to the preservation of health and the cure of disease. Whatever the disease, rest, cleanliness, pure air, light, and simple natural good diet are needed for cure.

ইহার দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে পথ্য যেরূপ উপকারী, এরূপ ঔষধের দ্বারা কখন আশা করা যাইতে পারে না।

চিকিৎসা শাস্ত্র যে বড়ই ভ্রমসংকুল তাহা অতি সহজেই দেখান যাইতে পারে। যেমন কোন একটী রোগীর জন্য ৪।৫ জন চিকিৎসক আহ্বান করিলে প্রায়ইদেখা যায় যে ঐ রোগীর ঔষধাদি ও রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে তাঁহাদের পরস্পর মতভেদ হয়। চিকিৎসা-সম্মিলনীর ২য় খণ্ডের ৭।৮ম সংখ্যার এলোপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী নামে প্রবন্ধটীতে দেখিতে পাই যে ইউরোপ খণ্ডের বড় বড় ডাক্তারগণ ঔষধের আরোগ্যকারী শক্তির উপর বিশ্বাস করেন না, এবং অনেক সময় তাঁহারা যে রোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, রোগীর মৃত্যুর পর তাহার শরীর ব্যবচ্ছেদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহার সে রোগ আদৌ হয় নাই। লণ্ডনের ডাক্তার ইভান্স (Professor Evans, Fellow of the Royal College, London) বলেন আজ কালের চিকিৎসা প্রণালী অতি নিন্দিত ও অত্যন্ত অসন্তোষকর। ইহাতে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে ইহার এমন কোন গুণ নাই।

ফরাসী ডাক্তার মেজেণ্ডি (M. Magendie, eminent French Physiologist and pathologist) বলেন রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা এতদূর অজ্ঞ যে রোগ হইলে চিকিৎসা না করিয়া প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকাই উচিত। উপরোক্ত মহৎ বাক্যগুলির দ্বারা এবং আমার নিজের গত ১২।১৩ বৎসর কাল পরীক্ষার দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির দ্বারাই রোগ নষ্ট হয় এবং ঔষধাদি দ্বারা প্রায়ই বিপরীত ফল হয়। আমার এই দীর্ঘকাল এইরূপ পরীক্ষার ফল দেখিয়া এক জনেরও যদি আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মে তাহা হইলেও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে মহাশয়ের নিকট নিবেদন যে আমি চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ নহি। তবে প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার দ্বারা যে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম। আপনি চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ এবং আপনার ঐ শাস্ত্রে

বিশেষ দূরদর্শিতা আছে। অতএব আমার ইচ্ছা যে আপনি অপার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে উপরোক্ত বিষয়ের সার উপদেশ সম্বলিত করিয়া আমার এই সামান্য প্রবন্ধটী আপনার সারগর্ভ পত্রিকাতে স্থান দান করেন। ইতি

তেলিনীপাড়া
হুগলী। } শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রলেখক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশস্থ একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার। কিন্তু তাঁহার মান প্রতিপত্তি কেবল জমীদার বলিয়াই নহে। অনেকেই জানেন, মনোমোহন বাবু, বুদ্ধিবিদ্যায় পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ বহুদর্শী, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত সাত্বিক ভাবাপন্ন মহাপুরুষ। উপরিলিখিত তাঁহার ঐ পত্রখানি আমরা পরম সমাদরে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে প্রকাশিত করিলাম।

পত্রমধ্যে মনোমোহন বাবু যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড় সত্য কথা, আমাদের প্রাণের কথা, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অতি নিগূঢ় উচ্চশ্রেণীর কথা বটে। কিন্তু যে কাল পড়িয়াছে, যে অধর্ম্মের স্রোত, পিশাচকুলের যে পাপস্রোত, যে হলাহলস্রোত দেশমধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে; তাহাতে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিলে, কোন ফল হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। ঔষধ বিনা, কেবল পথ্যের বলেই রোগশান্তি হয়; একথা এখন মনোমোহন বাবুর মত লোকের মুখে শুনিলেও, লোকে হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না। আর আমরা সেই কথার অনুমোদন করিতেছি বলিয়া, আমাদের কথাও পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

চরকের এই উক্তি কিন্তু বড়ই সসার, বড়ই যথার্থ। আজিকার কালে কথাটা প্রমাণ করিতে একটু কষ্ট হইবে বটে। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চরককার ঐ মহতী উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ভাবের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া মনোমোহন বাবু উহার পক্ষ সমর্থ করিয়াছেন, সে ভাবের ভাবুক একালে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত সত্বভাব দেশ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রজস্তমোগুণের প্রবল প্রাধান্যে লোক সকল আচ্ছন্ন, অভিভূত। তাই বলি, একালে উক্ত বিধির মহত্ব আর খাটে না, উহার তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে সকলকে বুঝান যায় না।

কিন্তু সময়ক্রমে কথাটা আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমাদের কথায় বিষবোধ করিলেও, আমাদের যুক্তিতত্ত্বে সহস্র হাততালি পড়িলেও, শাস্ত্রার্থের শরণাপন্ন হইয়া, ধীরে ধীরে কথাটা আমরা আলোচনা করিয়া সকলকে বুঝাইব। আজ সে অবসর নাই, এখন সে সময়ও নয়। সময়ক্রমে এই প্রাণের কথা, এবং অন্যান্য অনেক প্রাণের কথাই অবোধের তাড়না-তাড়িত হইয়াও অকুতোভয়ে অবশ্য বলিতে থাকিব। চি, স, ক, স।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

মানবশত্রু—স্ত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে রাক্ষসী মাতার পৈশাচিক প্রকৃতির দৃষ্টান্ত আমরা দেখাইয়াছি। আর দেখাইয়াছি যে মাতাপুত্রের এই শত্রুতাসম্বন্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই প্রসূত। এখন সেই আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে এইবার তাহার বিচার করা যাক।

আত্মজ্ঞানের ঈষদাভাসও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই কথাই একটু বিশদ করিয়া বলিলেই চলিবে। আমি কি, আমি কে, কেন আমি সংসারে আসিয়াছি, সংসারের সহিত আমার প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি, এই সকল তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। জীবের হৃদয়ে এই আত্মজ্ঞান তত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইলে, তাহাই পরমার্থজ্ঞানে পরিণত হয়। যিনি আত্মজ্ঞ, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্বদর্শীর সহিত ব্রহ্মজ্ঞের কোন ভেদাভেদ নাই। উহা তত্ত্বজ্ঞের একটি নামান্তর মাত্র।

আধুনিক শিক্ষার দোষে, আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে, এই পুণ্যভূমে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। যবনম্লেচ্ছের সংস্পর্শে, যবনম্লেচ্ছের সহবাসে, যাবনিক পানাহার, যাবনিক রীতিনীতির অনুকরণে, হিন্দুর বুদ্ধিশুদ্ধি নিতান্তই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞানতা, অহম্মুখতা, নাস্তিকতা প্রভৃতি আপদ সকল হিন্দুসমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া উহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। যেরূপ দীক্ষা শিক্ষা করিলে, যেরূপ সদাচারে থাকিলে, যেরূপ নিয়ম সকল পালন করিলে, মানবের

চিত্তশুদ্ধি হয়, দেহ সবল সুস্থ ও ধর্ম্মাচরণক্ষম হয়, হৃদয় ভক্তিপ্রবণ হয়, সে সকলে হিন্দুসন্তান ক্রমেই অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছেন।

পরের শিক্ষায় উন্মত্ত হইয়া হিন্দু এখন পরকালে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন। হিন্দু বুঝিতেছেন, ইহকালই বুঝি তাঁহার সর্ব্বস্ব, ইহ জীবনের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারিলেই বুঝি জীবনের ব্রত উদ্যাপন করা হইল। বিধিবিড়ম্বনায় হিন্দুজাতির গুরুপদে এখন যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা জানেন, ইহ জীবনে কেবল ঐশ্বর্য্যভোগ, কেবল সম্পদবৃদ্ধি, কেবল বিলাসবাসনা সাধন করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ হইল। পরকাল একটা থাকিতে হয় ত আছে; কিন্তু বিষয়কর্ম্মের সহিত, ইহ-জীবনের কার্য্যাকার্য্যের সহিত তাহার বড় একটা কোন সম্পর্ক নাই। পরকালের জন্য যে কার্য্য, তাহার নাম ধর্ম্মাচরণ; সেটা একটা পোষাকী কাজ। আটপহুরে কাজের নামই বিষয়কর্ম্ম। ধর্ম্মকর্ম্মের খাতিরে বিষয়কর্ম্মে ব্যাঘাত যে করে, সে হ্রস্বদীর্ঘবোধবিহীন মহামূর্খ।

ইংরেজগুরুর এই আধুনিক শিক্ষার ভ্রমে পড়িয়া, হিন্দুসন্তান আপনার পরকালের মাথা খাইতে বসিয়াছেন। ম্লেচ্ছের মত তিনিও মনে করিতে শিখিয়াছেন যে, বিষয়কর্ম্মই তাঁহার ইহ জীবনের প্রধান কর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধই নাই। তাই বিষয়ভোগের জন্য, বিষয়বৃদ্ধির জন্য যত কিছু বুদ্ধি, যত কিছু চাতুরী সকলই ব্যয়িত করিয়া আপনার বিলাসলালসা পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ান। তাঁহারা জানেন না যে, ইহকালের জন্য যে চাতুরী, সে চাতুরী চাতুরীই নহে। যে চাতুরীদ্বারা ইহ পরকালের উদ্দিষ্ট সাধিত হয়, তাহাকেই চাতুরী বলা যায়।

"যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।"

কিন্তু আজ্ সে পরকালের কথা, হিন্দুর অভিধান হইতে উচ্ছেদ হইতে চলিল। এখন এই পৃথিবীতে আত্মসুখলাভের জন্যই মানবমাত্রে ব্যতিব্যস্ত। অধিক আর কি বলিব, জননীর পুত্রবাৎসল্য এই বিলাসিতার স্বার্থে বিজড়িত ও কলুষিত হইয়াছে। জননীর পুত্রস্নেহ এখন স্বার্থের অনুগামী। পুত্র আমার লেখাপড়া শিখিবে, এম্, এ, বি, এ, পাস করিবে, চাকরী করিয়া মুটাভরা পয়সা আনিয়া দিবে, বিবাহ দ্বারা কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার অঞ্চল পূর্ণ করিয়া দিবে, এই সকল স্বার্থচিন্তায় জননী গর্ভসঞ্চারকাল

হইতে আকুল হইয়া থাকেন। সন্তান যদি জননীর সে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতি সে স্নেহ জননীর আর থাকে না। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্নেহ অবিকৃত থাকে; যখন সে প্রত্যাশার অবসান হয়, স্নেহের পরিমাণও তখনি কমিয়া যায়।

ইহার নাম কি বাৎসল্য? ইহার নাম কি পুত্রস্নেহ? তুমি জননী, পুত্রকৃত উপকারের প্রত্যাশায় তোমায় সন্তান পালন করিতে হইবে, এ কথা তোমায় কে বলিল? তোমার গর্ভে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সে সন্তানের লালনপালন করিতে তুমি বাধ্য। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সন্তান পালন হইবে বলিয়াই জীবশরীরে স্নেহমমতার সৃষ্টি হইয়াছে। স্নেহমমতা না থাকিলে সন্তান পালন হইত না, সংসাররক্ষা হইত না, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হইত না। মানবেতর নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহেও এই সন্তানস্নেহ সর্ব্বাংশে বিরাজমান। সন্তান প্রসূত হইবামাত্র, পশুপক্ষী কত যত্নে তাহার লালন-পালন করে, সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাদের সেই স্নেহটুকু প্রাকৃতিক। উহা ঈশ্বরদত্ত, সৃষ্টিরক্ষার অনুকূল। সে স্নেহে কোন স্বার্থ নাই, কোনপ্রকার বিনিময়ের ভাব নাই। কিন্তু মানবে আর ইতর প্রাণীতে প্রভেদ এই যে, মানব বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট; ইতর প্রাণী বুদ্ধিহীন। মানব এই বুদ্ধিকে আপন ইচ্ছামত সদসৎ দুই পথেই চালাইতে পারে। ভ্রান্ত মানব, এই বুদ্ধিবৃত্তিকে অসৎপথে চালিত করিয়াই, স্নেহের অঙ্গে স্বার্থের কালিমা মাখাইয়াছে, পবিত্রকে অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, জাহ্নবীর পূতসলিলে মূত্রপুরীষ মিশাইয়া কলুষিত করিয়াছে।

তাই বলি, স্নেহে এত স্বার্থ কেন? স্বর্গের আলোকে নরকের অন্ধকার কেন? পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পিশাচের দুষ্কীর্ত্তি কেন? তোমার সন্তান কত যত্নের ধন, তোমার নাড়ীছেঁড়া রক্তপিণ্ড, তাহার কাছে তোমার আবার প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা কেন? তাহার কাছে তোমার যত্ন পরিশ্রমের পারিশ্রমিক মূল্যের আশা করা কেন? বিনা মূল্যে, বিনা বিনিময়ে, বিনা স্বার্থে তাহাকে স্নেহ করাই ত, পরম ধর্ম্ম। তাহাই ত ঈশ্বরের নিয়ম, তাহাই ত স্বর্গের ভাব! এই স্বর্গীয়ভাবের চরমস্থানীয় বলিয়াই ত তোমার আসন স্বর্গের উপরে বলিয়া কথিত হইয়াছে। তুমি যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই নিঃস্বার্থ স্নেহবৃত্তিই ত তাহার একমাত্র কারণ। সেই নিঃস্বার্থভাব ত্যাগ

করিয়া আজ কি তুমি আসনচ্যুতা হইতেছ না, স্বর্গের আসন হইতে নামিয়া পৃথিবীর মলজঞ্জালে মিশাইয়া যাইতেছ না, ঐশিক নিয়মে ব্যভিচার করিয়া মানবজাতির অহিত সাধন করিতেছ না?

যে স্নেহ প্রত্যুপকারের মুখ চাহিয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক স্নেহ নহে। যাহা স্বাভাবিক, সাংসারিক কারণে তাহার ব্যতিক্রম হয় না। স্নেহ নিষ্কারণজাত। স্নেহ কেন করিতে হয়, এ কথার কোন বৈষয়িক উত্তর নাই। স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তাই স্নেহ করিতে হয়। ঐশী মায়া ইহার কারণ, কোন পার্থিব কারণের সহিত স্নেহের সম্বন্ধ নাই। স্নেহ পার্থিব কারণযুক্ত হইয়া পড়িলেই বিকৃত হইয়া যায়, স্নেহ নামে তাহাকে অভিহিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। তোমাকে স্নেহ না করিয়া আমি বাঁচি না, অতএব তোমায় স্নেহ করি। তুমি আমায় ভক্তি কর না, তবু তোমায় স্নেহ করি। ইহাই স্নেহের লক্ষণ।

ভক্তির লক্ষণ বরং অন্যবিধ হইতে পারে। তুমি মহান্, তুমি উচ্চ, তোমার মহিমার সীমা নাই, অতএব আমি তোমায় ভক্তি করি। তুমি মাতা, দশমাস আমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছ, তুমি বুকের রক্ত দিয়া আমায় পালন করিয়াছ, তুমি আহার নিদ্রা সুখসচ্ছন্দতা সকলি ভাসাইয়া দিয়া আমায় মানুষ করিয়াছ, তোমা হইতেই এ সংসার দেখিলাম, অতএব তোমায় ভক্তি করি। ভক্তির মূলে এইরূপ তাৎপর্য্য নিহিত থাকিতে পারে।

কিন্তু স্নেহের মূলে ত এসব কিছুই নাই। প্রাণান্তকর নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণা দিয়া যে সন্তান প্রসূত হইল, তাহার মুখের দিকে তাকাইলেই সকল যন্ত্রণা যেন তখনি জুড়াইয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক স্নেহের নিয়ম। পশু পক্ষীর পক্ষেও এই নিয়ম চিরকাল প্রচলিত। তবেই দেখ, যে তোমার কোন উপকার করে নাই, বরং অপকার করিয়া, মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইল, তাহাকে যখন স্নেহ করিতে তুমি বাধ্য; তখন কোন্ মুখে, তাহার কাছে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা তুমি করিতে চাও? প্রত্যুপকার না পাইলে কেন বৃথা আক্ষেপ কর? তোমার শতসহস্র সাধ পূর্ণ হইল না বলিয়া কেন মাথা খুঁড়িয়া মর? যাহার জন্য এত কষ্ট সহিয়াছ, সে যদি ভ্রান্ত হইয়া, সে যদি পশুভাবাপন্ন হইয়া, তোমার সহিত সদ্ব্যবহার না করে, যদি একটা মন্দ

কথাই বলিয়া ফেলে, যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারে, তবে তাহার উপর রাগ করিয়া, দ্বেষ করিয়া কেন স্নেহের মূলে কলঙ্ক রোপণ কর? তোমার এই নীচতা, এই সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া যদি সন্তানের মনে দুঃখ হয়, হৃদয়ে অশ্রদ্ধা হয়, পরস্পর মনোভঙ্গের সূত্রপাত হয়, তবে সে দোষ সন্তানের নয়। সে দোষের ভার সর্ব্বাংশে জননীর শিরে চাপাইতে আমরা প্রস্তুত আছি।

ক্রমশঃ—

শ্রী——

খাদ্য।

ডাক্তারীমতে লিখিত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মানুষকে বাষ্পীয় কলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। বাষ্পীয় কলটী ঠিক্ কার্য্যক্ষম রাখিতে গেলে কি কি দরকার? ১ম, কল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে মেরামত করা। ২য়, কলের অগ্নি ও বাষ্প উৎপাদনজন্য জল ও কয়লা প্রদান করা। মানুষের সম্বন্ধেও তাই। মানুষের ওজন ঠিক্ রাখিবার জন্য অর্থাৎ মানুষের কলের কোন অংশ ক্ষয় হইলে তাহার মেরামত জন্য একরূপ খাদ্যের প্রয়োজন। আর মানুষের উত্তাপ সংরক্ষণ জন্য আর একরূপ খাদ্যের প্রয়োজন। যে সকল খাদ্যের দ্বারা মনুষ্যের শরীর নির্ম্মাণ হয়, অর্থাৎ মাংস, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে শরীর নির্ম্মাণকারীখাদ্য বলা যায়। আর যে খাদ্যদ্বারা শরীরের তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাপোৎপাদক খাদ্য বলা যায়। এতদ্ব্যতীত জল ও কতকগুলি ধাতুদ্রব্যও আমাদিগের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। জল বহুল পরিমাণে দরকার। জল শরীরের সকল অংশেই আছে, অতএব জলকে শরীরনির্ম্মাণকারীও বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের সুবিধার জন্য জলকে শরীর নির্ম্মাণকারী না বলিয়া ধাতুদ্রব্য মধ্যেই ধরা গেল। তাহা হইলে মোটামুটী খাদ্য দ্রব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা গেল যথা;—

(১) ধাতু দ্রব্য। জল, লবণ, প্রভৃতি।

(২) তাপোৎপাদক (যাহাতে শরীরের উত্তাপ রক্ষা হয়) চিনি, তৈলময় পদার্থ, চাল, গম প্রভৃতির শ্বেতসার বা সাদা অংশ।

(৩) শরীর নির্ম্মাণকারী (যাহাতে মাংস, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়)

এল্‌ব্যুমেন্ (ডিম্বের শ্বেতাংশ প্রভৃতি) ফাইব্রিন, (মাংসের পদার্থ-বিশেষ), কেসিন্ (দুগ্ধের ছানা প্রভৃতি) কেসিন্‌কে ছানা বা পনিরময় পদার্থও বলা যায়।

এলব্যুমেন, ফাইব্রিন, কেসিন্ দ্রব্যগুলি কি তাহা আপাততঃ সকলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন্ না। তবে ক্রমে উহাদিগের বিষয় বিশদ করিয়া বলা যাইবে। এখন মোটামুটি বুঝিয়া রাখা যাক যে, ডিম্বের ভিতর যে শাদাবর্ণের ঘেলু বা লালাবৎ পদার্থ থাকে, তাহাই এল্‌ব্যুমেনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ডিম্বের ঐ শ্বেতাংশ প্রায় সমস্তই এল্‌ব্যুমেন্। এই এল্‌ব্যুমেন্ ডিম্ব ছাড়াও মাংসে, মৎস্যে এবং গম প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে। তার পর দুগ্ধ হইতে যে ছানা উৎপন্ন হয়, উহা কেসিনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই কেসিন্‌ও এল্‌ব্যুমেনের ন্যায় মাংসনির্ম্মাণকারী পদার্থ। তারপর মাংস সকল যে সূত্রময় পদার্থে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ফাইব্রিন বলা যায়। মাংস বা মৎস্য খাইবার সময় খুব করিয়া চিবিয়া চুষিয়া তাহার রসটুকু গ্রহণ করিবার পর যে সূত্রময় অংশ বিদ্যমান থাকে, তাহার অধিকাংশই এই ফাইব্রিন। মাংসের অধিকাংশই এই ফাইব্রিন নামক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই ফাইব্রিন্ মাংস ব্যতীত উদ্ভিদেও পাওয়া যায়।

এল্‌ব্যুমেন, ফাইব্রিন এবং কেসিন্ এই তিনটী দ্রব্যের রাসায়নিক উপাদান একই। অর্থাৎ ইহারা একই রকম মূলপদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই জন্য এই তিনটী দ্রব্যকে একই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া ইহাদিগকে এল্‌বিউমিনেট্ অর্থাৎ এল্‌বুমেনময় পদার্থ বলে। নাইট্রোজেন্ নামক মূলপদার্থ এই তিনটী দ্রব্যে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে নাইট্রোজেন্‌ময় পদার্থও বলা যায়। নাইট্রোজেন্ শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যবক্ষারজান। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রন্থাদি (যেমন রাধিকা বাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা) প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে নাইট্রোজেনকে যবক্ষারজান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নাইট্রোজেন্ একরূপ বাষ্পময় মূলপদার্থ।

নাইট্রোজেন বাষ্পবায়ুতে পাওয়া যায়। বায়ু নাইট্রোজেন্ এবং অক্সিজেন নামক দুইটী বাষ্প মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন বায়ু চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, না, সেইরূপ বায়ুর উপাদান নাইট্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ বাষ্পকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। নাইটার বা সোরা হইতে নাইট্রোজেন বাষ্প পাওয়া যায়, এজন্য ইহাকে নাইট্রোজেন কহা যায়। সোরার ইংরেজি প্রতিশব্দ নাইটার। নাইটার হইতে উৎপন্ন তাই নাইট্রোজেন্। এল্‌ব্যুমেন্, ফাইব্রিন এবং কেসিন্ এই তিনটী দ্রব্যে নাইট্রোজেন্ আছে, এজন্য ইহাদিগকে নাইট্রোজিনস্ (নাইট্রেজেনময়) পদার্থ বলা যায়। আমি ইহাদিগকে যবক্ষারজানময় পদার্থ না বলিয়া উহাদিগকে ভবিষ্যতে নাইট্রোজেন্‌ময় পদার্থ বলিব। অনেক ইংরাজী শব্দ আছে, যাহাদিগের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নাই এবং প্রতিশব্দ গড়িয়া লইতে গেলে সরল না হইয়া আরও দুর্ব্বোধ এবং জটিল হইয়া পড়ে। এই সকল স্থলে ইংরাজি মূলশব্দ রাখিয়া দেওয়াই ভাল। যথা, অক্সিজেন্ বাষ্পকে অম্লজান না বলিয়া অক্সিজেন্ বাষ্প বলাই শ্রেয়ঃ। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল ভূগোল গ্রন্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গুড্ হোপ্ অন্তরীপের অনুবাদ হইয়াছে উত্তমাশা (Good উত্তম hope আশা); নিউগিনিকে করা হইয়াছে নবগিনি। নিউজিলাণ্ড—নবজিলাণ্ড। (New অর্থে নূতন) এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জাহাজে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তমাশা অন্তরীপ কতদূরে বা সমাজদ্বীপ (Society islands) কোথায় বলিলে কেহ বুঝিবে কি না? অতএব এই সকল স্থলে মূল ইংরেজি কথা রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ইউরোপীয়েরা আমাদিগের দেশকে হিন্দুস্থান বলেন। হিন্দুপ্লেস্ (Hindooplace) বলিলে আমরা বুঝিব না। অতএব কতকগুলি বিদেশীয় বাক্যের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ না দিয়া আদত কথা বলিয়া দিলেই বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

আমাদিগের আর্য্যগণ কেবল পাঁচটীমাত্র মূল পদার্থের যোগে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে বলেন। তাঁহাদিগের মতে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল) তেজ, মরুৎ (বায়ু) ব্যোম (আকাশ) এই ৫টী মূলপদার্থ। জীবদেহ ও মনুষ্যশরীর এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত বলিয়া জীবদেহকে তাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক কহেন। কিন্তু এখনকার আধুনিক বিজ্ঞানবেত্তারা ৬৪ চৌষ-

ষ্টীটী মূলপদার্থ আছে বলেন। যে পদার্থ হইতে আর অন্য পদার্থ বাহির করা যায় না তাহাই মূলপদার্থ। দুইটী বাষ্পীয় পদার্থ মিলিত হইয়া বায়ু হইয়াছে, অতএব বায়ুকে মূলপদার্থ বলা যায় না, উহা মিশ্রপদার্থ। সেইরূপ জল ও দুইটী বাষ্পীয় মূলপদার্থে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব উহাও মিশ্রপদার্থ। যে ৬৪ চৌষষ্টীটী মূলপদার্থ জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৪ চতুর্দ্দশটী অধাতু, আর অবশিষ্ট গুলি সমুদয় ধাতু। অধাতুগুলি এইঃ—(১) অক্সিজেন (২) হাইড্রোজেন, (৩) নাইট্রোজেন, (৪) কার্‌বন, (৫) ক্লোরাইন, (৬) ব্রেমাইন (৭) আইওডাইন, (৮) ফ্লুয়োরাইন, (৯) গন্ধক (১০) সেলিনিয়ম্ (১১) টেলুরিয়ম্, (১২) ফস্‌ফরস (Phosphorous) (১৩) বোরণ (১৪) সিলিকন্ এই চৌদ্দটীর মধ্যে অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন ক্লোরাইন্ এবং ফ্লুয়োরাইন্ এই কয়টী বাষ্পাকারে অর্থাৎ গ্যাসের আকারে থাকে। ব্রোমাইন্ তরল গন্ধক, কার্‌বন (অঙ্গার, কয়লা), ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি প্রভৃতি অবশিষ্ট কয়টী সচরাচর কঠিন অবস্থায় থাকে। উত্তাপ প্রয়োগে ইহাদের প্রায় সকল গুলিকেই বাষ্পাকারে আনিতে পারা যায়। গন্ধক এবং ফস্‌ফরস্ অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। আইওডিন্ উত্তাপ ব্যতীতও আপনাআপনি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

ধাতুদ্রব্যের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, সিসা, লৌহ সোডিয়ম্, পোটাসিয়ম্, ক্যাল্‌সিয়ম্, পারদ, ম্যাংগানিস্ এলুমিনম্, দস্তা প্রভৃতি কয়েকটী সমধিক প্রসিদ্ধ মূলপদার্থ।

এই চৌষষ্টীটী মূলপদার্থ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালে আরও দুই একটী আবিষ্কৃত হইতে পারে, অথবা দুই একটী মূলপদার্থ পরে মিশ্রপদার্থ বলিয়া পরিগণিতও হইতে পারে। যাই হউক, যাবতীয় পদার্থ এই ৬৪ চৌষষ্টীটি মূলপদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের বিষয় বলিতে বলিতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন্, ক্লোরাইন্, কার্‌বন্, এবং ফস্‌ফরস্ এই কয়টী অধাতুর বিষয় স্থানে স্থানে উত্থাপন করিব এবং লৌহ, সোডিয়ম্, ক্যাল্‌সিয়ম্, পোটাসিয়ম্ এবং কয়টী ধাতবমুল পদার্থের বিষয়ও বলিবার প্রয়োজন হইবে। অতএব এই পদার্থ গুলির স্বরূপ মোটামুটী জানিয়া রাখা ভাল।

অক্সিজেন্ একরূপ চক্ষের অগোচর বাষ্পীয় পদার্থ। ইহাকেই এখন-

কার বাঙ্গলা গ্রন্থে অম্লজান বাষ্প কহে। নাইট্রোজেন্ ঐরূপ অদৃশ্য বাষ্পীয় পদার্থ। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন্ মিলিত হইয়া বায়ু হইয়াছে। এই অক্সিজেন্ বাষ্প প্রায় অধিকাংশ মূলপদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ মিশ্রপদার্থ উৎপন্ন করে।

হাইড্রোজেন্‌ও ঐরূপ বাষ্প। ইহা জলে পাওয়া যায়, এজন্য ইহাকে হাইড্রোজেন বা জলজান বাষ্পও কহে। আমরা সচরাচর যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি উহাতে ক্লোরিন্ নামক বাষ্প আছে। লবণ ক্লোরিন্ নামক বাষ্প এবং সোডিয়ম্ ধাতু এই দুই পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

কার্‌বন্‌কে বাঙ্গলা কথায় অঙ্গার বলা যায়। সচরাচর যাহাকে আমরা কয়লা বলি। ফস্‌ফরস্, অত্যন্ত দাহ্যপদার্থ; ধাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই ফরস্ফরস্ সংযোগে বিলাতি দিয়াসলাই প্রস্তুত হয়। একরূপ লাল দিয়াসলাই আছে তাহা বাক্সের গাত্রে না ঘসিয়া যে কোন স্থানে ঘসিলে জ্বলিয়া উঠে। এই লাল দিয়াসলাই রাত্রিকালে দেয়ালে ঘসিলে দেয়ালের গায়ে একরূপ শাদা দাগ পড়ে; তাহা হইতে আলো নির্গত হইতে থাকে। ঐ শাদা দাগটী ফস্‌ফরসের। তারপর জ্যোৎস্না পোকার উদর প্রদেশে ফস্‌ফরস্ আছে। উহাই রাত্রিকালে জ্বলিতে থাকে।

লৌহ কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। সোডিয়ম্ ধাতু সাজিমাটীতে পাওয়া যায়। ডাক্তারখানায় যে সোডা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও সোডিয়ম্ ধাতু আছে। কার্‌বন্ (অঙ্গার) সোডিয়ম্ এবং অক্সিজন্ বাষ্প এই কয়টী মিশ্রিত হইয়া ডাক্তারখানার সোডা নামক ঔষধ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্যাল্‌সিয়ম্‌কে চুন বলিতে পারা যায়। আমরা সচরাচর যে চুন ব্যবহার করি, উহার মূলপদার্থ এই ক্যাল্‌সিয়ম্ ধাতু। পোটাসিয়ম্ নানা উদ্ভিদ দ্রব্যে পাওয়া যায়। পোটাসিয়ম্ এবং অক্সিজেন্ মিলিত হইয়া পোটাস্ নামক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই পোটাস্ লেবুর রসে এবং গোল আলু প্রভৃতি উদ্ভিজে যথেষ্ট পরিমাণ আছে। ডাক্তারখানার কষ্টিক পোটাস্ লাইকর্ পোটাস্ এবং বাইকার্ব্বনেট্ অব্ পোটাস্ এই পোটাসিয়ম্ ধাতুঘটিত ঔষধ।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার সম্পাদক।

খাদ্যাখাদ্য।

ভূমিকা।

আহারেই দেহধারণ, আহারেই দেহবর্দ্ধন, আহারেই দেহরক্ষা ও দেহধ্বংস হইয়া থাকে। আহারের জন্যই জীবজগত লালায়িত হইয়া বেড়ায়। সামান্য কীটাণু হইতে মানব পর্য্যন্ত, আহার না হইলে কাহারই চলে না।

আহার ভিন্ন কাহারই চলে না, কিন্তু আহার বিষয়ে খাদ্যাখাদ্য বিচার আবার সকলেরই আছে। সামান্য পশুপক্ষীর আছে, মানবেরও আছে। একের পক্ষে যাহা খাদ্য, অন্যের পক্ষে তাহা অখাদ্য। বানরে যাহা খায়, ছাগল তাহা খায় না। শূকর যাহা খায়, সিংহ তাহা খায় না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিমধ্যে এই খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা প্রকৃতিদত্ত বিশিষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে করিয়া লয়। দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলেই তাহারা স্বভাবতঃ বুঝিতে পারে, কোন্‌টা তাহাদের খাদ্য, কোন্‌টা খাদ্য নয়। যেমন খাদ্যাখাদ্য বোধ, তেম্‌নি বাসস্থান নির্ম্মাণ, শাবকপালন ইত্যাদি দুই একটী বিষয়ে স্বাভাবিক এক একটু সামান্য বুদ্ধি, বিধাতা ইতর প্রাণিবর্গকে দিয়া রাখিয়াছেন। নহিলে উহাদের জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে।

মানবের পক্ষে নিয়ম স্বতন্ত্র। মানবের বুদ্ধি কেবল একবিষয়িণী নহে, মানবের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী। মানবের বুদ্ধি বহুবিধ বিচারশক্তিসম্পন্ন। শিক্ষা সাহায্যে মানব সেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন ও পরিমার্জ্জন করিতে পারে। সেই বুদ্ধিবলে মানব ভাল মন্দ সকল বিষয়েরই বিচার করিতে পারে; অন্য প্রাণী তাহা পারে না।

মানুষকে ভগবান এই বিচারশক্তি দিয়াছেন বলিয়াই ভাল মন্দ বিচারের ভার তাহারই হাতে। অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নাই, খাদ্যাখাদ্যের কথাই এস্থলে আলোচনীয়। মানুষ আপনি বিচার করিয়া আপনার খাদ্যাখাদ্য আপনি নির্ণয় করিয়া লয়। কিন্তু মানুষের মধ্যেও সকলেরই বিদ্যাবুদ্ধি কিছু সমান নহে। মানুষের মধ্যে অধিকাংশই

নির্ব্বোধ, অনেকেই পশুভাবাপন্ন। অভ্রান্ত বিচারের শক্তি সকলের নাই, সেরূপ প্রবৃত্তিও সকলের নাই। সেই জন্যই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁহারা জগতের হিতের নিমিত্ত একান্ত মনে চিন্তা করিয়া, বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া, আপনাদের সূক্ষ্মতম বিচারশক্তির বলে, মানবজাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশের নামই শাস্ত্র। তাই শাস্ত্রের শাসনে সমগ্র সমাজ পরিচালিত।

আমাদের আর্য্যশাস্ত্রের প্রণেতা অনন্তজ্ঞানী, অনন্তদর্শী ঋষিমণ্ডলী। তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র সকলে মানবজাতির আবশ্যকীয় সকল বিষয়েরই সূক্ষ্ম মীমাংসা আছে। খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণবিচার, বিধিনিষেধ, ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, আয়ুর্ব্বেদেও আছে। আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণী, সেই বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে আমরা বাধ্য।

কিন্তু যে কাল পড়িয়াছে, যেরূপ বিজাতীয় শিক্ষার বিষময় তরঙ্গ বহিয়াছে, তাহাতে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি যা কিছু ছিল, সকলই যেন ভাসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার অনাচার কদাচারে আমরা গা ঢালিয়া দিয়াছি, কোন বিষয়ের বিচার করিয়া যে আমাদের চলিতে হইবে, আমরা যে মানব, আমরা যে বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট জীব, ইহপরকালের হিতাহিত ভাবিয়া যে আমাদিগকে চলিতে হইবে, একথা যেন আমরা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। অবিচার অত্যাচারই আমাদের নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বিচার আচার এ শব্দ গুলা আমাদের অভিধান হইতে একবারে উঠাইয়া দিয়াছি।

যেমন সকল বিষয়ে, তেম্‌নি খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও আমাদের বুদ্ধিহীনতা এখন পদে পদে পরিলক্ষিত হইতেছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। যাহা কিছুতে উদর বিবর পরিপূর্ণ হয়, যাহা কিছু রসনার তৃপ্তিকর, তাহাকেই আমরা খাদ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। খাদ্যের গুণাগুণ বিচার একবারেই নাই। যাহা খাইলে শরীর সুস্থ থাকিবে, যাহা খাইলে দেহের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, যাহা খাইলে কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি নহে, কেবল রসনাতৃপ্তি নহে, শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান হইবে, সে দিকে আমাদের দৃষ্টি একবারেই নাই।

খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। দেশভেদে, প্রকৃতিভেদে, কালভেদে, ঋতুভেদে, তিথিভেদে, অবস্থা ও অধিকারভেদে খাদ্যাখাদ্যের

তারতম্য আছে। ইংলণ্ডে যাহা সুখাদ্য, ভারতে তাহা অখাদ্য। তোমার শরীরে যাহা সহিবে, আমার শরীরে হয় ত তাহা কুফল উৎপাদন করিবে। বসন্তে যাহা খাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বর্ষায় হয় ত তাহাতেই শরীর ধ্বংস করে। তিথিবিশেষে কোন বিশেষ দ্রব্য খাইলে শরীরের অনিষ্ট করে। যৌবনে যাহা খাইয়া পরিপাক করিয়াছি, জরাবস্থায় তাহা খাইলে, অগ্নিমান্দ্যবশতঃ অনিষ্ট করে। ক্ষত্রিয়ের যাহা আহার, ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ বা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের মীমাংসা সাধারণ লোকের বুদ্ধিবলে ঘটিয়া উঠে না। অনন্ততত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, অমানুষিকী শক্তিবলে ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপ বিচার ও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু খাদ্যাখাদ্যতত্ত্বের আরও সূক্ষ্মতর, আরও উচ্চতর কথা আছে। খাদ্যে কেবল শারীরিক নয়, আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও ইহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত খাদ্যাখ্যাদের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম এই শরীরযন্ত্রেরই ক্রিয়ামাত্র। শরীর খাদ্যে রক্ষিত ও খাদ্যেই পরিপুষ্ট হয়। যেমন মাল মশলায় গঠন করিবে, দেহযন্ত্রও সেইরূপ প্রকৃতির হইবে। মৃত্তিকাভেদে ফলফুলের স্বাদগন্ধের যেমন তারতম্য হয়, তেম্‌নি দেহভেদে দেহের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। খাদ্যবিশেষে শরীরে সত্ত্বগুণের সঞ্চয় হইতে পারে, খাদ্যবিশেষে আবার তমোগুণের প্রাধান্য হইতে পারে। মাংসাশী মানব নিরামিষাশী অপেক্ষা যে অশান্তিপ্রিয় ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইতরপ্রাণী মধ্যেও যাহারা মাংসাশী, তাহারাই হিংসাপরায়ণ। তবেই দেখ, খাদ্যের সঙ্গে মানসিকবৃত্তির সম্বন্ধ নাই, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অতএব, আহার কেবল শরীর রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই; এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত লঘুচেতা ও বুদ্ধিহীন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই লঘুচেতার দলই এখন আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া, সমাজপতি বলিয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে অগ্রসর। বাস্তবিক বুদ্ধিশুদ্ধি, বিচার বিবেচনা ইহাঁদের কিছুই নাই। গোখাদক যবন ম্লেচ্ছের দৃষ্টান্তে ইহাঁরা হিন্দুসমাজে গো-ভক্ষণের বিধান দিতে চাহেন, শীতপ্রধানদেশের পানীয় প্রথা, সেখানকার ঔষধ পথ্য, ইহাঁরা এই প্রখরতাপতপ্ত উষ্ণদেশে

চালাইতে চাহেন, আর অবিচারে ব্যভিচারে দেশটাকে ডুবাইয়া দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন।

সর্ব্বনাশেরও আর বড় বাকী নাই। আমরা এখন অন্য কথা বলিব না, দেশের স্বাস্থ্য যে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, সে দৃশ্য সকলেই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। এত যে মদ্যমাংস, এত যে রাজভোগ খাইয়া বাবুরা মানবজন্ম সফল হইল বলিয়া গর্ব্ব করেন, ব্যাধির পীড়নে সে গর্ব্ব কি ক্ষণে ক্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে না? শতকরা সুস্থশরীরী এখনকার কালে আর কয়টা দেখিতে পাও! একটা না একটা ব্যাধি লাগিয়াই আছে। অকালমৃত্যু ও রোগের হাতে যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করাই অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে। আর পরকালের পথ ত প্রায় সকলেই সাফ্ করিয়া রাখিতেছেন।

সে কথা যাক্, স্বাস্থ্যভঙ্গ এককারণে ঘটে না। কিন্তু যত কারণই থাকুক, খাদ্যাখাদ্যের অবিচার যে তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব খাদ্যাখাদ্য বিচারের আলোচনা এখন আমাদের দেশে নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই আমরা স্থির করিয়াছি যে, খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণতত্ত্ব আমরা প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ পাঠককে উপহার দিব। পাঠক দেখিবেন, এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ, যেরূপ বিবেচনা, যেরূপ বিচার, যেরূপ সূক্ষ্মতম পরীক্ষাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত অন্যদেশে দুর্ল্লভ বলিলেও হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহারা জগতের যে হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আমরা তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব পাঠকমণ্ডলীকে ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ক্রমশঃ—

কবিরাজ সম্পাদক।

স্ত্রী ও পুরুষ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অতি শৈশবকালে কন্যা এবং পুত্র দেখিয়া কোনই ইতরবিশেষ বুঝিতে পারা যায় না। ভাবগঠন সমস্তই একই প্রকারের। প্রভেদের মধ্যে এই যে কন্যা অপেক্ষা পুত্র কিছু আকারে বড় হয়। পুত্রসন্তানের মস্তক কন্যাসন্তানের মস্তক অপেক্ষা আকারে বড় এবং অস্থি সকল অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, এজন্য পুত্র প্রসব করিতে স্ত্রীলোকের যত কষ্ট হয়, কন্যা প্রসব করিতে তত হয় না। যে সকল স্থলে প্রসব আটকাইয়া যায় এবং অস্ত্রের সাহায্য বিনা প্রসবকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, তাহার প্রায় অধিকাংশ স্থলেই পুত্রসন্তান হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তান ওজনে কিছু ভারি হয়। তারপর কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম হইলে যদিও পুত্র ও কন্যা দেখিতে একই রকমের, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। পুত্রসন্তান কিছু ধীর এবং গম্ভীর হয়। কন্যাসন্তান কিছু বেশী কথা কয় এবং বেশী হাস্য করে। উহারা অপেক্ষাকৃত বেশী মাধুর্য্য এবং কোমলতাগুণে ভূষিত হয়। পুত্র অপেক্ষা কন্যা পিতামাতার বেশী মায়া আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এ সময় পর্য্যন্তও কিন্তু স্ত্রীপুরুষের চেহারার এবং ভাবভঙ্গীতে বড় একটা ইতরবিশেষ থাকে না। তারপর কন্যা যতই বড় হয়, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার আকৃতি এবং স্বভাব স্ত্রীরূপ ধারণ করে। কন্যা তখন আর বড় একটা পুরুষের নিকট যাইতে চায় না, যেন কিছু লজ্জাবোধ করে। ক্রমে মেয়েদের দলে মিশিয়া যায়। এতদিন ছেলে মেয়ে একত্রে ক্রীড়া করিতেছিল, কিন্তু স্ত্রী এখন পুরুষসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মেয়েদের লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তারপর বালকবালিকাগণের জননেন্দ্রিয় যতই পূর্ণ ও পুষ্ট হইতে থাকে, ততই তাহাদিগের বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক পার্থক্যগুলি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যৌবন বয়সে স্ত্রীর আকৃতি এবং প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নভাব ধারণ করে। এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে আপন আপন লিঙ্গের

বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টি ধারণ করে। তখন আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে স্ত্রী ও পুরুষে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখিতে পাই:—

পুরুষের গঠন কঠিন, স্ত্রীর গঠন নম্র। পুরুষের গঠন সরল, স্ত্রীর গঠন বক্র এবং অবনত (স্তনভরাবনতাঙ্গী)। পুরুষ দাঁড়াইবার সময় সোজা এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রী ধীরে ধীরে আগে পাছে পা ফেলিবে। পুরুষ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে। স্ত্রী হাত দিয়া মাটিতে আঁক পাড়িবে, অথবা অন্য কোন দ্রব্য নাড়িবে। পুরুষ কোন পদার্থ দর্শন করিলে কেবল তাহার উপরিভাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে না। জিনিষটী আগাগোড়া তলাইয়া দেখিবে। স্ত্রী পদার্থটীর উপর উপর চোক বুলাইবে। অথবা তাহাকে আড়নয়নে দেখিবে এবং তাহার বিষয় অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিবে অথচ কিছুই ঠিক করিতে পারিবে না। পুরুষ গম্ভীরপ্রকৃতি, স্ত্রী আমোদ এবং কৌতুকপ্রিয়। পুরুষের গঠন লম্বা এবং চওড়া, স্ত্রীর গঠন খাট এবং হাল্‌কা (ক্ষীণাঙ্গী)। পুরুষ কর্কশ এবং কঠিন। স্ত্রী মসৃণ এবং নম্র। পুরুষের বর্ণ গাঢ়, স্ত্রীর বর্ণ পাতলা। পুরুষের শরীরে অনেক স্থান খাঁজ অর্থাৎ চর্ম্ম কোচ্‌কান, শির উঠা প্রভৃতি আছে। স্ত্রীর শরীরে নাই। পুরুষের চুল শক্ত এবং ছোট। স্ত্রীর চুল লম্বা এবং কোমল। পুরুষের ভ্রূর চুলগুলি ঘন এবং শক্ত। স্ত্রীর ভ্রূ অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং ছোট। পুরুষ কুব্জ, স্ত্রী ন্যুব্জ। পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরলরৈখিক। স্ত্রীর বক্ররেখাযুক্ত। পুরুষের গঠন কোণযুক্ত। স্ত্রীর গঠন গোলাকার।

যে সকল উপাদানে স্ত্রী গঠিত, সে উপাদানগুলি পুরুষের উপাদান অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক, কোমল এবং অল্পেই উত্তেজিত হয়। এজন্য পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর স্বভাব কোমল কমনীয়, নমনীয়। স্ত্রী শোক তাপ এবং ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। উহারা স্নেহময়ী এবং সমধিক ধৈর্য্যগুণশালী। স্ত্রী যেমন সহ্য করিতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট উপস্থিত হইলে ইহারা যেমন ধৈর্য্যসহকারে যন্ত্রণা সহ্য করে, পুরুষে এমন পারে না। স্ত্রীর বুক ফাটে তথাচ মুখ ফোটে না। স্ত্রীর স্বভাব মাতৃস্নেহ এবং বাৎসল্য-বিভূষিত। স্ত্রীর সন্তান না হইলে পরের সন্তান লইয়া মানুষ করিবে। বাঁঝা অর্থাৎ নিঃসন্তান স্ত্রীলোক পশুপক্ষীকে সন্তানবৎ পালন করে। বেশ্যারা

বিড়াল কুক্কুর পুষিয়া তাহার উপর পুত্রস্নেহ সমর্পণ করে। সকল স্ত্রীলোকেই এই তিনটী গুণ দেখা যায়। নম্রত্ব, গোলত্ব, এবং উত্তেজকত্ব। স্ত্রীর সমস্ত অঙ্গই নম্র, মনও নম্র। উহাদের শরীর ও মন অতি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। উহাদিগের অভিমান অত্যন্ত বেশী। উহারা কিন্তু সহজে আত্মসমর্পণ করে এবং প্রিয়জনের জন্য আত্মত্যাগী হয়। স্ত্রীতে যেমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, পুরুষে তেমন পাওয়া যায় না। প্রিয়জনের মনস্তুষ্টিবিধানার্থ ইহারা সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করিতে পারে। ইহারা সামান্য বিষয় বেশী করিয়া চিন্তা করে। সামান্য কথায় মনে আঘাত পায়, এবং খোসামোদকরা ভালবাসে। ইহারা সোহাগ এবং নম্র ব্যবহারের প্রার্থী। উহাদের স্বভাব ও মন কোমল বলিয়া উহাদের প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর হইতে পায় না এবং এই জন্য অতি সহজেই উহাদিগকে ভুলাইতে পারা যায়। বাইবেলশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, স্ত্রীই সর্ব্বাগ্রে সর্পের প্ররোচনায় অমৃতবৃক্ষের ফল খাইয়া প্রথম পাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

এই সকল গুণ থাকাতেই পরাক্রমশালী পুরুষ অতি সহজেই উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছে। এবং উহারাও পুরুষের বাধ্য হইয়াছে। আবার এই নম্রতা এবং মোহিনী শক্তিগুণেই স্ত্রী পুরুষের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া তাহার উপর শাসনদণ্ড চালনা করিতেছে। স্ত্রীলোকের এই আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তি থাকাতেই পুরুষ আত্মহারা হইয়া রমণীর করে জীবন ধন এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম মানসম্ভ্রমপর্য্যন্ত সমর্পণ করিতেছে। সভ্যদেশের যাবতীয় নাটক, নভেল, উপন্যাস এই স্ত্রী পুরুষ গঠিত (নায়ক নায়িকা) ব্যাপার লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীই সর্ব্বপ্রথম পাপকার্য্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিল, পুরুষ নহে। তার পর স্ত্রীদ্বারা পুরুষ পাপে লিপ্ত হইয়াছে। স্ত্রী কি তবে পাপী তাহা নহে, স্ত্রীর প্রলোভন পুরুষাপেক্ষা বেশী। স্ত্রীর যে দিকে প্রথমে মন গড়ায়, সে দিক হইতে সহজে মন ফিরাইতে পারে না। স্ত্রীলোকের পরিণামচিন্তা নাই, যাহা উপস্থিত ভাল দেখে তাহাতেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে। স্ত্রী বাহ্য চাক্‌চিক্যে এবং সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়। পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করে, জানেনা যে পরে পুড়িয়া মরিয়া ছারখার হইবে। হাঁ করিয়া গ্রহনক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের শোভা দেখিতে দেখিতে ধীরগতিতে

অগ্রসর হয়, কিন্তু নিম্নে চহিয়া দেখে না যে গভীরকূপে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইবে। মধুপূর্ণ মধুচক্রে হাত বাড়ায়, জানে না যে মক্ষিকায় দংশন করিবে। এই জন্য স্ত্রী যত সহজে কুপথে পদার্পণ করে, পুরুষে তত করে না। ইভ (হবা আদামের স্ত্রী) দেখিল বৃক্ষটী বেশ সুন্দর, ফলগুলি সুপক্ক এবং খাইবার উপযোগী, এই ফল ভক্ষণ করিলে নাকি মানুষ জ্ঞানী হয়, তবে আর কি একটী ফল লইয়া খাইনা কেন? এই ফল ভক্ষণের পরিণাম যে এত ভয়ঙ্কর তাহা ভাবিল না, ঈশ্বরের আদেশ মানিল না।

স্ত্রীলোক গভীররূপে চিন্তা করিতে জানে না। কোন বিষয় গাঢ়রূপে ভাবিতে পারে না। তলাইয়া বুঝে না, গভীর চিন্তা পুরুষের কার্য্য।

স্ত্রীলোকের বোধশক্তি অতি প্রবল, সামান্য বিষয় বেশী করিয়া লয়। সামান্য অপমান বেশী করিয়া বোধ করে। সামান্য কথায় বেশী হাস্য করে।

বালকদিগের রোদন বল, স্ত্রীলোকের বল চক্ষুর জল, দীর্ঘনিশ্বাস এবং কোমল কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ। পুরুষের বল ক্রোধপূর্ণ খরদৃষ্টি এবং ভয়প্রদর্শন।

স্ত্রীলোক অব্যবস্থিতচিত্ত, অনন্যসন্ধিৎসু।

স্ত্রীলোকের স্নায়ুযন্ত্র সহজেই উত্তেজিত হয়, কোন বিষয়ে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের বোধশক্তি প্রবল, এজন্য যে কোন কার্য্যে তাহারা সহসা মাতিয়া উঠে।

স্ত্রীলোকের মুখশ্রীতে সর্ব্বদা পবিত্রতা, সরলতা এবং ধর্ম্মভাব বিরাজ করে। পুরুষ তাহাতে মোহিত হয়।

স্ত্রীলোক অত্যন্ত ভাবুক, তাহাদের মন কল্পনায় পরিপূর্ণ, অতি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে, সামান্য উপকারে বাধ্য হয়।

স্ত্রীলোকের ভালবাসা, (প্রেম) গভীর। যাহাকে ভাল বাসে খুব ভাল বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা এত দৃঢ় হইলেও পরিবর্ত্তনশীল। তাহাদের ঘৃণা জন্মিলে আর রক্ষা নাই। যাহাকে ঘৃণা করে, সে আর কিছুতেই মন পায় না। সে রোগের আর ঔষধ নাই, অনেক দিন ধরিয়া খোসামোদে না করিলে স্ত্রীলোকের মন পাওয়া যায় না। সে খোসামোদে বিশেষ কৌশল থাকা চাই। চতুর পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীলোকের মন ফিরাইতে পারে না।

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকার শ্রীরাধার মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারং"।

পুরুষে কোন জিনিষ পছন্দ করিতে হইলে সমস্ত দ্রব্যটী মোটের উপর কেমন তাহা দেখিয়া পছন্দ করে। স্ত্রীলোক ঐ দ্রব্যটীর প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখে এবং খুঁত বাহির করে। একটী পরিস্কার ডায়েমণ্ড-কাটা স্বর্ণচিক পুরুষের চক্ষে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু কেমন জিনিষটী দেখিবার জন্য বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দেও, তোমার গৃহিণী ঐ ডায়মণ্ডকাটার উপর কোথায় একটু চুলের ন্যায় ছিদ্র আছে তাহা দেখাইয়া দিবে। এ ছিদ্র পুরুষের চক্ষে পড়ে না, কোথায় সুন্দর ডায়মণ্ড-কাটা গঙ্গা যমুনা মলের উপর একটু দাগ আছে তাহা স্ত্রীলোকে ধরিয়া দিবে। পুরুষে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে মোটের উপর সুন্দরীটী দেখিতে কেমন তাহাই দেখিবে। স্ত্রীলোক উহার আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে, নাক, মুখ, চোখ, গলা, কপাল, চুল, বুক, সমস্ত একে একে লইয়া বিচার করিবে এবং কোথায় তাহার কপালে একটী বসন্তের দাগ আছে বা নাসিকার অগ্রভাগে তিল আছে তাহা ধরাইয়া দিবে। সমস্ত অঙ্গ মিলাইয়া যে একটা রূপ হয়, তাহা স্ত্রীলোকে দেখিতে পাইবে না।

পুরুষ নির্ভীকচিত্তে ঘোর বজ্রনিনাদ শ্রবণ করিবে। স্ত্রী কড়মড়ধ্বনি শুনিয়া স্বামীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইবে।

স্ত্রী নভোমণ্ডলে রামধনু দেখিয়া মোহিত হইবে এবং তাহার দিকেই চাহিয়া থাকিবে। পুরুষ সমস্ত আকাশপথে তাহার চক্ষু বুলাইবে এবং রামধনুর ন্যায় আর কিছু আকাশ আছে কি না তাহার অনুসন্ধান লইবে।

পুরুষ সূর্য্যের রশ্মি যেমন আছে তেমনিই দেখিবে, স্ত্রীলোক ঐ রশ্মিকে আয়নার ভিতর দিয়া দেখিবে এবং তাহাকে নানাবর্ণে সাজাইবে।

স্ত্রীলোক উচ্চহাস্য করে, পুরুষ মৃদুহাস্য হাসে। স্ত্রী ক্রন্দন করে, পুরুষ স্থির হইয়া থাকে। পুরুষের ক্রন্দন দেখিলে স্ত্রী একবারে হাল ছাড়িয়া দেয় এবং হতাশ হয়। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার সম্পাদক।

জ্বরচিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিমতে)

ডিজিটেলিস।

ব্যবহার লক্ষণঃ—রজোবন্ধকালীন বয়সে মধ্যে মধ্যে উত্তাপের ঝলক-বোধ পরে স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা এবং অসমান ও সবিরাম নাড়ী; সামান্য সঞ্চলনে ইহার বৃদ্ধি। বোধ হয় যেন নড়িলে চড়িলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে (আশঙ্কা হয় সর্ব্বদা না নড়িলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে—জেল্‌সি)

বৃদ্ধিঃ—শয়নে; সঞ্চলনে; উষ্ণগৃহে।

সময়ঃ—অনিয়মিত নাড়ীর লক্ষণেই জ্ঞাপকলক্ষণ।

কম্পঃ—হস্ত ও চরণতলে আরব্ধ, পরে সর্ব্বত্র বিস্তৃত। হস্ত ও বাহুর শীতলতা (শাখাঙ্গের জেলসি;—বাহুদ্বয়ের বেলা, হেলি; হস্ত ও চরণাঙ্গুলির ও ওষ্ঠের ব্রাই) সান্ধ্য কম্প; শীতল বায়ু লাগা (রেবা, কা, ক্যাম্ফ) ও গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ সহ্য না হওয়া; কম্পের প্রাধান্য ও আভ্যন্তরিক কম্প ও বাহ্যিক উত্তাপ; পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও উত্তাপ। হস্ত ও চরণের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্মযুক্ততা।

তাপঃ—হঠাৎ উত্তাপের ঝলক ও সর্ব্বাংশে দুর্ব্বলতাবোধ। কম্পের পর তৃষ্ণাবিহীনতা ও প্রধানতঃ আস্যে তাপের উদ্রেক; হস্তদ্বয় অধিক কাল-পর্য্যন্ত শীতল থাকে। সর্ব্বত্র উত্তাপবোধ, বিশেষতঃ আস্যে ও হস্তে; নাড়ীর দ্রুতগতি। শরীরে উত্তাপ এবং আস্যে শীতল ঘর্ম্ম; শরীরের বিভিন্নাংশের উত্তাপ, কিন্তু আস্যের নহে। আহারান্তে সাধারণ উত্তাপ। একহস্ত উষ্ণ ও অন্য হস্ত শীতল (লাইকো)।

ঘর্ম্মঃ—রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায়, মধ্যপরিমিত ও দুর্গন্ধ, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাদের হৃৎলক্ষণের উপশম নহে। শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, হস্ততলে উষ্ণঘর্ম্ম; শরীরের অর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম। রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম শীতল ও চট্‌চটে। কম্পের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্ম (বোভি, কষ্টি, এককালীন উত্তাপ ও অপ-র্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম-কোণা)

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকার শ্রীরাধার মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারং"।

পুরুষে কোন জিনিষ পছন্দ করিতে হইলে সমস্ত দ্রব্যটা মোটের উপর কেমন তাহা দেখিয়া পছন্দ করে। স্ত্রীলোক ঐ দ্রব্যটীর প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখে এবং খুঁত বাহির করে। একটী পরিস্কার ডায়েমণ্ড-কাটা স্বর্ণচিক পুরুষের চক্ষে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু কেমন জিনিষটী দেখিবার জন্য বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দেও, তোমার গৃহিণী ঐ ডায়মণ্ডকাটার উপর কোথায় একটু চুলের ন্যায় ছিদ্র আছে তাহা দেখাইয়া দিবে। এ ছিদ্র পুরুষের চক্ষে পড়ে না, কোথায় সুন্দর ডায়মণ্ড-কাটা গঙ্গা যমুনা মলের উপর একটু দাগ আছে তাহা স্ত্রীলোকে ধরিয়া দিবে। পুরুষে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে মোটের উপর সুন্দরীটী দেখিতে কেমন তাহাই দেখিবে। স্ত্রীলোক উহার আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে, নাক, মুখ, চোখ, গলা, কপাল, চুল, বুক, সমস্ত একে একে লইয়া বিচার করিবে এবং কোথায় তাহার কপালে একটী বসন্তের দাগ আছে বা নাসিকার অগ্রভাগে তিল আছে তাহা ধরাইয়া দিবে। সমস্ত অঙ্গ মিলাইয়া যে একটা রূপ হয়, তাহা স্ত্রীলোকে দেখিতে পাইবে না।

পুরুষ নির্ভীকচিত্তে ঘোর বজ্রনিনাদ শ্রবণ করিবে। স্ত্রী কড়মড়ধ্বনি শুনিয়া স্বামীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইবে।

স্ত্রী নভোমণ্ডলে রামধনু দেখিয়া মোহিত হইবে এবং তাহার দিকেই চাহিয়া থাকিবে। পুরুষ সমস্ত আকাশপথে তাহার চক্ষু বুলাইবে এবং রামধনুর ন্যায় আর কিছু আকাশ আছে কি না তাহার অনুসন্ধান লইবে।

পুরুষ সূর্য্যের রশ্মি যেমন আছে তেমনিই দেখিবে, স্ত্রীলোক ঐ রশ্মিকে আয়নার ভিতর দিয়া দেখিবে এবং তাহাকে নানাবর্ণে সাজাইবে।

স্ত্রীলোক উচ্চহাস্য করে, পুরুষ মৃদুহাস্য হাসে। স্ত্রী ক্রন্দন করে, পুরুষ স্থির হইয়া থাকে। পুরুষের ক্রন্দন দেখিলে স্ত্রী একবারে হাল ছাড়িয়া দেয় এবং হতাশ হয়। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার সম্পাদক।

জ্বরচিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিমতে)

ডিজিটেলিস।

ব্যবহার লক্ষণঃ—রজোবন্ধকালীন বয়সে মধ্যে মধ্যে উত্তাপের ঝলক-বোধ পরে স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা এবং অসমান ও সবিরাম নাড়ী; সামান্য সঞ্চলনে ইহার বৃদ্ধি। বোধ হয় যেন নড়িলে চড়িলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে (আশঙ্কা হয় সর্ব্বদা না নড়িলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে—জেলসি)

বৃদ্ধিঃ—শয়নে; সঞ্চলনে; উষ্ণগৃহে।

সময়ঃ—অনিয়মিত নাড়ীর লক্ষণেই জ্ঞাপকলক্ষণ।

কম্পঃ—হস্ত ও চরণতলে আরব্ধ, পরে সর্ব্বত্র বিস্তৃত। হস্ত ও বাহুর শীতলতা (শাখাঙ্গের জেলসি;—বাহুদ্বয়ের বেলা, হেলি; হস্ত ও চরণাঙ্গুলির ও ওষ্ঠের ব্রাই) সান্ধ্য কম্প; শীতল বায়ু লাগা (রেবা, কা, ক্যাম্ফ) ও গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ সহ্য না হওয়া; কম্পের প্রাধান্য ও আভ্যন্তরিক কম্প ও বাহ্যিক উত্তাপ; পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও উত্তাপ। হস্ত ও চরণের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্মযুক্ততা।

তাপঃ—হঠাৎ উত্তাপের ঝলক ও সর্ব্বাংশে দুর্ব্বলতাবোধ। কম্পের পর তৃষ্ণাবিহীনতা ও প্রধানতঃ আস্যে তাপের উদ্রেক; হস্তদ্বয় অধিক কাল-পর্য্যন্ত শীতল থাকে। সর্ব্বত্র উত্তাপবোধ, বিশেষতঃ আস্যে ও হস্তে; নাড়ীর দ্রুতগতি। শরীরে উত্তাপ এবং আস্যে শীতল ঘর্ম্ম; শরীরের বিভিন্নাংশের উত্তাপ, কিন্তু আস্যের নহে। আহারান্তে সাধারণ উত্তাপ। একহস্ত উষ্ণ ও অন্য হস্ত শীতল (লাইকো)।

ঘর্ম্মঃ—রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায়, মধ্যপরিমিত ও দুর্গন্ধ, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম, কিন্তু তাহাদের হৃৎলক্ষণের উপশম নহে। শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, হস্ততলে উষ্ণঘর্ম্ম; শরীরের অর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম। রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম শীতল ও চট্‌চটে। কম্পের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্ম (বোভি, কষ্টি, এককালীন উত্তাপ ও অপ-র্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম-কোণা)

BLEED THROUGH.

জিহ্বাঃ—পরিষ্কৃত বা শ্বেত লেপযুক্ত; অম্ল ও তিক্তদ্রব্য ভোজনেচ্ছা; নিয়ত লালাস্রাব।

নাড়ীঃ—তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রতিঘাতে সবিরামতা। বিশ্রামকালে অত্যন্ত মৃদুগতি; কোনপ্রকার সঞ্চলনে দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন।

মন্তব্যঃ—ইহার পর সিংকোনা কোনক্রমেই ব্যবহার্য্য নহে; কারণ এই ঔষধ হইতে উদ্ভূত উৎকণ্ঠা সিংকোনা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ড্রসেরা।

কম্পঃ—কম্পের সহ আস্যের শীতলতা ও মলিনতা এবং শাখাঙ্গের শীতলতা; পূর্ব্বাহ্নে কম্প; রাত্রিতে শয়নে ও বিশ্রামে আভ্যন্তরিক কম্প; বিশ্রামে কম্প ও শিহরণ, বোধ হয় যেন সর্ব্বত্রই অত্যন্ত শীতবোধ, এমন কি শায়িত অবস্থাতেও দিবসে কম্প, রাত্রিতে উত্তাপ।

তাপঃ—শুদ্ধ আস্য ও মস্তকেরই; সন্ধ্যাকালে শরীরের উর্দ্ধাংশে তাপের বৃদ্ধি; মধ্যরাত্রির পর উত্তাপের বৃদ্ধি। "তাপাবস্থায় অপর্য্যাপ্ত লালাস্রাব" (হানিমান)।

ঘর্ম্মঃ—শীতল ঘর্ম্ম কপালে, চরণে। রাত্রিতে উষ্ণ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পর ও প্রাতরভিমুখে, আস্যে ও উদরে ইহার অপর্য্যাপ্ততা। কাসিতে কাসিতে কষ্টবমন ও সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম।

জ্বরবিরামঃ—প্রায়ই সম্পূর্ণ, কিন্তু পাকস্থলীর লক্ষণ বর্ত্তমান। ঘর্ম্মাবস্থাপেক্ষা এই অবস্থায় অধিক কাসি। বিবমিষা ও গলামধ্য ক্ষতযুক্ত সবিরাম জ্বর।

মন্তব্যঃ—হুপাখ্য কাসি দেশব্যাপী হইলে, তৎকালীয় বা তৎসংসৃষ্ট জ্বরে ইহার ব্যবহার। অ্যারেনিয়া ও বোভিষ্টার ন্যায় ইহাতে কম্পের প্রাধান্য এবং অন্যান্য অবস্থা অতি সামান্যভাবে বা আংশিক প্রকারে বর্ত্তমান।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা, } শ্রীবিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি,
হোমিওপ্যাথি প্রাক্‌টীসনার।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কণ্টকারী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কণ্টকারী, বৃহতী, ভামোট, (ইহার সংস্কৃত নাম ভার্গী), বাসকছাল, ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেকে /৪ সের; ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ গজপিপুল, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, কিস্‌মিস্, দাড়িমফলের খোসা, দেবদারু মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে এক হইতে চারি আনা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাশ, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। যে জ্বর কিছুতেই উপশমিত না হয়, সেইরূপ অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের তরুণাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নহে।

লাক্ষাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের; লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের; দধির মাত ।৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরামূল, কট্‌কি ও রেণুকা মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকদিগের জ্বরাদি উপশম ও বলবৃদ্ধি হয়।*

ব্যাঘ্রী তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের; কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল ও কেশুরি-

---

* কুইনাইনসেবী বালকদিগকে তৈল মর্দ্দন করিতে দিলে জ্বরের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

য়ার রস প্রত্যেকে /৪ সের; কাঁজি /৪ সের কল্কার্থ মুথা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, শালপাণি, চাকুলে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা মিলিত /১ সের। নিমকাষ্ঠের অগ্নিতে মৃত্তিকাপাত্রে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে বালকদিগের শ্বাস, কাশ, জ্বর, অগ্নিবিকৃতি ও বিবিধ ত্বক্-পীড়া দূরীকৃত হয়।

জ্বরাতীসার।

কখন কখন বালকদিগের জ্বরের মধ্যে নানাবর্ণের তরল মলভেদ হইয়া থাকে। তদ্রূপ অবস্থায় শিশু পেটের বেদনায় বড়ই অস্থির হয়। ইহা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা জল /॥০ সের, শেষ ৵০ ছটাক, এই ক্বাথ দ্বারা শিশুর স্তন্যদোষ নিবারিত ও জ্বরাতীসার উপশমিত হয়। আকস্মিক হইলে স্তন্যদায়িনীকেও সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। মুথা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমি নিবারণ হয়। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের জ্বরাতীসার ও বমন নিবারণ হয়। হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে শুল্‌ফা প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের জ্বরাতীসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পশ্চাল্লিখিত পারিগর্ভিক রোগাধিকারোক্ত কুমারকল্যাণ রস অবস্থানুযায়ী অনুপানের সহিত সেবন করাইলে এই পীড়ায় বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। জ্বরে চমক বা তড়কার সময় শিশুর যে ভয়ানক অবস্থা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বিশেষ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। জ্বরের বেগ লাঘব হইয়া আসিলে আর কখন সেইরূপ ভাব উপস্থিত হয় না। তবে নিতান্ত বেগতিক দেখিলে চক্ষে মুখে বা মস্তকে শীতল জলের ছিটা

দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উহা উপশমিত হইলে আর শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ লক্ষিত হইলে কিঞ্চিৎ মকরধ্বজ চটী অতি অল্প মাত্রায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বালককে অবলেহন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রিমি দোষেরও লাঘব হয়।

ক্রিমিদোষ।

যদি এলো মেলো রূপে জ্বরের বেগ হয় অর্থাৎ জ্বর আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকে, অথবা কখন অল্প বা কখন অধিক পরিমাণে জ্বরের বেগ হয়, নাসারন্ধ্রে কফ জমাট হইয়া না থাকিলেও বালক অবিরত হস্ত দ্বারা নাসিকা ঘর্ষণ করে, তীব্র পেটের বেদনায় একবারে অস্থির হয় এবং বেদনার সহিত অল্প অল্প পাতলা মল ভেদ হয়, তবে ক্রিমিজনিত পীড়া বলিয়া স্থির করিবে। এরূপ অবস্থায় জয়ন্তী পাতা দ্বারা রুটির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া নাভির উপর স্থাপন করিলে বা হিঙ্গু দ্বারা ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। তলপেটে তারপিন তৈল মর্দ্দন করিবারও নিয়ম আছে। দাড়িমের খোলা, সুপারি মূল একত্রে বাঁটিয়া তাহার রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে বিস্তর উপকার হয়। মধুর সহিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ সেবন করাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। মুথা, ইন্দুরকানি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনা ছাল, দেবদারু, ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল /০ আনা, বিড়ঙ্গ /০ আনা বাঁটিয়া সেবন করাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ বিনষ্ট হয়। খোরাসানী যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ ও সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে পারসীয়াদি চূর্ণ কহে। এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িয়া বালককে একটু একটু সেবন করাইলে কাশ, জ্বর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল বাতাহত কদলীর ন্যায় উন্মূলিত হইয়া যায়। যুবকগণও ইহা সেবন করিতে পারেন।

দুধ পীলা।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বালকদেরও পীলা হইয়া থাকে। সেই

সঙ্গে জ্বর ও উদরের পীড়াও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ঔষধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া সাধারণ বিধানমতেই তাহার চিকিৎসা করিবে। শামুকের মুখের মধ্য ভাগ এবং মানকচুর শিকড় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের দুধ পীলার উপশম হয়।

অতীসার।

স্তন্যপায়ী শিশুর আমাতিসারে প্রথমতঃ ধাত্রীর উপবাস করা কর্ত্তব্য। অথবা পঞ্চকোল সিদ্ধ পেয়াদিও পান করিতে পারেন। বচ, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ ইহাদিগকে বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রযব, এই গুলিকে হরিদ্রাদিগণ কহে। এই উভয়গণ স্তন্য-শোধক, আমাতিসারনাশক, কফঘ্ন ও মেদশোধক। ইহাদের ক্বাথ শিশুর স্তন্যদায়িনীকে এবং সম্ভব হইলে শিশুকেও সেবন করাইবে। শিশুর অতীসারের আমাবস্থা শুষ্ক হইলে ধাত্রীর পিপুল চূর্ণের সহিত মাস কলায়ের যুষ পান করা কর্ত্তব্য। মুথা, আতইচ, শুঁঠ বালা, ইন্দ্রযব। বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ, গজপিপ্পলী, বরা-ক্রান্ত, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল। যথাবিধি ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ধাত্রী ও শিশুকে সেবন করাইলে সকল প্রকার অতীসার উপশমিত হয়।

শিশু ঔষধ সেবনে অসমর্থ হইলে কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েতবেল ইহাদের যথাপ্রাপ্ত পত্র বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অতীসার ও বমি নিবারিত হয়। পেটারী মূল, আকনাদি মূল, জাম ছাল, আমছাল, এই সমুদায় পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, ইহা হৃদয়, নাভি ও তালুতে ধারণ করিলে বমি ও অতীসার বারণ হয়।

আমড়াছাল, আমছাল, জামছাল। অথবা প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁটির শাঁস, মুতা ও রসোত। ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত শিশুকে অবলেহন করাইলে বমি, তৃষ্ণা ও অতীসার নিবারিত হয়। বিল্বমূলের ক্বাথে খই ও চিনি গুলিয়া পান করাইলেও উপকার হইতে দেখা যায়।

প্রবাহিকা।

চলিত ভাষায় ইহাকে আমবিকার কহে। আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইলে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে নাভির চতুঃপার্শ্বে এবং তলপেটে চাপ ধরিয়া অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়। মলত্যাগ করিবার সময় যার পর নাই যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শ্বেতজীরা ও শ্বেত ধুনা বিল্বপত্র রসে অথবা কেবল শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবন করাইলে বালকের আমরক্ত ও পেটের বেদনা নিবারিত হয়। মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, ইহাদিগকে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ (তরল পানীয়) প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করাইলে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। তিল, তিলতৈল, যষ্টিমধু, চিনি ও মধুর সহিত চাটিয়া সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও প্রবাহিকা নিবারণ হয়। খই, যষ্টিমধু, চিনি, মধু, এই সমুদায় তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইলে শীঘ্র আমাশয়ের পীড়া নষ্ট হয়। হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপ্পলী, শুলফা, ইহাদের চূর্ণও প্রবাহিকানাশক।

গ্রহণী।

আঁকোড় মূল অথবা কুড়চি মূল চাউল ধোওয়া জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে অতীসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, কুড়চি মূলেরছাল ৪ ভাগ, একত্রে পেষণ করিয়া গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করাইলে গ্রহণী রোগের শান্তি হয়। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস মিলিত করিয়া দুগ্ধ ⁄। এক পোয়া ⁄১ সের জলে পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ বালককে পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে মাংস রক্ত ক্ষরণ সহিত প্রবল গ্রহণী নষ্ট হয়। ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলেও উপকার হয়।

অজীর্ণ ও উদরাময় রোগগ্রস্ত বালকদিগের পক্ষে গব্য দুগ্ধ পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহাতে আরও উদরের পীড়া বৃদ্ধি হয় এবং ক্রিমি দোষ জন্মে। সুতরাং ছাগদুগ্ধই তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। দুগ্ধজীবী ও দুগ্ধান্নজীবী শিশুদিগের অজীর্ণ ও

উদরাময় হইলে লবঙ্গ চতুঃসম, দাড়িম্ব চতুঃসম, বালকুটজাবলেহ ও বালচাঙ্গেরী ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা অতি সুন্দররূপে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্নজীবি শিশুদিগের সম্বন্ধে রামবান রস ও মহাগন্ধক প্রভৃতি ঔষধই উৎকৃষ্ট। দুগ্ধজীবী শিশুদিগের ঔষধ গুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই ;—

লবঙ্গ চতুঃসম।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, এই দ্রব্য চতুষ্টয় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। পরে ইহাদিগের সমভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। চিনি ও মধুর সহিত এই চূর্ণের কিঞ্চিৎ বালককে অবলেহন করাইলে আমাতিসার ও তজ্জনিত পেটের বেদনা নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব চতুঃসম।

উপরোক্ত বস্তু চতুষ্টয় একটী দাড়িম্বের মধ্যগত করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পুট প্রদান করিবে। পরে ছাগদুগ্ধ বা জলের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধজীবী শিশুর পক্ষে ইহার একটী করিয়া বটী এবং দুগ্ধান্নজীবী শিশুর পক্ষে ইহার একটী করিয়া বটী এবং দুগ্ধান্নজীবী শিশুর বয়ঃক্রমানুসারে ২ হইতে ৪টী করিয়া বটী একবারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান ছাগ দুগ্ধ বা জল। বালকদিগের উদরাময় রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

কালকুটজাবলেহ।

কুট্টিত কুড়চি মূলের ছাল ৮ তোলা পরিমাণে ওজন করিয়া /১ সের জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে এবং আতইচ, আকণাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের কুই, শলুফা, ধাইফুল, মুথা, জায়ফল, এই কয় খানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এক একটী ।০ চারিআনা ওজনে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া সাবধানে রাখিয়া দিবে। যাহারা তীব্র পেটের বেদনায় একবারে অস্থির হইয়া পড়ে, এবং বাহ্যে যাইবার

সময় যাহাদের রক্তমিশ্রিত মল বা শুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ দুই বেলা অবলেহন করিতে দিলে শীঘ্র উপকার হয়। ইহা বালকদিগের আমশূল ও রক্ত-গ্রাহের মহৌষধ।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, আমরুলের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কয়েতবেল, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মোচরস, মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বালকের অতীসার এবং গ্রহণী প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ক্রমশঃ—

সাকিম উমারপুর
পোঃ নাকালিয়া
পাবনা।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিণাম।

এলোপ্যাথি মতে।

লোকের মুখে শুনিতে পাই—চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণকার ও পূর্ব্ব কালের চিকিৎসাপ্রণালীর তুলনা করিলে উভয়ে নাকি আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর দেখিয়া কবিরাজগণ ভয়ে স্তব্ধ হইতেন, এখনকার ডাক্তারেরা তাহাকে কি চমৎকার কৌশলেই নষ্ট করেন!। রণ-নিপুণ সেনাপতি যেমন কখন কখন শত্রুর নিকট পরাজয়ের বা পলায়নের ভাণ করিয়া শত্রুগণকে প্রথমে উল্লাসিত, পরে ছত্রভঙ্গ ও অবশেষে বিনষ্ট করেন। ডাক্তার মহাশয়গণও সেইরূপ নির্ব্বোধ জ্বরকে নানাবিধ সুশীতল খাদ্য পেয় দ্বারা প্রথমে পরিতৃপ্ত পরে বিরাম দ্বারা ছত্রভঙ্গ করেন এবং একটু সুযোগ পাইলেই কুইনাইন প্রভৃতি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে ধ্বংস করেন।

উৎসাহিগণ বলেন যে এক্ষণে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির জটিল পীড়াগুলি ডাক্তারেরা নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইতেছেন এবং স্নায়ু যন্ত্র, ও চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির পীড়াগুলি হস্তামলকবৎ লইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য এক একজন পণ্ডিত এক এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া তত্তৎ বিষয়ে অনেক আবিষ্কার করিয়াছেন, গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ও সুচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করিয়া মনুষ্য জাতির রোগ যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিয়াছেন। ইউরোপ ও মার্কিনে অস্ত্র চিকিৎসার যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এখন দেখিতে পাইলে প্রাচীন কালের চিকিৎসকগণ বিস্ময়স্তিমিত হইয়া থাকিতেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ব্বুদ কাটিয়া শস্ত্র চিকিৎসক অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য করিতেছেন। অন্ত্রবৃদ্ধি, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি কঠিন পীড়া সকল অস্ত্র ও কৌশলের সাহায্যে চিকিৎসার আয়ত্বাধীন হইয়াছে। ক্লোরোফরমের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় যে ভয়ঙ্কর রোগগ্রস্ত অঙ্গগুলি অনায়াসে কর্ত্তন করা হইতেছে এবং পচন নিবারক চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা তাহাদিগকে যে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করা হইতেছে, তাহাতে শস্ত্রচিকিৎসকগণকে দেবযোনির অবতার বলিয়াই বোধ হয়। ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী পুরুষগণ রমণীকুলের কি অশেষ উপকারই সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে গর্ভস্থ শিশুর হাত আগে বাহির হইলে টানাটানি করিয়া ধাত্রীগণ শিশু ও প্রসূতি উভয়কেই মারিয়া ফেলিত, এখন সেইখানে অতীব সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে মাতা ও সন্তান অন্ততঃ মাতাকে রক্ষা করিবার কতই উপায় হইয়াছে। এক্ষণে কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কার হওয়ায় আর এক চক্ষু হারাইলে কাহারই কানা হইয়া থাকিতে হইবে না। কৃত্রিম দন্তের অসাধারণ উন্নতি বশতঃ বার্দ্ধক্যের প্রধান যন্ত্রণা দন্তহীনতা ভোগ করিবার আর প্রয়োজন নাই। অধিক আর কি বলিব, এখনকার চিকিৎসকগণ বুড়াকে যুবা করিতে পারেন, মুমূর্ষুকে দীর্ঘজীবী করিতে পারেন, এখন তাঁহারা মৃতের শরীরে পুনর্জীবন সঞ্চার করিতে পারিলেই মৃত্যুঞ্জয় হয়েন।

স্তুতিবাদিগণ আধুনিক চিকিৎসার এইরূপ ও অন্যান্য যে সকল

প্রশংসা করেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যিনিই মনুষ্যজাতির রোগযন্ত্রণার বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে এইরূপ আত্মপ্রশংসায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট কিছু মাত্র নাই। ইহাতে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিবাদ প্রয়োজন। স্বীকার করিলাম যে, এক্ষণকার চিকিৎসক বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে ইন্দ্রজিত যেমন মেঘের আড়াল হইতে যুদ্ধ করিতেন, তেমনি এক স্থানে পীড়া হইলে দূরে প্রত্যুগ্রতা সাধন করেন। মানিয়া লইলাম যে কুম্ভকর্ণ কখন কখন যুদ্ধ কৌশলের অভাবে কেবল পর্ব্বত বা প্রস্তর চাপাইয়াই শত্রুনাশ করিতেন। আমরাও অধিক মাত্রায় এক একটী ঔষধ দিয়া কোন কোন রোগ আরাম করিতে পারি। স্বীকার করি যে, শস্ত্রচিকিৎসা ও ধাত্রী-বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাকেই কি চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্যক্ উন্নতি বলিতে হইবে? বুঝিতে পারিতেছি যে কুইনাইন প্রভৃতি কয়েকটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার হওয়াতে মনুষ্যসমাজের অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে উন্মত্ততা, বিষাদ বায়ু, গুল্মরোগ, অপস্মার প্রভৃতি যে কিছুতেই আরোগ্য হয় না তাহার কি উত্তর দিব? ক্ষয় কাশ, শ্বাস কাশ, প্রভৃতি ফুস্ ফুসের পীড়া, এবং হৃৎপিণ্ডের পর্দাগুলির একটী পীড়াও যে কোন মনুষ্যই আরোগ্য করিতে পারেন না, ইহা ভাবিলে কি দুঃখ হয় না? পাকস্থলীর অশেষবিধ পীড়া এমন কি পুরাতন অজীর্ণ বা অম্লরোগ যে মানুষের অসাধ্য, উদরাময় গ্রহণী প্রভৃতি রোগ পুরাতন হইলে যে মানুষ কিছুতেই আরাম করিতে পারে না, বহুমূত্র প্রমেহ ও উপদংশ রোগ একবার শরীর অধিকার করিলে যে মানুষকে আর মরণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না, সে মানুষের আবার চিকিৎসার গর্ব্ব কি? কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে মানুষ চিকিৎসা করিতে জানে না, কেবল ভয়বিহ্বল হইয়া আত্মরক্ষার জন্য রাজার সাহায্য লইয়া নিরপরাধ রোগীকে বন্দী করিয়া রাখে, সে মানুষের চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে বলিতে লজ্জা করে না? বিসূচিকা ও বসন্ত রোগ কোন কালেই মানুষের চিকিৎসার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল না। ঐ দুই রোগের প্রকৃতি কি তাহাই কেহ

বুঝিল না। এমন যে সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত ম্যালেরিয়া তাহাতেই বা কি চিকিৎসা আছে? এই যে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশ ছার খার হইল, জিজ্ঞাসা করি কোন চিকিৎসক কি সে সময় ম্যালেরিয়া দমন করিতে পারিয়াছেন? দমন করিতে পারা দূরে থাকুক, কেহ কি ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছেন? সেই ভীষণ সময়ে বঙ্গদেশীয় চিকিৎসকগণ অতীব লজ্জাকর কার্য্য করিয়াছিলেন। বিপন্নের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা শ্মশানের শকুনি ও শৃগালের অনুকরণ করিয়া সেই মুমূর্ষুগণকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের সমসাময়িক জন কয়েক পেটেণ্ট ঔষধবিক্রেতা দীন দুঃখির কাঁথার ভিতরের পয়সা গুলি মিথ্যা কথার মোহজাল বিস্তার করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন। অহহ এই কি চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি?

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বড় বড় রোগ মাত্রেই যখন চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না, কঠিন কঠিন পীড়া মাত্রেরই যখন নিদান বুঝিতে পারা যায় নাই; তখন চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে একথা কি করিয়া বলিব? এই যে এত ভিন্ন ভিন্ন মতের চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে, এই যে এত সহস্র সহস্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কি দেশের রোগসংখ্যা বা মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে? না তাহাতে অচিকিৎস্য রোগের যন্ত্রণা কিছু কমিয়াছে? যে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরচিকিৎসায় ডাক্তারগণ গর্ব্ব করেন, তাহাই বা ঔষধের দ্বারা—কেবল ঔষধের দ্বারা কয়জনে আরাম করিতে পারেন? যাঁহারা সেই জ্বর অধিক দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অনেক সময়েই কেবল উপসর্গ-চিকিৎসা ও রোগের দিনগণনা ভিন্ন অন্য কায চিকিৎসকের থাকে না। পরে যখন নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়াতে রোগ আপনা আপনিই সারিয়া আইসে, তখন চিকিৎসক মহাশয় আরোগ্য করার প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন, এবং কেহ কেহ কালি কলম ও কাগজ লইয়া হয় পুস্তক লিখিতে বসেন নতুবা সাময়িক পত্রে নিজের জয়ঘোষণা করিয়া প্রবন্ধ লিখেন।

বাস্তবিক মনুষ্য জাতি এত কাল চেষ্টা করিয়াও এই অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্রে এত অল্প উন্নতি করিয়াছেন যে তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। যতই দিন যাইতেছে ইউরোপ ও মার্কিন ততই নূতন নূতন মত করিতেছেন, বোধ হইতেছে যেন কতই দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু কলুর তৈলযন্ত্রের বলদ যেমন সমস্ত দিন চলিয়াও একটী সামান্য বৃত্তের মধ্যেই থাকে, সমগ্র চিকিৎসককুল এত কাল চেষ্টা করিয়াও সেইরূপ উন্নতির একটী নির্দ্দিষ্ট বৃত্ত-রেখার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহা যদি না হইত, তবে এখনও একটীও উৎকট রোগ আরাম করা যায় না কেন? এত অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের সম্যক্ ফল যদি পাওয়া যাইত, তবে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ অনেক গুলি কঠিন রোগে আধুনিক চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় কেন? ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রশংসা করা হইতেছে না, কেবল মনুষ্যজাতির উন্নতির অভাবের জন্য দুঃখ করা হইতেছে মাত্র।

কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, এত আর কোন শাস্ত্রই নহে। তথাপি এই দুইটী শাস্ত্রই অদ্যাপি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত রহিয়াছে, অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও রসায়ন দেখিতে দেখিতে নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ শাস্ত্র হইয়া উঠিল, কিন্তু মানুষের জীবন ও আত্মার জন্য যে দুইটী প্রয়োজন, তাহারা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। অনন্তজ্ঞানী বিধাতা এই দুইটী শাস্ত্রকে মানুষের একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার স্বরূপ রাখিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্য জাতি বহু আয়াস ভিন্ন এই দুই শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ আকারে প্রাপ্ত হইবেন না। যখন ইহারা সম্পূর্ণ হইবে, তখন মানুষ এক্ষণ অপেক্ষা উচ্চতর জীব হইবে।

সমগ্র জগতের সভ্য জাতির ধর্ম্মসমূহ ক্রমে ক্রমে একেশ্বর পূজার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভরসা করি চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহও ক্রমে ক্রমে একই চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, মনুষ্যের স্রষ্টা ইহ ও পরলোকের দণ্ড ও পুরস্কারবিধাতা যেমন এক জন মাত্রই হওয়া সম্ভব বলিয়া অনেক মানুষই একটু একটু করিয়া বুঝিতে-

ছেন, তেমনি প্রত্যেক রোগের শত শত প্রকারের চিকিৎসা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এক একটী রোগের এমন ঔষধ বা এমন উপায় বাহির হইবে যাহাতে সেই রোগ শীঘ্র ও নিশ্চয় সারে, তখন সকল লোকেই বুঝিবেন যে সে রোগের সেই চিকিৎসাই একমাত্র সুচিকিৎসা। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যেমন সংস্কৃত হইয়া একেশ্বরবাদে পরিণত হইবে, চিকিৎসা শাস্ত্রও সেইরূপ সংশোধিত হইয়া একটীমাত্র মত হইবে, তাহা একখানি পুস্তকেই লিখিত হইতে পারিবে। কত কালে এইরূপ হইবে তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। মানুষ তাহা জানে না।

কেবল একটী মাত্র উপায় আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিলে চিকিৎসার সত্যানুসন্ধানের পথে যাওয়া যায়। যদি এক্ষণ হইতে সমগ্র জগতের সুশিক্ষিত চিকিৎসক মণ্ডলী প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া উদার ভাবে সত্যানুসন্ধান করিবেন তাহা হইলেই আমাদিগের প্রস্তাবিত উপায়ের প্রথম কার্য্য করা হইল। যিনি যে প্রকার মতে চিকিৎসা করিতেছেন অবশ্য তিনি তাহাই করিতে থাকিবেন, নতুবা কায চলিবে না। কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনা এই যে প্রত্যেকেই নিজের শাস্ত্রের উপর অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্দিগ্ধ নেত্রে দর্শন করুন এবং অপরের শাস্ত্রকে উপহাস করিতে বিরত হউন। এক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসকগণের পরস্পরের প্রতি যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা এই শাস্ত্রের যথার্থ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। শকটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকে সমান তেজস্বী অশ্বযোজনা করিলে সেই শকট যেমন চলিতে পারে না, এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি বিভিন্ন মতের চিকিৎসাব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ পরস্পরের নিন্দাবাদী ও শত্রু হওয়াতেই সেইরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে না। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা করি বলিয়া প্রকৃতি আমাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রোগ প্রেরণ করেন। যখন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া আমরা পরাভূত হই, তখনই হে চিকিৎসকগণ! ত্রাহি ত্রাহি শব্দে তোমাদিগকে ডাকিতে থাকি। তোমরা আসিয়া কোথায় পরস্পরে সদ্‌যুক্তি করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, না তোমরা নিজেই পরস্পরের ভিতর বিবাদ বাধাইয়া দেও। তাই আমরা এত দুঃখ ভোগ করি, তাই আমরা এত শীঘ্র মরিয়া যাই। তৃণও বহু সংখ্যক একত্রিত হইলে মত্ত হস্তীকে বাঁধিতে পারে, ইহা স্মরণ করিয়া তোমাদিগের একত্রিত হওয়া উচিত। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত ইহা মনে রাখিয়া তোমরা নিজের শাস্ত্রের প্রতি অটল ভক্তি ছাড়িয়া দেও এবং সকল মানুষেরই কিছু কিছু বুদ্ধি আছে ইহা চিন্তা করিয়া অন্যের শাস্ত্রের প্রতি উদার ব্যবহার কর। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার নিকট তোমরা সমবেত চেষ্টার উপকারিতা শিক্ষা কর ও মানব জাতির উপকারার্থ উদারভাবে সত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ কর।

এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যখন চিকিৎসকগণের মন ব্যাকুল হইবে, এইরূপ উদারভাবে যখন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখনই প্রকৃত অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। কিন্তু অনুসন্ধানের পথে এক ভয়ঙ্কর বিঘ্ন আছে। সেই বিঘ্ন এক্ষণে আমরা বর্ণনা করিব।

প্রত্যেক রোগের নিদান ও প্রকৃতি, লক্ষণ ও ভাবিফল প্রভৃতি অঙ্গগুলি সম্বন্ধে এখনও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের মধ্যে যেমন বৈষম্য আছে তাহা শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। আর বৎসর কয়েক কালের ভিতরে সকল শ্রেণীরই বুদ্ধিমান চিকিৎসক এ সকল বিষয়ে একমত হইবেন। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের কথা উঠিলে কিরূপে বুঝিব কোন্ ঔষধটী ভাল? কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে যে অমুক রোগে অমুক মতের অমুক ঔষধ অপেক্ষা অমুক মতের ঔষধ শ্রেয়? কি উপায় অবলম্বন করিলে বুঝিতে পারিব যে বিসূচিকা রোগে এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভাল, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে কবিরাজী অপেক্ষা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ভাল এবং ক্ষয় কাশ রোগে কবিরাজি চিকিৎসাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ?

ইহার সহজ উত্তর এই যে কোন্ ঔষধে অধিক সংখ্যক রোগ সারে তাহাই দেখ। বিসূচিকা চিকিৎসায় কোন্ শ্রেণীর ঔষধে একশত রোগীর মধ্যে কত লোক বাঁচে তাহারই তালিকা কর। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঐ রোগ শতকরা নব্বই জন

আরোগ্য হয়, এলোপ্যাথি চিকিৎসায় শতকরা সত্তর জন আরাম হয় এবং কবিরাজী, হকিমি বা চীনদেশীয় চিকিৎসায় শতকরা পঞ্চাশ জন ভাল হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে বিসূচিকা রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে এবং ঔষধসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে। কিন্তু এই নিয়ম বাক্য ও প্রবন্ধ মধ্যে যেমন সহজ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে প্রয়োগ কালে তেমনি কঠিন এবং কার্য্যতঃ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইবে। যে এক শত রোগীকে হেমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া নব্বই জন আরাম করিলাম, তাহাদের রোগ কি এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত এক জন রোগীর মত সমান রূপ কঠিন? যদি তাহা না হয়, যদি এমন হয় যে যাহাদের এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কুড়ি জনকে মরণাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ করি, আর যাহাদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়াছি তাহাদের কেহই তেমন খারাপ অবস্থায় পড়ে নাই, তাহা হইলে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়া শতকরা ৭০ জন আরোগ্য হওয়া এবং হোমিওপ্যাথিক মতে শতকরা নব্বই জন আরোগ্য হওয়ার তুল্য মূল্য। আবার যদি এমন হয় যে কবিরাজি মতে যে এক শত জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দশ জনকে কবিরাজ মহাশয় ঠিক শাস্ত্রোক্ত অবস্থা অনুযায়ি ঔষধ দিতে পারেন নাই বলিয়া মারা পড়িল, আর দশ জন ঔষধ বমন করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন বমন নিবারক ঔষধ ধরিল তখন রোগীরা নিস্তেজ হইয়া মারা পড়িল, পীড়ার প্রকৃত ঔষধে কার্য্য হইল না। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা সত্তর জন বাঁচা ও কবিরাজি চিকিৎসায় শতকরা পঞ্চাশ জন বাঁচার একই মূল্য।

এখানেই বিঘ্নের শেষ হইল না। যদি এমনই হয় যে রোগবিশেষে ঔষধ বিশেষ খুব উপকারি হইল, অনেক লোক সেই ঔষধে সারিল, সকলেই বুঝিল যে সে রোগে সেই ঔষধটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা হইলেও তাহাকে বিশ্বাস নাই। এক বার যে ঔষধে যে রোগ বেশ ভাল হইল অন্য বার হয়ত সে ঔষধে উপকার হইবে না। ইহার উপর ভিন্ন ভিন্ন

লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধাতু আছে। এক জনের যে অবস্থায় যে ঔষধে উপকার হইল আর এক জনের সে অবস্থায় সে ঔষধে উপকার হয় না। তাহার পর যন্ত্রগুলির ক্রিয়াবৈষম্য বশতঃ একই ব্যক্তির শরীরে এক ঔষধ এক সময়ে বেশ উপকার করে, অন্য সময়ে করে না।

এত যদি গোলমাল তবে কিরূপে অনুসন্ধান করিব? বাস্তবিক ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে সত্য সিদ্ধান্ত করা বড়ই কঠিন। শারীরিক যন্ত্রগুলি যদিও সকল মানুষেরই একই আকারে গঠিত, একই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তথাপি প্রত্যেক মানুষের শরীরে জীবনীশক্তির এমনই একটু একটু সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিভেদ আছে যে সেই বিভেদ বশতঃই একজন মানুষের শারীরিক ক্রিয়ার সহিত অনেকাংশে এক হইয়াও একটু ভিন্ন হয়। এইরূপ বিভেদ কি জন্য হয় তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবল ইহা দেখিয়া বিস্মিত হই এবং ইহার 'ধাতু' নাম দিয়া নিজের অজ্ঞতা ঢাকিবার চেষ্টা করি। যেমন প্রত্যেক মানুষের মুখেই একই সংখ্যক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতিতে এমন একটু বিভেদ আছে যাহাতে এই পৃথিবীর কোটী কোটী মনুষ্য সকলেই পরস্পর ভিন্নাকৃতি; সেইরূপ এই পৃথিবীর কোটী কোটী মানুষের শারীরিক যন্ত্র ও কার্য্যগুলি প্রায়শ এক প্রকার হইয়াও একটু একটু বিভিন্ন। এই বিভেদবশতঃই ভিন্ন ভিন্ন লোকের শরীরে একই ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণের যত বিঘ্ন উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাই ভৈষজ্য শাস্ত্রকে এতকাল অনিশ্চিৎ করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহারই নিরাকরণ করিতে চিকিৎসকগণের এখনও বহুকাল পরিশ্রম করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত চিকিৎসকদিগের অনুসন্ধানের দোষ আছে। ইংরেজ-চিন্তাশীল কুলের চূড়ামণি লর্ড বেকন্ বলিয়াছেন যে মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ মনুষ্যগণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কালে অনেক দোষ করেন, তন্মধ্যে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া তিনি একটী ভয়ঙ্কর দোষ বলিয়া মনে করেন। অনেকে সামান্য অনুসন্ধান করিয়া অথবা কেবল মাত্র নিজের পোষিত

মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকেই যথার্থ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় সংগ্রহ করেন। আর যাঁহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক অনুসন্ধান করেন না, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইবার যে যে সম্ভাবনা আছে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিবার জন্য কষ্ট সহ্য করেন না, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়।

চিকিৎসকগণের যে এই দুইটী দোষ বহুল পরিমাণে আছে তাহা অঙ্গীকার করিতে পারা যায়না। কোন মহাত্মার মনে উদয় হইল যে কেবল জলেই সকল রোগ সারিবে। তিনি তাহারই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কেহ ভাবিলেন যখন জীবন বা প্রাণ একটী ভৌতিক শক্তিমাত্র তখন ভৌতিক শক্তির শ্রেষ্ঠ যে তাড়িত তাহাদ্বারা সকল ব্যাধিই আরোগ্য করা যাইবে; তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং জগতের নিকট তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। একজন পণ্ডিতের মনে ধারণা হইয়াছিল যে "সমঃসমংশমযতি" এই সূত্রের নীচে মনুষ্যের জন্ম জরা মরণাদি সকলই ঝুলিতেছে। ইহাতেই হোমিওপ্যাথির সৃষ্টি। আমি মহাত্মা হানিমান্‌কে যথেষ্ট ভক্তি করি এবং তাঁহার শাস্ত্রে অনেক সত্য আছে ইহাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র একটী সূত্রে বাঁধিয়া দিয়া তিনি ভাল কায করেন নাই বলিয়াই আমর বিশ্বাস। নিশ্চয়ই উপরোল্লিখিত শাস্ত্রগুলির সকলের মধ্যেই অর্থ আছে। কিন্তু কল্পনা শক্তির প্রশ্রয় থাকাতে ঐ সকল শাস্ত্র একমাত্র সত্যশাস্ত্র হইতে পারে নাই।

তাহার জ্বর অল্পসংখ্যক অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার দোষও চিকিৎসকদিগের আছে। খ্যাত নামা ডাক্তার চার্লস্ সূতিকা জ্বরের উপদেশ কালে ঐ ভাস্কর রোগের ঔষধ আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সকল কৌতুকাবহ গল্প বলিতেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এক জন চিকিৎসক এক একটী ঔষধ এই রোগে পরীক্ষা করিয়া এবং সুফল প্রাপ্ত হইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ঐ ঔষধের গুণ

ঘোষণা করিতেন। পর বৎসর সেই ঔষধ পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ রূপ ব্যর্থকাম হইতেন। তখন দ্বিতীয়ব্যক্তি, তাহার পর তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ লইয়া ঐরূপ করিতেন। এই রূপ করাতে এলোপ্যাথিক মতে অনেক রোগেরই চিকিৎসা অদ্যাপি অনিশ্চিত রহিয়াছে।

কল্পনা ও পোষিত মতের উপর ভিত্তি স্থাপন করিলে বালুকা রাশির উপর ইষ্টক সাজাইয়া নির্ম্মিত বাটীর ন্যায় চিকিৎসা শাস্ত্র অস্থায়ী ও অকর্ম্মণ্য হয়। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ইউরোপ ও ভারতবর্ষে অনেকেরই বিশ্বাস যে পিত্ত, কফ রক্ত প্রভৃতি দূষিত হইয়া সকল পীড়া উৎপন্ন করে। এইরূপ হয় কি না তাহা কাহারও দেখাইবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু এই মতটী দুর্ব্বল, অনুসন্ধানবিমুখ মানুষের মনে এমনি লাগিল যে সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়াও ইউরোপ এখনও ইহার হাত ভালরূপ এড়াইতে পারে নাই। আর ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামের উপাখ্যান যেমন জাগরূক আছে, তেমনি বায়ু, পিত্ত, কফ ও তাহাদের অনুচরবর্গ অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।—

অতএব অনুসন্ধিৎসুগণের উচিত যে তাঁহারা বর্ত্তমান কালের কোন চিকিৎসা শাস্ত্রেরই বৈজ্ঞানিক অংশ সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করিবেন না। কোন চিকিৎসা শাস্ত্রেরই নিদান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অংশ কঠিন ভিত্তির উপর গ্রথিত নহে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক অংশের সাহায্য লইয়া ঔষধের গুণ ও রোগারোগ্য করিবার ক্ষমতা নির্ণয় করিয়াই তাঁহারা প্রথমে সন্তুষ্ট থাকুন। উপরে বলিয়াছি যে ঔষধের রোগনাশ করিবার ক্ষমতা নির্ণয় করাও অতীব কঠিন। কি উপায়ে তাহা করা যায়, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

যিনি যে শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করেন, সেই শাস্ত্র মতে চিকিৎসা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পীড়াগ্রস্ত কত রোগীকে আরাম করিতে পারেন তাহাই প্রথমে বিচার করিতে হইবে। ঐরূপ বিচার ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপ হইতে পারে না। ইহার জন্য বড় বড় সহরে এক একটী সভা প্রয়োজন। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান

করিলে ভ্রমের হস্ত হইতে এড়ান যাইবে, সভা তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া বহু সংখ্যক হেডিং বিশিষ্ট এক এক খানি মুদ্রিত ফরম্ প্রত্যেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর নিকট দিবেন। ঐরূপ ফরম পূর্ণ করিয়া যখন চিকিৎসক সভ্য মহাশয়েরা সভার নিকট রিপোর্ট দিবেন তখন ঐ রোগের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়া বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সভা ঐ সকল রিপোর্টের আপেক্ষিক গুণ বিচার করিতে থাকিবেন।

ক্রমাগত এই উপায়ে কার্য্য করিলে, সভা নিশ্চয়ই দেখিতে দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে যত চিকিৎসাবিষয়ক মত প্রচলিত আছে, সকলগুলির ভিতরই কিছু কিছু সত্য আছে। সুতরাং তাঁহারা যদি এই গুলির সার সংগ্রহ করিয়া নূতন শাস্ত্র সংগঠন করিতে চাহেন, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বতন কোনটীরই মত হইবে না, অথচ সকলেরই কিছু কিছু উহাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবে দুইটী আপত্তি হইতে পারে। ১ম এই যে, এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে উহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হইবে না, কেবল সংখ্যা নির্ণায়ক বা ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল অনুসন্ধান হইবে মাত্র। আর দ্বিতীয়তঃ যখন প্রস্তাবিত চিকিৎসামত সংগঠিত হইবে, তখন উহা কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে না; অমুক ঔষধে অমুক রোগ কেন সারে তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এবং সমস্ত শাস্ত্রটী অন্যান্য চিকিৎসা মতের খিচুড়ি মাত্র হইবে।

ইহাতে আমাদের একমাত্র উত্তর এই যে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি চাহি না। নিদান শাস্ত্র গড়িতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা মহাশয়েরা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছা নাই। কেবল সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র সংগঠন করিলে কেহ কেহ বলিবেন যে উহা হাতুড়ে বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত, যাঁহারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়াছেন তাঁহারা ওরূপ শাস্ত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা তাঁহারা সকল কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান

করেন এবং কারণ বুঝিতে পারিলে নিয়ম আবিষ্কার করেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে সকল ঔষধ সত্য সত্যই মনুষ্যের উপকার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়টীর প্রকৃত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝা যায়। জ্বরে কুইনাইন ও উপদংশ রোগে পারদ যেমন মহৌষধ, এমন আর কোন রোগের কোন ঔষধ আছে কি না জানি না। তথাপি এই দুই ঔষধ কিরূপে কি উপায়ে উপকার করে, তাহা কি এখনও ভালরূপ বুঝা গিয়াছে?

আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা গণিয়াই চিরদিন ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া কখন হয় নাই। সুতরাং আমরা নূতন রকমের কোন প্রস্তাবই করি নাই। অবশ্য সকল শাস্ত্রের খিচুড়ি পাকাইয়া নূতন চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে অনেকে ঘৃণা বোধ করিবেন, কেহ কেহ পসার হানির ভয় করিবেন, কিন্তু যদি ঐরূপ সংমিশ্রিত মতের চিকিৎসা দ্বারা অধিক রোগী আরাম হয়, তাহা হইলে পসারের হানি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে।—

পাঠকদিগের অবগতির জন্য বলিতেছি যে এই বাঙ্গালা দেশেই দুই এক জন বিলক্ষণ যশস্বী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইরূপ উপায়ে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা তিন চারি প্রকারের মতে কার্য্য করেন। যে রোগে যে চিকিৎসা ভাল বলিয়া বোধ করেন, সেই রোগে সেইমতে চিকিৎসা করেন। কত দিনে এইরূপ চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িবে?।

বিষয়টী এতই গুরুতর যে মাদৃশ সামান্য ব্যক্তি দ্বারা এই কথা উত্থাপিত না হইয়া কোন খ্যাতনামা চিকিৎসক পণ্ডিত দ্বারা এই কথার সূচনা হইলেই ভাল হয়। যদি কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসক-দিগের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া একটী সভা স্থাপন করেন, তাহা হইলে ঐ সভাতে এরূপ প্রস্তাব কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই উঠিবে।

যদি মানুষের রোগ যন্ত্রণার শান্তি বা উপশম করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, যদি ঐ শাস্ত্র বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থায় আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে দণ্ডায়মান করাইতে হয়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে কলহ না করিয়া পরস্পরের যাহা কিছু ভাল আছে তাহা কেন আমরা

একত্রিত করি না? যাহা কিছু মন্দ আছে তাহা কেন ঝাড়িয়া ফেলি না? এখনও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের ভিতর যেরূপ বিবাদ চলিতেছে তাহাতে ভয় হয় যে, এখন এ কথা তুলিলে ক্রোধভরে কেহই ইহা গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু যখন রাগ পড়িয়া যাইবে, যখন সকলেই স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিবেন, তখন বুঝিবেন যে এই রূপ করা ভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির আর উপায় নাই। তখন নিশ্চয়ই সম্মিলিত ও পরিবর্ত্তিত চিকিৎসা শাস্ত্র সংগঠিত হইবে। এরূপ শাস্ত্র যদিও অসম্পূর্ণ থাকিবে, যদিও উহার উন্নতি প্রয়োজন হইবে বটে, তথাপি উহাই প্রকৃত পক্ষে যথার্থ চিকিৎসা শাস্ত্র হইবে, বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র গুলির উহাই পরিণাম হইবে।

শ্যামনগর
ফাল্গুন। ১২৯৬।

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বি, এ, এম, বি,

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্তযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, বুদ্ধি বিবেচনায় ও পাণ্ডিত্যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া গণনীয়। অন্ততঃ তাঁহার প্রতি লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি যথেষ্ট আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিণাম বিষয়ে তিনি যে এই মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার গুণ সমূহের জ্যোতি স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রবন্ধে গভীর জ্ঞান ও গবেষণার কথা অনেক আছে, দেখিবার শিখিবার অনেক আছে, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ বিষয়ে সর্ব্বাংশে আমরা অনুমোদন করি না। সে সকল স্থলে আমাদের বলিবার কথা বিস্তর আছে। তাহা বলা এস্থলে হইয়া উঠিবে না, বলিবার সময়ও এখন হয় নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি উন্নতি ও পরিণতির প্রকৃত কথা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। সেই সকল আন্তরিক গূঢ় কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মিলনীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উপরে বলিয়াছি ত' সে সকল কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি এই ত্রিবিধ চিকিৎসার প্রকৃত-

তত্ত্ব যদি এখন বিচার করিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি, তাহা হইলে কাল এমনি কুটিল যে, আমাদিগকে অনেকে হয়ত পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এমন দিন কিছু চিরদিন থাকিবে না। অন্ধকারের পর আলোক অমাবস্যার পর পূর্ণিমা আসিবেই আসিবে। ইহাই জগতের নিয়ম। সেই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় আমরা এখন অনেক কথা চাপিয়া এক প্রকার উদাসীন হইয়া বসিয়া আছি। পরিবর্ত্তনের লক্ষণও দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে। ভগবানের কৃপায় সে দিন বুঝি নিকট। দিন আসিলে দুঃখের কথা সব বলিব। আপাততঃ এ সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া তেলিনীপাড়া নিবাসী পরম বিজ্ঞ জীমদার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র খানি এই খণ্ডের স্থানান্তরে প্রকাশিত করিলাম।

চি, স, ক, স,।

মত-দ্বৈধ হয় কেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্বরিতাবস্থায় অন্যায় পানাহারের দোষে যে সকল মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে এবং ভোগবিলাসী পরমুখপ্রত্যাশী আমোদপ্রিয় বাবুগণ যে দিন দিন একবারে দুর্ব্বল ও ক্ষীণায়ু হইয়া পড়িতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে যথাসাধ্য বর্ণন করিয়াছি। এইক্ষণ বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগের সম্বন্ধে কিছু বলিব। নব্য তন্ত্রের উচ্চ শিক্ষিত বাবুগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, কবিরাজী মতে ওলাউঠা রোগের কোনও চিকিৎসার বিধান লক্ষিত হয় না; অথবা পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে এই রোগ একবারেই ছিল না, তাই ইহার কোনও উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই রোগ আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বতন হিন্দুগণ ইহাকে ওলা-

ওঠা বলিয়া জানিতেন না। তাঁহারা এই পীড়াকে বিসূচিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ওলাউঠা শব্দের যে প্রকৃত অর্থ কি, এবং কোন্ সময় কোথা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইল তাহাও কিছুমাত্র বলিতে পারি না। এই পীড়ায় বায়ুর প্রকোপবশতঃ অঙ্গসমস্তে সূচী বিদ্ধের ন্যায় অতিশয় তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, এই জন্য মহর্ষিগণ ইহাকে বিসূচিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * ফলতঃ ইহার নিদান, লক্ষণ, উপদ্রব ও পরিণামফলের বিষয় যেরূপ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগেরও ঠিক্ সেইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। তবে কালধর্ম্মে কর্ম্মবশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদিগকে অখণ্ড প্রতাপে বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করিতে দেখা যায়, তেমনি পাপস্রোত প্রবল হইলে প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী এক একটী পীড়া সমধিক মারাত্মক হইয়া জনপদ সকল বিধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। যাঁহারা সর্ব্বদর্শী বিচক্ষণ লোক, তাঁহারা সেই সকল অত্যহিত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ লোক সংসারে আজ কাল অতি বিরল। সকলেই স্বার্থ লইয়া বিব্রত। অন্যের উপকার হউক আর নাই হউক, নিজের কিঞ্চিৎ লাভ হইলেই যথেষ্ট।

অতি পূর্ব্বকালে যখন দুষ্ট গ্রহের দৃষ্টিপাতে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ভূমণ্ডল উত্তাপিত হওয়ায় সৃষ্টি বিনাশিনী মসূরিকা (বসন্ত রোগ) আবির্ভূতা হইয়া প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যেক নগরকে একবারে মহাশ্মশানে পরিণত করিতেছিল; সেই সময় পরদুঃখ কাতর পরম দয়ালু মহাত্মা বিশ্বামিত্র চণ্ডাল গৃহে অস্পর্শ কুক্কুর মাংস ভোজন করিয়াও সাধারণের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। অবশেষে পরম জ্ঞানী যোগতত্ত্ববিৎ শতাধিক মুনি একত্রে সমবেত হইয়া বহু গবেষণার পর টীকা দেওয়ার একটী অমোঘ উপায় সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই হইতেই ক্রমে ক্রমে বসন্ত রোগের উন্নত মস্তক অবনত হইল এবং চিরগর্ব্ব এক-

* সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সাবৈদ্যৈ র্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥

বারে খর্ব্ব হইয়া গেল। এই যে আবার এখন কালদোষে বসন্ত রোগের ন্যায় বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া দেশ শুদ্ধ একবারে উচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময় যদি সেই দয়ালুহৃদয় পুনর্ব্বসু ঋষি বিদ্যমান থাকিতেন, এখন যদি সেই প্রজাবৎসল ভগবান্ ধন্বন্তরী আবার মর্ত্ত্যধামে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কোন্ দিন টীকা দেওয়ার ন্যায় ইহারও একটা প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কালও নাই, সে লোকও নাই। আজ কাল যাঁহারা গণ্য মান্য সবিশেষ বিজ্ঞ বলিয়া জন সমাজে বিখ্যাত, তাঁহারা কেবল কুলবতী ভদ্রমহিলাদিগের অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া অপরিচিত যুবকবৃন্দের সহিত তাহাদিগের আলাপ করাইয়া দিতে এবং বিধবা যুবতীদিগের বৈধব্যযন্ত্রণায় অধীর হইয়া একাদশীর করাল গ্রাস হইতে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত!

এই সমুদয় কথা উল্লেখ করিয়া আপাততঃ কোন ফল নাই। এক্ষণে যাহা বর্ণিতে বসিয়াছি, তাহাই একটু আলোচনা করিব। পূর্ব্ব কালে যখন বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন এক জনের ঐ পীড়া হইলে বীজাণুদ্বারা গ্রামস্থ সকলকেই আক্রান্ত হইতে হইত। বিশেষ রূপ সতর্ক হইয়া থাকিলেও কেহ অব্যাহতি পাইত না। কিন্তু বর্ত্তমান ওলাউঠা, বসন্ত রোগের ন্যায় সংক্রামক পীড়া হইলেও ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলতঃ এই পীড়া সম্বন্ধে যিনি যে প্রকারই কেন মীমাংসা না করেন, ইহার নিদান সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে, পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের কখনও এই পীড়া হয় না। যাঁহারা ভক্ষ্যাভক্ষণা, ভিজ্ঞন অজিতাত্মা, যাঁহারা লোভ পরবশ হইয়া যাহা পায় তাহাই উদরসাৎ করিয়া ফেলে, সেই সকল আহারলোলুপ পেটুক ব্যক্তিরাই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে"*। দুরন্ত বসন্ত রোগের হস্ত হইতে ভাগ্যক্রমে একবার নিষ্কৃতিলাভ করিলে পুনর্ব্বার সেই রোগে আর আক্র-

* ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥

মণ করিতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্বতন হিন্দুগণ উক্ত রোগের বীজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিতেন। কিন্তু ওলাউঠা তদ্রূপ প্রকৃতির নহে। ইহার নিকট একবার অব্যাহতি পাইলেও পুনর্ব্বার ইহারই হস্তে জীবনের খেলা সাঙ্গ হইতে পারে। যখন কোন প্রদেশে প্রথম ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হয়, তখন একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিশ্চয় জানা যায় যে আহার লোলুপ পেটুকব্যক্তিই প্রথমে এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু রোগীর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে কখন প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। এইরূপে দুই এক জনের হইতে হইতে যখন গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, যখন চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি অবিরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মনকে আকুলিত করিয়া তুলে, থাকিয়া থাকিয়া পক্ষীগণ এক এক বার কলরব করিয়া উঠে এবং এক এক সময় ভীতিব্যঞ্জক অস্পষ্ট শব্দরাশি শ্রুতিগোচর হইয়া শরীর কম্পিত হয়, তখন খুব সাবধানে থাকিলেও যেন পেটের ভিতর আপনা হইতে গুড় গুড় করিয়া উঠে। যাহারা স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতির লোক, তাহারা সেই গুড় গুড়িতেই একবারে অধীর হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা মিতাহারী সাহসিক লোক, তাহারা যদি নিয়ত রোগীর কাছে বসিয়া নিজ হস্তে তাহার মল মূত্রাদিও পরিষ্কার করিয়া দেয়, সর্ব্বদা তাহার নিশ্বাস শরীরে লাগায়, এবং সেই গৃহস্থিত খাদ্য সামগ্রীও উদরস্থ করে, তথাপি তাহাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিতে পারে না। এই সমস্ত ধীর-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সংক্রামক পীড়া হইলে ও ঠিক্ বসন্ত রোগের ন্যায় নহে। সেই বসন্ত রোগেরই যখন প্রতীকার হইয়াছে, তখন ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?

ক্রমশঃ——

সাং উমারপুর
পোঃ নাকালীয়া
পাবনা।
} শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

কথাগুলি বেশ কথা। চি, স, ক, স,

মুড়ি।

কোন বিষয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্বের তারতম্যের সময়ে মুড়িকে উপমার স্থলে আনিয়া "মুড়ি মিছরির একদর" এই কথা বলিয়া থাকে। মুড়ি অতি লঘু অথচ পুষ্টিকারক খাদ্য। রুচির পরিবর্ত্তনে, সভ্যতার খরস্পর্শে মুড়ি এক্ষণে হেয় ও অখাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল খাদ্য এক্ষণে সুখাদ্য বলিয়া লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, বাস্তবিকই তাহার অধিকাংশ অখাদ্য। শৈশবাবস্থা হইতে এই সকল খাদ্যের প্রতি আমরা আস্থা দর্শাইয়া খৈ ও মুড়ি প্রভৃতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে শিখিতেছি ও ভাবী বংশধরদিগকে শিখাইতেছি। এখন ছেলেদিগকে মুড়ি খাইতে দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। আমাদের স্বভাব দোষে আমাদের ছেলেরাও মুড়িকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। মুড়ি যে খাদ্য নহে এই তাহাদের বিশ্বাস। বিলাতী আমদানি সুরঞ্জিত টিনের কানেস্টারার বিস্কুট তাহাদের খাদ্য বলিয়া তাহারা জানে। ক্রমে মুড়ির প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মে, এবং পরে উহা নিতান্তই অখাদ্য এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়। যে বিস্কুট ছেলেরা আহ্লাদপূর্ব্বক খায়, যাহা আমরা উপাদেয় খাদ্য বোধে ছেলেদিগকে দিয়া থাকি, তাহার উপাদান কদাচই মুড়ি অপেক্ষা কোন গুণে উৎকৃষ্ট বা অপকারী নহে, বরং অনেক স্থলে নিকৃষ্ট ও সমূহ অপকারী। মুড়ি আগ্নেয়, বায়ুনাশক, অম্লনাশক, পুষ্টিকারক অথচ লঘু। এতগুলি উৎকৃষ্ট ক্রিয়া স্বল্প মূল্যের অতি সামান্য দ্রব্যেরই আছে। সবলতা দুর্ব্বলতা, রোগ ও নীরোগ সকল অবস্থাতেই টাট্‌কা মুড়ি খাইতে পারা যায়। একটী অম্লশূলগ্রস্ত রোগীকে দেখিয়াছি, তিনি যে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করেন তাহাতেই সমূহ কষ্ট জন্মে ও যতক্ষণ তাহা বমি হইয়া উঠিয়া না পড়ে, ততক্ষণ কষ্টের আর সীমা থাকে না, কেবল মাত্র মুড়ি ও দুধ বা খৈ ও দুধ খাইয়া তিনি ভাল থাকেন; এবং ১০। ১১ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতেছি উক্ত উভয়বিধ খাদ্যের যে কোন রূপ দ্রব্য খাইয়া

তিনি জীবনধারণ করিতেছেন। ইহাতে এই বোধ হয় যে, মুড়ি সহজে পাচ্য ও অম্লনাশক। একটী অতিসারের রোগীকে পথ্য দেওয়া লইয়া বড়ই বিড়ম্বনায় পড়িতে হইয়াছিল। রোগী হিন্দুর বিধবা; মাংস ও মৎস্যের ক্বাথ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। বমনাদি উপসর্গ ছিল; কি পথ্য দেওয়া যায়, ভাবিয়া শেষে টাট্‌কা মুড়ির ক্বাথে রোগীর রুচি হইতে পারে স্থির করিয়া তখনই মুড়ি ভাজাইয়া তাহা জলে ফেলিয়া, সামান্য শর্করা, লবণ ও লেবুর রসের সহিত মণ্ড প্রস্তুত ও পাতলা বস্ত্রে ছাকিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে বমন নিবারণ জন্য বিস্‌মথ ক্রিয়েজোট্‌ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হইতেছিল। ২।৪ বার মুড়ির ক্বাথ সেবনে তাহা সুন্দর আরোগ্য হয়, অথচ অতিসার বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় নাই, বরং মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন সহ মল ক্রমশঃ কঠিন হইয়াছিল। হিক্কা নিবারণ পক্ষে টাট্‌কা মুড়ি ভিজের জল বিশেষ উপকারী। টাট্‌কা মুড়ি ভাজিয়া গরম থাকিতে জলে ফেলিয়া এক কোয়াটর্‌ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া একটু লবণ সহ হিক্কা নিবারণার্থ ঐ জল একটু একটু করিয়া পান করাইতে হয়। মুড়ি ভিজার জলে প্রস্রাব সরল করে, যাহাদের প্রস্রাব কালে কষ্ট বোধ হয়, জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, তাহাদিগকে মুড়ির জল শর্করা সহ পান করিতে ও তাহাতে প্রস্রাব সরল হয় এ কথা বলিতে শুনিয়াছি।

টাট্‌কা মুড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য; নারিকেল সহ খাইলে বিশেষ তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু হায়! রুচির পরিবর্ত্তনে এ খাদ্যকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি, অখাদ্য বলিয়া ঘৃণা করি। লবণ ও ঘৃত মাখিয়া অনেকে মুড়ি খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল ও লবণ সহ ভাল লাগে বলিয়া বোধ হয়। মুড়ি খাইয়া অধিক জল পান না করা উচিত। আহারান্তে অধিক জল পানে পাচক রসের তারল্য বশতঃ যেমত পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, মুড়ি ভক্ষণ অন্তে অধিক জল পানেও তদ্রূপ হয়। সুতরাং মুড়ি ভক্ষণ করিয়া অধিক জল পান না করাই ভাল।

বাঙ্গালী মুখে বলেন পুঁজি নাই তা ব্যবসা করিব কি? ব্যবসার ইচ্ছা খুবই আছে। বিলাত হইতে বিস্কুট আসে তবে আমাদের বালকদের

পথ্য চলে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় টাটকা মুড়ি টিনের কানস্তারায় পুরিয়া উত্তমরূপে প্যাক্‌ করিয়া "ইণ্ডিয়ান্‌ বিস্কুট" নাম দিয়া বিলাতে ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যদি চালান দেওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই উত্তম ব্যবসা চলিতে পারে। যে বিস্কুট বাজারে ১৲টাকা হিসাবে কানাষ্টারা বিক্রয় হয়, সেইরূপ কানষ্টারা মায় খরচায় এখানে তিন আনা চারি আনা পড়ন হইতে পারে ও ছয় আনা বা সাত আনায় বিক্রয় করিলে যথেষ্ট লাভ হয়; অথচ যে দেশে বিক্রয় হইবার কথা হইতেছে তথাকার লোকে ও অপেক্ষাকৃত সুলভ বলিয়া বোধ করে। কিন্তু বোধ করি এ সামান্য মুড়ির ব্যবসা অনেকে পছন্দ করেন না। দুধ বা দধি, শর্করা ও রম্ভা সহ মুড়ির ফলাহারে কাহার রসনা তৃপ্ত না হয়? স্বধর্ম্মপরায়ণ অনেক হিন্দুকে আমরা এখনও নারিকেল-মুড়ি ভক্ষণ করিতে দেখিয়া থাকি। বাজারের ঘৃত ও তৎসংসৃষ্ট পদার্থ তাঁহারা অখাদ্য বিবেচনা করেন, ভেজাল ঘৃত ভক্ষণে ধর্ম্ম নষ্ট হয় এরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস। সভ্য বাবুরা নারিকেল মুড়ি ভাল না বাসিতে পারেন, কিন্তু বিবিধ প্রকারে স্বীয় ভ্রমপ্রমাদবশতঃ পদে পদে তাঁহাদের অদৃষ্টে "নারিকেল" মুড়ি (অর্থাৎ মুড়া ঝাঁটা) ঘটিতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু নির্জ্জীব দেহে তাহাতে চৈতন্য উদয় হইতেছেনা!!

চিকিৎসা দর্শন।

নারিকেল।

মুড়ির কথার পরে নারিকেলের কথা না বলায় ভাল দেখায় না, মুড়ির সঙ্গে নারিকেল ভালই লাগে। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে দু চার কথা বলা উচিত।

চিকিৎসাদর্শনের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ করি নারিকেল গাছ দেখিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা অপ্রয়োজন। বিলাতী উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এই বৃক্ষকে পালমেসী জাতীয় কোকস্‌ নুসিফেরা নামক বৃক্ষ কহে। এই বৃক্ষ নিম্নবঙ্গ, চট্টগ্রাম অঞ্চল, লঙ্কাদ্বীপ

ও সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ স্থলে প্রচুর জন্মে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জন্মে না। তাহাতেই বোধ হয় লবণাক্ত আর্দ্র ভূমি এই বৃক্ষের উপযোগী।

ইহার ফল কাঁদি নিয়মে প্রচুর জন্মে। বৎসরের মধ্যে সচরাচর চারি বার এই ফল হয়। বাঙ্গালার মধ্যে যশোহর, খুল্‌না ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশবাসীরা ইহার যথেষ্ট আবাদ করে ও ইহা তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। এই বৃক্ষ ও ইহার ফলের সকল অংশই মনুষ্যের কার্য্যে লাগে। ইহার পাতায় জ্বালানি ও একরূপ ক্ষার পাওয়া যায়। পাতার শিরে গৃহসম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হয় ও বঙ্গদেশের প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা একটী আবশ্যকীয় বস্তু। ইহার ফলের খোসায় কাতার নামক দড়ি প্রস্তুত হয়, এই দড়ি অতি দৃঢ় ও তাতবাতে সহসা নষ্ট হয় না। সিংহল, মালাক্কা ও লাক্ষাদ্বীপ এবং মালবার দ্বীপ হইতে প্রতিবৎসর বহু টাকার কাতার দড়ি ভারতে আমদানি হয়। ইহার শস্যের আবরণকে মালা কহে, বাঙ্গালির অনেক গৃহস্থালি কার্য্যে এই মালা প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহার পক্কফলের শস্যের বিস্তর উৎকৃষ্ট ক্রিয়া আছে। ঐ শস্য অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ নারিকেল খণ্ড ও বৃহৎ নারিকেল খণ্ড নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধদ্বয় এই শস্যে প্রস্তুত হয় ও ইহারা মহোপকারী। অপক্ক নারিকেলকে ডাব কহে। ইহার জল অতি স্নিগ্ধকারক, পিপাসায় এই জল পানে বিশেষ তৃপ্তি জন্মে। নারিকেল গাছের অপক্ক শিকড়ের রস পানে মূত্রকৃচ্ছ্র ভা রোগে প্রস্রাব সরল হয়। পক্ক শিকড়ের ক্ষার সেবনে মূত্র বৃদ্ধি করে, অধিকন্তু ইহা অম্লনাশক। তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় ইহা হইতে রস সংগৃহীত ও তাড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। তবে, সে রসক্ষয়ে বৃক্ষের হানি হয় ও রস অপেক্ষা ফলে অধিক লাভ হয় বলিয়া বোধ করি এই তাড়ি প্রচলন নাই।

নারিকেল-শস্য।

অপক্ক অর্থাৎ ডাব নারিকেলের কোমল শস্য স্নিগ্ধকারক ও অতি উপাদেয় খাদ্য। শর্করা সহ সুস্বাদুর বৃদ্ধি হয়। নারিকেলের শস্য

পোষক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক। অপক্ক নারিকেল শস্য বিস্‌মথ্‌ সহ ভক্ষণে সত্বরে বমন নিবারণ হয়।

পক্ক নারিকেল শস্য সহজে পরিপাক হয় না। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল স্নিগ্ধকারক, মৃদুবিরেচক ও পোষক। ইহা কড্‌লিভার অইলের গুণবিশিষ্ট ও কড্‌লিভার অইলের পরিবর্ত্তে টাট্‌কা তৈল অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তাহাতে উদরাময় জন্মিতে পারে। পক্ক নারিকেলের দুগ্ধ বিশেষ বিরেচক গুণবিশিষ্ট। একটী স্ত্রীলোককে এই দুগ্ধ দেড় পোয়া পরিমাণে পান করিয়া ওলাউঠায় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি। পক্ক শস্যে অস্মদ্দেশে সন্দেশ, রসকরা, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ছেলেরা সহজে কড্‌লিভার্‌ অইল্‌ সেবন করিতে চাহে না। তাহাদিগকে প্রত্যহ পক্ক শস্য চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিতে দেওয়ায় কড্‌লিভার অইলের কার্য্য করে। চর্ব্বণ অন্তে সিটা গুলি ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অম্লরোগগ্রস্ত রোগীদের পক্ষে ডাবের জল, পক্কশস্য ও নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী।

একটী লোকের উৎকাশি জন্মে। রোগী তাহাতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিল। একটী ডাবের মুখে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেই ছিদ্রে মুখ দিয়া চুষিয়া ঐ জল টানিয়া পান করিতে দেওয়ায় এক দিবসে উৎকাশী আরোগ্য হইয়াছিল। তৎপরে আরও বহুস্থলে এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষিত ও সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পিত্তজ্বরের রোগীর পুনঃ পুনঃ বমন হইতে থাকিলে, ডাবের জলে পুনঃ পুনঃ কুল্য করিতে দেওয়ায় সত্বরে বমন প্রশমিত হয়। এই সঙ্গে নারিকেলের অপক্ক কোমল শস্য সেবন করিতে দেওয়া যায়।

কচি অবস্থার ডাব অর্থাৎ নারিকেলের কচি ফল ঈষৎ মিষ্টাস্বাদবিশিষ্ট কষায়। জ্বরের সময়ে মুখের আস্বাদন যখন অতি কদর্য্য থাকে তখন কচি নারিকেল লবণ সহ চর্ব্বণে মুখের আস্বাদন পরিবর্ত্তিত হয়।

পক্ক নারিকেলের জল ঈষৎ কটু আস্বাদন ও বিরেচক গুণ-বিশিষ্ট। কোষ্ঠবদ্ধতায় পক্কনারিকেল জল-পানে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

অধুনাতন-সময়ে কলিকাতার বাজারে যে সকল সুবাসিত তৈলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই নারিকেল তৈল। এই নারিকেল তৈল আজ কাল অনেকের জীবিকা স্বরূপ। এঞ্জুসি দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া কোন রূপ গন্ধদ্রব্য মিশ্রণে এই তৈল প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞাপনে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাবলি দেখা যায়, তাহার প্রায় এক বর্ণও সত্য নহে। তবে নারিকেল তৈলের যে সকল গুণ আছে, এই তৈল ব্যবহার তাহাই পাইবার আশা করা যায়। নারিকেল তৈল স্নিগ্ধকারক পুষ্টিকারক কেশ-বর্দ্ধক ইত্যাদি। এই সকল ফললাভ প্রত্যাশায় বিশুদ্ধ খোপ্‌রার তৈল ব্যবহার করাই ভাল। অস্মদ্দেশে পূর্ব্বাঞ্চলে গৃহস্থেরাও পক্ক নারিকেল শুখাইয়া তাহা হইতে তৈল প্রস্তুত করে। নারিকেল পচিয়া যাইলেও ফেলা যায় না, তাহা হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, সে তৈলে একটু মন্দ গন্ধ জন্মে। জল সহ জাল দিলে সে গন্ধ নষ্ট হয়। নারিকেল বৃক্ষের শিকড়, গাছ, পাতা, ফল, খোসা, মালা প্রভৃতি সকল অংশই মানবের উপকারে আইসে। গৃহস্থের পক্ষে এরূপ কল্যাণকর বৃক্ষ আর আছে কি না সন্দেহ।

হিন্দুশাস্ত্রমতে নারিকেল অতি পবিত্র ফল। যে কোন শাস্ত্রীয় কার্য্যে নারিকেল ফলের আবশ্যক হয়। পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থস্থানে যাও দেখিবে শুষ্ক কত কালের একটী নারিকেল ফল তোমার হস্তে দিয়া মন্ত্রপূত করিয়া তোমার মন্তব্য কার্য্যে সংকল্প করিবে। মূল্যও পাণ্ডারা বিলক্ষণ লয়। ঐ সকল স্থানে নারিকেল ফল জন্মে না, এজন্য এরূপ অবস্থা ঘটে। এক একটী শুষ্ক নারিকেল সহস্রাধিক হাত স্পর্শ করিয়া সহস্রাধিক বার মন্ত্রপূত হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে নারিকেলের ব্যবসা করিলে প্রচুর লাভ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা দর্শন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"চিকিৎসা দর্শন" হইতে "মুড়ি" ও "নারিকেল" বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটী আমরা সাদরে ও সাগ্রহে উদ্ধৃত করিয়া সম্মিলনীর পাঠককে উপহার দিলাম। প্রবন্ধ দুইটি বিলাতী ব্যাধিগ্রস্ত বঙ্গসন্তানের পক্ষে প্রকৃত পক্ষেই "নারিকেল মুড়ির" প্রকৃষ্ট প্রহার বটে। ট্যাড়া মেজাজী বোকা বাবুদের চৈতন্যোদয় জন্য এই "নারিকেল মুড়ির" বড় প্রয়োজন হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। লেখক আমাদেরই প্রাণের কথা লিখিয়াছেন। আরও আনন্দের কথা এই যে লেখক নিজে ডাক্তার। ডাক্তার হইয়া তিনি বিস্কুট অপেক্ষা মুড়ির শ্রেষ্ঠতা ও কড্‌লিবার অপেক্ষা নারিকেল শস্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাহেবের দেশে সাহেবের পুঁথিতে যে ঔষধ যে পথ্যের ব্যবস্থা আছে, তাহা ছাড়া এ দেশে আর কিছুই ঔষধ বা পথ্যের স্থানীয় হইতে পারে না বলিয়া অধিকাংশ ডাক্তার বাবুদের বিশ্বাস। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে ডাক্তার রজনী বাবু কুঠারা-ঘাত করিয়াছেন, তাঁহার সাহস ও বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

প্রবন্ধে সার কথা অনেক আছে, কিন্তু সকল কথা তথাপি বলা হয় নাই। নারিকেল ও মুড়ির উপকারিতা বিষয়ে এখনও এত কথা বলিবার আছে যে, সে জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন। আমরা অবসর মতে তাহা লিখিবার চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইতে এ সকল কথা লিখিবার ইচ্ছা আছে। নানা কারণে লেখা হয় নাই। এখন ধীরে ধীরে লিখিবার সময় আসিতেছে দেখিয়া আমরাও আশান্বিত হইয়াছি আমাদের বিশ্বাস আছে এম্‌নি করিয়া ধীরে ধীরে সকল কথাই লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিবে। বুঝিবে যে আমাদের ঘরের সামগ্রী পায়ে ঠেলিয়া, পরের উচ্ছিষ্টে লোলুপ হইয়া আমরা মহা পাপ করিয়াছি। এই চৈতন্যের একটু সূত্রপাত হইলেই আমরাও অকুতোভয়ে প্রাণের কথা সকলই বলিতে থাকিব। চিকিৎসা-সম্মিলনীর আশা তখন সার্থক হইবে।

চি, স, ক, স।

শিশু চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি মতে।

অবস্থানুসারে চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

১। আক্রান্ত স্থানের অবস্থা। টনসিল বা তালুমূল স্ফীত হইলে একোন,বেল, হিপার, ল্যাকে, মার্ক ও ক্যাল। কোমল তালু আক্রান্ত হইলে বেল ও ফস্, আল্ জিহ্বার বিবৃদ্ধি হইলে ল্যাকে ও কফি। সীমাবদ্ধ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে মার্ক। অংশুবৎ লালবর্ণে বেল। আক্রান্ত স্থান নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে ল্যাকে, আর্স, মার্ক সাল্ফ। শিরা সকলে রক্ত সঞ্চার হইয়া স্ফীত হইলে পাল্স। ক্ষত দৃষ্ট হইলে ল্যাকে, ইগ্নে মার্ক, সিলি, আর্স, কুপ্রাম কার্ব ও এসিড-নাইট্রী। জলপূর্ণ ফোস্কায় আর্স। পচনশীল ক্ষত হইলে আর্স, বেল সিলি ও ল্যাকে।

২। বেদনার অবস্থা। গলাধঃকরণে জ্বালা বা দগ্ধ হওয়া অনুভব হইলে বেল ও হিপার। চাপিয়া ধরা বোধ হইলে আর্স, মার্ক, ও ইগ্নে। কোন কঠিন দ্রব্য কণ্ঠে সংস্থিত অনুভব হইলে ল্যাকে, হিপার বেল, ক্যামো, নক্স, সিপি ও সাল্ফ। গলাধঃকরণে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হইলে নাকস ও ইগ্নে। কণ্ঠাবরোধ বা সংকোচন ভাবে বেল ও ল্যাকে।

৩। যে সকল অবস্থায় বৃদ্ধি। সন্ধ্যায় অধিক বোধ হইলে পালস্। রাত্রে মার্ক। প্রত্যুষে নাক্স। নিদ্রার পর ল্যাকে। পরিভ্রমণের পর একোন ও ব্রাই। শির নত করিলে বা ফিরাইলে বৃদ্ধি বোধ হইলে ক্যামো ও ব্রাই। গ্রীবা স্পর্শ করায় ল্যাকে ও ব্রাই। পান করায় আক্ষেপবৎ যন্ত্রণায় বেল ও ল্যাকে। চিৎ হইয়া শয়নে শিলি ও একোন। কথা বলায় ক্লেশ হইলে একোন ও নাক্স। শীতল বাতাসে বৃদ্ধি হইলে নাক্স, কফি, হিপার, মার্ক ও আর্স।

৪। সাঙ্গিক বা সহকারী পীড়া অনুসারে চিকিৎসা—মস্তিষ্কে রক্ত

সঞ্চারে ব্রাই, ক্যামো, মার্ক ও এসিড-নাই। লালা নিঃসরণ থাকিলে মার্ক, বেল ও ল্যাকে। মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে মার্ক, বেল, ল্যাকে ও এসিড-নাই। জ্বর থাকিলে একোন্, বেল, ব্রাই; ল্যাকে, পালস্ ও মার্ক।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } ডাক্তার শ্রীশিখরকুমার বসু। এল, এম, এস,

পূর্ব্ববঙ্গ।

(টাঙ্গাইল।)

অধুনা আমাদিগের এই বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটী কেবল মাত্র সহর বাজারের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেই মনোযোগী ছিলেন। এক্ষণে যাহাতে বাঙ্গালা দেশের পল্লিগ্রাম সকলেও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয় এবং পথ ঘাট পরিস্কৃত হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোকেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বড়ই সুখের বিষয়।

আমাদিগের স্বদেশীয় কৃতবিদ্য ডাক্তারগণও পল্লিগ্রাম ও গরিব লোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা করিবার জন্য সদুপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক সকল প্রণয়ন করিয়া স্বদেশের হিত সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ডাক্তার যদুনাথের "শরীরপালন" দেশবিখ্যাত। সম্প্রতি ইংলণ্ডে সুশিক্ষিত ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত * মহাশয় স্বাস্থ্যদর্পণ নামে পল্লিগ্রামের

---

*Surgeon major K. P. Gupta, M. A. M. B. F. R. B. S. Deputy sanitary commissioner (Bengal).

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর সহিত আধুনিক ইউরোপীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সকলের ঐক্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় যাবতীয় নিয়মগুলি জানিতে পারা যায়।

কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল পুস্তকে প্রকটিত করা যত সহজ, সর্ব্ব-দেশে সর্ব্বকালে সকলের পক্ষে ঐ সকল নিয়ম পালন করা বড়ই কঠিন। এমন কি, স্থানবিশেষে অসাধ্য। মনু বলিয়াছেন, জলে এবং নদী-তীরে মল ত্যাগ করিবে না। স্বাস্থ্যদর্পণকার বলেন, অনেক লোকে জলে মলত্যাগ করিতে ভাল বাসে। পূর্ব্ববঙ্গে ঠিক্ খালের ও স্রোতের ধারে পায়খানা দেখা যায়। তাহাতে জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি আরও বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গে পল্লিগ্রাম দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পথিককে মলের দুর্গন্ধ নিবন্ধন বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তিনি বলেন আইন প্রণয়ন দ্বারা এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করা উচিত। এই সকল দেশে তিনি পায়খানা তৈয়ারির এইরূপ উপদেশ দেন, যথাঃ—বাটীর উঠানের এক প্রান্তে খানিকটা গর্ত্ত কাটিয়া ঐ গর্ত্ত চাঁচের বা দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিলেই পায়খানা হইতে পারে এবং জলে মলত্যাগ করা নিবারিত হয়। তিনি গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বলেন যে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রতিবৎসর জলপ্লাবিত হয় বলিয়া তথাকার অধিবাসিরা মাটীর দেওয়াল না দিয়া দরমা বা চাঁচের বেড়া দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহাতে দরমার ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চালিত হয় বলিয়া বাত জ্বর প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য তিনি বলেন যে ঐ দেশের লোক কেন যে বেড়াতে মাটীর লেপ দেয় না তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি উপদেশ দেন যে মাটীর লেপে গৃহের সৌন্দর্য্য কিয়ৎ পরিমাণ নষ্ট হইলেও স্বাস্থ্যের জন্য তাহা করা উচিত। স্বাস্থ্যদর্পণের গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বেশ পরিজ্ঞাত আছেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এমন অনেক পল্লিগ্রাম আছে, যে খানে এই সকল সহজ নিয়ম সকলও পালন করা একরূপ অসাধ্য।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর বলেন বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি উচ্চ ও শুষ্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। গৃহত শুষ্ক হইবেই। গৃহের চতুঃপার্শ্ব অন্যূন ৪০০ চারিশত হাত পর্য্যন্ত ভূমি উচ্চ এবং শুষ্ক হইবে। অগভীর খানা, পুকুর, নদী এবং গর্ত্তের নিকট বাসগৃহ প্রস্তুত করা নিষেধ, ইত্যাদি।*

কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে এই সকল বিধি প্রচলিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লবকৃস্ অরিজিন অফ্ সিভিলাইজেসন্ (Originof civilization in England) নামক গ্রন্থে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধক বলিয়া যে সকল কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভূমির অত্যধিক উচ্চতা এবং জল প্লাবন একটী কারণ। এইজন্য আমেরিকার আমেজন নদীর তীরবর্ত্তি স্থানে সভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই প্রবন্ধে আরও দেখাইব যে মানব জাতির একটা হজমি শক্তি আছে। যেমন অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত বা ভয়ঙ্কর স্থান হউক না কেন মানুষ ক্রমে অভ্যাস করিলে সকল স্থানেই সুস্থ শরীরে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। "শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সয়াও তাই সয়।" আফ্রিকা মহাদেশের সিরালিওন নামক স্থানে ইউরোপ দেশের লোক বাস করিলেই পীড়িত হইয়া শমনসদনে গমন করে। এজন্য ঐ স্থানকে "সাদা মানুষের কবর" (White men's grave) কহে। কিন্তু সে দেশেও নিগ্রোজাতি পরম সুখে বাস করিতেছে।

আমাদিগের ভারতবর্ষে সকল দেশের সর্ব্ব প্রকার জল হাওয়ার নমুনা পাওয়া যায়। হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ স্থান পৃথিবীতে নাই। আবার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী স্থানের ন্যায় নিম্নভূমি জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ। কাশ্মীর দেশের তুল্য মনোহর জল বায়ু পৃথিবীতে আর নাই। পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থান এবং সুন্দর-বনের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর স্থান অতি বিরল। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই (Terai) নামক নিম্ন ভূমি আছে। তাহা নিবিড় অরণ্য এবং

* চিকিৎসা সম্মিলনী ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা ১২৯১।

জলায় পরিপূর্ণ। তরাই প্রদেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, অথচ তরাই প্রদেশেও লোকালয় আছে। ব্রহ্মদেশে আমাদিগের ভারতবর্ষীয় লোক গমন করিলেই জঙ্গলা জ্বরে আক্রান্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মবাসী মগেরা বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সম্মিলনীর পাঠকগণ! আপনারা কি কেহ বর্ষাকালে পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন নাই? যদি না গিয়া থাকেন তবে সম্মিলনী-সম্পাদক কি বলেন শুনুন।

বাঙ্গালা দেশ নদীপ্রধান দেশ। হিমালয় পর্ব্বতে যত বৃষ্টি পতিত হয় তাহার প্রায় সমুদয় জল দুইটী বড় বড় নদী দিয়া বাঙ্গালা দেশের ভিতর দিয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। এই দুইটী নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। বাঙ্গালা দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ নিম্ন। এই নিম্ন স্থানের পরিমাণ সুন্দরবন বাদ দিলে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের (Bengal proper) প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। নদী নিম্নগামী। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশঃ ঢালু। এজন্য গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া উহারা পরিশেষে বাঙ্গালা দেশের ভিতর দিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। গঙ্গানদী যখন বাঙ্গালার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছে, তখন ঐ প্রদেশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিধায় ঐ অংশে গঙ্গার প্রশস্ততা কম, পাড় উচ্চ এবং গভীরতা বেশী। তার পর ছাপ ঘাটীর মোহানা * হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়াছে। তার পর রাজসাহী এবং পাবনা জেলা ছাড়াইয়া ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া গমনকালে গঙ্গা ভয়ানক চওড়া হইয়াছে। কিন্তু এই অংশে ইহার গভীরতা এবং বেগ ক্রমশঃ কম হইয়া গিয়াছে। একটী ঢালু উঠানে একটী নালা কাটিয়া কৃত্রিম নদী তৈয়ার

* এই স্থান হইতে ভাগীরথী নির্গত হইয়াছে। এই স্থানটী মুরশীদাবাদ জেলার অন্তর্গত এবং উহার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

করিয়া তাহাতে এক ঘড়া জল ঢালিয়া দিলে ঐ জল ক্রমে যত নিম্নে যাইবে ততই চওড়া হইবে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ নীচ স্থান থাকিলে নিম্ন স্থান গুলি বাছিয়া বাছিয়া যাইবার জন্য ঐ জল শতধারায় বিভক্ত হইয়া গমন করিবে। জলের প্রধান বেগটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নিম্ন স্থানটী পছন্দ করিয়া সেই স্থানটী দিয়া গমন করিবে। গঙ্গাও সেইরূপ ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়া গমনকালে অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছে এবং শত ধারায় বিভক্ত হইয়াছে। যতই নিম্নদিকে আসিয়াছে ততই গঙ্গার গভীরতা কম হইয়াছে এবং উহার স্রোতও কম হইয়াছে। রামপুরের নীচে গঙ্গার যেরূপ বেগ, গোয়ালন্দের নীচে তত নহে। চব্বিশ পরগণা এবং যশোহর জিলার দক্ষিণ ভাগও নিম্ন বঙ্গের অন্তর্গত। এই খানেই বিখ্যাত সুন্দরবন। এই সুন্দরবনের ভিতর যে কত খাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তাহার সংখ্যা নাই। এই স্থলে নদী সকল পরস্পর মিলিত হইয়া জালের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। এই খাল ও নদীগুলি সমস্তই ভাগীরথীর এবং পদ্মার শাখা প্রশাখা। চব্বিশ পরগণার কলিকাতা অঞ্চল এবং যশোহর জিলার খুলনা হইতে উত্তর দিক আর তত জলপ্লাবিত হয় না। কলিকাতা পূর্ব্বে জলপ্লাবিত হইত। যখন ইংরেজেরা প্রথম আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন, তখন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান কলিকাতার নিকটস্থ ধাপা নামক বিলের ন্যায় জলাভূমি ছিল এবং উহারও নিকট যে একটুকু আদটুকু উচ্চ ভূমি ছিল তাহার উপরেও জোয়ারের জল উঠিত। এজন্য সুতানুটী গোবিন্দপুর * প্রভৃতির অধিবাসিরা পুষ্করিণী কাটিয়া মাটী তুলিয়া উচ্চ করিয়া ঐ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে বাস করিত। এ জন্যই কলিকাতা এবং সহরতলিতে এত অসংখ্য পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পুষ্করিণীর অধিকাংশ কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ভরাট করিয়া দিয়াছেন। তার পর ইংরেজেরা ক্রমশঃ কলিকাতাকে উচ্চ করিয়া লইয়াছেন। এবং

* এই সকল গ্রামের উপর এখন কলিকাতা সহর হইয়াছে। কলিকাতার যোড়াসাঁকোতে সুতানুটীর বাজার ছিল।

কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ কলিকাতা অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চল এবং বাখরগঞ্জ একই লাইনে গঙ্গানদীর মোহানায় স্থিত। বাখরগঞ্জ এবং কলিকাতা প্রায় সমান নিম্ন হইলেও কলিকাতা অঞ্চল কিছু বেশী উচ্চ। কলিকাতা সমুদ্র হইতে অনুমান ১৮ ফুট উচ্চ। ঢাকা জেলার গড় উচ্চতা ৮।১০ ফুট হইবে। বাখরগঞ্জও প্রায় ঐরূপ। টাঙ্গাইল ঢাকা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। চাটিগাঁ এবং ত্রিপুরা সমুদ্রের ধারে হইলেও উহা সমধিক উচ্চ। এই সকল স্থান বহু পূর্ব্ব হইতে আছে। কিন্তু গঙ্গানদীর মোহানার নিকটস্থ চব্বিশ পরগণা এবং বাখরগঞ্জ গঙ্গা নদীর দ্বারা আনীত মৃত্তিকার দ্বারা ক্রমশঃ সমুদ্র ভরাট হইয়া অল্পদিন নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান জলপ্লাবিত হইত বটে, কিন্তু অদ্য যে স্থানের বিষয় বলিতেছি সেরূপ ভাবে ডুবিত না। কলিকাতা সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী। সুন্দরবনে জোয়ার ভাটা থাকাতে জোয়ারের সময় মাত্র দুই ফুট দেড় ফুট জল হয় এবং ভাটার সময় সমস্ত জল নামিয়া পড়ে। জোয়ার ভাটা থাকাতে এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া সমুদ্রের টান থাকাতে বর্ষাকালেও সুন্দরবনে বেশী জল স্থায়ী ভাবে থাকিতে পায় না। কলিকাতাস্থ উচ্চ ভূমি সকলেও এইরূপ জোয়ারের জল উঠিত মাত্র। বাখরগঞ্জের দক্ষিণ ভাগেও এইরূপ জোয়ারের টান থাকাতে ঐ অঞ্চলে বর্ষাকালে গভীর জল দাঁড়াইতে পায় না। চব্বিশ পরগণা জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান নিম্ন হইলেও টাঙ্গাইল এবং ঢাকা জেলার ন্যায় জলপ্লাবিত হয় না কেন? কারণ ব্রহ্মপুত্রের সমুদয় জল এবং গঙ্গানদীর প্রায় সমস্ত জল পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। কেবল ভাগীরথী এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র শাখা মুরশিদাবাদ নদীয়া এবং চব্বিশপরগণার ভিতর দিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ছাপঘাটীর মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণ ধারের ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিধায় এই স্থানে গঙ্গার প্রধান স্রোত দক্ষিণবাহিনী না হইয়া বরাবর উত্তর পূর্ব্ব মুখো হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়া একবারে দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। এই গঙ্গানদী ছাপঘাটীর মোহানা হইতে পদ্মা নাম ধারণ করিয়াছে। তার

পর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ইহাকে পদ্মাই বলে। তার পর ইহা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া ফরিদপুরের ভিতর দিয়া বাখরগঞ্জে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র এবং অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে। এই মেঘনা ভয়ানক প্রশস্ত।

তারপর ব্রহ্মপুত্র। এই ব্রহ্মপুত্রনদ হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উঠিয়া বরাবর হিমালয়ের ধারে ধারে একবারে পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া আসাম প্রদেশের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে গিয়া তার পর দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে; এই ব্রহ্মপুত্র নদী বরাবর মৈমনসিং জেলার ভিতর দিয়া ঢাকা জেলার পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া এবং তৎপর ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম ধার দিয়া মেঘনার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের নিকট হইতে একটী বৃহৎ শাখা নির্গত হইয়া বরাবর দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পাবনা এবং মৈমনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া গোয়ালন্দে আসিয়া পদ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই শাখাটিকে যমুনা বলে। কিন্তু অধুনা এইটীই প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র। কারণ সাবেক ব্রহ্মপুত্র এখন ক্ষুদ্র নদী হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রের সমুদয় জল যমুনা শাখা দিয়া পদ্মায় আসিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে এই যমুনা ব্রহ্মপুত্রের একটী ক্ষুদ্র শাখা ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রাচীন ব্যক্তি কহিলেন যে অনুমান ৩০ বৎসর হইল ইহা ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়াছে। পদ্মানদী বর্ষাকালে স্থানে স্থানে দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ প্রশস্ত হয়। যমুনা বা আধুনিক ব্রহ্মপুত্রও ঐরূপ প্রশস্ত, বরঞ্চ কিছু বেশী। গোয়ালন্দের নিম্নে এই ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা মিলিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে। এই স্থানকে বাইশ কোদালের মোহানা বলে। ব্রহ্মপুত্রের জল অপেক্ষাকৃত কাল (Dark) এবং পদ্মার জল কিছু সাদা (Grey) এই জন্য এই মোহানাতে এই দুই নদীর সম্মিলন স্থান বেশ চেনা যায়। ঠিক যেন হরিহরের মিলন। নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী এবং খড়িয়া নদী মিলিত হইয়াছে। সেখানেও খড়িয়া নদীর জল ময়লা এবং ভাগীরথীর জল সাদা। ঐ খানে ঐ দুই নদীর জল মিলিত হইয়া বর্ষাকালে বড় মনোহর দেখায়। গোয়ালন্দের নীচে পদ্মা ও ব্রহ্ম-

পুত্রের সম্মিলন স্থান দেখিলে মনোমধ্যে একরূপ অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। এবং বাইরণের ন্যায় "Ten thousand fleets sweep over thee in vain" না বলিয়া অন্ততঃ "Ten thousand canoes and boats sweep over thee in vain" বলিতে ইচ্ছা করে। কলিকাতা অঞ্চলের লোক যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে যান নাই তাঁহারা বর্ষাকালে গোয়ালন্দের ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া এই স্থানটী দেখিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং কলম্বসের ন্যায় আপন মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন "আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দেশ আছে কিনা ?"

বাঙ্গালা দেশের খুব উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভাগ জলপ্লাবিত হয় না। মধ্য ভাগে কোন কোন স্থান বর্ষাকালে অল্প অল্প জলপ্লাবিত হয়। এই মধ্য ভাগের মধ্যে নদীয়া যশোহর, চব্বিশ পরগণা এবং মুরসীদাবাদ জেলা বা বাঙ্গালার প্রেসিডেন্সি বিভাগ। এই বিভাগই বল্লালসেনের বাগড়ি দেশ। এখনকার ঢাকা ডিবিজন বা ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং মৈমনসিংহ ফরিদপুর জেলার যে ভাগ কীর্ত্তিনাশা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ বেলগাছি, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান গুলি ভাদ্র মাসে মাত্র জলপ্লাবিত হয় কিন্তু তত বেশী প্লাবিত হয় না। পাবনা এবং রাজসাহী জেলাদ্বয় উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত। পাবনা,রাজসাহী মালদহ প্রভৃতি জেলা গুলিই বরেন্দ দেশ বলিয়া খ্যাত। এর মধ্যে রাজসাহীর কতক অংশ অর্থাৎ পাবনার নিকটবর্ত্তী স্থান (নাটোর প্রভৃতি) আষাঢ় মাস হইতেই জলমগ্ন হয়। পাবনা জিলাও ডুবা দেশ। কিন্তু পাবনার যে অংশ যমুনা নদীর তীরবর্ত্তি তাহা ভয়ঙ্কর রূপে প্লাবিত হয়। মৈমনসিং জেলার দক্ষিণ ভাগমাত্র জলপ্লাবিত হয় এই ভাগেই টাঙ্গাইল সব্‌-ডিবিজন। টাঙ্গাইলের উত্তর হইতে বরাবর ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ। তার পর আরও উচ্চে গারো পাহাড় মৈমনসিং বা নসিরাবাদ সহর টাঙ্গাইল হইতে উত্তর পূর্ব্বে প্রায়, পঁচিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলের দক্ষিণে ঢাকা এবং ফরিদপুর জিলা। টাঙ্গাইল হইতে আরম্ভ করিয়া ফরিদপুরের অর্দ্ধেক, সমুদয় ঢাকা জেলা, তথা পাবনার যমুনার তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় স্থান বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই ভয়ানক রূপে জলপ্লাবিত হয়।

এই সকল স্থান কিরূপ তাহা টাঙ্গাইল সব্‌ডিবিজানের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি হইবে। টাঙ্গাইল স্থানটী যমুনার নিকটবর্ত্তী বলিয়া যেরূপ বেশী জলপ্লাবিত হয়, পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন স্থান সেরূপ প্লাবিত হয় কিনা সন্দেহ। ঢাকা বিক্রমপুর জলমগ্ন হয় বটে, কিন্তু টাঙ্গাইল অপেক্ষা কিঞ্চিত কম। যখন যমুনা নদী ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখা মাত্র ছিল, তখন এ প্রদেশে এত গভীর জল হইত না। অন্ততঃ সে দেশের প্রাচীন ব্যক্তিরা এইরূপ বলেন। মধ্য বঙ্গের কোন কোন স্থান বর্ষাকালে জল-প্লাবিত হয় বটে কিন্তু সে প্লাবন অতি অল্পদিন মাত্র থাকে, অর্থাৎ ভাদ্র-মাসে ১০।১৫।২০ দিন মাত্র প্লাবিত হয় এবং শীঘ্রই জল নামিয়া যায়। এইরূপ জলপ্লাবনে মাঠে মাত্র জল উঠে। গ্রামগুলি জলমগ্ন হয় না। নদীর ধারের দু একটী গ্রামের রাস্তায় অল্প অল্প জল উঠে মাত্র। এর মধ্যে যে স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী প্লাবিত (যেমন মুরসিদাবাদের কালান্তর নামক স্থান) সে সকল স্থানে বা গ্রামে ভদ্রলোকের প্রায় বাস নাই। কেবল কৃষক সম্প্রদায় বাস করে। পদ্মানদীর চরেও ঐরূপ কৃষক সম্প্রদায় বাস করে। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে জল উঠিয়া মাঠ ঘাঠ গ্রাম প্লাবিত করে এবং এই অঞ্চল প্রায় কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্লাবিত থাকে। এই সকল প্রদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি বিস্তর ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের বাস।

পাঠক! বর্ষাকালে টাঙ্গাইল যাইবেন, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আষাঢ় মাস। কেবল বর্ষা আরম্ভ। রামপুর এবং দামুকদিয়ার নীচে পদ্মার নূতন জল আসিয়াছে। আট ফুট দশ ফুট বা ততোধিক পাড় জাগিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং ক্রমাগত মাটীর চাপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দুই ধারে মাঠে জল উঠে নাই। সমস্ত গ্রাম এবং মাঠ শুষ্ক। খালে ও বিলে জল প্রবেশ করে নাই। ভাদ্রমাসে পদ্মার পাড় ছাড়িয়া দুই ধার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হইবে। এখন সে প্লাব-নের চিহ্নও নাই। গোয়ালন্দ বা রাজবাটীর উপর জল উঠে নাই। এই আষাঢ় মাসে কলিকাতার সিয়ালদহে রেলে উঠিয়া বরাবর উত্তর পূর্ব্ব মুখো চলিলাম। তার পর পোড়াদহ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে খাড়া

পুত্রের সম্মিলন স্থান দেখিলে মনোমধ্যে একরূপ অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। এবং বাইরণের ন্যায় "Ten thousand fleets sweep over thee in vain" না বলিয়া অন্ততঃ "Ten thousand canoes and boats sweep over thee in vain" বলিতে ইচ্ছা করে। কলিকাতা অঞ্চলের লোক যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে যান নাই তাঁহারা বর্ষাকালে গোয়ালন্দের ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া এই স্থানটী দেখিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং কলম্বসের ন্যায় আপন মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন "আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দেশ আছে কিনা ?"

বাঙ্গালা দেশের খুব উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভাগ জলপ্লাবিত হয় না। মধ্য ভাগে কোন কোন স্থান বর্ষাকালে অল্প অল্প জলপ্লাবিত হয়। এই মধ্য ভাগের মধ্যে নদীয়া যশোহর, চব্বিশ পরগণা এবং মুরসীদাবাদ জেলা বা বাঙ্গালার প্রেসিডেন্সি বিভাগ। এই বিভাগই বল্লালসেনের বাগড়ি দেশ। এখনকার ঢাকা ডিবিজন বা ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং মৈমনসিংহ ফরিদপুর জেলার যে ভাগ কীর্ত্তিনাশা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ বেলগাছি, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান গুলি ভাদ্র মাসে মাত্র জলপ্লাবিত হয় কিন্তু তত বেশী প্লাবিত হয় না। পাবনা এবং রাজসাহী জেলাদ্বয় উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত। পাবনা,রাজসাহী মালদহ প্রভৃতি জেলা গুলিই বরেন্দ দেশ বলিয়া খ্যাত। এর মধ্যে রাজসাহীর কতক অংশ অর্থাৎ পাবনার নিকটবর্ত্তী স্থান (নাটোর প্রভৃতি) আষাঢ় মাস হইতেই জলমগ্ন হয়। পাবনা জিলাও ডুবা দেশ। কিন্তু পাবনার যে অংশ যমুনা নদীর তীরবর্ত্তি তাহা ভয়ঙ্কর রূপে প্লাবিত হয়। মৈমনসিং জেলার দক্ষিণ ভাগমাত্র জলপ্লাবিত হয় এই ভাগেই টাঙ্গাইল সব্‌-ডিবিজন। টাঙ্গাইলের উত্তর হইতে বরাবর ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ। তার পর আরও উচ্চে গারো পাহাড় মৈমনসিং বা নসিরাবাদ সহর টাঙ্গাইল হইতে উত্তর পূর্ব্বে প্রায়, পঁচিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলের দক্ষিণে ঢাকা এবং ফরির্দপূর জিলা। টাঙ্গাইল হইতে আরম্ভ করিয়া ফরিদপুরের অর্দ্ধেক, সমুদয় ঢাকা জেলা, তথা পাবনার যমুনার তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় স্থান বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই ভয়ানক রূপে জলপ্লাবিত হয়।

এই সকল স্থান কিরূপ তাহা টাঙ্গাইল সব্‌ডিবিজানের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি হইবে। টাঙ্গাইল স্থানটী যমুনার নিকটবর্ত্তী বলিয়া যেরূপ বেশী জলপ্লাবিত হয়, পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন স্থান সেরূপ প্লাবিত হয় কিনা সন্দেহ। ঢাকা বিক্রমপুর জলমগ্ন হয় বটে, কিন্তু টাঙ্গাইল অপেক্ষা কিঞ্চিত কম। যখন যমুনা নদী ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখা মাত্র ছিল, তখন এ প্রদেশে এত গভীর জল হইত না। অন্ততঃ সে দেশের প্রাচীন ব্যক্তিরা এইরূপ বলেন। মধ্য বঙ্গের কোন কোন স্থান বর্ষাকালে জল-প্লাবিত হয় বটে কিন্তু সে প্লাবন অতি অল্পদিন মাত্র থাকে, অর্থাৎ ভাদ্র-মাসে ১০।১৫।২০ দিন মাত্র প্লাবিত হয় এবং শীঘ্রই জল নামিয়া যায়। এইরূপ জলপ্লাবনে মাঠে মাত্র জল উঠে। গ্রামগুলি জলমগ্ন হয় না। নদীর ধারের দু একটী গ্রামের রাস্তায় অল্প অল্প জল উঠে মাত্র। এর মধ্যে যে স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী প্লাবিত (যেমন মুরসিদাবাদের কালান্তর নামক স্থান) সে সকল স্থানে বা গ্রামে ভদ্রলোকের প্রায় বাস নাই। কেবল কৃষক সম্প্রদায় বাস করে। পদ্মানদীর চরেও ঐরূপ কৃষক সম্প্রদায় বাস করে। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে জল উঠিয়া মাঠ ঘাঠ গ্রাম প্লাবিত করে এবং এই অঞ্চল প্রায় কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্লাবিত থাকে। এই সকল প্রদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি বিস্তর ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের বাস।

পাঠক! বর্ষাকালে টাঙ্গাইল যাইবেন, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আষাঢ় মাস। কেবল বর্ষা আরম্ভ। রামপুর এবং দায়ুকান্দিয়ার নীচে পদ্মার নূতন জল আসিয়াছে। আট ফুট দশ ফুট বা ততোধিক পাড় জাগিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং ক্রমাগত মাটীর চাপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দুই ধারে মাঠে জল উঠে নাই। সমস্ত গ্রাম এবং মাঠ শুষ্ক। খালে ও বিলে জল প্রবেশ করে নাই। ভাদ্রমাসে পদ্মার পাড় ছাড়িয়া দুই ধার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হইবে। এখন সে প্লাব-নের চিহ্নও নাই। গোয়ালন্দ বা রাজবাটীর উপর জল উঠে নাই। এই আষাঢ় মাসে কলিকাতার সিয়ালদহে রেলে উঠিয়া বরাবর উত্তর পূর্ব্ব মুখো চলিলাম। তার পর পোড়াদহ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে খাড়া

পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া গোয়ালন্দের ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। যমুনা নদী দিয়া বর্ষাকালে প্রত্যহ ইণ্ডিয়া জেনেরল ষ্টীম ন্যাভিগেসন কোম্পানীর জাহাজ সকল আসাম প্রদেশে গমন করে। এই গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা নারায়ণগঞ্জেও ষ্টীমার যাতায়াত করে। টাঙ্গাইল যাইতে হইলে যমুনা নদী দিয়া উত্তরমুখো যাইতে হয়। প্রাতঃকালে গোয়ালন্দে নামিয়া পোড়াবাড়ী নামক স্থানের টিকিট লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। বাইসকোদালের মোহানা ছাড়াইয়া বরাবর যমুনায় প্রবেশ করিলাম। প্রথমতঃ তোমার দক্ষিণ দিকে ফরিদপুর জেলা এবং বামদিকে পাবনা জেলা। তার পর দক্ষিণে মৈমনসিং এবং বামে পাবনা জেলা। সবে আষাঢ় মাস। কিন্তু গোয়ালন্দ হইতে যে মৃত্তিকা ছাড়াইলে এ মৃত্তিকা আর দেখিতে পাইবে না। কেবল প্রকাণ্ড অসীম একটি জলের চাদর। যমুনা দুই ধারে পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছে। মাঠে কেবল ধান ও পাটের আবাদ। সমস্তই জলে ডুবিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। জল যত বাড়িতেছে পাট ও ধানও ততই মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে! এবং সাহস সহকারে যেন বলিতেছে, তোমরা দেখ "জল বড় কি আমরা বড়"। দুই ধারে যমুনা হইতে অসংখ্য খাল নির্গত হইয়াছে। দৃশ্যটী প্রায় সুন্দরবনের ন্যায় (সুন্দরবনের যে অংশে অরণ্য ছাপ হইয়া ধানের আবাদ হইয়াছে)। সুন্দর বনেও নদীর দুইধার হইতে অসংখ্য ছোট ছোট খাল গমন করিয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখে এই সকল খাল অসংখ্য। যে স্থানে ধান বা পাটের আবাদ নাই, সেই গুলি জঙ্গলে খাল। এই সকল খালের দুইধার লোকালয়। আমাদিগের দেশে যেমন ঘনবসতিপূর্ণ চালে চালে ঠেকা গ্রাম দেখা যায়, এসকল দেশে প্রায় সেরূপ ধরণের গ্রাম দেখা যায় না। ইহার বসতি আর এক ভাবের। একটী পল্লিগ্রামের বর্ণনা শুনুন।

ষ্টীমার ছয় ঘণ্টা আন্দাজ গমন করিয়া পোড়াবাটীর ঘাটে নামিতে হইবে। নামিতে হইবে কোথায়? ষ্টীমার হইতে নৌকার উপর। কারণ চতুর্দ্দিকে জল বই আর কিছুই নাই। তার পর একটী বৃহৎ খাল দিয়া পোড়াবাড়ীর দিকে গমন করিতে হইবে। দূর হইতে পল্লিগ্রাম

গুলি দেখিতে আমাদিগের দেশের গ্রামের ন্যায়। অর্থাৎ গাছ পালায় আবৃত গ্রাম। বোধ হয় যেন গ্রামের মধ্যে গিয়া ডেঙ্গা (উচ্চ ভূমি) পাইব। কিন্তু তাহা পাইবে না। আমি একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া খাল দিয়া ধান ও পাটের জমি দিয়া "বিদ্যাকৈর" নামক গ্রামে প্রবেশ করিলাম। বোধ হইল যেন আমাদিগের দেশের ন্যায় গ্রামে যাচ্ছি; গ্রামে যাইলে রাস্তা পাইব, লোকালয় পাইব, একটু বিশ্রাম করিয়া প্রাণ শীতল হইবে। ক্রমে যতই গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম, বৃক্ষ ও জঙ্গলগুলি পৃথক হইয়া আমাকে একটী খাল দেখাইয়া দিল। কেবল জল এবং জঙ্গল। দৃশ্যটী প্রায় জল ও জঙ্গলপূর্ণ সুন্দরবনের ন্যায়। তবে সুন্দরবনে লোকালয় নাই, এখানে লোকালয় আছে। সুন্দরবন হইতে এই মাত্র বিভেদ যে, বন তত নিবিড় নহে এবং সুন্দরি কাষ্ঠ এবং গরাণের বৃক্ষ না হইয়া বৃক্ষ গুলি অর্থকর বৃক্ষ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আগাছা। আম্র, বাঁশ, মাদার, পিঠালি, বেতস প্রভৃতিতে নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষ গুলি সতেজ। খালের উপর দুই ধার হইতে বাঁশ আসিয়া নিম্নে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ অরণ্য মধ্যে বরাবর জল। বাঁশ প্রভৃতি সমস্তই জলমগ্ন। এ দেশে কাঁঠাল গাছ বড় একটা হয় না। কারণ কাঁঠাল গাছ জলে ডুবিলেই মরিয়া যায়। আম গাছ জলে ডুবিলে মরে না। এই খালের দুইধার বনের মধ্যে বেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে এক এক ঘর গৃহস্থ একটী একটী ক্ষুদ্র মাটীর ঢিপি (টিলা) করিয়া বাস করিতেছেন। এক একটী বাড়ী এক রশী দুই রশী বা ততোধিক দূরে অবস্থিত। ঘরগুলি ঝাঁপের বেড়া দেওয়া। কারণ এ দেশ জলপ্লাবিত বলিয়া আমাদিগের দেশের ন্যায় মৃত্তিকা প্রাচীর নির্ম্মিত ঘর হয় না। বাটীর চারি দিকে প্রাচীর বেড়া বা টাটী কিছুই নাই। কেবল একটী স্তূপাকার মাটীর টিলার উপর তিন চারি খানি ঘর। টিলার ধারে চতুর্দ্দিক জঙ্গল। এ দেশে জঙ্গলই বাটীর আবরু রক্ষা করে। এজন্য লোকে ইচ্ছা করিয়া বাটীর টিলার চারিধারে আম, মাদার, বেত, বাঁশ প্রভৃতির গাছ লাগায়। বিদ্যাকৈর গ্রামের টিলা গুলি আষাঢ় মাসে জল ছাড়া আন্দাজ এক হাত উচ্চ। গরিব লোকের

বাটীর টিলার জমির পরিমাণ অর্দ্ধকাঠা, এক কাঠা। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁদের টিলা দুই বিঘা, এক বিঘা। উঠান ভিজে ও স্যাঁতস্যেঁতে।

ঘরের মেজে কর্দ্দমময়। ঠিক যেন বোধ হয় নূতন কাদা দিয়া এখনি তৈয়ার হইয়াছে। কোন কোন ঘরের মেজে বালিময় কিন্তু সে গুলিও ভিজে। ঘরের মেজেয় জুতা পায়ে দিবার বা রাখিবার যো নাই। খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতে হয় এবং মেজে এত ভিজে যে জুতা এবং খড়মের দাগ পড়ে এবং মৃত্তিকা দমিয়া যায়। মাচা এবং চৌকিতে গৃহস্থেরা শয়ন করেন। কিন্তু অনেক ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেও ঐ ভিজে মৃত্তিকায় চাটাই এবং মাদুর পাতিয়া শয়ন করেন। তাহাতে তাঁদের বিশেষ অসুখ হয় না। বাটীগুলি জল ও জঙ্গলে আবৃত, অন্ধকারময়। ভদ্র লোকে জলের উপর খোঁটা পুঁতিয়া মাচা বাঁধিয়া পায়খানা করে। গরীব লোকে ডাল পুঁতিয়া বা গাছের ডালে চড়িয়া বাহে যায়। বাটীর চতুর্দ্দিকের জলে বাঁশ পাতা, জঙ্গল, পাট ও ধান গাছ পচিতেছে; সেই জলে গৃহস্থেরা বাসন ধুইতেছে, মল মূত্র ত্যাগ করিতেছে, এবং বাধ্য হইয়া সেই জলই পানার্থ ব্যবহার করিতেছে, তাহাতেই স্নানাহ্নিক সমাপন হইতেছে। প্রায় বড় বড় গৃহস্থের বাড়ীর জলে ২।৪ খান নৌকা দেখা যায়। নৌকার মাথাটী বাড়ীর টিলার উপর চড়িয়াছে। এই সকল ডিঙ্গিতে চড়িয়া গৃহস্থেরা এবাটী ওবাটী যাতায়াত করেন, হাট বাজার করেন এবং ডিঙ্গিতে চড়িয়াই স্কুলের ছাত্ররা স্কুলে গমন করে। যাঁরা কখনও পূর্ব্বে এই সকল স্থানে গমন করেন নাই তাঁহারা হঠাৎ এদেশে গিয়া পড়িলে অত্যন্ত ভয় পান। আমার মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময় ভয় এবং বীভৎস রস উপস্থিত হইয়াছিল। জ্ঞান হইল এ স্থানে মনুষ্যে বাস করে কি করিয়া। সঙ্গের সঙ্গীটী বলিলেন ডাক্তার বাবু! এই সকল বাটীতে এক রাত্রি বাস করাই কঠিন ব্যাপার।

যারা গরিব লোক তাহাদের ঘর গুলি অধিকতর অস্বাস্থ্যকর। এই সকল জঙ্গলে শীতকালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হয়। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই কেঁদো বাঘ। (Leopard & panther and not tiger.) সুতরাং মানুষ ধরে না। বর্ষাকালে বাঘ শৃগাল প্রভৃতি আরণ্য জন্তু মৈমনসিংহের উচ্চ প্রদেশে

গমন করে এবং শীতকালে নামিয়া আইসে। আমি কোন স্থানে দেখিলাম একটী শৃগাল পাটবনে জলে হাবু ডুবু খাচ্ছেন। তিনি আর পালাইতে পারেন নাই, এখন অন্তিম কাল উপস্থিত। নৌকায় চড়িয়া এই সকল গ্রামের ভিতর গমন করিতে করিতে উপর দিকে চাহিলে দেখিবে বড় বড় সর্প সকল বাঁশ গাছে লম্বমান রহিয়াছেন। এবং নিম্নে চাহিয়া দেখিবে বড় বড় গোসাপ নামক সরীসৃপ লকলক করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া জলের ভিতর জঙ্গলে সাঁতরাইয়া বেড়াইতেছে। এবাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে নৌকা করিয়া যাইতে হয়। সে জলও এক হাঁটু বা এক উরু নহে। তিন হাত, চার হাত, আট হাত জল। কেবল খাল, জল ও জঙ্গল। গ্রাম গুলি ঘন, মাটগুলি ছোট ছোট। কিন্তু গ্রাম গুলি যেমন ঘন, অধিবাসীর সংখ্যা তত অধিক নহে। কারণ টিলা বাঁধিয়া বসতি করিতে হয়। সুতরাং নিকটে নিকটে বাটী হইবার যো নাই।

অনেক স্থলে মাঠের মধ্যে দুই এক ঘর মানুষ লইয়া একটী গ্রাম। বড় বড় গ্রাম গুলিতে বিস্তর ভদ্র লোকের বাস। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ। দালান কোঠা প্রায় নাই। বড় বড় ধনী লোকেরা দুই চারিটী পাকা একতালা দালান করিয়াছেন। প্রায় সকল বাটীই খড়ের চালা, সুতরাং হঠাৎ বাটী দেখিয়া এদেশে ধনী এবং গরিব চেনা যায় না। যাঁহারা খুব বড় মানুষ তাঁহারা বড় বড় পুষ্করিণী কাটাইয়া মাটী তুলিয়া পঞ্চাশ ষাট বিঘা জমি ভরাট করিয়া বাটী তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত যে তাঁহার চারুপাঠে লিখিয়াছেন "বিকসিত পুষ্পোদ্যানস্থিত বিচিত্র অট্টালিকোপরি বাস"—এদেশের বড় মানুষদের ভাগ্যে সেটা প্রায় ঘটিবার যো নাই। আর ছেলে বেলায় পড়িয়াছিলাম "লেখা পড়া শিখে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই"। এ দেশের শিক্ষিত লোকের ভাগ্যে গাড়ী ঘোড়া চড়া ঘটে না। কেবল নৌকা আর নৌকা। বড় বড় গৃহস্থের মেয়েরা পর্য্যন্ত নৌকারোহণে এবাটী ওবাটী যাতায়াত করেন। এক একটী বাটী এক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। দুই একমাস বড় বড় ভদ্রলোকের গ্রামে দুই চারিবাড়ী একসঙ্গে বেড়ান যায়। খুব বড় মানুষ ভিন্ন এদেশে শুষ্ক ঘরে বাস করিতে পায় না। বড় বড় ধনী লোকে খিলানের পোঁতা করিয়া

দালান তৈয়ার করিয়াছেন। তাঁহারাই সুখ সচ্ছন্দতা অনুভব করেন। নচেৎ গরিব এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের খুব কষ্ট। অন্ততঃ আমাদিগের এইরূপ ধারণা। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই স্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের মন বা শরীরে বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। তাহা হইলে এদেশে থাকিতে পারিতেন না। এই অঞ্চলের যে সকল লোক বিদেশে গিয়া ভাল দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশের উপর বিলক্ষণ চটা, তবে পৈতৃক বাস বলিয়া কিকরেন, কোনরূপে থাকিতেছেন। যাঁরা বিদেশে চাকুরি করেন তাঁরা বর্ষাকালে বাটী আসিতে চান না।

মৈমনসিং জিলার মধ্যে টাঙ্গাইল সব্‌ডিবিজন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাস। কিন্তু দেশের গুণে চেষ্টা করিয়াও তাঁরা স্বদেশের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে কোনই উন্নতি করিতে পারেন নাই। সকল গায়েই ঘা, তার ঔষধ দিবেন কোথা। বিন্যাকৈর, সন্তোষ, কাগমারী, বেলতা, সাকরাইল প্রভৃতি গ্রামগুলি টাঙ্গাইল মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। কিন্তু মিউনিসিপালিটী বর্ষাকালে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন। শীতকালে এগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার জন্য দু একটী রাস্তা বাঁধিয়া দেন মাত্র। এ দেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নৌকা করিয়া যাইবার সময় পাট ও ধান পচা এবং জঙ্গল পচা দুর্গন্ধে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ঐ দুর্গন্ধ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তার পর গ্রামের প্রান্তভাগে দৈবাৎ যদি একটু খানি জমি থাকিল, কিম্বা রাস্তার কোন অংশ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইল তবে লোকে ঐ স্থানে ক্রমাগত মলত্যাগ আরম্ভ করে। বিষ্ঠার উপর বিষ্ঠা স্তূপাকার হয়। যেমন চিলি দেশে পেন্‌গুইন্ (penguin) নামক পক্ষী সমুদ্র উপকূলে বিষ্ঠার উপর বিষ্ঠাত্যাগ করে, এ দেশের খালি জমিতেও সেইরূপ বিষ্ঠা সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত বিষ্ঠাপূর্ণ স্থান দিয়া গমন করিলে অসহ্য এক প্রকার চিম্‌সা পচা দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এদেশের লোকের তাহাতে বিশেষ কষ্ট হউক বা না হউক কিন্তু বিদেশী লোকের পক্ষে ইহা বড়ই ভয়ানক।

এইত সবে আষাঢ় মাস। তার পর শ্রাবণ ভাদ্রে ক্রমে জলবৃদ্ধি হইয়া কোন কোন মাটীর টিলার উপর জল উঠে এবং ঘরের পোঁতা সকল জলে

ভাঙ্গিয়া যায়। বেড়া গুলি পর্য্যন্ত জলে ভাঙ্গিয়া যায়। বেড়া গুলি পর্য্যন্ত জলে পচিতে আরম্ভ করে তখন সে বাটীতে বাস করিতে আমাদিগের দেশের লোকের মনে কেমন ঘৃণার উদ্রেক হয়। সর্ব্বদা "গা ঘিন ঘিন করে"। চাঁচের বেড়া কাদা দিয়া লেপিলে সে কাদা আর শুখায় না এবং বর্ষাকালে হয়ত ঘরে জল প্রবেশ করিলে ঐ কাদা পড়িয়া যায় বা বেড়া ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্যই পূর্ব্ব বঙ্গের গৃহস্থেরা মাটীর লেপ দিয়া বেড়ায় লেপ দেন না। স্বাস্থ্যদর্পণকার ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত মহাশয় যেরূপে উঠানে গর্ত্ত কাটিয়া পায়খানা তৈয়ার করিতে বলেন, এদেশে বর্ষাকালে তাহা হয় না। বর্ষাকালে কোন গৃহস্থের বাটীর উঠানে আজ একটী এক হাত গভীর গর্ত্ত কাটিলাম কল্য প্রাতে দেখিলাম মাটী চোঁয়াইয়া জল উঠিয়া গর্ত্তটী পূরিয়া গিয়াছে। সুতরাং জলে বাহ্যে যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আর শীত কালে ও গ্রীষ্ম কালে পল্লিগ্রামে পায়খানার দরকার হয় না, তখন সকলেই মাঠে গিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারেন কারণ তখন জল নামিয়া যায়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনেক ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোক পর্য্যন্ত নৌকায় চড়িয়া বাহ্যে যাইতে বাধ্য হন। কারণ সে সময়ে মাচার পায়খানাগুলি ডুবিয়া যায়। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে গিয়া নৌকার মাথায় চড়িয়া মলত্যাগ করিতে হয়; ঐ সময় ডিঙ্গির মাথাটী জলমগ্নপ্রায় হয় এবং নৌকার পশ্চাদ্ভাগ উচ্চ হইয়া উঠে। ছোট লোকে সর্ব্বদা এইরূপ ভাবে বাড়ীর নিকটে জঙ্গলে বা মাঠে নৌকায় বাহ্যে যাইতেছে দেখিতেপাওয়া যায়। এই সময়ে যে বাটীর স্ত্রীলোক পরিজন কোন কোন বৎসর বেশী ছেলে পিলের কি কষ্ট হয় তাহা মনে ধারণা করাও কঠিন।

এইত দেশের অবস্থা। তাহার উপর কোন কোন বৎসর ব্রহ্মপুত্রের বন্যা হইয়া জল বৃদ্ধি হইলে সমস্ত স্থান জলমগ্ন হয়। তখন এ দেশ একবারই মৃত্তিকাশূন্য হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন সমস্ত গৃহস্থের ঘরের ভিতর জল প্রবেশ করে এবং লোক মাচার উপর থাকে। আদহাত কি একহাত খাড়াই জল বাড়িলেই এইরূপ অবস্থা হয়। এই বৎসর (১২৯৬) যে সময় টাঙ্গাইল ভীষণ বন্যা বলিয়া কলিকাতার সঞ্জীবনী এবং

অন্যান্য সকলে আলোচনা করিতেছিলেন ঐ সময়ে আমি সেই দেশে উপস্থিত ছিলাম। এইবার ১ এক হাত খাড়াই জল বাড়িয়াছিল। এইরূপ ভীষণ বন্যা এ দেশে বিরল নহে। ১২৯৩ সালে নাকি এইরূপ সমস্ত জলমগ্ন হইয়াছিল।

তার পর প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জল নামিবার সময় ক্রমে ক্রমে পাতা লতা বাঁশ ও পাট প্রভৃতি পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এ দেশে প্রায় সকলেই জলে মলত্যাগ করে। জল নামিবার সময় জল কম পড়িলে ঐ জল যে কি ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা বলা যায় না। জলের বর্ণ নীলের কুঠীর নীল পরিত্যক্ত জলের ন্যায় নীলবর্ণ ধারণ করে এবং তাহা হইতে রোগবীজ সকল উঠিতে থাকে। ঐ সময় জল এতই ভয়ানক হয় যে তাহা ফিল্‌টার করিলেও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ খালে ও জলে সর্ব্বত্রই মল ভাসিতে থাকে। তাহাতেই স্নান করিতে হয় এবং সেই জলই খাইতে হয়। পরে শীতে ও গ্রীষ্ম কালে এ দেশে সমস্ত জল নামিয়া যায়। তখন অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হয়। পুষ্করণী এ দেশে প্রায় ভাল হয় না। পুষ্করণী গুলির জল পীত বর্ণ ধারণ করে, তাহার উপর তাহাতে একরূপ কীট জন্মায়। দুই একটী পুষ্করণী হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ গ্যাস উঠিতে থাকে। কোন গ্রামে কোন একটী বৃহৎ পুষ্করণী আগা গোড়া পানাচ্ছাদিত থাকায় তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম পানা সরিয়া দেওয়া না হয় কেন? তাহাতে তাঁহারা বলিলেন পানা তুলিয়া ফেলিলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত হইবে। ঐ বাষ্পটী কি তাহা জানিবার জন্য ঐ পুষ্করণীর নিকটে একটী ঘরে দুই এক দিন শয়ন করিয়া জানিলাম ওটী মার্স গ্যাস (Marsh gas)। পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার করিলেও তাহার জল ভাল হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে চতুর্দ্দিকে পাট ও ধানের আবাদ। বর্ষাকালে মাঠ ও পুষ্করণী সমুদয় এক হইয়া যায়। সুতরাং জল নামিবার সময় ঐ সকল মাঠের এবং গ্রামের কলুষিত পচা জল পুষ্করণীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহা নিবারণের সহজ উপায় নাই। উহার জল ভাল করা বিস্তর ব্যয়সাধ্য। এ দেশে বাটী তৈয়ার করাও অত্যন্ত

ব্যয়সাধ্য। কারণ প্রথমতঃ ৮ হাত ১০ হাত মাটী কাটিয়া জমী ভরাট করিয়া বাটী করিতে হয়। তাহাতে এক বিঘা বাস্তু তৈয়ার করিতে ১বিঘা আন্দাজ পুষ্করণী বা গর্ত্ত কাটিতে হয়। সুতরাং শিক্ষিত লোক জানিয়া শুনিয়াও অস্বাস্থ্যকর বাটীতেই বাস করিতে বাধ্য হন। অনেক শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গিতশালী ব্যক্তি অনেক ব্যয় করিয়া বাটীর চারি দিকে অনেক দূর লইয়া মাটী তুলিয়া উচ্চ করিয়াছেন, এবং কেহবা বাটীর সম্মুখে প্রাঙ্গন তৈয়ার করিয়া একটু ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু একটু বেশী বন্যা হইলেই সমস্ত জলমগ্ন হইয়া যায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ইটের পোঁতা দিয়া সুন্দর সুন্দর খড়ের আটচালা তৈয়ার করিয়াছেন। সে গুলি বেশ স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। কিন্তু দোষের মধ্যে চতুর্দ্দিকে জল ছাড়াইবার যো নাই। দুই এক খানি গ্রাম অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায়; সেখানে দুই চারি ঘর গৃহস্থ একত্রে টিলা করিয়া আছেন। তাঁহারা বেশ ফুলের বাগান এবং ইটের পোঁতাযুক্ত আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। সে স্থান গুলি স্বাস্থ্যকর এবং বাসোপযোগী।

এই দেশে বর্ষাকালে আমাদিগের দেশের লোক গেলে প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়েন। যাঁহারা এদেশে যাইতে চান, তাঁহাদের শীত বা গ্রীষ্ম কালে যাওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশে কোন বাড়ীতেই বেড়া বা প্রাচীর নাই। প্রাচীর ত হয়ই না। বেড়া দেওয়াও অভ্যাস নাই। দিতেও জানে না। দৈবাৎ যদি কেহ দেন, তবে তাহা পাতা লতা বা পাতখড়ী (পাকাটী) দিয়া এদিকে একটু ওদিকে একটু বেড়া দেয়; তাহাতে প্রায় চারিদিকেই ফাক থাকে। আমাদিগের দেশে যেমন পরিষ্কার বাঁশের বা ছ্যাঁচার বেড়া দেয় এবং দুয়ার আগোড় তৈয়ার করে, এদেশের লোক সেরূপ বেড়া দিতে জানেনা। ঘেরা বাটীতে থাকাও অভ্যাস নাই। লোকের সাহসও অসীম। শীত কালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হয়। মানুষ থাক বা না থাক, উঠানে বসিয়া বাঘ ডাকে। কারণ বাড়ীর চারি দিকেই ফাঁক। গৃহস্থ ও ছেলে পিলে অনায়াসেই রাত্রে খোলা বাড়ীতে শৌচ প্রস্রাব করিতে উঠে। তাহাতে তাদের মনে ভয় হয় না। এ দেশে জল নামিবার সময় ম্যালেরিয়া জ্বর কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এইত ম্যালে-

অন্যান্য সকলে আলোচনা করিতেছিলেন ঐ সময়ে আমি সেই দেশে উপস্থিত ছিলাম। এইবার ১ এক হাত খাড়াই জল বাড়িয়াছিল। এইরূপ ভীষণ বন্যা এ দেশে বিরল নহে। ১২৯৩ সালে নাকি এইরূপ সমস্ত জলমগ্ন হইয়াছিল।

তার পর প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জল নামিবার সময় ক্রমে ক্রমে পাতা লতা বাঁশ ও পাট প্রভৃতি পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এ দেশে প্রায় সকলেই জলে মলত্যাগ করে। জল নামিবার সময় জল কম পড়িলে ঐ জল যে কি ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা বলা যায় না। জলের বর্ণ নীলের কুঠীর নীল পরিত্যক্ত জলের ন্যায় নীলবর্ণ ধারণ করে এবং তাহা হইতে রোগবীজ সকল উঠিতে থাকে। ঐ সময় জল এতই ভয়ানক হয় যে তাহা ফিল্‌টার করিলেও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ খালে ও জলে সর্ব্বত্রই মল ভাসিতে থাকে। তাহাতেই স্নান করিতে হয় এবং সেই জলই খাইতে হয়। পরে শীতে ও গ্রীষ্ম কালে এ দেশে সমস্ত জল নামিয়া যায়। তখন অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হয়। পুষ্করণী এ দেশে প্রায় ভাল হয় না। পুষ্করণী গুলির জল পীত বর্ণ ধারণ করে, তাহার উপর তাহাতে একরূপ কীট জন্মায়। দুই একটী পুষ্করণী হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ গ্যাস উঠিতে থাকে। কোন গ্রামে কোন একটী বৃহৎ পুষ্করণী আগা গোড়া পানাচ্ছাদিত থাকায় তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম পানা সরিয়া দেওয়া না হয় কেন? তাহাতে তাঁহারা বলিলেন পানা তুলিয়া ফেলিলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত হইবে। ঐ বাষ্পটী কি তাহা জানিবার জন্য ঐ পুষ্করণীর নিকটে একটী ঘরে দুই এক দিন শয়ন করিয়া জানিলাম ওটী মার্স গ্যাস (Marsh gas)। পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার করিলেও তাহার জল ভাল হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে চতুর্দ্দিকে পাট ও ধানের আবাদ। বর্ষাকালে মাঠ ও পুষ্করণী সমুদয় এক হইয়া যায়। সুতরাং জল নামিবার সময় ঐ সকল মাঠের এবং গ্রামের কলুষিত পচা জল পুষ্করণীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহা নিবারণের সহজ উপায় নাই। উহার জল ভাল করা বিস্তর ব্যয়সাধ্য। এ দেশে বাটী তৈয়ার করাও অত্যন্ত

ব্যয়সাধ্য। কারণ প্রথমতঃ ৮ হাত ১০ হাত মাটী কাটিয়া জমী ভরাট করিয়া বাটী করিতে হয়। তাহাতে এক বিঘা বাস্তু তৈয়ার করিতে ১বিঘা আন্দাজ পুষ্করণী বা গর্ত্ত কাটিতে হয়। সুতরাং শিক্ষিত লোক জানিয়া শুনিয়াও অস্বাস্থ্যকর বাটীতেই বাস করিতে বাধ্য হন। অনেক শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গিতশালী ব্যক্তি অনেক ব্যয় করিয়া বাটীর চারি দিকে অনেক দূর লইয়া মাটী তুলিয়া উচ্চ করিয়াছেন, এবং কেহবা বাটীর সম্মুখে প্রাঙ্গন তৈয়ার করিয়া একটু ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু একটু বেশী বন্যা হইলেই সমস্ত জলমগ্ন হইয়া যায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ইটের পোঁতা দিয়া সুন্দর সুন্দর খড়ের আটচালা তৈয়ার করিয়াছেন। সে গুলি বেশ স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। কিন্তু দোষের মধ্যে চতুর্দ্দিকে জল ছাড়াইবার যো নাই। দুই এক খানি গ্রাম অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায়; সেখানে দুই চারি ঘর গৃহস্থ একত্রে টিলা করিয়া আছেন। তাঁহারা বেশ ফুলের বাগান এবং ইটের পোঁতাযুক্ত আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। সে স্থান গুলি স্বাস্থ্যকর এবং বাসোপযোগী।

এই দেশে বর্ষাকালে আমাদিগের দেশের লোক গেলে প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়েন। যাঁহারা এদেশে যাইতে চান, তাঁহাদের শীত বা গ্রীষ্ম কালে যাওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশে কোন বাড়ীতেই বেড়া বা প্রাচীর নাই। প্রাচীর ত হয়ই না। বেড়া দেওয়াও অভ্যাস নাই। দিতেও জানে না। দৈবাৎ যদি কেহ দেন, তবে তাহা পাতা লতা বা পাতখড়ী (পাকাটী) দিয়া এদিকে একটু ওদিকে একটু বেড়া দেয়; তাহাতে প্রায় চারিদিকেই ফাক থাকে। আমাদিগের দেশে যেমন পরিষ্কার বাঁশের বা ছ্যাঁচার বেড়া দেয় এবং দুয়ার আগোড় তৈয়ার করে, এদেশের লোক সেরূপ বেড়া দিতে জানেনা। ঘেরা বাটীতে থাকাও অভ্যাস নাই। লোকের সাহসও অসীম। শীত কালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হয়। মানুষ থাক বা না থাক, উঠানে বসিয়া বাঘ ডাকে। কারণ বাড়ীর চারি দিকেই ফাঁক। গৃহস্থ ও ছেলে পিলে অনায়াসেই রাত্রে খোলা বাড়ীতে শৌচ প্রস্রাব করিতে উঠে। তাহাতে তাদের মনে ভয় হয় না। এ দেশে জল নামিবার সময় ম্যালেরিয়া জ্বর কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এইত ম্যালে-

রিয়ার জন্ম স্থান। আর একটী এ দেশের বিশেষ রোগ হচ্ছে গলদেশে গণ্ডমালা বা ঘ্যাগ। যেমন বহরমপুরে গঙ্গার ধার গোদের জন্ম স্থান, সেইরূপ এই স্থান গলগণ্ডের জন্ম স্থান। আমার তদ্দেশীয় একজন ডাক্তারবন্ধু বলেন যে তাঁহার দাতব্য ঔষধালয়ে প্রতি বৎসর ৮।১০ আউন্স আও ডাইড অব্ মার্কুরি খরচ হয়! এই ঔষধটী ঘ্যাগের চিকিৎসার লাগে। গঙ্গার জলে গোদ আর ব্রহ্মপুত্রের জলে ঘ্যাগের উৎপত্তি। সচরাচর এ দেশের লোক বেশ সুস্থ এবং বলবান। কিন্তু বালকগণ প্রায়ই পীড়িত। বিদেশী লোক যাঁরা আছেন, তাঁদের শরীর প্রথম প্রথম ভাল থাকে না। যে সকল পশ্চিমে খোট্টা এ দেশে দেখা যায়, তাঁহারা এ দেশে আসিয়া রোগের জ্বালায় একবারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে বর্ষাকালে বেশ মাছ পাওয়া যায়; কিন্তু টাঙ্গাইল সব্‌ডিবিজানে বর্ষায় মৎস্য বা তরকারী প্রায় পাওয়া যায় না। তখন ডাল ভাতের উপর নির্ভর। উহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। যাঁহারা খুব ধনী, তাঁহারাই নানা উপায়ে মৎস্য তরকারী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এদেশে বর্ষায় লোকে তরকারী অভাবে জল কচু (শোলা কচু) কচুর শিকড় বানান প্রভৃতি অখাদ্য দ্রব্যও আহার করিতে বাধ্য হন। এদেশে ডাটা গাছ খুব বড় হয় কিন্তু উহা খাইতে মিষ্ট নয়। সুতরাং ভদ্রলোকে বর্ষাকালে ঘৃত দুগ্ধ এবং ডাল মাত্র আহার করেন। বর্ষাকালে রন্ধন করিবার কষ্ট বেশী। মেজে ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে, এজন্য উনান বর্ষাকালে তৈয়ার হয় না এবং মাটীর উনানে আগুণ নিবিয়া যায়। এজন্য লোকে বড় বড় তৌল হাড়ীর তলা ফেলিয়া দিয়া একরূপ তোলা উনানে ভাত রাঁধে। ছেলেপিলে কর্দ্দমময় মাটীতে বসিয়া লুটপুট করে। তাহা দেখিলে দুই চক্ষে জল আসে। কিন্তু এদেশবাসীদিগের তাহাতে বড় কষ্ট বোধ হয় না। অনেকে নৌকার উপরে ভাত রাঁধে। সকল গৃহস্থেরি নৌকা আছে। এবং প্রায় সকলেই নৌকা বাহিতে জানে। বর্ষার জল নামিবার সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাওয়া এবং এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাওয়া বড় কষ্টকর। তখন না পা চলে না, নৌকা চলে। কতক কাদা কতক জল। এই সময়ে এদেশের লোকের অনেকের পায়ে ক্ষত

হয়। স্থানদোষে গৃহস্থেরা যথেষ্ট অর্থ থাকিতেও টাকার হাঁড়ী বুকে করিয়া বর্ষাকালে নিতান্ত কষ্টে বাস করেন। যাঁরা খুব ধনী, তাঁরাই এদেশে সুখে থাকেন।

পূর্ব্ববঙ্গে নদীর ধারে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে দুই একটী ভাল গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিতে বড় বড় বাজার এবং বন্দর স্থাপিত। যে যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের কারখানা আছে, সে স্থল গুলি বেশ বাসযোগ্য। ইংরাজ জাতির এই একটী মহৎ গুণ আছে। আর গুণ থাকুক বা না থাকুক, ইংরাজ জাতি যেমন স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে জানেন এবং মনোহর স্থানে বাস করিতে জানেন আমরা তেমন জানিনা। যেখানে ইংরাজের কারখানা, সেই স্থানই যেন স্বর্গ তুল্য। যে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট সব্‌ডিবিজান তৈয়ার করিয়াছেন, সেগুলি মনোহর স্থান। ইহাঁরা এমন প্লাবিত দেশেও বাছিয়া বাছিয়া উচ্চ স্থানটী পছন্দ করিয়া সেইখানে আফিষ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ নইলে কি বিদেশী মুনেসফ হাকিম আমলা প্রভৃতি বাস করিতে পারিতেন, না তাঁহাদের শরীর সুস্থ থাকিত? পাবনা জেলায় সেরাজগঞ্জ এবং নিজ পাবনা সহর এবং ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ বেশ ভাল স্থান। এই দুই স্থানে অনেক পাটের কারখানা আছে। পূর্ব্ব বঙ্গের যত পাট এই দুই স্থানে জড় হয়। টাঙ্গাইল সবডিবিজানের হেড কোয়ার্টার একটী নদীর ধারে স্থাপিত। ঐ টাঙ্গাইল হইতে আরম্ভ করিয়া যতই উত্তরে যাও সমস্ত উচ্চ ভূমি। এই টাঙ্গাইল বড়ই মনোহর স্থান। পরিষ্কার সবুজ ময়দানটী। তাহার উপর ঝাউগাছ বেষ্টিত রাস্তা। রাস্তা গুলি কাঁচা হইলেও মনোহর। নদীর ধারের রাস্তাটী কেমন চমৎকার! বর্ষাকালে আরও ভাল দেখায়। ইষ্টকের পোঁতা দেওয়া পরিষ্কার আটচালা গুলি। এই গুলি আফিস এবং আমলাদিগের বসতিস্থান। টাঙ্গাইলের পারে নদীর ধারের গ্রামগুলি জলপ্লাবিত হয় না। এই দিকেই বাঁশেলা করাটিয়া প্রভৃতি গ্রাম। নদীর অপর পারে অর্থাৎ টাঙ্গাইলের দক্ষিণ দিক সমস্ত নিম্ন এবং জলমগ্ন। এই নিম্ন স্থান বরাবর ঢাকা এবং ফরিদপুর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যে বৎসর খুব জলপ্লাবন হয়, সেই বৎসর মাত্র টাঙ্গাইল মহকুমার স্থানে স্থানে জল উঠে এবং দুই

একটী আমলার বাসায় জল উঠে। কিন্তু সে অতি অল্পদিন মাত্র। এই বৎসর টাঙ্গাইলের উপর জল উঠিয়াছিল। আমাকে এদেশে কিছু দিন থাকিতে হইয়াছিল। আমার মন খারাপ হইলে আমি টাঙ্গাইলে বেড়াইতে যাইতাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে টাঙ্গাইল বড়ই সুন্দর দেখায়। টাঙ্গাইলের জল হাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার নিতান্ত পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে আমাদের দেশের লোকের টেকা কঠিন। প্রথমে গিয়া মন টিকিবে না, তারপর ক্রমে শরীর মন অসুস্থ হইবে। আমি অনেক বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং চিরদিন বিদেশে বাস করিয়াছি; কিন্তু এদেশে প্রথমে যখন বিন্যাকৈর গ্রামে প্রবেশ করিলাম, তখন ভয়ে আমার মুখটী চুন হইয়া গেল। আমি এদেশে কিছু দিন ছিলাম। দুই চারিটী শিক্ষিত লোকের সহিত প্রণয় হইয়াছিল। আমার মন খারাপ হওয়াতে তাঁহারা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন ডাক্তার বাবুর (Hydrophobia) (জলাতঙ্ক) হইয়াছে, অর্থাৎ জল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। বাস্তবিক আমার জলে ভয় নাই। একে বেড়াইবার কষ্ট, এবাড়ী ওবাড়ী নৌকা ভিন্ন যাতায়াত নাই; তাহার উপর নানা কারণে ক্রমে ক্রমে মনে একরূপ কষ্টের উদ্রেক হইয়া একবারে আহার উঠিয়া গেল। তার পর দৌর্ব্বল্য (Palpitatier) (হৃদ্‌কম্প) উপস্থিত হইয়া একবারে শরীরের ও মনের বল ফুরাইয়া গেল। এই সময়েই আমি তাড়াতাড়ি দেশে চলিয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিবামাত্র শরীর ও মন সুস্থ হইল। উচ্চ স্থানের লোক পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া থাকিতে হইলে একটী জলের ফিলটার লইয়া যাইবেন এবং যে স্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ, সেই স্থানে বাস করিবেন। বিল ও খালের জল না খাইয়া কূপজল ব্যবহার করিবেন।

এখন বক্তব্য এই যে, এই সকল দেশের পল্লিগ্রামে মনুপ্রবর্ত্তিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম কিরূপে প্রতিপালিত হইবে? মনু যে সময় বিধি প্রণয়ন করেন, সে কালে পূর্ব্ব বঙ্গে লোকের বাস ছিল না। মনু জানিতেন না যে কালমাহাত্ম্যে এই সকল দুর্গম স্থানেও মনুষ্যের আবাসভূমি হইবে। মনু ছিলেন আর্য্যাবর্ত্তে। তখন বাঙ্গালাদেশ সমুদ্রমগ্ন ছিল। তাঁরা

জানিতেন মনুষ্য উচ্চ ভূমিতেই বাস করে। জলা ভূমিতে মানুষ থাকিতে পারে না তাঁদের এইরূপ ধারণা ছিল। এই জন্য মনু বিধি করিয়াছেন জলে মলত্যাগ করিওনা। করিলে তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। খাস্তগীর মহাশয় বলিলেন গৃহ শুষ্ক ও উচ্চ হইবে, তাহার চতুস্পার্শ চারিশত হাত পর্য্যন্ত শুষ্ক হওয়া উচিত। ইত্যাদি। বাস্তবিক কলিকাতায় বসিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেওয়া বড়ই সহজ। আমি যে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস জলে ডুবিয়া থাকি, আমার স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় কি? উপায় অভ্যাস। আবার বলি "শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াও তাই সয়।" এই সকল স্থলে স্বাস্থ্য রক্ষার আর একরূপ বিধি হওয়া উচিত। সকল লোকের ধাতু সমান নহে। দেশভেদে বিভিন্ন ধাতুর মনুষ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গের লোক যেমন কষ্টসহ এবং উদ্যমশীল এরূপ আর দেখা যায় না। ইহাঁরা যেরূপ অবস্থায় থাকেন তাহার অপেক্ষা কষ্ট আর হইতে পারে না। এজন্য ইহাঁরা যে সে স্থানে পড়িয়া থাকিতে পারেন এবং সামান্য ডাল ভাত আহারে থাকিতে পারেন। এই জন্যই পূর্ব্ব বঙ্গে আমাদিগের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী অনেকগুলি বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাক্তার সম্পাদক।

কলিকাতা মেডিকেলস্কুল।

আমরা কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের নিয়মাবলি প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। দেশীয়দিগের যত্নে, সম্পূর্ণ দেশীয় লোকদিগের সাহায্যে এরূপ একটী মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া আমাদিগের দেশের গৌরব বলিতে হইবে। ডাক্তার মহেন্দ্র নাথের বিজ্ঞান সভা, লেডি ডফারিণের স্ত্রী চিকিৎসালয় প্রভৃতির অপেক্ষা ইহা কম প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, নরদেহতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। মেডিকেল কলেজ মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি কেবল চিকিৎসা শিক্ষা করিবার স্থান নহে, ইহা বিজ্ঞানালোচনার স্থান। অতএব এরূপ একটী প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়

স্থাপন যে দেশের পক্ষে একান্তই হিতকর, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

এই স্কুলটী ১৮৮৭ সালে আমাদিগের দেশীয় দুই একটী সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য ডাক্তারের দ্বারা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী আমাদিগের পরম বন্ধু ডাক্তার রাধা গোবিন্দ কর মহাশয়ই ইহার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। এই স্কুলটী ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে দেশের অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোক এবং প্রধান প্রধান ডাক্তার এই স্কুলের উন্নতি কল্পে যোগ দান করিয়াছেন। স্কুলটী ১৮৮২ সালের ৬ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে। এই স্কুলে এক্ষণে ৩টী ক্লাস হইয়াছে এবং ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, এই স্কুলেও সেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের সহিত একটী আউট্‌ডোর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতেও বিস্তর দরিদ্র লোক ঔষধ ও পথ্য পাইয়া থাকে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে প্রায় ৪০০০ চারি হাজার রোগী এই ঔষধালয়ে চিকিৎসিত হইয়াছে। এতদিন এই স্কুলে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের উপায় ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট শবচ্ছেদের অনুমতি দিয়াছেন। মৃতদেহ প্রাপ্ত হইবার জন্যও সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই স্কুলটীর সহিত একটী হস্পিটাল স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু উদ্যোগকারী অর্থাভাবে এপর্য্যন্ত তাহা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আপাততঃ এই স্কুলের ছাত্রেরা মেয়ো এবং চাঁদনি হাঁসপাতালে গিয়া রোগী দেখিয়া আসে। ইহার সহিত একটী পুস্তকালয় এবং কিমিকাল লেবরেটরী স্থাপিত হওয়াও প্রয়োজন। স্কুলটী ভাল রূপে চালাইতে গেলে বহু অর্থের প্রয়োজন। দেশীয় বড় বড় ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা এই স্কুলে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অবৈতনিক। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান দেশীয় ডাক্তারগণ এই স্কুলের শিক্ষক। তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

মেডিসিন	ডাঃ	জগবন্ধু বসু এম, ডি।
	„	এম, এন, বনার্জ্জি, এম, আর, সি, এস।
	„	আরজি কর, এল আর, সি, পি,
সার্জ্জরি	„	প্রাণধন বসু এম, বি।
	„	জে, এন, মিট্র এম, আর, সি, পি।
আই মেডিসিন্	„	লালমাধব মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্।
হাইজিন	„	সুন্দরীমোহন দাস এম, বি,
মেডিকেল্ জুরিস্‌প্রডেন্স	„	যোগেন্দ্র নাথ দত্ত।
মিড্‌ওয়াইফারি	„	এস্ মুকার্জ্জি, এম, ডি, সি, পি, এচ্ ডি।
থেরাপিউটিক্‌স্	„	নীরদবিহারি বসু এম, বি।
সর্জ্জিকাল এনাটমি	„	অমূল্যচরণ বসু এম, বি।
মেটিরিয়া মেডিকা	„	বি বসু এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস্।
এনাটমি	„	অমূল্য চরণ বসু, এম, বি।
	„	শরতচন্দ্র বসু এম, এ, এম, বি।
ফিজিওলজি	„	এম এল্ দে, এম, বি, সি, এম, বি, এম্, সি।
	„	নীলরতন সরকার এম, এ, এম্, বি।
ডিমনস্‌ট্রেসন্	„	মহেন্দ্রনাথ সেন এম, বি।
	„	শরচ্চন্দ্র বসু এম, এ, এম, বি।
	„	আশুতোষ নাথ।

ক্লিনিকাল মেডিসিন	{	„ ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত এম, বি।
		„ নীলরতন সরকার এম, এ, এম, বি।
		„ শশীভূষণ মুখার্জ্জি এম, বি, ।
		„ এস্ সি, সর্ব্বাধিকারী বি, এ, এম, বি।
ডিসেক্‌সন্	{	„ আর জি কর।
		„ অমূল্য চরণ
		„ শরত চন্দ্র

হাইকোর্টের উকিল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, এটর্নি বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন এবং মহারাজা কুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর এই স্কুলের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার সম্পাদক।

কবিরাজ সম্পাদকের মন্তব্য।

কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের স্থাপনায় আমরা অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছি, অসন্তোষের কোন কথাই নাই। কিন্তু একটা আক্ষেপের কথা এই সঙ্গে মনে পড়ে, না বলিয়া থাকিতে পারি না। এ সংসার এমনি স্থান যে তেলা মাথায় তেল দিবার জন্য সবাই ব্যগ্র, রুখুমাথার দিকে নজর দিবার লোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এই কলিকাতা স্কুলের উদ্যোগকারী ও সহকারীগণ সকলেই গণনীয় ব্যক্তি, ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ডাক্তারি বিদ্যার বিস্তার বৃদ্ধির জন্য ইহাঁরা যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এমন লোক কেহ নাই যে, এই হতভাগা দেশীয় চিকিৎসা কার্য্যের পুনঃ প্রচারে এরূপ উদ্যম অধ্যবসায় আয়াস চেষ্টা করিতে পারেন। ডাক্তারী রাজার চিকিৎসা, রাজা উহার সহায়, ধনী ও শিক্ষিতে উহার উৎসাহদাতা, দেশের জন্য সাধারণ উহার পক্ষপাতী। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কল্পে আমাদের সহায় সম্পত্তি কেহই নাই। সেই অনাদৃত পদ-দলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে ব্রতী কেবল আমাদের মত দরিদ্র দুর্ব্বল, অসমর্থ অকিঞ্চন সামান্য কবিরাজ মাত্র। আমাদের ক্ষীণ প্রাণের এ ক্ষীণ চেষ্টায় এ কার্য্য সাধন ক্রিয়া কি সম্ভব? জানি না, দুর্ব্বলের ব্রতে সবলের সহায়তা কবে পাইব?

চি, স, ক, স,

অবলা-বান্ধব।

প্রথম অধ্যায়।

রোহিণী বা প্রদররোগ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

জয়া। ভাল, বোন্! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে মেয়ে লোকদিগের অপত্যপথ হইতে অবিরত রক্ত ভাঙ্গিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সাতিশয় যন্ত্রণাপ্রদান করিয়া থাকে, এ আবার কি ব্যারাম? হতভাগিনীগণ লজ্জায় মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কিছু বলিতেও পারে না, তাহাদের ব্যারামেরও কোন প্রতিকার হয় না। এমন করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কি শরীর টেকে? না গৃহকার্য্যেই উৎসাহ থাকে? তুমি সে দিন মার কাছে এই সকল রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদি কিছু শুনিয়া থাকত আমাকেও কেন তাহা শুনাও না?

বিজয়া। ভগিনি! ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমিও তোমাকে এই সকল রোগের কথা বলিব বলিব মনে করিয়াছিলাম। মেয়েলোকদিগের অপত্যপথ হইতে মাসে মাসে যে এক একবার শশকরক্ত বা লাক্ষাজলসদৃশ রক্ত নির্গত হইয়া ৩।৪ দিন বা ঊর্দ্ধসংখ্যা ৪।৫ দিন বিদ্যমান থাকে, তাহাকে আর কোন ব্যারাম বলা যায় না। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সাধারণ উত্তেজন বশতই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু একবার রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়া যদি ১৬।১৭ দিন বা তদপেক্ষা আরও বেশী দিন উহা বর্ত্তমান থাকে এবং কটী, পার্শ্ব, তলপেট, নিতম্ব ও জরায়ু মধ্যে কিছু কিছু বেদনা অনুভূত হয়, আর সেই সঙ্গে অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, শরীরের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যারাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পীড়াকে মেয়েলোকেরা রোহিণীর পীড়া বলিয়া থাকে। পুরুষেরা ইহাকে অসৃক্‌দর বা প্রদর বলিয়াই জানেন। কিন্তু এই দুইটী কোন একটীর কথা বলিলে মেয়েরা কিছুই বুঝিতে পারে না। রোহিণী বলিলে সকলেই ইহার সমুদায় উপদ্রব ও লক্ষণের বিষয় সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সুতরাং আমিও ইহাকে রোহিণী বলিয়াই বর্ণনা করিব। এই

পীড়া দীর্ঘকালব্যাপক হইলে কাহারও কাহারও জরায়ুতে ঘা হইয়া রক্ত-মিশ্রিত পুঁয বা শুদ্ধ পুঁযই অবিরত নির্গত হইতে থাকে। আবার সময় সময় পচা মাংস-ধোওয়া জলের ন্যায় একপ্রকার দুর্গন্ধময় তরলপদার্থও নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে আর তাহাকে রোহিণী বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা পরে কহিব। আপাততঃ রক্তভাঙ্গার কথাই কহিতেছি। একমাত্র প্রদররোগেই যে এরূপ হয়, তাহা নহে। রক্তমাত্রী ও ষষ্ঠী আরও দুইপ্রকার বাধক আছে, তাহাতেও দীর্ঘকাল-পর্য্যন্ত রক্ত ভাঙ্গিয়া থাকে। আবার রক্তপিত্ত ব্যারামেও রক্ত নির্গত হইতে পারে। ফলতঃ যে কারণেই হউক না কেন, অপত্যপথ হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখিলেই মেয়েলোকেরা তাহাকে রোহিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

জয়া। তবে এই যে এতগুলি ব্যারামে মেয়েদের রক্ত ভাঙ্গে, ইহার কি কোন পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নাই? কেমন করিয়া এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রোগের কথা বুঝিতে পারা যায়?

বিজয়া। প্রত্যেক ব্যারামেরই ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি লক্ষণ আছে, সে সমস্তই তোমার কাছে বিশেষ করিয়া কহিতেছি। যদি নাকমুখ দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে তাহাকে ত রক্তপিত্তের পীড়াই বলে। তাহা না হইয়া যদি অধঃস্থিত অপত্যপথ, মূত্ররন্ধ্র এবং গুহ্যদ্বার, এই তিনটী বা ইহার মধ্যে কোন দুইটী দিয়া একত্রে রক্ত নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহা-কেও রক্তপিত্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়। এতদ্ভিন্ন একমাত্র অপত্যপথ দিয়া রক্ত পতিত হইলে তাহাকে রোহিণী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ফলতঃ যে পীড়াই হউক না কেন, পিত্তদ্বারা রক্ত দূষিত না হইলে কখনও রক্ত পড়ে না। এই জন্য সকলপ্রকার রক্তপড়ার চিকিৎসাতেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইক্ষণ দোষাদিভেদে যে সকল লক্ষণ অনুভূত হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে কহিতেছি।

অতি প্রত্যূষে অর্দ্ধোদয়কালে যেপ্রকার সূর্য্যের বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, যদি সেইপ্রকার বর্ণের বা মাংসধোওয়া জলের ন্যায় অল্প অল্প রক্তনির্গত হয় এবং তাহাতে ফেণা থাকে, তাহা হইলে বাতাধিক্য বলিয়া স্থির করিবে। এইরূপ অবস্থায় রোগিণী মনে করে, কে যেন শত শত সূচদ্বারা তাহার যোনিরন্ধ্র সর্ব্বদা পীড়ন করিতেছে। ফলতঃ এই পীড়ায় যোনিমধ্যে

অত্যন্ত বেদনা হয়। সচল লবণ, জীরা, যষ্টিমধু এবং নীলপদ্ম ইহার প্রত্যেকটী।০ চারি আনা ওজনে ৮ তোলা দধির সহিত বেশ করিয়া মিশা-ইয়া লইবে। ১ তোলা মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে ২।৩ দিনের মধ্যেই উপকার দর্শে। রসাঞ্জন ও নটীয়াশাকের মূল, চাউলধোওয়া জল মধুর সহিত সেবন করিলে শীঘ্র রক্তপ্রদর উপশমিত হয়। যদি শ্বাসরোগ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহার সহিত বামনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া লইবে।

পিত্তদোষ প্রবল হইলে অত্যন্ত দাহের সহিত ঘন ঘন রক্তনির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং নিঃসৃত রক্ত অঙ্গুলীদ্বারা স্পর্শ করিলে বা নির্গত হইবার সময় যোনিরন্ধ্রে অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া বোধ হয়। পিত্তাধিক্যে লাল, নীল, কৃষ্ণ বা ঈষৎ হরিদ্রার ন্যায় রক্তের বর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কুশের মূল বাটিয়া চাউলধোওয়া জলের সহিত ২।৩ বার সেবন করিলে শীঘ্র রক্তপড়া বন্ধ হয়। আমলকীর রসের মধ্যে কিঞ্চিৎ চিনি গুলিয়া পান করিলে দাহ নিবারিত হয়। শ্লেষ্মকদোষে পিচ্ছিল, আমগন্ধি, পাণ্ডুবর্ণ বা মাংস-ধোওয়া জলের ন্যায় অধিকপরিমাণে রক্ত নির্গত হয়। এইরূপ অব-স্থায় যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে বিল-ক্ষণ উপকার হয়।

যদি মধু বা গলিত ঘৃতের ন্যায় অথবা হাড়ের মধ্যে যে ঈষৎ হরিদ্রার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট একপ্রকার পদার্থ থাকে, সেইপ্রকার স্রাব সর্ব্বদা যোনি হইতে নির্গত হইতে আরম্ভ হয়, এবং সেই সকল নিঃসৃতপদার্থ হইতে মরা মানুষের গন্ধের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনটী দোষই প্রধান বলিয়া জানিবে। এরূপাবস্থায় কখনও পীড়া সহজে উপশমিত হয় না। যদি রক্তস্রাবের বিরামকাল অতি অল্প হয় অর্থাৎ যেপ্রকার রঙ্গের রক্তই হউক না কেন, সর্ব্বদাই যদি তাহা পড়িতে থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, অঙ্গসমূহের খেঁচুনী ও প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীকে একবারে শয্যাশায়িনী করিয়া ফেলে, তাহা হইলে প্রায়ই কাহাকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কণ্ঠাগত-প্রাণপর্য্যন্ত চিকিৎসায় বিরত থাকা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ত্রিদোষ-জনিত রোহিণীর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রোগিণী একবারে শয্যাশায়িনী না হইলে এবং জ্বরের বেগ কিঞ্চিৎ অল্প থাকিলে এই ঔষধগুলি কখনও ব্যর্থ হয় না।

১০ টাগোলমরিচের সহিত বিলাই আঁচড়ার মূল ৵০ আনা বেশ করিয়া বাটিয়া সেবন করিলে শীঘ্র রক্তভাঙ্গা নিরারিত হয়। অধিকপরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে দিনের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ২।৪ দিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপ উপকার হইতে দেখা যায়।

অশোকেমূলের ছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা একত্রে পাক করিতে করিতে যখন দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সময় তাহা নামাইয়া পান করিলে প্রবল রক্তভাঙ্গা নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রা, রসোত, বাসকছাল, মুথা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলারমুটী (অসহ্য হইলে রক্তচন্দন) এই সাতখানি দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২৮ রতি করিয়া একত্রে শিলায় ছেঁচিয়া লইবে। পরে অর্দ্ধসের জলদ্বারা পাক করিয়া দুই ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। এই কাথের মধ্যে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া সেবন করিলে তলপেটের তীব্রবেদনা এবং নানাবর্ণের রক্তস্রাব উপশমিত হয়।

ক্রমশঃ—

নাকালিয়া পাবনা। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

কুইনাইনের অপব্যবহার।

কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালাজ্বরের মহৌষধি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়াসংক্রান্ত অন্যান্য জ্বরে কুইনাইন ব্রহ্মাস্ত্র। পরে যেমনই হউক, তখন ত খাইবামাত্র অমনিই জ্বর বন্ধ; এই জন্যই কুইনাইনের উপর লোকের এত ভক্তি। এই জন্যই ভারতবর্ষের মুদির দোকানে পর্য্যন্ত কুইনাইন বিক্রয় হয়। এই কুইনাইনের উপর ডাক্তারদিগের অচলা ভক্তি। থাকিবারই কথা। কারণ নবজ্বরের এমন ব্রহ্মাস্ত্র আর সহজে মিলে না। এমন প্রত্যক্ষ ফলদায়ী ঔষধ মিলা কঠিন। কিন্তু কুইনাইনের এই মোহিনীশক্তিতে ভুলিয়া অনেক শিক্ষিত ডাক্তার জ্বর দেখিলেই কুইনাইন দেন। ছোট খাট ডাক্তারদের ত কথাই

নাই। জ্বর দেখিলেই কুইনাইন দেওয়া ডাক্তারদিগের একটী রোগ। স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবারে ডাক্তারগণ কিরূপে অনর্থক কুইনাইন খাওয়াইয়া রোগীর অপকার সাধন করেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বলিব। রেমিটেণ্ট ফিবার দুই শ্রেণীর আছে। একরূপ জ্বরে কুইনাইন দিলে আরাম হয়, আর একরূপ জ্বরে ফাইল ফাইল কুইনাইন ঢালিলেও উপকার হয় না। এ কথা এই সম্মিলনীপত্রিকাতেই আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাক্তারেরা রেমিটেণ্টফিবার হইলে গোড়াগুড়ি ফিবার মিক্‌চার খাওয়াইতেন। তার পর ফিবারমিক্‌চার খাওয়াইতে খাওয়াইতে পনর দিন বিশ দিন বাদে প্রাতে জ্বর কম পড়িলে তখন ২ দুই পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইতেন। আমরা দেখিয়াছি কলিকাতার অনেক ডাক্তার জ্বরচিকিৎসায় সিংকোনা বার্কের বড় ভক্ত ছিলেন। সচরাচর ফিবারমিক্‌চার এই ভাবে তৈয়ার হইত, এখনও অনেক যায়গায় হয় যথাঃ—

এসিড্ নাইট্রিক্ ডিল
টীংচার ডিজিটেলিস্
টীংচার সিংকোনা
ডিককসেন সিংকোনা।

খালি টীংচার সিংকোনায় মন উঠিত না। এজন্য আবার ডিককসন্ সিংকোনা যোগ করা হইত। এরই মধ্যে কোন কোন ডাক্তার অবিচ্ছেদী জ্বরে শীতল জল দিয়া গা মোছাইয়াই হউক বা ভিনিগার দিয়া গা মোছাইয়াই হউক রোগীর শরীর কৃত্রিম উপায়ে শীতল করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতেন। তাহাতে কোনই ফল হইত না। যে জ্বর সেই জ্বর। আবার অধিক উত্তাপ হইলে উত্তাপ কমাইবার জন্যও কুইনাইন দেওয়া হইত। কিন্তু কিছুতেই জ্বরের ভোগ টুটিত না। সেই ১৯ দিন বা ২১।২২ দিন সময় লইত। তার পর স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা নামক প্রবল ঘর্ম্মকারক ঔষধের প্রচলন হইল। তখন ঐ ঔষধ দিয়া ঘাম হইলে তখন কুইনাইন দেওয়া হইত, কিন্তু তাহাতেও রোগের ভোগ সেই তিন সপ্তাহ। তার পর ডাক্তারদের বাই উঠিল, যেমন চূলপরিমাণ উত্তাপ কম পড়িবে অমনি খাওয়াও কুইনাইন। তার সময় নেই অসময় সেই। এখনও এইরূপ প্রথা প্রবলরূপে সহরে এবং পাড়াগাঁয়ে চলিতেছে। যাহা সহরে উঠে পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারেও তাহারই নকল

করিতে শিখে। যেহেতু কলিকাতা হচ্ছে বাঙ্গলার রাজধানী। কিন্তু তাহাতেও জ্বরের কিছুই হয় না। এত করে প্রাতে দুইপ্রহরে সন্ধ্যায় প্রত্যহ ২০।২৫।৩০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলেন, সব জলে পড়িল। বাড়ার ভাগ কুইনাইন খেয়ে খেয়ে রোগীর কান ভোঁভাঁ হইয়া গেল। হয় ত শিরঃপীড়া না হয় প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ আরও শীঘ্র শীঘ্র দেখা দিল। তবু কুইনাইন বন্ধ নাই। দুই একজন ডাক্তার এইরূপ চিকিৎসার অত্যন্ত গোঁড়া।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জ্বরচিকিৎসাগ্রন্থে এই প্রথার বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। এইরূপ প্রথা অনেক স্থলে বেশ কায করে, কিন্তু সকল প্রকার অবিচ্ছেদী জ্বরে ইহাতে ফল হয় না। কিন্তু ডাক্তারগণের মনের ভ্রম, যে কুইনাইনে কিছুই হইতেছে না, তবু ক্রমাগত কুইনাইন ঢালিতেছেন। কুইনাইনের এমনই মোহিনীশক্তি, এবং লোকের ইহাতে এতই বিশ্বাস। তার পর হাউয়ার্ডের কুইনাইনে ফল না হইল ত দ্যাও হেরিংসের। তাতেও সানাইল না, জ্বর কম পড়িল না। আবার এখন হইয়াছে "ব্রমো হাইড্রেট্ অব্ কুইনাইন।" তাতেই বা ছাই কি হচ্ছে? কোন ফল নাই কেবল মূল্য বেশী। তবে ব্রমোহাইড্রেট্ অব্ কুইনাইনের একটা গুণ এই যে উহাতে শিরঃপীড়া বা কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি উপসর্গ বড় একটা আনে না। তা কুইনাইন খাওয়াইয়া খানিকটা ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাওয়াইলেও সেই ফল হয়। তবে আর অত মূল্যবান ঔষধে ফল কি?

তারপর অনেক ডাক্তারের এইরূপ বাতিক আছে। তাঁহারা জ্বরের প্রথমে কুইনাইন দেন না। পরে ১৫ দিন কি ১৮ দিনের দিন যখন জ্বরটী আপনা হইতেই কমিয়া আসিল তখন খানিক করিয়া কুইনাইন দিতে লাগিলেন। জ্বর বিজ্বর হইয়া আপনি আপনি ছাড়িয়া গেল; এক দিন জ্বর হইল না তবু কুইনাইনের হাত হইতে রোগীর নিস্তার নাই। অনেকে টেম্পারেচার কম পড়িয়াছে শুনিলে তাড়াতাড়ি আসিয়া কুইনাইন দেন। কিন্তু এইরূপস্থলে আমরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কুইনাইন না দিলেও দুই একদিন বাদে আপনিই জ্বর বন্ধ হয়। কেবল অনর্থক কুইনাইন দিয়া ধাত খারাপ করা মাত্র। ক্রমে ক্রমে জ্বর কম পড়িয়া তার পর আপনিই ছাড়িয়া যায়। এ জ্বর জোর করিয়া ছাড়াইবার যো নাই। কেবল রোগীর ও চিকিৎসকের ধৈর্য্য ভিন্ন উপায় নাই। আজ আর অন্য রোগীর কথা না বলিয়া নিজের

কথাই বলিব। আমি এইবার তিন সপ্তাহকাল স্বল্প-বিরামজ্বরে ভুগিয়াছি। প্রথম দুই চারি দিন খুব ধরাধর করিয়া কুইনাইন খাইলাম। তাহাতে বড় একটা ফল পাইলাম না। পরে আর কুইনাইন খাইলাম না। তার পর উনিশ দিনের দিন প্রাতে আমার শরীর বেশ খোলসা বোধ হইতে লাগিল। থার্মমিটার দিয়া জানিতে পারিলাম আজ বেশ একটু জ্বর কম আছে। তার পরদিন প্রাতে আর জ্বর মোটেই নাই। কিন্তু বৈকালে জ্বর হইল। তার পর রাত্রে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। তার পর চব্বিশদিনের দিন অন্নপথ্য করিলাম। অনেক রোগীকে জ্বরের এইরূপ শেষাবস্থায় রেমিসেনের সময় ২০।৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন দিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাচ জ্বর বন্ধ হয় নাই। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস এইরূপ কুইনাইন দেওয়াতে রোগী আরও বেশীদিন ভোগে এবং অনেক দিনপর্য্যন্ত দুর্ব্বল সারিতে পারে না। এইরূপ দুইটী রোগী ২৮ দিন ভুগিয়াছিল, পরে ভাত খাবার পরও দুই চারি দিন জ্বর হইয়াছিল এবং অনেক দিনপর্য্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

কয়েকটী ঔষধের গুণ ও প্রয়োগবিধি।

(এলোপ্যাথিমতে।)

৮ম ও ৯ম সংখ্যা সম্মিলনীতে "এণ্টিপাইরিন্" নামক ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে। সহযোগী অবিনাশ বাবু "এণ্টিপাইরিণের" গুরুতর দোষের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। তবে কিনা "একোহিদোষোগুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃকিরণেষ্বিবাঙ্কঃ"। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সহযোগী যে বলেন সে দোষটী বড়ই ভয়ানক। তিনি বলেন, যদি বিধির বিপাকে আর উত্তাপ না বাড়ে তবে রোগীকে একবারে নিমতলারঘাট দেখিতে হয়। বাস্তবিক এই কথাগুলি বড়ই ভয়ানক এবং ইহা মনে করিলে আর এ সকল ঔষধের উপর শ্রদ্ধা থাকে না। তবে কথা এই যে ডাক্তারি ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি ঐরূপ ধরণের ঔষধ আছে, সে গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ না করিলে পদে পদে বিপদ ঘটে। কিন্তু ছুরিতে হাত কাঁটে বলিয়া ছুরির ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে নাই।

কবিরাজী ঔষধমধ্যেও সেঁকবিষ, হলাহল, অহিফেণ ইত্যাদি নানাবিধ বিষপ্রয়োগ প্রচলিত আছে। তাহাতে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ না করিলে বিপদ ঘটিয়া থাকে।

এণ্টিপাইরিন্ প্রভৃতি ঔষধে যে বিপদ ঘটে, সেটী ডাক্তারদিগের যত দোষ, ঔষধের তত নহে। আমরা শাকভাতখেগো বাঙ্গালী। ঔষধগুলি বিলাতী, বিলাতী ঔষধের বিলাতিমাত্রা। আয়ুর্ব্বেদ এবং ডাক্তারিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে ঔষধের মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হইবে। সবলের পক্ষে যে মাত্রা, দুর্ব্বলের পক্ষে সে মাত্রা নহে। স্ত্রী ও বালক বৃদ্ধকে কমমাত্রায় দিতে হইবে। যে কোন ঔষধ বিলাতে আবিষ্কৃত হউক্ না কেন, বিলাতী ডাক্তার যে পরিমাণে ঔষধ দিতে বলেন, আমাদিগকে সে পরিমাণে না দেওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশীয় ডাক্তার মহাশয়েরা ঔষধপ্রয়োগকালে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলেই আর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বিলাত হইতে কোন নূতন ঔষধ আমদানী হইলে হঠাৎ তাহার গুণ শুনিয়া মোহিত না হইয়া অল্প অল্পপরিমাণে আমাদিগের দেশীয়লোকের উপর অগ্রে পরীক্ষা করা উচিত। আমরা তাহা করি না, যেহেতু আমরা অনুকরণপ্রিয়। অমুক ইংরেজ ডাক্তার বলিয়াছেন, ঔষধের গুণ অসীম, এই মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। বস্ আর কথা নাই, ঢাল ঔষধ সেই মাত্রায়, আর ওদিকেও রোগীর দফা রফা। কোন নূতন ঔষধ আমদানী হইলে অগ্রে তাহার বিশেষ গুণ ও দোষ অবগত না হইয়া প্রয়োগ করা নিতান্তই অনুচিত।

সহযোগী দেখিবেন যে আমার এণ্টিপাইরিন্ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এণ্টিপাইরিন্ দিতে নাই, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই কথাগুলি আমার নিজের নহে। তাহা পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পুনর্ব্বার লিখিত হইল। সহযোগী দেখিবেন যে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগে কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যথাঃ—

(১) হৃদয়ের দুর্ব্বলতা থাকিলে এণ্টিপাইরিন্ দিবে না।

(২) ডিপ্থিরিয়া এবং তৎসক্রান্ত নানাবিধ উপসর্গ যাহাতে হৃদয়ের পীড়া থাকে।

(৩) অতিরিক্ত রক্তস্রাবে নিষিদ্ধ।

(৪) স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন এবং বাধকের পীড়াতে এণ্টিপাইরিন্ দিতে নাই।

(৫) নিউমোনিয়া রোগে এণ্টিপাইরিন্ দিতে নাই। লোবার নিউমেনিয়াতে দিলে তত হানি নাই। কিন্তু তাহার সহিত ফুস্ফুস্ শোথ (ইডিমা অব্লঙ্গংস) থাকিলে কদাচ দিবে না।

(৬) কোন দুর্ব্বল অবস্থায় ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

(৭) ডাক্তার সেজ বলেন যে, প্রত্যেক নূতন রোগীতে এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগ করিতে হইলে খুব অল্পমাত্রায় দিবে। তারপর তাহার ফল দেখিয়া হয় ঔষধ চালাইবে না হয় বন্ধ করিবে।

(৮) প্যারিনগরের ডাক্তার লিয়ন আর্ ডুইন্ বলেন "যে সকল ব্যক্তির হৃদয় দুর্ব্বল তাহাদিগের সম্বন্ধে এণ্টিপাইরিণের কথা মনেও করিতে নাই। যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল তাহাদিগকে প্রথমতঃ খুব অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে গেলে প্রত্যেক নূতন রোগীতে খুব্ অল্পমাত্রায় এণ্টিপাইরিন্ দিয়া পরীক্ষা করা উচিত যে সে, এণ্টিপাইরিন্ সহ্য করিতে পারে কি না"।

স্যালোল (Salol)—এই ঔষধটী স্যালিসিলিক এসিড্ এবং ফিনোল্ এই উভয়ের যোগে প্রস্তুত। ইহাতে স্যালিসিলিক এসিড্ ৬০ ভাগ এবং ফিনল্ ৪০ ভাগ আছে। ইহা স্বাদ এবং গন্ধবিহীন। জলে দ্রবণীয় নহে। ইহা পাকস্থলীর পাচকরসে দ্রব হয় না, তবে প্যান্ক্রিয়াসের রসে (Pancrecticgice) দ্রবণীয়। এজন্য এই ঔষধ পাকস্থলীর ডিওডিনম্ পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে শরীরের কার্য্যে লাগে না। এইনিমিত্ত পাকস্থলীর দুর্ব্বলাবস্থায় ইহা বেশ উপযোগী। তরুণ বাতরোগে ইহা চমৎকার উপকার করে। ডাং ক্যাণ্ডওয়েল বলেন যে স্যালোল পুরাতন এবং নূতন বাতরোগে তথা সায়েটিকা, নিউর‍্যাল্জিয়া, শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে উপকার করে। স্যালোল এই সকল পীড়াতে রক্তপরিষ্কার এবং শরীর সংশোধন হইয়া উপকারক হয়। ইহা উত্তাপ নিবারক এবং এণ্টিসেপ্টিক্ (পচন নিবারক)। অজীর্ণরোগ, সিস্টাইটিস্ (মূত্রাধারের প্রদাহ) পাইলাইটিস্, ক্ষত, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি

রোগে পচননিবারক হইয়া স্যালোল উপকারক হয়। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার সম্পাদক।

সমালোচনা।

নারীতত্ত্ব। হিন্দুমহিলাদিগের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্বোধন বিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত। ১ নং অপারসারকিউলাররোড, বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

গ্রন্থখানি বড় সুন্দর হইয়াছে। পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। হিন্দুমহিলারা পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এমন অনেক কথাই ইহাতে আছে। আর স্ত্রী হইয়া যাঁহারা ঘরসংসার করেন, তাঁহাদেরও এ সকল তত্ত্ব জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। গ্রন্থকার পুরাণাদিশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গৃহিণীগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

চিকিৎসা-লহরী। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বৈদ্যক, অবধৌতিক ও মুষ্টিযোগাদি চিকিৎসা এবং বিবিধ গৃহস্থালী বিষয়ক মাসিকপত্রিকা। কলিকাতা মাণিকতলা ২৪। এ নং যোগীপাড়া লেন হইতে শ্রীরামকুমার নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

এই পঞ্চবিধ চিকিৎসাময়ী মাসিকপত্রিকার আকার ডিমাই এক ফর্ম্মা মোটে বারপাতা। এই দ্বাদশপত্রের মধ্যে দ্বাদশটি রোগের ঔষধ ও পথ্য-সমেত চিকিৎসা-প্রণালী, গোচিকিৎসা, তারপর কেশবিন্যাস প্রণালী ও অলঙ্কার পরিষ্কার করার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। শেষে মলাটে মিষ্টান্ন ভোজনের কথা, তাসখেলার রীতি ও একটি চোরের গল্প দিয়া শেষ করা হইয়াছে। প্রকাশক নাথ মহাশয় চিকিৎসক কি না তাহা জানি না, তিনি একধারে যে এত কাজ করিতে পারেন এবং এই ক্ষুদ্রাধারে যে এতকাজ পূরিতে পারেন, তাঁহার বাহাদুরীকে ধন্যবাদ। দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি একটী যন্ত্রপ্রচার করুন, যাহার দ্বারা গরু, মানুষ, ছাগল, বিড়াল, বানর, বনমানুষ সকল জন্তুর সকল রোগ জন্মের মত উড়িয়া যাইবে, জীব জগত একবারে অমরতা লাভ করিবে।

কবিরাজ সম্পাদক।